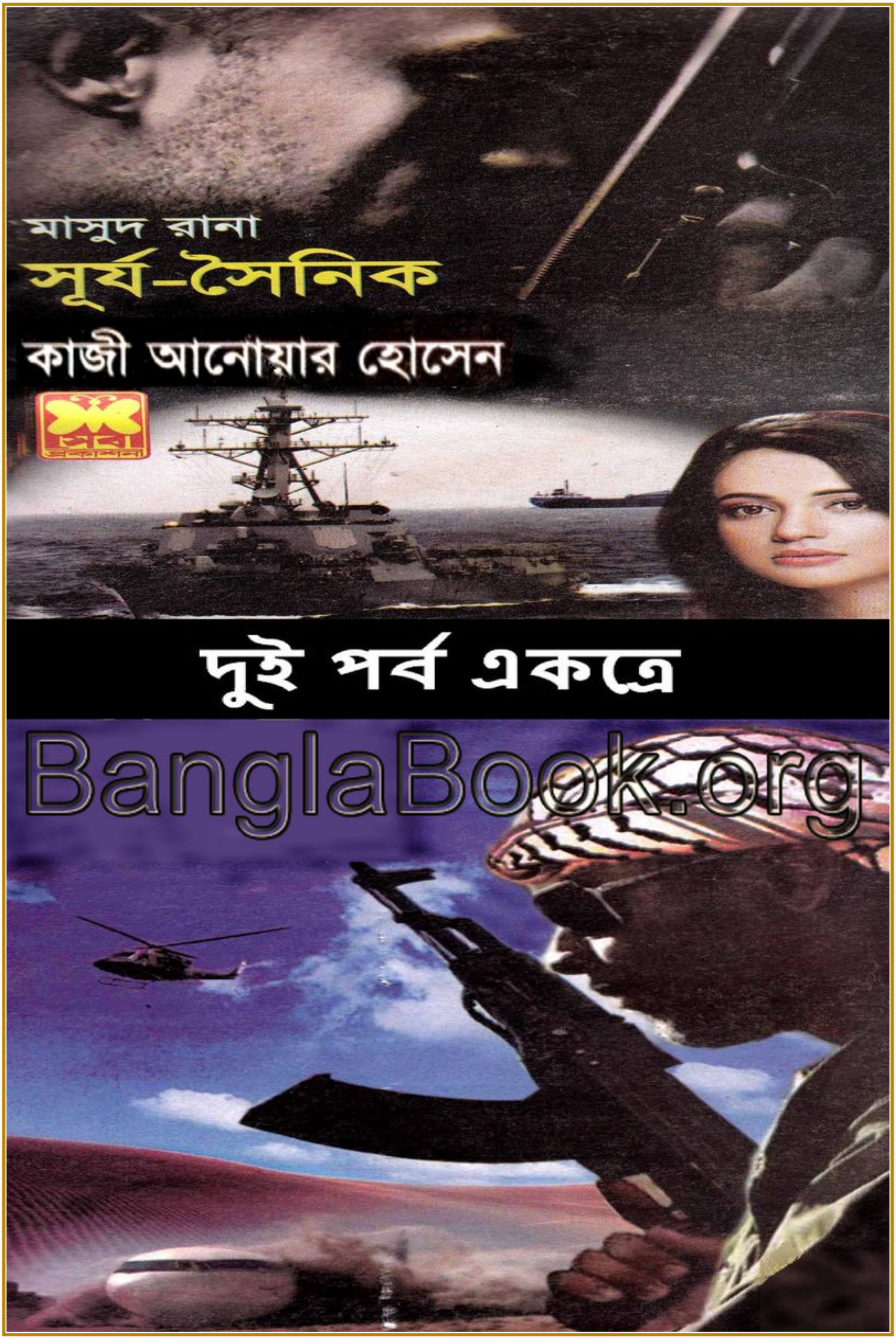

মাসুদ রানা
সূর্য-সৈনিক
কাজী আনোয়ার হোসেন
দুই পর্ব একত্রে
BanglaBook.org

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

মাসুদ রানা

সূর্য-সৈনিক

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ঘিরেছে বারবারি উপকূলের রাজধানী ত্রিপোলিকে। বহু দূর থেকে চোখে পড়ছে দুর্গ-শহর। দেখলে মনে হয় ওখানে বাস করে রূপকথার কোনও দুষ্ট জাদুকর। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পাথরের বাড়ি, তীরের কাছে বাশাওয়ের প্রকাণ্ড কেল্লা। আশপাশে কোথাও গাছপালা নেই বললেই চলে।

আঠারো শ' তিন সাল। মার্চের প্রথম সপ্তাহ। ত্রিপোলি উপসাগর। বীরদর্পে এগিয়ে চলেছে দুটি মার্কিন রণতরী।

আমেরিকার স্কোয়াড্রন মাত্র কয়েক শ' গজ যেতে না যেতেই আচমকা শুরু হলো প্রবল সামুদ্রিক ঝড়। মাথার উপর নড়ে উঠল ঘন কালো মেঘ, শুরু হলো একের পর এক বজ্রপাত। চমকে উঠে আঁকাবাঁকা হলুদ রেখায় আকাশ চিরে দিয়ে সাঁৎ করে ঢুকে যাচ্ছে সাগরের বুকে। প্রচণ্ড হাওয়া লাগতেই টলমল করে উঠল জাহাজ দুটো, তারপর ছুটল ভীতা হরিণীর মত। কেচ 'অ্যাডভেঞ্চার' ও তার চেয়ে বড় ব্রিগ 'সিগনাল' ঠেলা-ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এল তীর থেকে অনেক দূরে।

রণতরী সিগনালের ডেকে স্পাইগ্লাসের ভিতর দিয়ে চারপাশ দেখছে লেফটেন্যান্ট জেফ মার্টেল। সিগনালের ফার্স্ট অফিসার সে। বহু দূরে একপলক দেখল ত্রিপোলি বন্দরের কাছে বিশাল মাস্তুল নিয়ে আটকে আছে রণতরী ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া।

এদিকের সাগরে ভয়ানক দাপট আরব জলদস্যুদের.

তারপরও আমেরিকা থেকে দুই রণতরী এসেছে শুধু ওই আটকে পড়া ফ্রিগেট ক্যালিফোর্নিয়ার কারণে।

সাত মাস আগে বারবারির এক দস্যু-তরীকে কোণঠাসা করে ফ্রিগেট ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া, কিন্তু নিজেই ফেঁসে যায় ত্রিপোলির কুখ্যাত বন্দরের অগভীর পানিতে। সে সময় জাহাজ রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন ফ্রিগেটের ক্যাপ্টেন, চার্লস হ্যানলি। সাগরে ফেলে দেন পঞ্চাশটা কামান। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি, ওজন কমিয়েও ভেসে উঠতে পারেনি ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া। জোয়ার আসতে তখনও অনেক দেরি। বারোটা দস্যু গানবোট চারদিক থেকে ঘিরে গোলাবর্ষণ শুরু করে রণতরীর উপর। শেষে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেন হ্যানলি। তাঁকে এবং তাঁর সৈনিকদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় বাশাওয়ের রাজ দরবারে। সেই সময়ে ওই শহরে ছিলেন এক ডাচ কনসাল, পরে তাঁর কাছ থেকে জানা গেছে: ক্যাপ্টেন হ্যানলি ও তাঁর পদস্থ অফিসারদের যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গেই রাখা হয়েছে। তবে সাধারণ নাবিক ও সৈনিকদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দেয়া হবে বারবারির জলদস্যুদের কাছে।

এরপর ভূমধ্যসাগরে আমেরিকান ফ্লিট কমাণ্ডাররা অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করলেন, ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়াকে নতুন করে দখল করা অসম্ভব। আর দখল করতে পারলেও, ওটা নিয়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয় ত্রিপোলির বন্দর থেকে—কাজেই পুড়িয়ে দেয়া হবে জাহাজটাকে। এদিকে কয়েক হাত ঘুরে এল তথ্য: ত্রিপোলি রাজ্যের শাসক. বাশাও আমেরিকানদের ছেড়ে দিতে পারেন, তবে সেজন্য তাঁকে উপহার দিতে হবে নগদ পাঁচ লক্ষ ডলার।

শত শত বছর ধরে বারবারি উপকূলের দুঃসাহসী জলদস্যুরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে হামলা করে আসছে, জাহাজ নিয়ে চলে

যাচ্ছে সুদূর উত্তরে আয়ারল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডে। শহরের পর শহর লুঠ করছে, ওসব দেশ থেকে ধরে আনছে লাখ লাখ মানুষকে। তাদের অনেকে হয়েছে জাহাজের গ্যালির ক্রীতদাস। অন্যদেরকে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে উত্তর-আফ্রিকার বাজারে। সুন্দরী, সাদা মেয়েদের স্থান হয়েছে ক্ষমতাশালী শাসনকর্তাদের হারেমে। ধনী বন্দির আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুরা মুক্তিপণ দিলে দেশে ফিরবার সুযোগ পেয়েছে তারা। তবে ক্রীতদাস হিসাবে বাকি জীবন থাকতে হয়েছে সাধারণ মানুষদের, অমানুষিক পরিশ্রম করে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয়েছে বিনা চিকিৎসায়।

ইংল্যাণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের রয়েছে শক্তিশালী নেভি, তারপরও বাণিজ্য-তরীগুলোর নিরাপত্তার স্বার্থে অস্বাভাবিক হারে নিয়মিত চাঁদা দিতে হচ্ছে তাদেরকে। তাঞ্জিয়ার, তিউনিস এবং ত্রিপোলির প্রধান শাসক বারবারি উপকূলের এই তিন নগর-কর্তা তুলছে এ চাঁদা।

তখন মাত্র ইংল্যাণ্ড থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছে শিশু রাষ্ট্র ইউনাইটেড স্টেট্স্, প্রাক্তন শাসকের ইউনিয়ন জ্যাকের নীচ থেকে সরে গেছে। সামুদ্রিক বাণিজ্য করতে গিয়ে তারা দেখল দেশের আয়করের দশ ভাগের এক ভাগ তুলে দিতে হচ্ছে জলদস্যুদের হাতে, নইলে লুঠ হচ্ছে জাহাজ। এভাবে চলল বেশ কিছুদিন, তারপর হঠাৎ সব বদলাতে লাগল। তৃতীয় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন টমাস জেফারসন, তিনি ঘোষণা দিলেন: এরপর থেকে জলদস্যুদের একটা পয়সাও চাঁদা দেবে না ইউনাইটেড স্টেট্স্।

বারবারি উপকূলের নগর-কর্তারা ঘোষণা করলেন, নতুন ওই দেশের নেতা খামোকা হুমকি দিচ্ছেন। কাজেই তাঁরা তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

জবাবে টমাস জেফারসন মহাসাগরে ভাসালেন জাহাজের এক

মস্ত আর্মাডা।

ওই বিশাল রণতরীর বহর দেখে তাঞ্জিয়ারের সম্রাট বুঝলেন চাঁদা তুলবার দিন শেষ। তিনি দেরি না করে সমস্ত আমেরিকান নাবিকদের বন্দিশালা থেকে মুক্ত করে দিলেন, জানিয়ে দিলেন ইউনাইটেড স্টেট্স্‌কে এখন থেকে চাঁদা দিতে হবে না। বদলে কমোডোর এডি টিসন আটকে রাখা দুটি বারবারি বাণিজ্য-তরী ফিরিয়ে দিলেন সম্রাটকে।

তবে ঘাবড়ে গেলেন না ত্রিপোলির বাশাও। এর বড় কারণ তাঁর জলদস্যুরা দখল করে নিয়েছে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া। বিশাল এ জাহাজের নতুন নাম রাখা হলো ইউনূসের তরী। আমেরিকানদের এতবড় জাহাজ দখল করে শক্ত অবস্থান নিলেন বাশাও, চাইলেন না কোনও চুক্তি করতে। আমেরিকান কমাণ্ডাররা জানেন বারবারি উপকূলের জলদস্যুরা দখল করলেও ওই ফ্রিগেটকে দস্যু-তরী হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। তবে নিজ দেশের জাহাজের জ্যাক স্টাফ থেকে বিদেশি পতাকা উড়তে দেখে তাঁদের রক্ত গরম হয়ে উঠল, কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারলেন না তাঁরা।

এরপর বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেছে।

আজ পাঁচদিন হলো ত্রিপোলি বন্দরে ক্যালিফোর্নিয়ার উপর চোখ রাখছে আমেরিকান নেভি। জাহাজটা ভাসছে ত্রিপোলির বন্দরের ভিতর অংশে। ওটাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে তীরে বসানো দেড় শ' কামান। আমেরিকান দুই রণতরীর ক্যাপ্টেন ভেবেচিন্তে ক্যালিফোর্নিয়াকে জ্বালিয়ে দেবার উপায় খুঁজে পাওয়ার আগেই উঠল তুমুল ঝড়। এখন একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভেসে চলেছেন ঝড়ের তোড়ে। তুমুল হাওয়া ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তাঁদেরকে পুব সাগরে।

ঝড়ের সঙ্গে লড়তে লড়তে হতক্লান্ত হয়ে পড়েছে সিগনালের

সবাই। ফার্স্ট অফিসার জেফ মার্টেল ভাবতে পারছে না কীসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে রণতরী অ্যাডভেঞ্চারের নাবিকরা। ওই জাহাজটা সিগনালের চেয়ে অনেক ছোট, মাত্র চৌষট্টি টনি। আগে ছিল ক্রীতদাস বহনকারী জাহাজ। তিন মাস আগে ওটা দখল করে নিয়েছে আমেরিকান নেভি। তখন নাম ছিল হালিদা। ওটার হোল্ডে ছিল উনষাট জন আফ্রিকান ক্রীতদাস, বেঁধে রাখা হয়েছিল শিকল দিয়ে। ত্রিপোলির বাশাওয়ের তরফ থেকে উপহার হিসাবে পাঠানো হচ্ছিল তাদের ইস্তাম্বুলের সুলতানের কাছে।

মার্চের তেরো তারিখে শেষপর্যন্ত থামল সামুদ্রিক ঝড়।

ষোলো তারিখে দুই রণতরীর রন্দেভু হলো। এরপর আবারও রওনা হলো তারা ত্রিপোলির দিকে।

সে-রাতে স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডার, ক্যাপ্টেন জ্যাচ রেমণ্ড যুদ্ধ-পরিকল্পনার জন্য জরুরি মিটিং ডাকল। খুদে অ্যাডভেঞ্চারের ক্যাপ্টেনের কেবিনে বসল অফিসাররা। সশস্ত্র আটজন নৌ-সেনা নিয়ে নৌকায় করে ওই জাহাজে গেল লেফটেন্যান্ট জেফ মার্টেল।

নিচু গানেলে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে মার্টেলকে তুলে নিল ক্যাপ্টেন জ্যাচ রেমণ্ড। ঠাট্টা করল, 'ও? আরামসে ঝড় পার করে এখন বিজয়ের স্বাদ নিতে চাইছ?'

অ্যাডভেঞ্চারের ক্যাপ্টেন সুদর্শন সুপুরুষ। চওড়া কাঁধ, মাথাভরা ঘন কালো চুল। যে কাউকে আকর্ষণ করে তার বুদ্ধিদীপ্ত বাদামি চোখ, মুহূর্তে সবাই মেনে নেয় তার কর্তৃত্ব।

'দুনিয়ার সব কিছুর বদলে বিজয় চাই, স্যর,' বলল মার্টেল।

এ দু'জনের পদবী সমান, বয়সেও সমান। যখন মিডশিপমেন ছিল, তখন থেকে তাদের বন্ধুত্ব।

দৈর্ঘ্যে জেফ মার্টেল বন্ধুর সমান। তবে অপেক্ষাকৃত হালকা-পাতলা, ঠিক যেন পাকা কোনও ফেন্সার। ওর চোখের মণি দুটো এতই ঘন কালো, মনে হয় কয়লার টুকরো। এখন তার পরনে

স্থানীয় পোশাক। ছদ্মবেশের কারণে লাগছে কিংবদন্তীর জলদস্যু ইউনুস আল-কবিরের মত। মনে মনে তার আশা, একদিন মুখোমুখি হবে ওই দস্যুর। কানাডার মণ্ট্রিয়লে জন্মেছে মার্টেল, তবে ষোলো বছর বয়সে চলে আসে ইউনাইটেড স্টেট্সে। ওর জানার কৌতূহল ছিল, কীভাবে পরিচালিত হবে গণতান্ত্রিক দেশ। কিছুদিন পর নাগরিত্ব নেয়, দশ বছর কাজ করে টিমবার স্কুনারে। শেষে যোগ দেয় আমেরিকান নেভিতে।

চৌষট্টি ফুটি অ্যাডভেঞ্চারে গাদাগাদি হয়ে অপেক্ষা করছে আশিজন যোদ্ধা। তাদের কেউ কেউ ছদ্মবেশ পরেছে। বেশির ভাগ যোদ্ধা লুকিয়েছে গানেলের পিছনে, কিংবা অবস্থান নিয়েছে হোল্ডে। পরে যখন পাল তুলে ত্রিপোলির পাথুরে ব্রেকওয়াটার পেরুবে অ্যাডভেঞ্চার, ঢুকে পড়বে বন্দরের অভ্যন্তরে, তখন এই লোকগুলো ডেকে দাঁড়িয়ে লড়বে।

'মার্টেল, এসো পরিচয় করিয়ে দিই ব্রুনো মার্সের সঙ্গে। বন্দরের কাছাকাছি হলে সারেঙের কাজ করবে ও।'

চওড়া দেহের লোক ব্রুনো মার্স, গায়ের রং কালচে। মুখ ভরা ঘন কালো দাড়ি, পুরো বুক ঢেকে ফেলেছে। নোংরা সুতির পাগড়ি ঘিরে রেখেছে বিরাট মাথাটাকে। কোমর-বন্ধ থেকে ঝুলছে বাঁকা ছোরা। হাতলে ঝিকমিক করছে লাল পাথর।

সারেঙের সঙ্গে হাত মেলাতে চাইল মার্টেল, তবে তার আগে জ্যাচ রেমণ্ডের কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'এ বোধহয় স্বেচ্ছাসেবী নয়?'

'অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে ওর পিছনে,' তিক্ত স্বরে বলল জ্যাচ রেমণ্ড।

'আপনাকে দলে পেয়ে খুব খুশি হলাম, মিস্টার মার্স,' বলল মার্টেল, খপ্ করে ধরল ইটালিয়ানের ঘর্মাক্ত হাত। 'আমাদের যুদ্ধে সামিল হওয়ার জন্য ইউএসএস সিগনালের সবার তরফ

থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

চওড়া হাসি দিল ব্রুনো। তার দাঁত ফাঁক ফাঁক। 'বাশাওয়ের দস্যুরা বহুবার আমার জাহাজে হামলা করেছে। তাই ভাবলাম, এইবার প্রতিশোধ নিলে কেমন হয়।'

'খুব ভাল লাগছে যে আপনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন,' একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল মার্টেল। চারদিকে চাইতে শুরু করেছে।

অ্যাডভেঞ্চারের মাত্র দুটো মাস্তুল এখনও খাড়া, কাত হয়ে গেছে কয়েকটা। যে হাওয়া ধরছে পালগুলো, সব লবণে ভরা। কাপড়ের এখানে ওখানে তালি-পট্টি দেয়া। অবশ্য ডেক ঘষা হয়েছে লাই ও পাথর দিয়ে। চকচক করছে ওক কাঠ। মার্টেলের চোখ জ্বলছে লাইয়ের ধকে।

অ্যাডভেঞ্চারে রয়েছে মাত্র চারটি ছোট ক্যারোনেড। নেভির এ কামান গোলা ছুঁড়লে রেলের উপর পিছিয়ে যায়, লাফিয়ে ওঠে না চাকার উপর। এদিকে রেইডিং পার্টি শুয়ে পড়েছে ডেকের উপর, হাতের পাশে মাস্কেট ও তলোয়ার। বেশিরভাগ সৈনিককে দেখতে লাগছে অসুস্থ। গত ক'দিনের ঝড় মস্ত ঝাঁকি দিয়ে গেছে সবাইকে।

জ্যাচ রেমণ্ডের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল মার্টেল। 'ভাল লোক নিয়ে লড়তে চাইছ।'

'টিটকারি দেয় কে রে?' ভুরু কুঁচকে বন্ধুকে দেখল রেমণ্ড। 'বলো দেখি জাহাজটা কার? শুনিনি তো কেউ তোমাকে ক্যাপ্টেন বলে ডেকেছে কোনদিন। অথচ দেখো, বছরের পর পর সার্ভিস দিয়ে চলেছ।'

'কথা ঠিক, ক্যাপ্টেন!' হাসিমুখে মেনে নিল মার্টেল।

সে রাতে মিটিং শেষে যে যার দায়িত্ব বুঝে নিল।

পরের রাতে অনুকূল হাওয়া বইতে শুরু করল। ত্রিপোলির দিকে ছুটল অ্যাডভেঞ্চার। পালা করে ব্রাসের টেলিস্কোপ চোখে

তুলল মার্টেল ও রেমণ্ড।

পরদিন ফাঁকা বিশাল মরুভূমির বুকে জেগে উঠল প্রাচীর ঘেরা দুর্গ-নগরী। বাশাওয়ের কেল্লা ও উঁচু দেয়ালে দেখা গেল কামান, সংখ্যায় এক শ' পঞ্চাশটি। রক্ষা করছে পুরো নগরী। সমুদ্র-প্রাচীরের কারণে দূর থেকে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়ার মাত্র তিনটি মাস্তুল দেখা গেল।

'তোমার কী মনে হয়?' জানতে চাইল জ্যাচ রেমণ্ড। এবারের আক্রমণের জন্য মার্টেলকে ফার্স্ট অফিসার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সে। ইটালিয়ান সারেঙের পিছনে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই বন্ধু।

অ্যাডভেঞ্চারের ফোলা পালের দিকে চাইল মার্টেল। পরক্ষণে দেখল পিছন-সাগরে ফেনা তৈরি করছে জাহাজটা। গতিবেগ হবে চার নট। 'আমার মনে হয় গতি কমানো উচিত। নইলে সূর্যাস্তের আগেই বন্দরে ঢুকে পড়ব।'

'তা হলে টপ সেইল আর জিব গুটিয়ে নিতে বলব, ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইল ব্রুনো মার্স।

'বোধহয় তা-ই ভাল।'

সময় পেরুতে লাগল, দীর্ঘ হলো মাস্তুলের ছায়া, শেষে মিলিয়ে গেল এক সময়। সূর্যের শেষ রশ্মি ঠিকরে উঠল পশ্চিম দিগন্তে। ত্রিপোলির উপসাগরে প্রবেশ করল অ্যাডভেঞ্চার, এগুতে লাগল দুর্গ-নগরীর সুউচ্চ প্রাচীর লক্ষ্য করে। নতুন চাঁদের আলোয় বাশাওয়ের বিশাল কেল্লা ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। উঁচু প্রাচীর ও কেল্লার গায়ে কালো ফোঁটার মত কী যেন। ওগুলো বিধ্বংসী কামান, সামনে থেকে দেখলে ভয়ই লাগে। প্রাচীরের ওপাশে চোখে পড়ল মসজিদের মাথার উপর গম্বুজ। অ্যাডভেঞ্চারের সবার কানে দূর থেকে ভেসে এল আযানের ধ্বনি। সূর্য ডুববার আগমুহূর্তে নামাযের জন্য ডাকছেন মোয়াজ্জিন।

বাশাওয়ের কেল্লার ঠিক নীচে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া। দূর থেকে মনে হলো ভাল অবস্থায় রাখা হয়েছে জাহাজটাকে। সাগরে ফেলে দেয়া হয়েছিল কামানগুলো, কিন্তু আবার উদ্ধার করা হয়েছে। প্রতিটি রয়েছে গানপোর্টে।

নিঃসঙ্গ ওই জাহাজ দেখে একই সঙ্গে কয়েকটা অনুভূতি হলো মার্টেলের ভিতর। ভাবছে, কী অপূর্ব সুন্দর জাহাজ, আর কী প্রকাণ্ড! আবার রেগে উঠল, ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়ার স্টার্নে ঝুলছে ত্রিপোলির বাশাওয়ের পতাকা। ওই রণতরীর তিন শ' সাতজন নাবিক-সৈনিককে বন্দি করে রেখেছে বাশাও। এখন যদি জ্যাচ রেমণ্ড নির্দেশ দেয়, দ্বিধা না করে সৈনিকদের নিয়ে আক্রমণ করবে সে বাশাওয়ের কেল্লা, চেষ্টা করবে বন্দিদের উদ্ধার করতে। কিন্তু মনের গভীরে জানে মার্টেল, কখনও এ নির্দেশ আসবে না। সমগ্র ভূমধ্যসাগরের কমাণ্ডার, কমোডোর টিসন ওদের জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এমন কোনও ঝুঁকি নেবেন না যার ফলে, বারবারি জলদস্যুরা আরও বেশি আমেরিকানকে বন্দি করতে পারে।

বন্দরের ব্রেকওয়াটারের চারপাশে নোঙর ফেলেছে কমপক্ষে বারোটা জাহাজ। সেগুলোর ভিতর রয়েছে ল্যাটিন রিগ মার্চেণ্টিমেন থেকে শুরু করে জলদস্যুদের জাহাজও। ছোট বড় বিভিন্ন আকারের জাহাজ থেকে মুখ বের করে রয়েছে কামান। বিশটা গোনার পর হিসাব বাদ দিল মার্টেল।

নতুন অনুভূতি আঁকড়ে ধরল হৃৎপিণ্ডকে।

হ্যাঁ, ভয় লাগছে তার।

সব যদি পরিকল্পনা মত না চলে, ওদের পক্ষে অ্যাডভেঞ্চার সহ বন্দর থেকে আর বেরুনো সম্ভব হবে না। জাহাজের প্রতিটি মানুষ লাশ হয়ে পড়ে থাকবে। অথবা তার চেয়েও খারাপ, হয়তো বন্দি হবে তারা, এবং বাকি জীবন বরণ করতে হবে ক্রীতদাসত্ব।

গলা শুকিয়ে গেল মার্টেলের। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলাস প্র্যাকটিস করে নিজের দক্ষতা বাড়িয়েছে সে। কিন্তু এখন মনে হলো না সে বিদ্যা খুব কাজে আসবে। কোমর-বন্ধনির দু'পাশের খাপে গুঁজে রেখেছে বেমানান চেহারার দুটো .৫৮ ক্যালিবারের ফ্লিন্টলক পিস্তল। ওগুলো যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। চট্ করে দেখে নিল অ্যাডভেঞ্চারের গানেলের আড়ালে শুয়ে থাকা সৈনিকদের। তাদের সঙ্গে কুঠার-বর্শা-তলোয়ার ও ছোরা। আরব জলদস্যুদের মতই রক্ত-তৃষ্ণা নিয়ে অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকে স্বেচ্ছাসেবী, দেশের জন্য যে-কোনও সময় জান দিতে রাজি। তাদের মাঝে হাঁটছে এক মিডশিপম্যান, নিশ্চিত হচ্ছে স্কোয়াড লিডাররা তাদের লণ্ঠন জ্বেলে নিয়েছে। হ্যাঁ, সবাই প্রস্তুত। তিমি মাছের তেলে ভিজানো সলতে তৈরি।

আরেকবার ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে চাইল জেফ মার্টেল। অনেক কাছে চলে এসেছে। ওই দেখা যায় রেইলে দাঁড়িয়ে তিন প্রহরী, পরিষ্কার চোখে পড়ল ওদের কোমরে ঝুলানো দীর্ঘ তলোয়ার।

মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে। আরও দু'ঘণ্টা লাগল ফ্রিগেটের কাছাকাছি হতে। এবার চেঁচিয়ে কথা বললে শুনবে লোকগুলো।

আরবিতে ফাটা গলা ছাড়ল ব্রুনো মার্স, 'অ্যাহোয়, শুনছ?'

'কী চাও?' একজন পাল্টা জানতে চাইল।

'আমি ব্রুনো মার্স,' বলে উঠল ইটালিয়ান সারেং। জ্যাচ রেমণ্ড ও মার্টেলের তৈরি খসড়া অনুযায়ী গড়গড় করে বলতে লাগল, 'এই জাহাজটা হালিদা। গরু-ছাগল-দুম্বা বিক্রিতে এসেছি। পৌঁছে দেব মাল্টার ব্রিটিশ বেসে। কিন্তু ঝড় শুরু হলো, অন্য দিকে সরে গেলাম। খসে পড়েছে নোঙর। থামতেও পারছি না। রাতের জন্য তোমাদের সুন্দর জাহাজে দড়ি বাঁধতে পারি? সকালে ডকে নেমে নোঙর কিনব।'

'ব্যস, আর কিছু বলার নেই,' মার্টেলের কানের কাছে বলল জ্যাচ রেমণ্ড। 'ওরা যদি আপত্তি করে, ঝামেলার ভিতর পড়ব।'

'থামতে দেবে। ওদের দিক থেকে ভেবে দেখো। কেউ এত ছোট জাহাজ নিয়ে ভিড়তে চাইলে কী-ই বা ভাবতাম আমরা?'

'না, কিছুই ভাবতাম না।'

প্রহরীদের নেতা খসখস করে দাড়ি চুলকাল, সন্দেহ নিয়ে চাইল অ্যাডভেঞ্চারের দিকে, তারপর চেঁচিয়ে জানাল, 'ঠিক আছে! দড়ি বাঁধতে পারো। তবে ভোরে সরে যাবে।'

'অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন। দশটা ছেলে দিন।' মুখ না ফিরিয়ে নিচু স্বরে বলল মার্স, 'ওরা রাজি হয়েছে।'

পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে জ্যাচ রেমণ্ড ও জেফ মার্টেল। হালকা হাওয়া অ্যাডভেঞ্চারকে নিয়ে চলেছে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়ার পাশে। ফ্রিগেটের কামানগুলো দেখছে ওরা, নলের মুখ থেকে নিরাপত্তা-খাপ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রকাণ্ড লাগছে একেকটা গহ্বর। এখন যদি বুঝে ফেলে জলদস্যুরা, এত কম রেঞ্জে শলার কাঠির মত মট্ করে ভাঙবে অ্যাডভেঞ্চার, ছিন্নভিন্ন হবে আশিজন সৈনিক।

আরও কাছে চলে গেল অ্যাডভেঞ্চার। ওটার ডেক থেকে পনেরো ফুট উপরে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়ার রেলিং। ওখানে আলাপ করছে প্রহরীরা, আঙুল তুলে দেখাল অ্যাডভেঞ্চারের গানেল। ওখানে গুটিশুটি মেরে অনেকে বসে রয়েছে।

দুই জাহাজের মাঝে এখনও দশ ফুট দূরত্ব। এমন সময় এক প্রহরী চেঁচিয়ে উঠল, 'আমেরিকানো!'

'আপনার লোকদের বলুন হামলা করতে,' প্রায় কেঁদে ফেলল ব্রুনো মার্স।

'কমাণ্ডিং অফিসার না বললে কেউ আক্রমণ করবে না,' কড়া স্বরে বলল জ্যাচ রেমণ্ড।

ক্যালিফোর্নিয়ার ডেকে বারবারি জলদস্যুরা সড়াৎ করে বের করে ফেলেছে তলোয়ার। তাদের একজন পিঠের ক্রস-ফিতা থেকে বের করতে চাইল ব্লাণ্ডারবাস* । দুই জাহাজে ঘর্ষণ হতেই চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিল জ্যাচ রেমণ্ড, 'জাহাজে ওঠো!'

বুকে ঝুলছে খুদে বাইবেল, একবার ওটা স্পর্শ করল মার্টেল, তারপর এক লাফে উঠে পড়ল খোলা এক গানপোর্টে। এক হাতে আঁকড়ে ধরল কাঠের ফ্রেম, অন্যহাত রাখল হালকা গরম ব্রোঞ্জের কামানে। ওপাশের ফ্রেম ও কামানের মাঝ দিয়ে গলিয়ে দিল দুই পা, পিছলে ঢুকে গেল জাহাজের পেটে। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েই খাপ থেকে বের করল তলোয়ার।

নিচু ছাত থেকে ঝুলছে মাত্র একটা লণ্ঠন। সে আলোয় দেখা গেল আরেকটা গানপোর্ট থেকে হুড়মুড় করে পিছিয়ে গেল দুই জলদস্যু। লাফিয়ে জাহাজে উঠছে আমেরিকান সৈনিক। দুই জলদস্যুর একজন ঘুরেই মার্টেলকে দেখতে পেল। দেরি না করে খাপ থেকে চওড়া ফলার তলোয়ার বের করল, খালি পায়ে তেড়ে এল ডেক মাড়িয়ে। কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার। নিরস্ত্র বা আনাড়ি কাউকে আক্রমণ করবার সময় এ কৌশলে বেশ ভাল ফল দেয়।

ঘাবড়ে গেল না জেফ মার্টেল। থমকে না গিয়ে চেয়ে রইল শীতল চোখে। তেড়ে আসছে শত্রু। কোমরের পাশ থেকে তলোয়ার চালাল লোকটা। দু' টুকরো করতে চাইছে। তবে হালকা পায়ে এক ফুট সামনে বাড়ল মার্টেল, দেরি না করে

* বড় বোরের অস্ত্র। একসঙ্গে ছিটকে বের হয় অজস্র বল। আহত হয় অনেকে।

নিজের তলোয়ার গেঁথে দিতে চাইল শক্রর বুকে।

শেষ মুহূর্তে থামতে পারল না জলদস্যু, পাঁজরের ভিতর পড়পড় করে ঢুকল মার্টেলের তলোয়ারের ফলা, বেরিয়ে গেল পিঠ ভেদ করে। লোকটার হাত থেকে খসে পড়ল ভারী তলোয়ার, ঠনাৎ করে পড়ল ডেকে। আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে শক্রর বুকে এসে পড়ল জলদস্যু, শিথিল। মার্টেল এক হাঁটু তুলে তাকে ঠেলে দিয়েই বুক থেকে হ্যাঁচকা টানে বের করে নিল ফলা, চরকির মত ঘুরল। পাশেই ছায়া। ঝপ্ করে বসে পড়ল। ওর মাথার উপর দিয়ে গেল ধারালো কুঠারের ফলা। কাঁধ খুঁজে না পেয়ে সরছে আরেকদিকে। বাঁ পাশ থেকে তলোয়ার চালাল মার্টেল, ফলার ডগা চিরচির করে কাটল লোকটার কাপড়-ত্বক এবং পেশি। পুরো পেট চিরতে পারেনি, তবে মার্টেল দেখল গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত। ওই লোক আর লড়বে না।

গোটা গানডেক জুড়ে যেন নারকীয় দৃশ্য। আবছা আলোয় কুঠার নিয়ে ব্যস্ত কালো মূর্তিগুলো, একে অপরের দেহে ফলা গেঁথে দিতে চাইছে। তলোয়ারের ইস্পাতে ইস্পাত ঠনাৎ-ঠং লাগছে। একে অপরকে ফুটো করছে। ব্যথায় কাতরে উঠছে আহতরা। গান-পাউডারের গন্ধে বাতাস ভারী। সব ছাপিয়ে আসছে রক্তের আঁষটে ঘ্রাণ।

লড়াই থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আরেকদিকে চলল মার্টেল। তলোয়ার বা বর্শা নিয়ে লড়াইয়ের জন্য উপযুক্ত জায়গা নয় গানডেক। তবে প্রাণপণ লড়ে চলেছে দুই পক্ষ। এক আমেরিকান সৈনিক পড়ে গেল। তার বুকে তলোয়ার গেঁথে দিয়েছে এক দস্যু। প্রতিপক্ষ ওই লোক সবার চেয়ে লম্বা। পাগড়ি ছুঁই-ছুঁই করছে ছাতের আড়াটাকে। তলোয়ার চালাল সে মার্টেলের দিকে। ফলাটা ঠেকিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট। তবে এত জোরে আঘাত হেনেছে দস্যু, অবশ হয়ে গেল হাত। দ্বিতীয়বারের মত

আক্রমণ এল। নিজের তলোয়ার তুলে ঠেকাতে গিয়ে ফুরিয়ে গেল মার্টেলের সব শক্তি। কোনওমতে সরিয়ে দিল ফলা।

টলমল করতে করতে পিছাতে হলো ওকে। ধাওয়া করে এল জলদস্যু, দু' পাশ থেকে চালাচ্ছে তলোয়ার। শত্রুকে দাঁড়াতে দেবে না। আক্রমণ দূরের কথা, সোজা হয়ে তলোয়ার তুলতেই পারছে না মার্টেল। জ্যাচ রেমণ্ড পরিকল্পনার সময় বারবার বলেছে: হামলার সময় নীরবতা বজায় রাখতে হবে, নইলে বন্দরের সমস্ত জলদস্যু ছুটে আসবে।

খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে মার্টেল, আর কোনও উপায় না দেখে কোমরের খাপ থেকে বের করল পিস্তল। নিশানা নিখুঁত হওয়ার আগেই টিপে দিল ট্রিগার। প্যানের ভিতর ঝলসে উঠল সামান্য পাউডার, পরক্ষণে জ্বলে উঠল মূল চার্জ, কড়াৎ করে উঠল ফ্লিন্টলক। .৫৮ ক্যালিবারের বল ফুটো করল দস্যুর বুক।

সাধারণ লোক এক পলকে ডেকের উপর আছড়ে পড়ত, কিন্তু কিছুই পাত্তা না দিয়ে এগিয়ে আসছে দস্যু! মাত্র এক সেকেণ্ড পেল মার্টেল, তারপর দেখল তলোয়ার চালাতে চালাতে আসছে দানব। লেফটেন্যান্টের বাহুর উপর পড়ত কোপ, তবে শেষ মুহূর্তে ফলা দিয়ে ঠেকিয়ে দিল সে আঘাতটা। প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে দৈত্য, সামলাতে গিয়ে ছিটকে পিছাতে হলো। খেয়াল করবার আগেই চলে গেল মার্টেল গানডেকের আরেক মাথায়। ফ্রিগেট ক্যালিফোর্নিয়ার আঠারো পাউণ্ডের কামানের উপরে পড়ল সে। জ্যাচ রেমণ্ডের কথা তখনও কানের ভিতর গুঞ্জন করছে: নীরবতা বজায় রাখতে হবে। কিন্তু এবার কোমরের পিছন থেকে জ্বলন্ত তেলের লণ্ঠন খুলে নিল মার্টেল, দেরি না করে শিখা ছুঁইয়ে দিল ব্রোঞ্জের কামানের টাচ-হোলে। পাউডার চার্জ পুড়তে শুরু করেছে, কড়া গন্ধ বেরুল। চারপাশে হই-হই করে লড়ছে সবাই। সেসব শব্দের উপর দিয়ে শোনা গেল বারুদ পুড়বার মৃদু চিড়বিড়

আওয়াজ। দানব দস্যুর মাঝখানে মোটা কামান রেখে দাঁড়িয়েছে লেফটেন্যান্ট। নেভির কামান সম্বন্ধে এত দিনের অভিজ্ঞতা ওকে বলে দিল, ঠিক সময় বেছে নিয়েছে।

জলদস্যু বুঝে নিয়েছে, হাঁপিয়ে গেছে প্রতিপক্ষ, বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, মেনে নিয়েছে মরতে হবে। মাথার উপর তলোয়ার তুলল দস্যু, পরক্ষণে হামলা করল, টের পেতে চাইল মাংস-হাড় কাটবার অনুভূতি। কিন্তু ততক্ষণে বেজির মত সরে গেছে মার্টেল। শেষ আঘাত হানতে এত ব্যস্ত দস্যু, নিজের তলোয়ার ফেরাতে পারল না, বা খেয়ালই করল না কামানের পিছনে পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। এক সেকেণ্ড পর ভুশ করে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল গন্ধকের ধোঁয়া। প্রচণ্ড বুম্‌ম্‌ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল গোলা।

ডেকের উপর দিয়ে যেন হড়কে না যায়, সেজন্য রয়েছে হেম্প লাইনগুলো, তারপরও কয়েক ফুট পিছিয়ে গেল কামান। ব্রোঞ্জের দৈত্যের পিছন অংশ ছিটকে লাগল দস্যুর তলপেটে, চুরমার হলো পেলভিসের হাড়গুলো, চুরচুর হলো হিপজয়েন্ট, গুঁড়ো হলো দুই উরুর হাড়। শিথিল দেহটা ছিটকে গিয়ে লাগল ছাতের বিমে, সেখান থেকে নামল ডেকে। তবে উল্টো ভাঁজ হয়ে গেছে।

এক সেকেণ্ড পর গানপোর্ট দিয়ে উঁকি দিল মার্টেল। আঠারো পাউণ্ডের গোলা বন্দর পেরিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়েছে কেল্লার দেয়ালে। মস্ত এক গর্ত তৈরি করেছে। উপর অংশ থেকে নেমে আসছে ছোট পাথরের অ্যাভালাঞ্চ।

'এক গোলায় দুই পাখি, মোটেই খারাপ নয়,' বলল বোসান, মাইকেল গোমেজ। 'চালিয়ে যান, স্যর।'

'যদি ক্যাপ্টেন জানতে চায়... গোলা ছুঁড়েছে ওই বদমাশ।'

'আমি তো তা-ই দেখলাম, লেফটেন্যান্ট মার্টেল!'

কামান গোলাবর্ষণ করতেই যেন স্টার্টারের পিস্তল টাশ্ করে উঠেছে। শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা। প্রতিরোধ বাদ দিয়ে গানপোর্টগুলোর সামনে ছুটে গেল জলদস্যুরা, একের পর এক লাফিয়ে পড়তে লাগল বন্দরের শান্ত পানিতে। যারা মই বেয়ে মেইন ডেকে উঠতে চাইছে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে জ্যাচ রেমণ্ডের দল।

'চলো, কাজ শেষ করি,' বলল মার্টেল।

ওরা দু'জন জাহাজের স্টারবোর্ডে সরে গেল, ওখানে অ্যাডভেঞ্চারের নাবিকরা জড় হয়েছে রেইডিং পার্টির হাতে বিস্ফোরক তুলে দেওয়ার জন্য। মার্টেলের অধীনে গোমেজ ও আরও ছ'জন বুঝে নিল কালো পাউডার। সবার আগে মই বেয়ে নীচের ডেকে নামতে লাগল লেফটেন্যান্ট। পরের ডেকে দেখা গেল এখনও র‍্যাফটার থেকে ঝুলছে হ্যামক, তবে অন্যান্য সব জিনিস লুঠ হয়েছে।

মই বেয়ে নামছে মার্টেলের দল, শেষে চলে এল সবচেয়ে নীচের ডেকে। একটা হোল্ডের ভিতর ঢুকল। নেভির বেশিরভাগ রসদ সরিয়ে নেয়া হয়েছে, তবে তারপরও যা রয়েছে তাতে আগুন দিলে পুড়তে শুরু করবে ফ্রিগেট।

দ্রুত কাজ সারতে চাইল সবাই। লেফটেন্যান্ট স্থির করল কোথায় বসানো হবে সলতে। কাজ শেষে লণ্ঠন থেকে আগুন দিল। তরতর করে বেড়ে উঠল শিখাগুলো। এবং এতই দ্রুত যে, চমকে গেল সবাই। কয়েক মুহূর্তের ভিতর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল হোল্ড। আগুন দেয়া দলটি তাড়াতাড়ি মই বেয়ে উঠতে লাগল। একটু পর পর থামছে, শার্টের আস্তিনে নাক-মুখ চেপে শ্বাস নিচ্ছে। হঠাৎ ওদের মাথার উপর বিস্ফোরিত হলো ছাত। ঝলসে উঠল আগুন। মনে হলো ডেকের উপর পড়েছে কামানের গোলা। মাইকেল গোমেজ ছিটকে পড়ল এক পাশে, আরেকটু

হলে জ্বলন্ত বিমের নীচে চাপা পড়ত কিন্তু ওর দুই পা ধরে কর্কশ ডেকের উপর দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে সরিয়ে নিল মার্টেল। টেনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল, পরক্ষণে ছুটতে লাগল। পিছনে আসছে দলের সবাই। উপর থেকে খসে পড়ছে জ্বলন্ত কাঠ। ছুটবার ফাঁকে এদিক ওদিক সরতে হচ্ছে।

একটা মইয়ের সামনে পৌঁছে গেল ওরা। ঘুরে দাঁড়াল মার্টেল, দ্রুত ইশারা করল, 'যাও-যাও-যাও! জলদি! নইলে পুড়ে মরতে হবে!'

প্রায় সবার শেষে ধীরে উঠছে মাইকেলের পা দুটো। তার পরপর উঠতে লাগল মার্টেল। পিছনে একটা করিডোর থেকে ধেয়ে এল আগুনের লেলিহান শিখা। মাইকেলের পিঠে কাঁধ দিয়ে গুঁতো দিল মার্টেল। দ্রুত নড়ছে না ছোকরা! গায়ের জোরে উপরে ঠেলল। প্রায় একই সঙ্গে হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে এল দু'জন, শরীর গড়িয়ে সরে গেল দু'পাশে। ঠিক তখনই হোল্ডের ভিতর থেকে ভলকে উঠল আগুন, গিয়ে লাগল ছাতে। ওখানে তৈরি হলো কমলা রঙের বিশাল এক ছাতি।

সবাই যেন রয়েছে আগুনের সাগরে। দেয়াল, ডেক ও ছাত জুড়ে নেচে চলেছে উদ্বাহু শিখা। সেই সঙ্গে গাঢ় ধোঁয়া। সবার চোখ থেকে দরদর করে অশ্রু ঝরছে। কিছু দেখা যায় না। মাইকেল ও মার্টেল প্রায় অন্ধের মত পৌঁছে গেল একটা মইয়ের মুখে, ওটা বেয়ে উঠে এল গানডেকে। পোর্টগুলো দিয়ে গলগল করে বেরুচ্ছে ধোঁয়া। তবে এখানে যথেষ্ট বাতাস আছে। গত পাঁচ মিনিটে এই প্রথমবারের মত বুক ভরে দম নিতে পারল ওরা। আর কাশতে হচ্ছে না।

ছোট একটা বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে দিল ক্যালিফোর্নিয়াকে, তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দু'জন।

'চলো, বাছা!' তাড়া দিল মার্টেল।

লাফ দিয়ে উঠল ওরা, দৌড়ে গিয়ে চড়ল এক গানপোর্টে। সামনেই অ্যাডভেঞ্চারের ক্রুরা হাত বাড়িয়ে রেখেছে। নিজেদের জাহাজে নামিয়ে নিল ওদেরকে। দু'জন ক্রু বার কয়েক পিঠ চাপড়ে দিল মার্টেলের। লেফটেন্যান্টের ধারণা হলো ওকে বাহবা দেয়া চলছে। কিন্তু তা নয়, লোকগুলো ওর শার্টের পিঠ থেকে আগুন নেভাতে ব্যস্ত।

ফ্রিগেট ক্যালিফোর্নিয়ার বুলওয়ার্কের উপর বুট রাখল জ্যাচ রেমণ্ড।

মুখ তুলে চাইল মার্টেল। 'ক্যাপ্টেন,' গলা উঁচিয়ে বলল, 'নীচের ডেকে কেউ নেই।'

'খুব ভাল, লেফটেন্যান্ট।' দড়ি বেয়ে সঙ্গীদের নেমে যেতে দেখছে রেমণ্ড, সবার শেষে নেমে এল নিজের জাহাজে।

দাউ-দাউ করে জ্বলছে ক্যালিফোর্নিয়া। গানপোর্ট থেকে ছিটকে উঠছে লাল-হলুদ-কমলা শিখা, মাস্তুলের দড়ি পোড়াতে শুরু করেছে। এখুনি নরক হয়ে উঠবে চারপাশ। এখন পুড়তে শুরু করেছে কামানের ভিতরের পাউডার।

এখনও নয়টি কামান তাক করা অ্যাডভেঞ্চারের দিকে!

খুদে রণতরীর সামনের দিকের দড়ি সহজে খোলা গেল। কিন্তু পেঁচিয়ে গেছে পিছনের দড়ি। লোক ঠেলে ওখানে চলে গেল মার্টেল, খাপ থেকে বের করল তলোয়ার। লড়াই করতে গিয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে তলোয়ার। এক ইঞ্চি পুরু দড়ি, তারপরও প্রচণ্ড কোপে কেটে দিল।

লেলিহান আগুন প্রচুর অক্সিজেন পোড়াচ্ছে, আর সেই কারণে ভরছে না অ্যাডভেঞ্চারের পাল। ক্যালিফোর্নিয়ার জ্বলন্ত দড়ি-দড়ার কাছে ঝুঁকে পড়েছে জিব পাল। অ্যাডভেঞ্চারকে সরিয়ে নিতে চাইছে নাবিকরা। তবে একটু সরলেই আবার অমোঘ টানে ফিরছে। যে-কোনও মুহূর্তে আগুন ধরবে এই জাহাজেও।

ফ্রিগেটের প্রধান মাস্তুল থেকে খসে পড়ল জ্বলন্ত পাল। তার এক টুকরো আগুন পুড়িয়ে দিল এক নাবিকের চুল।

'মার্টেল,' ভারী গলায় বলে উঠল জ্যাচ রেমণ্ড, 'জাহাজ থেকে নৌকা নামাও, টেনে নিয়ে যাও আমাদেরকে।'

'আই-আই, ক্যাপ্টেন।'

মাইকেল ও অন্য চার নাবিককে নিয়ে মার্টেল জাহাজ থেকে নামিয়ে ফেলল ডিঙি। অ্যাডভেঞ্চারের বো থেকে দড়া নিয়েছে ওরা। নিঃশব্দে জাহাজ টেনে নেয়ার চেষ্টা শুরু হলো। দড়া টানটান হতেই বৈঠা বাইতে লাগল সবাই, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতে গিয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে গেছে। পানি থেকে বৈঠা তুললে দেখছে আগুনের তৈরি হাওয়ায় অর্ধেক পথ আবার পিছিয়ে পড়েছে।

'বৈঠা মারো, বৈঠা মারো!' চেঁচিয়ে উঠল মার্টেল। 'মারো টান, হেঁইয়ো!'

প্রাণপণ চেষ্টা করছে সবাই। চৌষট্টি টন ওজনের বোঝা নিয়ে এগুতে চাইছে। পিছন থেকে আকর্ষণ করছে আগুনের লেলিহান যজ্ঞ। জেদ ধরে বৈঠা বেয়ে চলেছে তারা। ভেঙে আসতে চাইছে মেরুদণ্ড। ফুলে উঠছে ঘাড়ের রগ। টনটন করছে দুই হাত। ডিঙি নৌকার দুঃসাহসী নাবিকরা একটু একটু করে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে চলল অ্যাডভেঞ্চারকে। কিছু দূর যাওয়ার পর পাল তুলল জ্যাচ রেমণ্ড। মরুভূমি থেকে ভেসে এল মৃদু হাওয়া, একটা একটা করে ফুলে উঠল পাল।

ঠিক তখনই কেল্লার দেয়ালে ফুটে উঠল রক্তগোলাপ। ক' মুহূর্ত পর ভেসে এল কামানের গর্জন। জাহাজ ও নৌকা পেরিয়ে দূরে গিয়ে পড়ল গোলা। মোট বারোবার গোলা-বর্ষণ হলো। অস্থির হয়ে উঠল চারপাশের প্রাঙ্গন। ব্রেকওয়াটার ধরে ছুটে আসছে প্রহরীরা। ছোট ক্যালিবারের অস্ত্র থেকে গুলি করছে।

দ্রুত দাঁড় টানছে মাঝি-মাল্লারা। হঠাৎ অ্যাডভেঞ্চারের পিছনে

ঝলসে উঠল লাল আলো। ক্যালিফোর্নিয়ার পুরো পালে ধরে গেছে আগুন।

পরবর্তী বিশ মিনিট রুদ্ধশ্বাসে দাঁড় টেনে চলল মাল্লারা, এদিকে চারপাশের পানিতে এসে পড়ছে একের পর এক গোলা। একটা চলে গেল অ্যাডভেঞ্চারের টপগ্যালেন্ট পাল ভেদ করে। তবে এখনও সরাসরি কোনও গোলা আঘাত হানেনি। প্রথমে থেমে গেল খুদে ক্যালিবারের গুলি, তারপর অ্যাডভেঞ্চার সরে গেল বাশাওয়ের কামানেরও আওতার বাইরে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল সবাই, ঢলে পড়ল একে অপরের উপর। হাসছে, গান গাইছে, নাচছে উন্মাদের মত। জ্বলন্ত জাহাজের আলোয় ওই যে দেখা যায় বাশাওয়ের কেল্লা! আর ওদেরকে ধরতে পারবে না কেউ!

অ্যাডভেঞ্চারে ভিড়ল মার্টেলের ডিঙি। ওটা তুলে রাখা হলো ডেভিটে।

'দারুণ দেখিয়েছ, দোস্ত,' খুশি মনে বলল জ্যাচ রেমণ্ড। পিছন থেকে আসা রক্তিম আলোয় চকচক করছে তার মুখ।

মার্টেল এতই ক্লান্ত, কোনও জবাব দিতে পারল না, চুপচাপ হাঁপিয়ে চলেছে। তবে ছোট্ট করে স্যালিউট দিল বন্ধুর উদ্দেশে।

হঠাৎ সবার চোখ ঘুরে গেল বন্দরের দিকে। দাউ-দাউ করে জ্বলছে ক্যালিফোর্নিয়ার বিশাল মাস্তুলগুলো, কাত হয়ে পড়ে গেল পোর্ট সাইডে। বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, ছিটকে উঠল স্ফুলিঙ্গ। অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে ফ্রিগেটের, প্রায় একইসঙ্গে আগুন উগরে দিল কামানগুলো, কিছু গোলা পড়ল পানিতে, বাকিগুলো লাগল গিয়ে বাশাওয়ের কেল্লার দেয়ালে।

হই-হই করে উঠল নাবিকরা। প্রতিশোধ নেয়া গেছে জলদস্যু ও বাশাওয়ের উপর।

'এবার কী?' জানতে চাইল মার্টেল।

সাগরের দিকে চেয়ে রইল জ্যাচ রেমণ্ড। ওদিক থেকে চোখ

না সরিয়ে বলল: 'আজ রাতেই সব শেষ হয়ে যায়নি। বন্দরে এক দস্যুকে চিনতে পেরেছি—ইউনুস আল-কবির। ওর জাহাজের নাম রক। প্রাগৈতিহাসিক বিশাল আরবি পাখি। বাজি ধরতে পারো, লোকটা এখন পাল তুলছে আমাদের আক্রমণ করবে বলে। আজ যা হলো তার জন্য বন্দি নাবিকদের উপর প্রতিশোধ নেবে না বাশাও। তার কাছে মানুষগুলো জরুরি। বহু হাজার ডলার মুক্তিপণ পাবে। কিন্তু ইউনুস আল-কবির প্রতিশোধ নিতে চাইবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে।'

'শুনেছি আগে ধার্মিক লোক ছিল, কথা ঠিক?'

'কয়েক বছর হলো বদলে গেছে,' বলল জ্যাচ। 'আগে ছিল মুসলিমদের ইমাম। তবে খ্রিস্টানদের প্রতি তার ঘৃণার সীমা পরিসীমা নেই। এই লোক মুসলিমদেরকে শুধু ঘৃণা করতেই শেখায়নি, হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র। মুসলিম দেশের পতাকা নেই এমন যে-কোনও জাহাজ আক্রমণ করে সে।'

'শুনেছি, কাউকে বন্দি করে না। কতল করে।'

'একই কথা শুনেছি আমিও। ইমাম আল কবিরের উপর নাকি কারও কোনওরকম নিয়ন্ত্রণ নেই। যখন খুশি যে-কোনও বন্দরে ভেড়ে তার জাহাজ। এই লোককে শাসনকর্তারা সমঝে চলে, কারণ অসংখ্য ভক্ত তাকে পীরের মত মানে। তার একটি কথায় জীবন দিতে পারে স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধারা।'

'মনে হচ্ছে ধর্ম ব্যবসায়ী?'

'বলতে পারো। আল-কবিরের লোক ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাদের কাছে বিধর্মীর জাহাজ লুটে নেয়া ধর্মের কাজ। ওটাকে তারা বলে: জিহাদ। ওরা লড়ে মরতে রাজি, যদি সঙ্গে নিতে পারে কোনও অমুসলিমকে।'

বিশালদেহী ওই দস্যুর কথা মনে পড়ল মার্টেলের। লোকটা গুলি খেয়েও তেড়ে এসেছিল। হয়তো ইউনুস আল-কবিরের

ভক্তদের কেউ। তার দৃষ্টিতে ছিল তীব্র ঘৃণা আর উন্মাদনা। ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়াকে রক্ষার চাইতে মার্কিনিদের মারতে বেশি আগ্রহী ছিল।

'কেন আমাদের এত ঘৃণা করে ওরা?' বলল মার্টেল।

চোখ সরু করে চাইল জ্যাচ রেমণ্ড। 'এমন পাগলাটে প্রশ্ন আগে কখনও শুনিনি, মার্টেল।' বড় করে শ্বাস নিল সে। 'তবে আমি কী মনে করি বলছি: আমরা বেঁচে আছি বলে ওরা আমাদেরকে ঘৃণা করে। ঘৃণা করে কারণ আমরা ওদের মত নই, ওদের ধর্মের কেউ নই। সবচেয়ে বড় কারণ: ওরা মনে করে আমাদেরকে ঘৃণা করার অধিকার আছে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, আমাদের মধ্যেও এমন লোকের অভাব নেই।'

পুরো এক মিনিট নীরব রইল মার্টেল, রেমণ্ডের কথাগুলো ভাবছে। কোনও মানুষ কেন এভাবে ভাববে, তা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছে না। আজ রাতে কয়েকজন মানুষকে খুন করেছে, তবে ওদেরকে ঘৃণা করত না সে। নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে গেছে। ওই হত্যা কোনও ব্যক্তিগত বিষয় ছিল না। অথচ কিছু মানুষ ভাবছে অন্যদেরকে ঘৃণা করার অধিকার তাদের আছে!

'এবার কী নির্দেশ দেবে?' কিছুক্ষণ পর বলল মার্টেল।

'ইউনুস আল-কবিরের রক শক্তিশালী জাহাজ, সেই তুলনায় অ্যাডভেঞ্চার দুর্বল। তা ছাড়া, এই জাহাজে অনেক বেশি লোক। তোমাদেরকে সিগনালে তুলে দেব। আগের পরিকল্পনা বদলে নিয়েছি। তোমরা মাল্টা দ্বীপে যাবে না। সিগনাল নিয়ে শিক্ষা দেবে ইউনুস আল-কবিরকে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে আমেরিকান নেভি তাকে ভয় পায় না। ক্যাপ্টেন জেমস রবার্টসকে জানিয়ে দিয়ো, যুদ্ধে হারা চলবে না।'

মৃদু হাসল জেফ মার্টেল। গত দু' বছর লড়তে হয়নি। শুধু হালিদা দখল করবার সময় লড়েছে। তারপর পুড়িয়ে দিয়েছে

ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়াকে। ওর ভাল লাগছে এবার দস্যুদের বিরুদ্ধে নিজেরা কিছু করতে পারবে ভেবে।

'আমরা যদি লোকটাকে ধরতে পারি, বা হত্যা করতে পারি,' বলল মার্টেল, 'আমাদের মনোবল বাড়বে।'

'এবং অনেক কমবে ওদের মনোবল।'

ভোরের এক ঘণ্টা আগে।

সিগনালের প্রধান মাস্তুলের উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল ওয়াচম্যান, 'জাহাজ! সামনে জাহাজ দেখা যায়! স্টারবোর্ডের বিম থেকে ছয় পয়েন্ট দূরে।'

এ সংবাদের অপেক্ষায় ছিল দুই লেফটেন্যান্ট, জেফ মার্টেল ও সিগনালের ভারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন জেমস রবার্টস।

'সময় হলো,' বলল ক্যাপ্টেন।

জেমস রবার্টসের বয়স মাত্র ছাব্বিশ। আইনানুগ ভাবে নেভি সৃষ্টির এক মাস আগে কংগ্রেস থেকে কমিশন পেয়েছে সে। জ্যাচ রেমণ্ডের সঙ্গে বড় হয়েছে, এবং তারই মত মহানায়ক হয়ে উঠছে নেভিতে। সবাই বলছে বিশাল এই ফ্লিট দেশে ফিরবার আগেই তাকে পদোন্নতি দেয়া হবে। হালকা-পাতলা লোক সে, মুখটা ঘোড়ার মুখের মত লম্বা, গর্তে বসানো চোখ দুটো তীক্ষ্ণ। কড়া মানসিকতার মানুষ, কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। যে জাহাজে নিয়োগ করা হয়, নাবিকরা মনে করে কপালের গুণে এত ভাল ক্যাপ্টেন পেয়েছে।

বালুঘড়ি চলছে। ধীরে নীচে পড়ছে বালু-কণা। আরও দশ মিনিট পর আবার চিৎকার ভেসে এল মেইনমাস্ট থেকে: 'জাহাজটা চলতে শুরু করেছে উপকূলের পাশ ঘেঁষে।'

ঘোঁৎ করে উঠল রবার্টস, 'ওরা ঘুরে আমাদের পিছনে আসতে চেয়েছিল। তারপর ধাওয়া করে হামলা করত।' বোসান

মাইকেলের দিকে চাইল সে। ছোকরা এই জাহাজের সেইলিং মাস্টার। 'সব পাল তুলে দাও।'

চেঁচিয়ে উঠল মাইকেল। দড়ি-দড়ার সঙ্গে ঝুলছে কয়েকজন, একইসঙ্গে কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা। বারোটা পাল ইয়ার্ড থেকে উপরে উঠল, হালকা বাতাসে ফুলে উঠল। চাপ খেয়ে ককিয়ে উঠল প্রধান মাস্তুল। ভূমধ্যসাগরে বাঁক নিয়ে রওনা হয়ে গেল দুই শ' চল্লিশ টনি জাহাজ।

কাত হয়ে পিছনে সাগরের দিকে চাইল মার্টেল। সাদা ফেনা তুলে ছুটছে জাহাজ। আন্দাজ করল, ঘণ্টায় দশ নট গতিতে চলেছে ওরা। বাতাস বাড়লে সব মিলে আরও পাঁচ নট মিলতে পারে।

'ওরা আমাদের দেখেই চলতে শুরু করেছে,' চেঁচিয়ে উঠল পাহারাদার। 'পাল তুলছে ওরাও।'

'এ সাগরে এমন কোনও ল্যাটিন রিগওয়ালা জাহাজ নেই, যেটা আমাদের চেয়ে দ্রুত চলে,' বলল মার্টেল।

'কথা ঠিক। কিন্তু ওরা আমাদের চেয়ে অনেক কম পানি কাটছে। যদি চায়, উপকূলের পাশ দিয়ে যেতে পারবে। আমাদের কামান নাগাল পাবে না ওদের।'

'ক্যাপ্টেন রেমণ্ডের কাছে শুনলাম ইউনুস আল-কবির লড়তে ভয় পায় না।'

'তোমার কি মনে হয় আমাদের পিছু নেবে ওরা?'

'জ্যাচ রেমণ্ড তো তাই মনে করে।'

পরের তেরো ঘণ্টা দস্যুজাহাজকে ধাওয়া করল সিগনাল। সিগনালের পালের সংখ্যা বেশি, ইউনুস আল-কবিরের জাহাজের তুলনায় গতিও বেশি। তবে আরব দস্যু এদিকের পানি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি চেনে। বারবার সিগনালকে বিপজ্জনক অগভীর

পানিতে টেনে নেবার চেষ্টা করল। শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে ধাওয়া বন্ধ করে সিগনালকে সরে যেতে হলো নিরাপদ পানিতে। উপকূলের কাছে জোরালো হাওয়া খুঁজে নিল ইউনুস আল-কবির। ওই বাতাস মরুভূমি পেরিয়ে টিলা টপকে আসছে। এদিকের উপকূলে একের পর এক টিলা।

টুকটুকে লাল সূর্য পশ্চিমে পাটে বসল। ততক্ষণে কমে এসেছে দুই জাহাজের মাঝের দূরত্ব। এদিকে প্রায় থেমে গেছে উপকূল থেকে আসা হাওয়া।

'আর এক ঘণ্টার মধ্যেই ওদের ধরব,' বলল রবার্টস। কেবিন স্টুয়ার্ডের হাত থেকে পানি নিল। চোখ বোলাল খোলা গানডেকের উপর।

কামান নিয়ে তৈরি ক্রুরা। খানিক দূরে গোলা ও পাউডার। দশ-বারো বছর বয়সী জনা কয়েক 'পাউডার মাঙ্কি' অপেক্ষা করছে। যুদ্ধ শুরু হলে দ্রুত কামান প্রস্তুত রাখবার জন্য তাদের লাগবে। দড়ি-দড়া বেয়ে উপরে উঠে গেছে কয়েকজন নাবিক। প্রয়োজনের সময় দেরি না করে পালের দিক পরিবর্তন করবে। মেরিন মার্কসম্যানরা উঠেছে ফোরমাস্ট ও মেইনমাস্টে। তাদের দু'জন টেক্সাসের লোক, দুই ভাই। কম কথা বলে, কিন্তু অন্যদের তুলনায় দ্রুত লোড করে অস্ত্র। প্রতি মিনিটে চারবার এবং প্রতিবার আঘাত হানে নিখুঁত লক্ষ্যে।

হঠাৎ দুটো সাদা ধোঁয়া একাকার হয়ে ঢেকে দিল ইউনুস আল-কবিরের জাহাজকে। এক মুহূর্ত পর ভেসে এল গোলার আওয়াজ। একটা গোলা গিয়ে পড়ল সিগনালের পোর্ট বো থেকে খানিক দূরে। অন্যটা পড়ল স্টার্ন পেরিয়ে সাগরে।

একে অপরের দিকে চাইল রবার্টস ও মার্টেল।

মার্টেল বলল, 'ওদের স্টার্নে ও-দুটো দূরপাল্লার কামান। আমাদের সরে যাওয়া উচিত, ক্যাপ্টেন।'

'মিস্টার গোমেজ, পোর্টে বারো ডিগ্রি সরো,' নির্দেশ দিল রবার্টস। দস্যুজাহাজের গোলন্দাজদের কাছ থেকে দূরে সরতে চাইছে। 'তৈরি থাকো। প্রতিবার গোলা এলে দিক পাল্টে নিতে হবে। শেষ গোলা যেখানে পড়েছে, তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

'আর যদি গোলা পড়ে তো আপনার নির্দেশ কী হবে?' মুখ ফস্কে বলে উঠল বোসান।

এ ধরনের মন্তব্যের জন্য মাইকেলের পিঠে চাবুক কষাতে পারত ক্যাপ্টেন রবার্টস। তার বদলে বলল, 'নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো।'

উপকূল থেকে আসা হাওয়া থেমে গেল হঠাৎ। দস্যুজাহাজের ত্রিকোণ বড় পাল ঝুলে পড়ল। আর এগুতে পারছে না জাহাজ। কিন্তু সিগনালের পালগুলো এখনও ফোলা। দস্যুজাহাজের সরাসরি পিছনে চলল সিগনাল। এমন একটা কোণ তৈরি করে চলেছে, সামনের জাহাজের বো থেকে কামান ছোঁড়া অসম্ভব। কিছুক্ষণ পর দুই জাহাজের মাঝে আর মাত্র দেড় শ' গজ দূরত্ব রইল। আর তখনই গর্জে উঠল জলদস্যুদের কামান। ওই জাহাজের এক পাশ ঢেকে গেল ধোঁয়ায়। দুটো গোলা অনেকে উপর দিয়ে গেল। তবে তৃতীয়টা লাগল সিগনালের খোলে।

চুপ করে রইল জেমস্ রবার্টস, অপেক্ষা করছে দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে। যে-কোনও সময় বিধ্বস্ত হবে জাহাজ। খেয়াল করছে, দস্যুজাহাজের অন্য কোনও কামান এখনও গোলা ছুঁড়ছে না। দেখতে না দেখতে গোলা ফুরিয়ে গেল দস্যুদের। ব্যস্ত হয়ে উঠল কামান পরিষ্কারে ও রিলোডে।

'কামান নিশানা করো!' নির্দেশ দিল রবার্টস। 'আগুন দাও ফিউজে!'

কর্কশ আওয়াজে গোলা দাগল চারটে কামান। প্রচণ্ড শব্দে ধক্

করে উঠল মার্টেলের হৃৎপিণ্ড। মনে হলো লাথি খেয়েছে বুকে। জাহাজের বো হারিয়ে গেল ঘন ধোঁয়ায়। পরক্ষণে বাতাসে ভর করে ধোঁয়া ঢেকে দিল পিছন অংশ। আমেরিকান জাহাজ ছুটে চলেছে দস্যুজাহাজ লক্ষ্য করে। মেরিনরা উঁচু জায়গা থেকে গুলি ছুঁড়ছে, পরক্ষণে মাস্কেটে ভরছে গুলি। সামনের জাহাজে ডেকে পড়ে গেল কয়েকজন। ভেবেছে রেলিঙের ওপাশে তারা নিরাপদ।

গোলা-গুলির উপর দিয়ে চেঁচাল রবার্টস, 'মিস্টার গোমেজ, মেইনমাস্ট থেকে কয়েকটা পাল নামিয়ে ফেলো, নইলে পুরো মাস্তুল ভেঙে পড়বে। মিস্টার মার্টেল, বো-র দিকে দায়িত্ব নাও। আগুনগুলো নিভিয়ে ফেলো। তৈরি রাখো কামান।'

'আই-আই, স্যর,' দ্রুত স্যালিউট দিয়ে বো-র দিকে ছুটল মার্টেল। দস্যুজাহাজ থেকে মাস্কেটের অসংখ্য বুলেট এসে বিঁধছে ডেকে। এক পলক দেখল বারবারি জাহাজে দাউ-দাউ করে জ্বলছে আগুন। সিগনাল থেকে সমানে গুলিবর্ষণ চলছে। মার্টেল খেয়াল করল ওই জাহাজে চড়া কণ্ঠে নির্দেশ দিয়ে চলেছে এক লোক। ভয়ের বিন্দুমাত্র ছাপ নেই আচরণে। সব স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করছে। পরনে সাদা জোব্বা। গালে ঘন কালো চাপ দাড়ি। কিন্তু দীর্ঘ গোঁফগুলো ধবধবে সাদা, নেমেছে থুতনির পাশে। মস্ত নাক তার, ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকানো ডগা, প্রায় নেমে এসেছে উপরের ঠোঁটের উপর।

ইউনুস আল-কবির টের পেল কেউ লক্ষ করছে। তীক্ষ্ণ চোখে আমেরিকান জাহাজের দিকে চাইল। মার্টেল এক শ' গজ দূর থেকেও টের পেল লোকটার চোখেমুখে উথলে উঠেছে প্রবল ঘৃণা। একটা গোলা দাগতেই আর দেখা গেল না দস্যু নেতাকে। নিজেও ধপ করে বসে পড়ল মার্টেল। ওর পিছনের রেলিঙে এসে লেগেছে গোলা। ছিন্নভিন্ন হলো শক্ত কাঠ। উঠে দাঁড়িয়ে আবারও চাইল মার্টেল। ইউনুস আল-কবির এখনও তেমনি চেয়ে।

চোখ সরিয়ে নিল মার্টেল। দেরি না করে চলে গেল বো-র সামনে, ওখানে লোকজনকে ডেকে জড় করল। পানি ভরা বালতি হাতে কাজে লাগিয়ে দিল। ঝপাঝপ পানি ঢালতে নিভে এল আগুন। গোলা পড়ে একটা কামান পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে। তবে পাশেরটা এখনও ঠিক। নিজে ওটার দায়িত্ব নিল মার্টেল। একটু আগে এখানে লড়েছে এক তরুণ মিডশিপম্যান, কিন্তু বেচারা এখন আগুনে পুড়ে ঝলসে গেছে। লাশ থেকে পোড়া গন্ধ আসছে।

বারুদ ভরা কামান তৈরি। ফিউজে ম্যাচ ছোঁয়াল মার্টেল। বিকট আওয়াজ তুলল কামান। বিদ্যুদ্বেগে পিছিয়ে গেল গাইড রেইল ধরে। মুহূর্তের মধ্যে ব্যারেলের ভিতর অংশ সাফ করে ফেলল কয়েকজন। দস্যুজাহাজের কোথায় গোলা লেগেছে, একবার দেখে নিল মার্টেল। একটা গানপোর্টের পাশে মস্ত গর্ত হয়েছে। পাশে পড়ে আছে এক লোক, ছটফট করছে ব্যথায়।

'রিলোড!'

প্রায় পয়েণ্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে এখন দুই জাহাজ, একটি অন্যটির উপর গোলা ফেলছে। যেন দুই ষাঁড় লড়ছে, কিন্তু জানে না কখন থামা উচিত। এদিকে ঘনিয়ে আসছে আঁধার। দুই দল যোদ্ধা এতই কাছে, শত্রু-জাহাজের আগুনের আভায় সহজে পরস্পরকে গুলি করছে। এখানে ওখানে দপ্ করে জ্বলে উঠছে শিখা, আবার নেভানো হচ্ছে।

দস্যুজাহাজ থেকে দ্রুত কমে আসছে গোলাগুলি। একটার পর একটা কামান ধ্বংস করছে আমেরিকানরা। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল পুরো এক মিনিট পেরিয়ে গেল, কিন্তু শত্রুযান থেকে কোনও গোলা এল না।

নির্দেশ দিল জেমস রবার্টস, 'সবাই তৈরি হয়ে নাও, ওই জাহাজে উঠতে হবে!'

গ্র্যাপলিং হুক নিয়ে প্রস্তুত হলো নাবিকরা। দুই জাহাজকে দড়ি দিয়ে বাঁধবে। আরেক দল তৈরি হলো বর্শা, কুঠার ও তলোয়ার নিয়ে। মার্টেল নিজের দুই পিস্তলের প্রাইমিং প্যান পরীক্ষা করে দেখল, তারপর গুঁজে নিল বেল্টে। খাপ থেকে বের করল কাটলাস।

ফেনায়িত শুভ্র ঢেউ ঠেলে দস্যুজাহাজের দিকে ছুটল সিগনাল, ভাব দেখে মনে হলো খেপা ষাঁড়। দুই জাহাজের মাঝে দশ ফুট থাকতে ছুঁড়ে দেয়া হলো হুকগুলো। পরক্ষণে প্রচণ্ড গুঁতো খেল দুই জাহাজ। দেরি করল না মার্টেল, লাফিয়ে পেরুল রেলিং, নেমে পড়ল শত্রুযানের ডেকে।

সামলে নেয়ার আগেই একের পর এক বিকট আওয়াজ শুরু হলো জাহাজ জুড়ে। বসে পড়তে বাধ্য হলো মার্টেল। থরথর করে কাঁপছে জলদস্যু যান। ওই লোকগুলো ভুল বুঝিয়েছে আমেরিকান নেভিকে। সিগনাল কাছে আসতেই আগুন উগরে দিল কামান। বারোটা গোলা গিয়ে পড়ল ব্রিগের উপর। রেলিঙের পাশে তৈরি ছিল সৈনিকদল, অনেকে ছিন্নভিন্ন হলো। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মার্টেল, চট্ করে পিছনে চাইল। গ্র্যাপলিং দড়িগুলো উন্মত্তের মত কাটতে চাইছে সৈনিকরা। দস্যুজাহাজ থেকে তাদের উপর গুলি বর্ষণ হচ্ছে অবিরাম।

নিজের লোক মরতে দেখে থমকে গেল মার্টেল। কিন্তু রেলিং টপকে নতুন করে সিগনালে নামতে পারল না। তার আগেই দেখতে না দেখতে বিশ ফুট সরে গেল জাহাজ। ফাঁদে পড়ে চারপাশে চাইল অসহায় মার্টেল। ওর মাথার উপর দিয়ে ছুটছে মেরিনদের মাস্কেটের গুলি।

দস্যুদের গোলন্দাজরা খেয়াল করেনি জাহাজে নেমেছে সে। এখন বাঁচবার একমাত্র উপায় সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়া। যথেষ্ট ভাল সাঁতারু সে। তারপরও প্রার্থনা করল, যেন দূরের ওই তীরে

পৌঁছুতে পারে। নিঃশব্দে পা বাড়াল মার্টেল। এদিকের রেলিঙে নয়, ওদিকের রেলিং পেরিয়ে লাফিয়ে পড়তে হবে। প্রায় গন্তব্যে পৌঁছে গেছে, কিন্তু ঠিক তখনই ধেয়ে এল এক লোক।

ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল মার্টেলকে। ওই লোক বুঝে উঠবার আগেই হামলা করতে হবে। ঘুরেই উল্টো তেড়ে গেল সে। ডান হাতে বের করল পিস্তল, পরক্ষণে টিপে দিল ট্রিগার। দু' সেকেণ্ড পর ওর কাঁধ গুঁতো দিল লোকটার বুকে।

জোরাল ধাক্কা খেয়ে রেলিং টপকে পানিতে পড়ল দু'জন। জাহাজ থেকে নীচে পড়বার সময় টের পেল মার্টেল, সঙ্গের লোকটার গোঁফ সাদা! ইউনুস আল-কবিরকে সঙ্গে নিয়ে সাগরে পড়ছে সে!

জড়াজড়ি করে কুসুম-গরম পানিতে ঝপাস করে পড়ল দু'জন। ভেসে উঠেই পাশে ইউনুস আল-কবিরকে দেখল মার্টেল। দ্রুত শ্বাস টানছে ইমাম। উন্মত্তের মত একহাত নেড়ে ভেসে থাকতে চাইছে। অন্য হাতটা অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে নড়ছে। মার্টেলের চোখে পড়ল, সাদা জোব্বার কাঁধে লাল দাগ। সরাসরি গুলি লেগেছে কাঁধের জয়েন্টে। লোকটা হাত তুলতে পারছে না।

চারপাশ দেখে নিল মার্টেল। কয়েক মুহূর্তে পঞ্চাশ ফুট দূরে সরে গেছে দস্যুজাহাজ। সিগনালের পাশে চলে গেল। নতুন করে আবারও সংঘর্ষ হলো। ওদিকে হই-চই চলছে। এত দূর থেকে কেউ শুনবে না মার্টেল বা আল-কবিরের কণ্ঠ। কাজেই চিৎকার করল না কেউ-ই।

পানির উপর মাথা জাগাতে গিয়ে হিমশিম খেল আল-কবির। দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। জোরে শ্বাস নিতে পারছে না। তার উপর ভারী জোব্বা তাকে টেনে নামাতে চাইছে। ছোটবেলা থেকে দক্ষ সাঁতারু মার্টেল, পরিষ্কার বুঝল ইউনুস আল-কবির ভাল সাঁতার জানে না। হঠাৎ ডুবে গেল মাথাটা। কয়েক মুহূর্ত হাবুডুবু খেয়ে

আবার ভেসে উঠল। তবে লোকটা একবারের জন্যও সাহায্য চায়নি ওর কাছে।

আবারও ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পর ভেসে উঠল। কোনওমতে ভাসছে। ঠোঁট দুটো পানি থেকে উপরে রাখতে চাইছে। সবসময় পারছে না। লাথি মেরে বুট খুলে ফেলল মার্টেল, এক টানে খাপ থেকে ছোরা বের করে চিরে দিল ইমামের জোব্বা। একটু দূরে ভেসে গেল পোশাক। তবে ওটার মালিক বড়জোর আর এক মিনিট ভাসতে পারবে।

এখান থেকে কমপক্ষে তিন মাইল দূরে উপকূল। মার্টেল নিশ্চিত নয় ওখানে পৌঁছুতে পারবে কি না। ইমামকে অতদূরে টেনে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু লোকটার জীবন এখন ওর হাতে। নিজেকে জিজ্ঞেস করল মার্টেল, কখনও কোনও দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে গেছি? ...না, আমার উচিত লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।

ইউনুস আল-কবিরের উদোম বুক পেঁচিয়ে ধরল মার্টেল। জবাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে চাইল ইমাম।

সরে না গিয়ে বলল মার্টেল, 'আমরা যখন জাহাজ থেকে পড়ে গেলাম, তখন থেকে আর পরস্পরের শত্রু নই। তবে ঈশ্বরের শপথ, তুমি যদি ঝাপটা-ঝাপটি করো, তোমাকে ফেলেই চলে যাব।'

'আমি হলে তা-ই করতাম,' বিজাতীয় সুরে ইংরেজি বলল ইউনুস আল-কবির।

'তা হলে তা-ই হোক,' একটানে দ্বিতীয় পিস্তল বের করল মার্টেল, পরক্ষণে সজোরে ব্যারেলটা নামিয়ে আনল ইমামের মাথার উপর। বামহাতে অচেতন দেহ পেঁচিয়ে ধরে রওনা হয়ে গেল তীরের দিকে।

দুই

ওয়াশিংটন ডি.সি.।

পথের পাশে পুরনো হোণ্ডা অ্যাকর্ডের ড্রাইভিং সিটে বসে আছে আহমেদ শরীফ, মনোযোগ দিয়ে পড়ছে চিঠিগুলোর ফটোকপি। এগুলো বিখ্যাত অ্যাডমিরাল জেমস রবার্টসের চিঠি। এ ভদ্রলোক যে সমস্ত প্রেসিডেন্টের অধীনে কাজ করেছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই পেয়েছেন অজস্র পুরস্কার। আমেরিকান সরকারের আর কোনও অফিসার এত সম্মান অর্জন করতে পারেননি।

অ্যাডমিরালের চিঠির মূল কপিগুলো ড্যাশবোর্ডে তুলে রেখেছে আহমেদ শরীফ। প্রতিলিপি থেকে চোখ সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল সে। পনেরো মিনিট পেরুল, তারপর যা আশা করছে, দেখতে পেল। উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালের রোলস-রয়েস সিলভার ডন গাড়িটা সাঁই-সাঁই করে পেরিয়ে যেতেই মুচকি হাসল। মিস্টার বিউ মরটন চলেছেন চিঠিগুলো কিনতে। তবে, ঠকতে হবে তাঁকে। আজ ভোরে খবরের-কাগজ দেখেই রওনা হয়েছে আহমেদ। গিয়ে কিনেও নিয়েছে চিঠিগুলো। তারপর থেকে মনে মনে হাসছে। যাঁকে নিজের ওস্তাদ মনে করে, সেই বিউ মরটনকে হারাতে পেরে যার পর নাই সন্তুষ্ট।

যে কেউ নির্দ্বিধায় বলবে পৃথিবীর সেরা নেভাল হিস্টোরিয়ান বিউ মরটন, তার তুলনা হয় না। কিন্তু গত ছয় বছরে তার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সৎ-বাপের তাড়া খাওয়া বঙ্গ-সন্তান আহমেদ

শরীফ। নিরানব্বুই সালে প্রথমে আমেরিকায় আসে। ছোট চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে নেমে পড়ে স্টক মার্কেটে। তারপর থেকে শুধু এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। এরইমধ্যে জমিয়ে ফেলেছে বারো মিলিয়ন ডলার। এখনও স্টক এক্সচেঞ্জের সঙ্গে জড়িত, তবে আগের মত সময় দেয় না। গত ক' বছরে হাজারো বই কিনেছে সে সমুদ্র বিষয়ে, এবং পড়েছে মনোযোগ দিয়ে। তা চিঠি হোক বা কোনও অ্যান্টিক, নতুন যা কিছু পেয়েছে, ছুটে গিয়ে কিনে নিয়েছে। বেশির ভাগ সময়ই ঠকেনি।

বোধহয় এবারও জিতেছে সে।

রবার্টস পরিবারে বংশপরম্পরায় ছিল চিঠিগুলো। তবে এখন নিভে এসেছে বংশের বাতি। জেনি রবার্টসের একমাত্র ছেলে ভীষণ রকম অটিস্টিক, চিকিৎসায় ব্যয় হচ্ছে প্রচুর। ভদ্রমহিলা অভাবে রয়েছেন জানবার পর এসব চিঠির জন্য বেশি দরদাম করেনি আহমেদ।

ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা মার্কেটে গাড়ি রেখেছে। তারপর চিঠিগুলো ফটোকপি করিয়ে নিয়ে রাস্তার পাশে থেমেছে কখন আসবেন বিউ মরটন।

আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করল আহমেদ, তারপর তৃপ্তির সঙ্গে দেখল, ফিরছে রোলস-রয়েস। দ্বিতীয়বার ওটার দিকে চাইল না। বার কয়েক তুড়ি দিয়ে তুলে নিল একটা চিঠি।

ওর হাতে এখন যে চিঠি, ওটা পাঠানো হয়েছিল সেক্রেটারি অভ ওয়ার, জেরি হিউবার্টকে। তখন ফিলাডেলফিয়ার নেভি ইয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন জেমস রবার্টস। ভদ্রলোক শুধু শুকনো কথা লিখেছেন। কী ধরনের সাপ্লাই পেয়েছেন, ফ্রিগেটের মেরামত কতখানি হলো, কী ধরনের পাল পেয়েছে নেভি, এই সব। তবে বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসে রবার্টস ওই ফ্যাসিলিটির প্রধান না হয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসাবে কাজ করতে পারলে বেশি খুশি

হতেন।

এ চিঠি সরিয়ে রাখল আহমেদ। এক ঢোক সেভেন-আপ গিলে নিয়ে কয়েকটা চিঠি তুলে নিল। প্রথমটার উপর চোখ বোলাল। রবার্টসকে লিখেছে জাহাজের এক পেটি অফিসার। বারবারি উপকূলে লড়াইয়ের সময় সে ছিল রবার্টসের অধীনে। ব্যাকরণ মেনে চিঠি লেখা হয়নি। লোকটার নাম মাইকেল গোমেজ। স্বল্প শিক্ষিত। বর্ণনা দিয়েছে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়াকে কীভাবে পুড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর রক নামের এক দস্যু জাহাজের সঙ্গে লড়ে তারা।

ওই ইতিহাস ভাল করেই জানে আহমেদ। ক্যাপ্টেন জ্যাচ রেমণ্ড লিখেছিলেন কীভাবে পুড়িয়ে দেয়া হয় আমেরিকান ফ্রিগেট। তবে জলদস্যু জাহাজের সঙ্গে কীভাবে লড়াই হয়, তাঁর লেখায় কিছুই নেই। অবশ্য ওই যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায় ওয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে। সেটা লেখেন ক্যাপ্টেন জেমস রবার্টস।

চিঠি পড়তে পড়তে আহমেদের মনে হলো বারুদের গন্ধ এসে লাগছে নাকে। চিৎকার করে উঠছে আহত সৈনিকরা। তারপর দস্যু জাহাজের পাশে ভিড়ল রণতরী সিগনাল।

চিঠিতে অ্যাডমিরাল রবার্টসের কাছে গোমেজ জানতে চেয়েছে ব্রিগের সেকেণ্ড ইন-কমাণ্ড জেফ মার্টেলের ভাগ্যে কী ঘটেছে। জলদস্যু তরীতে লাফিয়ে নামেন লেফটেন্যাণ্ট মার্টেল, তারপর গর্জে ওঠে দস্যুদের কামান। আগের চিঠিগুলো পড়ে আহমেদ ভেবেছিল, সে সময় মারা পড়েন মার্টেল। কারণ, তাঁর জন্য মুক্তিপণ দাবি করেনি দস্যুরা।

চিঠি পড়ে চলেছে আহমেদ, কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল ভুল ভেবেছিল সে। গোমেজ দেখতে পায় জলদস্যু তরীর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে লড়ছেন মার্টেল। তারপর দু'জনেই রেলিং টপকে পড়ে যান সাগরে।

'...তারপর আর মিস্টার মার্টেল বা ইউনুস আল-কবিরকে দেখতে পাইনি...'

জলদস্যু জাহাজের বর্ণনা পড়ছে আহমেদ। তবে ওকে কাঁপিয়ে দিল ইউনুস আল-কবির নামটা। বর্তমান বিশ্বে এই নাম আবারও উচ্চারিত হচ্ছে। অতীতের সেই দস্যু নয়, এ নতুন কেউ। শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করে পৃথিবী জুড়ে জঙ্গিবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে লোকটা। গত কয়েক বছরে অন্যতম ওয়ান্টেড হয়ে উঠেছে।

নব্য ইউনুস আল-কবির কিছু ভিডিও ছেড়েছে। তাতে দেখা যায় এক লোক তলোয়ার উঁচু করে কেটে ফেলছে শ্বেতাঙ্গদের গর্দান।

এই লোকের নির্দেশে মিডল ইস্ট থেকে শুরু করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান জুড়ে অসংখ্য আত্মঘাতী বোমার হামলা চলছে। তার সেরা কীর্তি আফগান সীমান্তে এক পাকিস্তানী আর্মি পোস্টে আক্রমণ। ওতে মারা পড়ে দেড় শ' সৈনিক।

এই একই লোক বহুদিন থেকেই বাংলাদেশের মৌলবাদী জঙ্গিদের দিচ্ছে বিপুল টাকা ও অস্ত্র-শস্ত্র।

চিঠিগুলো ঘেঁটে রবার্টসের জবাব খুঁজতে চাইল আহমেদ। এবং পেয়েও গেল। ভদ্রলোক সব গুছিয়ে রাখতেন। পরের চিঠি মাইকেল গোমেজের উদ্দেশে। রবার্টস কী লিখেছেন পড়তে শুরু করল আহমেদ। দ্বিতীয়বার পড়তে হলো। বিস্মিত হয়ে উঠেছে। আস্তে করে হেলান দিয়ে বসল সিটে।

চিঠির তৎকালীন পরিস্থিতি এবং বর্তমান পরিস্থিতির কোনও মিল আছে কি না, বুঝতে চাইছে। আস্তে করে মাথা নাড়ল। কোনও মিল না থাকারই কথা।

অন্য চিঠি হাতে নেবে, কিন্তু তা না করে আবারও আগের চিঠিটা পড়ল। নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। এই চিঠির গুরুত্ব

আমেরিকান সরকারের কাছে অনেক। এ থেকে সুবিধা পাবে তারা। কিন্তু আমেরিকান সরকারের হাতে চিঠি না দিয়ে ভাল হয় না বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দিলে?

এ ধরনের তথ্য পেলে প্রিয় বন্ধু কমপিউটার বিশেষজ্ঞ রশিদ রায়হানের সঙ্গে আলাপ করে সে, নিজেই চলে যায় রানা এজেন্সিতে। কিন্তু বন্ধু এখন জরুরি কাজে দেশের বাইরে। তা ছাড়া, এ চিঠি রানা এজেন্সির এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না। আসলে দিতে হবে বাংলাদেশ সরকারের উপযুক্ত কোনও অফিসারের হাতে।

গত কয়েক বছরে আহমেদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বাংলাদেশি অনেকের সঙ্গে। আর সে-কারণে মনে পড়ল চিঠিটা কাকে দেয়া যায়।

মোবাইল ফোন বের করে ডায়াল করল আহমেদ, অপেক্ষা করছে।

'হ্যালো?' ওপাশ থেকে ভেসে এল মিষ্টি নারী কণ্ঠ।

ডিরেক্ট লাইনে যোগাযোগ করেছে বলে জুনিয়র অফিসারদের মাধ্যমে লাইন পেতে হলো না আহমেদকে। 'হাই, কৃষ্ণা। আমি আহমেদ। মনে পড়ে সেই বিদীর্ণহৃদয় মানুষটাকে?'

'আহমেদ, তাই তো দেখছি!' বলল মেয়েটি। 'কিন্তু আমি যাকে চিনতাম সে গত সাত দিনে ফোন করেনি! তুমি কি ভূত?'

'বলতেও পারো। এই ভূত অপেক্ষা করছে তোমার অপূর্ব মুখটা দেখার জন্য।'

'মতলবটা কী তোমার? হঠাৎ অফিসে ফোন?'

'ওই যে বললাম, মোনালিসা টাইপের মুখ দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছি।'

'কখন আসতে চাও?'

'যখন তুমি বলবে। তুমি বললে আমি পারি না এমন কিছু...'

উদাস ভঙ্গি নিয়ে থেমে গেল আহমেদ।

'সামাজিকতা রক্ষা করতে, নাকি কোনও কাজ?'

'দুটোই বলতে পারো।'

'আমি কিন্তু খুব ব্যস্ত। জানো তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী জাতি-সংঘে এসেছেন? কাল আসছেন ওয়াশিংটনে।'

'আরে, সেজন্যেই তো আসতে চাই,' হালকা সুরে বলল আহমেদ। 'যা আনব তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে ভদ্রমহিলার।'

'ঠাট্টা করছ?' একটু গম্ভীর হয়ে গেল কৃষ্ণা হায়দার।

'না। এমন একটা জিনিস পেয়েছি, যেটা আমি চাই সবার আগে তুমি দেখো।' জেমস রবার্টসের চিঠির বিষয়টা সংক্ষেপে বলল আহমেদ।

ওর কথা শেষে মাত্র একটা প্রশ্ন করল বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেণ্ড অফিসার, 'আমার অফিসে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?'

'জ্যাম ঠেলে? ধরো দুই ঘণ্টা?'

'চলে এসো।' কেটে গেল লাইন।

চিঠিগুলো গুছিয়ে রেখে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করল আহমেদ। গিয়ার ফেলে রওনা হয়ে গেল। গুনগুন করে গাইছে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত: আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

তিন

টলমল করছে ভারত মহাসাগরের সুনীল জলরাশি। কিন্তু ওটার বুকে ভাসছে মস্ত এক বেমানান খুঁত। ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলেছে পাঁচ শ' ষাট ফুটি বিতিকিচ্ছিরি এক ফ্রেইটার। মোটা

চিমনি থেকে ভকভক করে বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া। বহু পুরনো জাহাজ, অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে যৌবন। সোমালিয়ার উপকূল থেকে খানিক দূর দিয়ে চলছে মন্থর গতিতে।

সাগরে ডেবে রয়েছে খোল। ক্যাপ্টেন কোনও ঝুঁকি নিতে চাননি, মুম্বাই বন্দর পেরুনোর পর তীরের পাশ দিয়ে ঘুরপথে যাচ্ছেন। নইলে সামুদ্রিক ঝড় এলে মস্ত বিপদে পড়বে সবাই। ডেক থেকে মাত্র চার ফুট নীচে সাগর। জাহাজটা বামপাশে কাত হয়ে পড়েছে। একটু জোরালো ঢেউ এলেই ডেকে উঠে আসছে পানি। অদক্ষ হাতে রং করা হয়েছে সবুজ খোলটা। তার উপর এখানে ওখানে নানা রঙের পোঁচ। স্কাপারগুলোর গায়ে মরিচার ছাপ। খোলের কয়েক জায়গায় ঝালাই করা ধাতব প্লেট।

আমিডশিপ থেকে খানিক পিছনে ফ্রেইটারের সুপারস্ট্রাকচার। সামনে তিনটে হোল্ড, পিছনে দুটো। বিশাল তিনটে ক্রেন, পুরু জঙে আচ্ছন্ন। একই অবস্থা কেবলগুলোরও। ডেকের উপর নানান জঞ্জাল। ফুটো হয়ে যাওয়া ব্যারেল, নষ্ট মেশিনারি থেকে শুরু করে ভাঙা একটা সাইকেল পর্যন্ত পাওয়া যাবে। এক দিকের রেলিং মরিচা ধরে খসে পড়েছে। সে জায়গা নিয়েছে পুরু শিকল। ওদিক দিয়ে যে কেউ পড়ে যেতে পারে।

জাহাজের একটু দূর দিয়ে চলেছে একটা মাছ ধরা ট্রলার। ওটার ডেক থেকে পুরনো জাহাজের দিকে চেয়ে রয়েছে জেলেরা।

সোমালিয়ান ক্যাপ্টেনের দেহ দড়ির মত পাকানো, চেহারা ঠিক কুঠারের ফলার মত লম্বাটে। মুখ খুললে দেখা যায় মাঝের দুটো দাঁত নেই। অন্যগুলো পোকায় ধরা, কালো মাড়িতে ঘা। ব্রিজে সে ছাড়া আরও তিনজন দাঁড়িয়ে। এদের সঙ্গে আলাপ সেরে নিল ক্যাপ্টেন, তারপর টু ওয়ে ট্র্যান্সিভার থেকে তুলে নিল হ্যাণ্ড মাইক। সুইচ দাবিয়ে বিশ্রী সুরে ইংরেজি বলে উঠল, 'অ্যাহোয়, ফ্রেইটার।'

দুই সেকেণ্ড পর ছোট্ট স্পিকারে শোনা গেল কণ্ঠ: 'তোমরা কি আমার পোর্ট বিমের পাশের ওই ট্রলার?'

'হ্যাঁ। আমাদের ডাক্তার দরকার।' এক মুহূর্ত পর বলল সোমালিয়ান ক্যাপ্টেন, 'আমার চারজন লোক অসুস্থ। তোমাদের সঙ্গে ডাক্তার আছে?'

'আমাদের এক নাবিক নেভির মেইল-নার্স ছিল। তোমার লোকেদের কী হয়েছে?'

'আমরা বুঝব কী করে? আমরা তো ডাক্তার না।'

'কতটা অসুস্থ?' রেডিও অপারেটর জানতে চাইল।

'ক' দিন ধরে বমি করছে। মনে হয় পচা খাবার খেয়েছে।'

'ঠিক আছে। আমরা বোধহয় ওদের সুস্থ করে তুলতে পারব। সুপারস্ট্রাকচারের পাশে ভিড়বে। যতটা পারা যায় গতি কমাব আমরা। তবে পুরোপুরি থামতে পারব না। কথা বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, বুঝেছি। তোমরা থামবে না। ঠিক আছে।' সঙ্গীদের দিকে চেয়ে শেয়ালের মত চতুর হাসি দিল লোকটা। সোমালিয়ান ভাষায় বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস করেছে। তবে থামবে না। বোধহয় ভাবছে থামলে আর ইঞ্জিন চালু হবে না। রাসদি, স্টিয়ারিং হুইল ধরো। সুপারস্ট্রাকচারের পাশে ভিড়বে, সমান গতি তুলে এগুতে থাকবে।'

'ঠিক আছে, ওস্তাদ।'

'তোমরা ডেকে বেরিয়ে যাও,' অন্য দু'জনকে নির্দেশ দিল গুলবুদ্দীন। হুইলহাউসের নীচে কেবিনের দিকে চাইল। ওখানে কর্কশ-নোংরা কম্বল কাঁধে জড়িয়ে গুটিসুটি মেরে বসে আছে চারজন। খুবই শীর্ণ, কাঁধের হাড়ে মাংস নেই বললেই চলে।

ষাট ফুটি ট্রলার থেকে বিশাল উঁচু দেখাল জাহাজটাকে। তবে ওটার ডেক পানি থেকে মাত্র চার ফুট উপরে। সহজেই রেলিং ধরতে পারবে সোমালিয়ানরা। তার উপর নাবিকরা জাহাজের

পাশে নামিয়ে দিয়েছে ট্রাকের চাকা। সংঘর্ষ হবে না দুই জলযানে। রেলিঙের একটা অংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সহজেই অসুস্থদের তুলে নেবে। নাবিকদের দিকে চাইল গুলবুদ্দীন। প্রথম লোকটা বেঁটে। এশিয়ান। বোধহয় চিনা। পরনে ইউনিফর্ম শার্ট ও নীল প্যান্ট। কাঁধের এপিউলেট বলছে জাহাজের ক্যাপ্টেন। দ্বিতীয়জন বিশাল, ছয়ফুটি এক মহিলা-দানব। অন্য দু'জন পুরুষ, কোন্ দেশি বোঝা গেল না।

'আপনিই ক্যাপ্টেন?' অফিসারের দিকে চাইল গুলবুদ্দীন।

'হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন গ্যাং ফেং।'

'সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ। আমার লোক খুবই অসুস্থ। অথচ দেখুন ওদের কপাল, সাগরে মাছ ধরতে যেতেই হবে।'

'আমার কর্তব্য সাহায্য করা,' তাড়াহুড়ো করে বললেন ক্যাপ্টেন ফেং। 'জাহাজের পাশেই রেখো তোমাদের ট্রলার। চলেছি সুয়েজ খালের দিকে। তোমার লোকদের তীরে নামাতে গিয়ে সময় অপচয় করতে পারব না।'

'এ নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না,' তেলতেলে হাসি দিল গুলবুদ্দীন। ট্রলারের দড়ি এগিয়ে দিল।

বিশালদেহী মহিলা দড়িটা নিয়ে রেলিঙে বেঁধে ফেলল।

'ঠিক আছে, তোমার লোকদের তুলে দাও,' বললেন ফেং।

নিজের এক লোককে ট্রলারের রেলিঙে উঠতে সাহায্য করল গুলবুদ্দীন। দুই জলযানের মাঝে মাত্র নয় ইঞ্চি ফাঁক। কেউ এত শান্ত সাগরে পা পিছলে পড়বে না। লোকটাকে ধরে নিয়ে ফ্রেইটারের ডেকে উঠে পড়ল গুলবুদ্দীন। একটু সরে দাঁড়াল। ওর পর জাহাজে উঠল আরও দুই অসুস্থ রোগী।

চতুর্থ লোকটা লাফিয়ে উঠবার পর সন্দেহের মধ্যে পড়লেন ক্যাপ্টেন ফেং। ঠিক করেছেন জানতে চাইবেন এদের কী ধরনের অসুস্থতা। কিন্তু মুখ খুলবার আগেই গা থেকে কম্বল ফেলে দিল

তারা। আর কম্বল সরে যেতেই দেখা গেল ওদের হাতে ধরা একে-৪৭। এবার গুলবুদ্দীনের ট্রলারে অন্য দুই সঙ্গী শাহিন ও হাকিম কাঠের সিন্দুক থেকে বের করল রাইফেল। ওগুলো হাতে নিয়ে উঠে এল জাহাজে।

'জলদস্যু!' ককিয়ে উঠলেন চিনা ক্যাপ্টেন। জবাবে তাঁর পেটে মেশিন পিস্তলের নল দিয়ে গুঁতো মারল গুলবুদ্দীন।

প্রায় ভাঁজ হয়ে গেলেন ফেং, ব্যথা সামলাতে গিয়ে উবু হয়ে বসে পড়েছেন। অস্ত্রের মুখে নাবিকদের রেলিং থেকে সরিয়ে নিল গুলবুদ্দীনের লোক। কেউ উঁচু ব্রিজ উইঙে থাকতে পারে, কাজেই ওদিকে নজর রেখেছে একজন।

কিন্তু ওখানে কেউ নেই।

গুলবুদ্দীন একহাতে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল ক্যাপ্টেনকে, আরেক হাতে কণ্ঠার উপর ধরল পিস্তলের নল। 'যা বলব ঠিক তা-ই করবেন, তা হলে কারও ক্ষতি করব না।'

ক্যাপ্টেনের চোখে ফুটে উঠল প্রবল প্রতিবাদ, তবে তা মুহূর্তের জন্য। তারপর নিস্পৃহ হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। কিছুই খেয়াল করেনি জলদস্যু নেতা, ঘাড় কাত করে ইশারা করল।

'আপনি রেডিও রুমে চলুন। ওখানে একটা ঘোষণা দেবেন, সবাই যেন মেস হলে চলে আসে। উপস্থিত হতে হবে সবাইকে। পরে যদি কাউকে জাহাজে ঘুরঘুর করতে দেখি, বিনা দ্বিধায় গুলি করব।'

গুলবুদ্দীনের কথা শেষ হওয়ার আগেই প্লাস্টিকের ফিতা দিয়ে ক্রুদের হাত বেঁধে ফেলেছে তার লোক। একাও মহিলার বিষয়ে কোনও ঝুঁকি নেয়নি, ব্যবহার করেছে তিনটি ফিতা।

ক্রুদের দায়িত্ব নিয়েছে শাহিন ও আলীম। অন্য চার অসুস্থ জেলে ঢুকে পড়েছে সুপারস্ট্রাকচারে। ক্যাপ্টেন ফেং-এর পিঠে পিস্তলের খোঁচা দিয়ে এগুতে বলল গুলবুদ্দীন। জাহাজের ভিতর

অংশের তাপ মাত্র কয়েক ডিগ্রি কম। এয়ার-কণ্ডিশনার ঠিক কাজ করছে না। হল ও প্যাসেজওয়ে বহুদিন পরিষ্কার হয়নি। ফেটে গেছে লিনোলিয়াম মেঝে, উঠে আসছে চল্টা। প্রতি কোণে পাওয়া গেল ফুটবলের মত গোল ঝুল।

পুরো এক মিনিট লাগল না সিঁড়ি বেয়ে ব্রিজে উঠতে। ভিতরে কাঠের বড় হুইলের সামনে এক হেলমসম্যান। আরেক অফিসার ঝুঁকে পড়েছে চার্ট টেবিলের উপর। পাশে কয়েকটা এঁটো বাসন। চার্ট এতই পুরনো, মনে হয় ওটা প্যানজিয়ারের উপকূল। জানালাগুলো নীলচে হয়ে উঠেছে সামুদ্রিক লবণে।

'জেলেরা কী বলছে?' চার্ট থেকে মুখ না তুলে জানতে চাইল তরুণ অফিসার। কোনও জবাব এল না দেখে মাথা তুলল, পরক্ষণে বিস্ফারিত হলো দুই চোখ।

রাইফেল হাতে পুরো ঘর কাভার করছে দুই জলদস্যু। ক্যাপ্টেনের মাথা কাত হয়ে আছে। ঘাড়ের উপর ঠেসে ধরা হয়েছে পিস্তলের মাযল।

'কোনও সাহস দেখাতে যেয়ো না, মিস্টার কাশেম,' নরম স্বরে সাবধান করলেন কাপ্টেন ফেং। 'এরা বলেছে নির্দেশ মত চললে কারও ক্ষতি করবে না। চালু করো শিপওয়াইড চ্যানেল।'

'আই, ক্যাপ্টেন।' ঝুঁকে ইণ্টারকমের বাটন টিপল অফিসার। একটু একটু করে সরে আসছে। মাইক্রোফোন বাড়িয়ে দিল ক্যাপ্টেনের দিকে।

ফেং-এর উদ্দেশে বলল গুলবুদ্দীন, 'কাউকে সাবধান করলে খুন হয়ে যাবেন নিজেই। আপনার একটা লোকও বাঁচবে না।'

'আমি কোনও ঝুঁকি নেব না,' মাইকের সুইচ না টিপে কাঁপা স্বরে বললেন ক্যাপ্টেন। এবার সুইচ অন করে লাউড স্পিকারে জাহাজের চারপাশে ছড়িয়ে দিলেন বাণী: 'ক্যাপ্টেন বলছি। আপনারা এক্ষুণি চলে আসুন মেস হলে। এটা জরুরি মিটিং।

ডিউটিতে থাকা ইঞ্জিনিয়ারদেরকেও আসতে হবে। আবারও বলছি জরুরি মিটিং। যে যেখানে আছেন, চলে আসুন মেস হলে।'

'যথেষ্ট,' ছোঁ দিয়ে মাইক্রোফোন কেড়ে নিল গুলবুদ্দীন। 'মোক্তার, হুইল বুঝে নাও।' অফিসার ও হেলমসম্যানের দিকে পিস্তলের ইশারা করল সে। 'অ্যাই, তোমরা ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়াও।'

'মাত্র একজন লোক হেলমস সামলাতে পারবে না,' প্রতিবাদ করলেন ফেং।

'আমরা আগেও এরকম ঝক্কড়ে জাহাজ চালিয়েছি।'

'হতে পারে।'

বহুদিন হলো সোমালিয়া শাসন করছে না কোনও সরকার। কয়েকজন ওয়ার লর্ড মিলে ভাগ করে নিয়েছে দেশটাকে। নিজেদের ভিতর প্রচণ্ড বিরোধ। প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব সেনাবাহিনী। এবং এসব ওয়ার লর্ডের কেউ কেউ সেনাবাহিনী পুষতে গিয়ে শুরু করেছে জলদস্যুতা। এদের কারণে হর্ন অভ আফ্রিকার চারপাশের পানি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমেরিকা ও আরও কিছু দেশ তাদের নেভি রেখেছে এদিকে। কিন্তু ক'দিন পর পর ছিনতাই হচ্ছে জাহাজ। এত বিস্তৃত সাগর পাহারা দেয়া অসম্ভব। তার উপর সোমালিয়ান জলদস্যুরা জাহাজে উঠবার জন্য ব্যবহার করছে স্পিড-বোট। আগে জাহাজ থেকে নগদ টাকা ও মূল্যবান জিনিস নিয়ে যেত, কিন্তু বেশ কয়েক বছর হলো তারা গোটা জাহাজ হাইজ্যাক করছে। কার্গোগুলো স্থান পাচ্ছে কালোবাজারে। বেশিরভাগ সময় ক্রুদের নামিয়ে দেয়া হচ্ছে লাইফবোটে, অথবা মুক্তিপণ আদায় করা হচ্ছে জাহাজের মালিকের কাছ থেকে। মুক্তিপণ না দিলে খুন হচ্ছে ক্রুরা।

ক'দিন পর পর বড় জাহাজ হাইজ্যাক করছে সোমালিয়ানরা। আগে শুধু উপকূলবর্তী ফ্রেইটারে হামলা চলত, কিন্তু এখন ট্যাঙ্কার

বা কন্টেইনারশিপও বাদ পড়ছে না। এক সপ্তাহ আগে একটা ক্রুজ লাইনারের উপর পনেরো মিনিট গুলিবর্ষণ করা হয়। সবাই জানে ইদানীং এক ওয়ার লর্ড উত্তর-উপকূলের সমস্ত জলদস্যুদের একত্র করে মস্ত দল তৈরি করেছে। আশপাশের সবাই মেনেও নিয়েছে তার নেতৃত্ব।

এ দলের সর্বোচ্চ নেতা দালমার আলী। মধ্য নব্বুই-এর দিকে সে ছিল রাজধানী মোগাদিশুর এক সাধারণ সৈনিক। তখন ইউএন চেষ্টা করছে সেদেশের মহামারীতে আক্রান্ত ক্ষুধার্ত মানুষদের বাঁচিয়ে রাখতে। সে সময় দালমার আলী নাম কিনল একের পর এক ইউএন ট্রাক লুঠ করে। সেসব ইমার্জেন্সি ফুড চলে গেল তার পকেটে। তারপর এক ভোরে আমেরিকান একটা পজিশনে হামলা করল দালমার আলী, আরপিজি দিয়ে উড়িয়ে দিল হামভি। বিধ্বস্ত যান থেকে টেনে বের করল মৃত-অর্ধমৃত সবাইকে, টুকরো টুকরো করে ফেলল ম্যাসেটি দিয়ে কুপিয়ে।

এরপর ভয় পেয়ে মেরিনদের প্রত্যাহার করতে শুরু করল আমেরিকান সরকার। তখন থেকে দলবল তৈরির চেষ্টা করছে দালমার আলী। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেশের চার ভাগের এক ভাগ দখল করে নিল এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী দস্যু। উনিশ শ' আটানব্বুই-এ যখন কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় আমেরিকান এম্বেসিতে বোমা মারল আল-কায়েদা, সেই সময়ে দালমার আলী ওই বোমারুদেরকে লুকিয়ে রাখে দু'মাস। এর ফলে তার মাথার জন্য আড়াই লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে হেগের বিশ্ব আদালত। দালমার ভাল করেই জানে তার সময় ফুরিয়ে আসছে, শীঘ্রিই কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ওই পুরস্কার পাওয়ার চেষ্টা করবে। এবং এটা জানে বলেই মোগাদিশু থেকে নিজ কার্যক্রম সরিয়ে নিয়েছে, চলে এসেছে তিন শ' মাইল উত্তরে, উপকূল ঘেঁষা জলাভূমির ভিতর।

প্রচার করা হলো: ওই এলাকায় এসে জলদস্যুদের কাছ থেকে

বন্দিদের ছুটিয়ে নিয়েছে দালমার আলী, মুক্ত করে দিয়েছে মানুষগুলোকে। তবে সত্য কথা হচ্ছে: এর পর থেকে যত লোক বন্দি হয়েছে, তাদের জন্য নিজেই মুক্তিপণ চেয়েছে সে। কোনও দেশ বা জাহাজ-কোম্পানি মুক্তিপণ না দিলে, বা বেশি দরদাম করলে দেরি না করে মেরে ফেলা হয় মানুষগুলোকে। শোনা যায় দালমারের কণ্ঠ থেকে ঝুলছে সোনা দিয়ে ফিলিং করা দাঁতের বড়সড় নেকলেস। ওই লোকগুলোকে নিজ হাতে খুন করেছে সে।

আজকের এই পুরনো ফ্রেইটারটা দখল করেছে সেই কুখ্যাত দালমার আলীর স্যাঙাতরাই।

ক্যাপ্টেন ফেংকে তার অফিসে ঢুকতে বাধ্য করল গুলবুদ্দীন ও তার এক লোক। এদিকে ব্রিজের অফিসার ও হেলমসম্যানকে মেস হলে নিয়ে গেল আরেক জলদস্যু। ক্যাপ্টেন ফেং-এর অফিস ও কেবিন পাইলটহাউসের এক ডেক নীচে। ঘরদুটো পরিষ্কার। দেয়ালে ঝুলছে দুটো ছবি, এ ছাড়া ধাতব দেয়াল ফাঁকা। টেবিলের উপর ফ্রেমে বাঁধানো ছবিতে ক্যাপ্টেন ফেং ও এক বয়স্কা মহিলা। ক্যাপ্টেনের মা হতে পারেন হয়তো।

একমাত্র পোর্টহোল থেকে আসছে উজ্জ্বল আলো।

'ক্রুদের ম্যানিফেস্ট দেখি,' হুকুমের সুরে বলল গুলবুদ্দীন।

ক্যাপ্টেনের ডেস্কের পাশে ছোট সেফ। ওটার উপর ঝুঁকে পড়লেন ফেং, কম্বিনেশন মিলিয়ে তালা খুলছেন।

'তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে আসবেন,' নির্দেশ দিল জলদস্যু নেতা।

কাঁধের উপর দিয়ে তার দিকে চাইলেন ফেং। 'শপথ করে বলতে পারি এখানে কোনও অস্ত্র নেই,' বললেন বটে, তবে নির্দেশ মেনে তালা খুলেই পিছিয়ে গেলেন।

গুলবুদ্দীনের সঙ্গী একে-৪৭ বাগিয়ে ধরেছে ক্যাপ্টেনের বুকে। এবার গুলবুদ্দীন ঝুঁকে পড়ল সিন্দুকের উপর। ফাইল ও ফোল্ডার

বের করে ধপাধপ্ করে নামিয়ে রাখল ক্যাপ্টেনের ডেস্কের উপর। শিস দিয়ে উঠল পুরু খাম দেখে। দেরি না করে খুলে ফেলল, বেরিয়ে এল কয়েক দেশের মুদ্রা। নাকের নীচে ধরল এক শ' ডলারের তোড়া। বড় করে শ্বাস নিল, ভাব দেখে মনে হলো সেরা ওয়াইনের সুবাস পেয়েছে।

'এখানে কত আছে, ক্যাপ্টেন?'

'বারো হাজার ডলার। একটু কমও থাকতে পারে।'

এনভেলপটা শার্টের পকেটে রেখে দিল গুলবুদ্দীন। এবার কাগজপত্র ঘাঁটতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্ত পর পেল ক্রুদের ম্যানিফেস্ট। সোমালিয়ান ভাষাও পড়তে পারে না সে, ইংরেজি তো দূরের কথা। তবে পাসপোর্টগুলো থেকে চিনতে পারছে কে কোন্ দেশের। সব মিলে ক্রু রয়েছে তেইশজন। প্রতিটি পাসপোর্ট ঘেঁটে দেখল সে। ক্যাপ্টেন ফেং, অফিসার কাশেম, হেলমসম্যান ও ডেকের কয়েকজনকে ভাল করেই চিনল। খুশি হয়ে উঠল গুলবুদ্দীন। ক্রুদের চার ভাগের এক ভাগ ক্রু এরইমধ্যে হাতের মুঠোর ভিতর চলে এসেছে।

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। এবার মেস হলে চলুন।'

পাঁচ মিনিট পর মেস হলে পৌঁছে গেল তারা। ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল বাতি। গিজগিজ করছে লোক। কেউ কেউ ধূমপান করছে। বাতাসে ঘন ধোঁয়া। হয়তো ওটার কারণেই ঘামের গন্ধ পাওয়া গেল না। উত্তেজনা ও ভয়ের কারণে দরদর করে ঘামছে সবাই। হতক্লান্ত চেহারার একটা দল। এদের কপাল মন্দ যে ভাল কোনও জাহাজে স্থান মেলেনি। তবে পুরনো জাহাজ মোটামুটি যত্নে রেখেছে, নইলে এ জিনিস এতদিনে ভেঙে ফেলা হতো। আর তা হলে চাকরি থাকত না তাদের।

ক্যাপ্টেন ফেং-এর এক ক্রুর মাথার পিছনে রক্তে ভেজা ব্যাণ্ডেজ। নিশ্চয়ই কিছু বলেছে, বা কিছু করতে গিয়েছিল, যে

কারণে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে জলদস্যুরা।

'কী হয়েছে, ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার। জাম্প সুটে লেগে রয়েছে গ্রিজ।

'আপনার কী মনে হয়?' ভুরু নাচালেন ফেং, তারপর বললেন, 'দেখতেই পাচ্ছেন, জাহাজে জলদস্যু উঠেছে।'

'একদম চুপ!' ধমকে উঠল গুলবুদ্দীন। ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে পাসপোর্টগুলো নিয়ে এসেছে। একটা একটা করে ছবি মিলিয়ে দেখতে লাগল। একবার এক জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বিশ্বাস করে মস্ত ভুল করেছিল সে, ওই লোকের দু'জন ক্রু জাহাজে লুকিয়ে ছিল। গুলবুদ্দীনের এক লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলে তারা, রেডিও রুমে গিয়ে মে-ডে প্রচার করে, তারপর ধরা পড়ে।

'গুড। কেউ হিরো সাজতে চেষ্টা করেনি।' পাসপোর্টগুলো পাশে রাখল গুলবুদ্দীন, চোখ বুলিয়ে নিল সবার উপর। ভীত মানুষ দেখলেই চিনতে পারে সে, এবং তাতে খুশি হয়। সন্দেহ নেই এই জাহাজের ক্রুরা তীব্র আতঙ্কের ভিতর আছে। নিজের এক লোককে ডেকে পাঠিয়ে দিল গুলবুদ্দীন। সে লোক গিয়ে রাসদিকে বলবে ট্রলার সরিয়ে নিতে। সোজা বেসে ফিরবে রাসদি, সর্বোচ্চ নেতাকে জানিয়ে দেবে ওরা একটা ফ্রেইটার দখল করেছে। 'আমার নাম গুলবুদ্দীন হেকমত, আর এই জাহাজ এখন থেকে আমার। তোমরা যদি আমার নির্দেশ মত চলো, তোমাদেরকে খুন করব না। যদি পালাতে চেষ্টা করো, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারব। হাঙরের মুখে ফেলে দেয়া হবে লাশ। সবসময় এই দুটো বিষয় মাথার ভিতর রাখবে।'

'আমার লোক নির্দেশ মত চলবে,' ক্লান্ত স্বরে বললেন ফেং। 'আপনি যা বলবেন তাই মানব। আমরা সবাই যার যার ঘরে পরিবারের কাছে ফিরতে চাই।'

'খুবই ভাল বলেছেন, ক্যাপ্টেন। আপনার সাহায্য নিয়ে

জাহাজের মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তারা মুক্তিপণ দিলেই মুক্তি পাবেন।'

'ওই হারামজাদারা এক গ্যালন রংও খরচ করে না,' ফিসফিস করে পাশেরজনকে বললেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার। 'ওরা আমাদের জন্য একটা পয়সা খরচ করবে না।'

দুই জলদস্যু চলে গেছে কিচেনে। অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার হতে পারে এমন সব সরিয়ে ফেলছে। একটু পর সুতির ব্যাগ ভরা স্টেকের ছোরা, কিচেন ছুরি ও কাঁটা-চামচ নিয়ে ফিরল। এরপর গুলবুদ্দীন ছাড়া মেস হল-এ রইল শুধু একজন সশস্ত্র দস্যু। অন্যরা হলওয়েতে বেরিয়ে গেছে। সঙ্গে নিয়েছে ছুরির ব্যাগ, ফেলে দেবে সাগরে।

'ওরা জানে কী করতে হবে,' ফিসফিস করে রেডিও অপারেটরকে বলল কাশেম। 'ভাবছি ওদের লোক কমলে একটা ছুরি নিয়ে...'

তরুণ অফিসার জানে না তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক দস্যু। দেরি করল না সে, একে-৪৭-এর বাঁট পড়ল কাশেমের ঘাড়ে। ঠাস্ করে নাকমুখ বাড়ি খেল ফরমাইকা লাগানো টেবিলের উপর। কয়েক মুহূর্ত পর সিধে হলো অফিসার, নাক থেকে দরদর করে বেরুচ্ছে তাজা রক্ত।

'আবার কথা বললে স্রেফ খুন করে ফেলব,' ধমক দিল গুলবুদ্দীন। কণ্ঠস্বর বলে দিল মিথ্যা বলছে না। 'মেস হলের পাশে বাথরুম দেখছি। দরকার পড়লে ব্যবহার করবেন। আপনারা এখানেই থাকছেন। বাইরে থেকে দরজা আটকিয়ে দেব। সর্বক্ষণ পাহারা থাকবে।' এবার নিজ দলের জন্য সোমালিয়ান বলে উঠল, 'চলো, দেখা যাক কার্গো হিসাবে কী এনেছে আমাদের জন্য।'

একটা লাইন তৈরি করে মেস হলের বাইরে অপেক্ষা করছে দস্যুরা। বাইরে থেকে আটকে দেয়া হলো দরজা। একটা তার

দিয়ে হ্যাণ্ডেলে প্যাঁচ মেরে, অপর অংশ পেঁচিয়ে দেয়া হলো প্যাসেজওয়েের উল্টোদিকের রেলিঙে। এবার আর ভিতর থেকে দরজা খোলা সম্ভব হবে না। গুলবুদ্দীন দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে বলল তার এক লোককে। অন্যরা নিয়ম মেনে জাহাজ তল্লাসী করতে চলল।

এ জাহাজ বড়, কিন্তু বাইরের আকৃতির তুলনায় ভিতর অংশে জায়গা কম। কিছুক্ষণ থাকলে হাঁফ ধরে যায় বুকে। আগে যা ধারণা করেছিল গুলবুদ্দীন, সে তুলনায় জাহাজের হোল্ড অনেক ছোট। পিছনের দুই হোল্ডে ঠেসে রাখা হয়েছে শিপিং কণ্টেইনার। সবচেয়ে চিকন দস্যু চাইলেও দুই সারি বাক্সের মাঝ দিয়ে যেতে পারবে না। নিজেদের নিরাপদ বন্দরে না পৌঁছুনো পর্যন্ত বুঝবার উপায় নেই কণ্টেইনারগুলোর ভিতর কী। তবে সামনের তিন হোল্ডে যা পাওয়া গেল, তাতেই খুশি হয়ে উঠল গুলবুদ্দীন। ক্রেট্ ভরা যন্ত্রপাতি, ইণ্ডিয়ান গাড়ির ইঞ্জিন, লোহার চারকোনা পাত ও ছয়টি পিকআপ ট্রাক। শেষের জিনিসগুলোর ছাতের উপর মেশিনগান বসিয়ে নিলে রীতিমত যুদ্ধযান হয়ে উঠবে। আফ্রিকায় ওটাকে বলে টেকনিকাল্স্। শুধু এগুলো নয়, বড় একটা ট্রাকও রয়েছে। তবে ওটা এত পুরনো যে মনে হয় না চলবে। জাহাজে আরও রয়েছে স্টেনসিল করা পেট মোটা ছালা। এক নামকরা এনজিও গম পাঠাচ্ছে সুদানে। তবে সবচেয়ে বড় পুরস্কার এক শ' ড্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। সার হিসাবে ভাল কাজ করে, তবে ওই নাইট্রেট কম্পাউণ্ডের সঙ্গে ডিজেল মেশালে তৈরি হয় শক্তিশালী বিস্ফোরক। এ জাহাজের সামনের হোল্ডে যে পরিমাণ আছে, অর্ধেক মোগাদিশু উড়িয়ে দিতে পারবে দালমার আলী।

গুলবুদ্দীন ভাল করে জানে চির দিনের জন্য জলাভূমিতে পড়ে থাকবে না তার নেতা। প্রায়ই বলে আবার রাজধানীতে ফিরবে সে, অন্যান্য ওয়ার লর্ডের বিরুদ্ধে শেষবারের মত লড়বে। আর

এখন এসব বিস্ফোরক পেয়ে যাওয়ায় অন্যদের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থানে পৌঁছে গেছে দালমার। গুলবুদ্দীনের মনে সন্দেহ নেই, আজ হোক বা এক মাস পর হোক, পুরো সোমালিয়া দখল করে নেবে তার নেতা। মনে মনে হাসল গুলবুদ্দীন। এই ফ্রেইটার দখল করেছে বলে সে নিজে পাবে অচিন্ত্যনীয় সম্মান ও বিপুল সম্পদ। বলা যায় না, দালমার হয়তো প্রধানমন্ত্রী করে দেবে তাকে।

একটু মন খারাপ করল গুলবুদ্দীন। রাসদিকে আগেই খবর দিতে পাঠানোটা ঠিক হলো না। কিন্তু এখন আর ভেবে কী হবে! ওদের সঙ্গের রেডিও বড়জোর দুই মাইল পর্যন্ত যোগাযোগ করবে। এদিকে ট্রলার চলে গেছে রেঞ্জের অনেক বাইরে।

হোল্ড থেকে বেরিয়ে ব্রিজে চলে এল গুলবুদ্দীন, ক্যাপ্টেনের কেবিনে পাওয়া কিউবান চুরুট ধরিয়ে চারপাশে চাইল। দিগন্তে ঝুলছে অস্তায়মান সূর্য। সেই আলোয় ব্রোঞ্জের মত হয়ে উঠেছে পান্না-সবুজ সাগর। গুলবুদ্দীন বা তার মত দস্যুদের চোখে সন্ধ্যার কোনও বাড়তি সৌন্দর্য নেই। এ ধরনের লোক বেঁচে থাকে নোংরা এক পরিবেশে। কী পাবে সেটা মেপে প্রতিটি পদক্ষেপ নেয়। হয়তো কেউ বলতে পারে, এ ধরনের লোক তৈরি হয়েছে সোমালিয়ার যুদ্ধাবস্থার কারণে। এ মানুষগুলো ভাল পরিবেশে বাঁচবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। সত্যি হচ্ছে: সোমালিয়ার বেশিরভাগ লোক জীবনে কখনও কোনও অস্ত্র ব্যবহার করেনি। কিন্তু গুলবুদ্দীনের মত যারা দালমার আলীদের মদত দিয়ে চলেছে, তারা এসব করছে ক্ষমতা পাওয়ার আশায়, সবার উপর ছড়ি ঘোরাবার জন্য। যেমন এ জাহাজের সবার জীবন নিয়ে যেমন খুশি খেলছে তারা।

ক্যাপ্টেনের মাথা নিচু হতে দেখে ভাল লেগেছে গুলবুদ্দীনের। নাবিকদের চোখে যে ভয় দেখেছে, তাতে নিজেকে মনে হয়েছে ক্ষমতাশালী। ক্যাপ্টেনের কেবিনে বয়স্কা এক মহিলার ছবি, ইচ্ছা

করলে ওই মহিলার সন্তানকে মেরে ফেলতে পারে সে। কথাটা ভাবলে নিজেকে ক্ষমতাবান মনে হয়। সে যে অবস্থানে রয়েছে, সেখানে কোনও তাড়াহুড়ো করতে হয় না তাকে।

শাহিন ও হাকিম ব্রিজে এসে ঢুকেছে। পছন্দ মত পোশাক পরে নিয়েছে অফিসারদের কোয়ার্টার থেকে। শাহিনের বয়স মাত্র চব্বিশ, কিন্তু এরইমধ্যে বারোটা জাহাজ হাইজ্যাক করে ফেলেছে। চিকন ধরনের লোক সে, জিন্স পরবার জন্য বেল্টে নতুন গর্ত করতে হয়েছে। আর হাকিমের বয়স পঁয়তাল্লিশ মত। সে দালমার আলীর পাশে থেকে আমেরিকান মেরিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। একবার ভিন্ন এক দলের বিরুদ্ধে ছোরা লড়াইয়ে তার বাম গালের মাংস খুবলে যায়। এর পর থেকে চুপ মেরে যায়। কম কথা বলে, এবং যখন বলে, তার বেশিরভাগ বোঝা যায় না। তবে গুলবুদ্দীনের প্রতিটি নির্দেশ পালন করে সে। গুলবুদ্দীন এর বেশি কিছু চায় না তার কাছে।

'যাও, ক্যাপ্টেনকে নিয়ে এসো। তার কাছ থেকে জানতে হবে এ জাহাজের মালিক কোম্পানি কত টাকা দিতে পারে।' শাহিনের চোখের দিকে চাইল গুলবুদ্দীন। 'আরেকটা কথা, বাড়ি ফেরা পর্যন্ত গাঁজা টানবে না বলে দিচ্ছি, খবরদার!'

দুই জলদস্যু সিঁড়ি বেয়ে প্রধান ডেকে নেমে গেল। ডুবন্ত সূর্যের লালচে আলোয় ভুতুড়ে লাগছে জাহাজটাকে। দ্রুত নেমে আসছে ছায়া। সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর জ্বলছে কয়েকটা আলো। সে আভায় বেশি দূর দেখা যায় না। প্রহরীকে দরজায় বাঁধা তারটা খুলতে বলল শাহিন। সে ও হাকিম দু'হাতে বাগিয়ে ধরল অস্ত্র। কয়েক সেকেণ্ড পর ক্যাঁচকোঁচ শব্দে খুলে গেল দরজা।

হাঁ হয়ে গেল তিন জলদস্যু!

কেউ নেই হলঘরে।

চার

দরজা ঠেলে মেস হলের ভিতর ঢুকল শাহিন ও হাকিম। প্রহরীর মনে হলো করিডোরের দূরে কে যেন! অন্ধকারে চেয়ে রইল সে। কাঁধে তুলেছে রাইফেল। ক্রুরা গায়েব না হলে ভয় পেত না, গিয়ে দেখত প্যাসেজওয়ের ওদিকে কী। কিন্তু এখন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে তার উত্তেজিত স্নায়ু। ট্রিগার পেঁচিয়ে ধরল তর্জনী, বারোটা গুলি ছুটে গেল করিডোর ধরে। একে-৪৭-এর আগুনের ঝিলিকে পরিষ্কার দেখা গেল, করিডোর ফাঁকা। কারও কোনও ক্ষতি হয়নি, শুধু নোংরা দেয়াল থেকে খসে পড়েছে আরও রং।

'কী হলো?' জানতে চাইল শাহিন।

'আমার মনে হলো কে যেন...' থমকে থমকে বলল প্রহরী।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল শাহিন। 'হাকিম, তুমি ওর সঙ্গে গিয়ে ডেক খুঁজে দেখো। আমি গুলবুদ্দীনকে জানাচ্ছি কী ঘটেছে এখানে।'

গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে গুলবুদ্দীন। শাহিনের সঙ্গে তার দেখা হলো মাঝ পথে। সিনেমার নায়কের মত পিস্তলটা কাত করে বাড়িয়ে ধরেছে। চোখ জ্বলছে রাগে।

'কে গুলি করল? এবং কেন?' হাঁটবার গতি কমল না গুলবুদ্দীনের। বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে পিছাতে শুরু করল শাহিন।

'মেস হল ফাঁকা—কেউ নেই। খালিক নাকি ছায়া মত কী যেন দেখেছে। হাকিম আর খালিক এখন ডেক দেখতে গেছে।'

গুলবুদ্দীনের মনে হলো ভুল শুনছে। 'মেস হল খালি মানে?'

'ক্রুরা গায়েব। রেলিং আর দরজার হ্যাণ্ডেলে তার লাগানো

ছিল। জেগে ছিল খালিক। কিন্তু লোকগুলো কীভাবে যেন গায়েব হয়ে গেছে!'

করিডোর পেরিয়ে মেস হলের দরজার সামনে পৌঁছে গেল দুই দস্যু। কপাট এখনও সামান্য ফাঁক করা। গায়ের জোরে লাথি দিয়ে গুলবুদ্দীন খুলল দরজা। ডোরস্টপে লেগে বিকট আওয়াজ উঠল। মনে হলো চারপাশ থরথর করে কাঁপছে। গুলবুদ্দীন এক ঘণ্টা আগে দেখে গেছে এ ঘরে তেইশজন ছিল। এখনও ঠিক তা-ই আছে! এক এক করে গুনল গুলবুদ্দীন। একজনও বাদ পড়েনি। লোকগুলো উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত।

'গুলি কীসের?' নরম স্বরে জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন ফেং।

সঙ্গীর উপর খুনিদৃষ্টি ফেলল গুলবুদ্দীন। 'ইঁদুর মারা হয়েছে।' খপ করে শাহিনের বাহু ধরল, ঘর থেকে ঠেলে বের করে নিয়ে এল। পিছনে দরজা বন্ধ হতেই সপাটে দুটো চড় লাগিয়ে দিল দুই গালে। 'আবার নেশা করেছ! ...এখন কী দেখলে?'

'না, গুলবুদ্দীন। শপথ করে বলতে পারি। আমরা সবাই দেখেছি...'

'যথেষ্ট শুনেছি! আবার যদি দেখি আমার কোনও কাজে গাঁজা টেনেছ, এক গুলিতে খতম করব। কুত্তার বাচ্চা! কথা মাথার ভিতর ঢুকেছে?' শাহিনের চোখ পায়ের আঙুল গুনছে। কোনও জবাব দিল না। খপ করে তার চোয়াল ধরল গুলবুদ্দীন, চোখে চোখ রাখল। 'বুঝতে পেরেছিস?'

'হ্যাঁ, গুলবুদ্দীন।'

'দরজাটা আবারও বেঁধে ফ্যাল। খুঁজে বের কর খালিক আর হাকিমকে। আমি চাই না আরও গুলি নষ্ট হোক।'

দরজা বন্ধ করে হুকুম পালন করতে রওনা হয়ে গেল শাহিন। করিডোরেই দাঁড়িয়ে রইল গুলবুদ্দীন। একবার কান পাতল পুরু ধাতব দরজার উপর। কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। ফাঁকা

করিডোরের চারপাশ দেখে নিল। কোথাও অস্বাভাবিক কিছু নেই। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো কেউ চোখ রাখছে তার উপর। ঘাড়ের কাছ থেকে শিরশির করে একটা অনুভূতি নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। বিড়বিড় করে বলল, 'শালারা, আমাকে ঘাবড়ে দিতে চায়! আমি শালা কি ওদের মত?'

জলদস্যুরা ভাবতেও পারবে না মেস হল-এর দুই ডেক নীচে রয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ঘর, সেখানে বসে সোমালিয়ান লোকটাকে শিউরে উঠতে দেখল মাসুদ রানা, ঠোঁটে মৃদু হাসি। বিশাল ফ্ল্যাট-প্যানেল ডিসপ্লেতে পরিষ্কার দেখছে লোকটাকে।

নিচু ছাতের এ ঘরটার নাম দেয়া হয়েছে অপারেশন্স সেন্টার। বললে ভুল হবে না, এটাই হাইটেক জাহাজের মগজ। ঘরে আবছা নীল আভা, চালু রয়েছে অসংখ্য কমপিউটার স্ক্রিন। মেঝে ঢেকে দেয়া হয়েছে অ্যান্টিস্কিড অ্যান্টিস্ট্যাটিক রাবার দিয়ে। হঠাৎ কেউ এ ঘর দেখলে ভাববে টেলিভিশনে দেখা স্টার-শিপ এন্টারপ্রাইজের ব্রিজ নেমে এসেছে পৃথিবীতে। মেইন ডিসপ্লের সামনে দুটো চেয়ার। প্রথমটা হেলমসম্যানের জন্য। পাশেরটা ওয়েপন্স কন্ট্রোল। এ ছাড়া ঘরের চারপাশে রেডিও, সোনার, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ড্যামেজ কন্ট্রোল-এর প্রধানদের চেয়ার ও কন্সোল।

অপারেশন্স সেন্টারের মাঝামাঝি জায়গায় মাসুদ রানার চেয়ার, ওখানে বসলে চারপাশের সবই দেখা যায়। ওই চেয়ারের সঙ্গে ফিট করা কমপিউটারের সাহায্যে ঘরের যে-কোনও কন্সোল অপারেট করতে পারে রানা।

সুঠামদেহী যুবক মাসুদ রানা বাঙালি। উচ্চতা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। প্রথম দৃষ্টিতে ভয়ানক নিষ্ঠুর মনে হয়, আবার চোখের দিকে চাইলে মনে হয় মায়াময় এক কোমলহৃদয়ের

মানুষ। কুচকুচে কালো দুটি চোখ সব দেখে, সব খেয়াল করে। ভিতরে কী যেন রয়েছে ওর, যে-কারও মনে হবে, ঠিক এই মানুষটাকেই খুঁজছে সে জীবনভর। এর উপর ভরসা রাখলে ঠকতে হবে না। খুব কম মানুষ জানে সে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুঃসাহসী এক এজেন্ট। দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও নিজ দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে জান বাজি রেখে।

ওর পাশে বসেছে সোহেল আহমেদ, বিসিআই, অর্থাৎ বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি, দুর্ধর্ষ চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার। রানার প্রিয় বন্ধু। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি দুর্দান্ত সাহসী মানুষ। ওদেরকে পাঠানো হয়েছে একটি বিশেষ মিশন দিয়ে।

২০০৯-এর জুনের শেষে বাংলাদেশের পতাকাবাহী লায়নস হার্টের মালিকানাধীন একটি ফ্রেইটার এমভি জাহাঙ্গীর ৪৩,০০০ টন নিকেল ওর নিয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে যাচ্ছিল গ্রিসের উদ্দেশে। ভারতের কোচি শহর থেকে আরব সাগর ধরে ৫০০ মাইল পশ্চিমে যেতেই অতর্কিত আক্রমণ করে জাহাজটা দখল করে নেয় একদল সশস্ত্র সোমালিয়ান জলদস্যু। পঁচিশজন ক্রুসহ জাহাজটা হাইজ্যাক করে নিয়ে যায় তারা ১১০০ মাইল দূরে সোমালিয়ার উপকূলে। আত্মসমর্পণ না করে উপায় ছিল না বাঙালি ক্যাপ্টেন নাসিরুদ্দীন চাকলাদারের।

ইণ্ডিয়ান কোস্ট গার্ড এবং সিঙ্গাপুর ও দুবাইয়ের অ্যান্টি-পাইরেসি টিমের কাছে সাহায্য চেয়ে কোনও লাভ হয়নি। ক্রুদের দু'জনের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীরাও ছিলেন। দস্যুদের কাছে আবেদন-নিবেদনে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর ২০০৯ সালের ২০ই সেপ্টেম্বর জাহাজের মালিকের কাছ থেকে ৩ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ আদায় করে তারপর ছেড়ে দেয় তারা

এমভি জাহাঙ্গীরকে।

ওই বছর সোমালিয়ার জলদস্যুরা মোট ১২১টি জাহাজের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। কমা তো দূরের কথা, বাড়তে বাড়তে অসহ্য পর্যায়ে চলে যায় তাদের পাইরেসির মাত্রা।

উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ সরকার এই দস্যুতার একটা বিহিত করবার জন্য বিসিআই-চিফকে অনুরোধ করে। বলা হয় যেভাবে হোক সোমালিয়ান জলদস্যুদের হাত থেকে বাংলাদেশি বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে রক্ষা করার একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।

এরপর সোমালিয়ান দস্যুদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে ব্যাপারে বিসিআই অফিসে একটা জরুরি মিটিং হয়।

তারই বাস্তবায়নে গত ক'দিন হলো এ মিশনে এসেছে মার্ভেলের এই দলটি। সঙ্গে রয়েছে কোরিয়া, চিন, মালয়েশিয়ার কয়েকজন এজেন্টও। কারণ, বার বার তাদের জাহাজও আটক করে মুক্তিপণ আদায় করেছে এই দস্যুরা। আপাতত মার্ভেলের ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় অভিনয় করছে চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের এক সুযোগ্য এজেন্ট।

গত কয়েকদিন যাবৎ সোমালিয়ার পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করছে মার্ভেল। শেষে আজ জাহাজে এসে উঠেছে সোমালিয়ান জলদস্যুরা। আপাতত তাদের হাতে 'বন্দি' মার্ভেলের তেইশজন সদস্য। অথচ অপারেশন্স সেন্টারের কেউ বিন্দুমাত্র শঙ্কিত নয়।

রানার বন্ধু লিউ ফু-চুং এ মিশনে নিজে আসতে না পারলেও পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের সিক্রেট সার্ভিসের অন্যতম সেরা একজন অপারেটরকে।

মার্ভেল জাহাজে ভারতীয় এজেন্ট অনিল চট্টোপাধ্যায় নেই। অন্য কাজে আটকা পড়েছে সে। স্ত্রীর বাচ্চা হবে, কাজেই আসেনি আতাসি। আসতে পারেনি ইন্দোনেশিয়ান নেভাল ইন্টেলিজেন্সের উর্বশী দাশাও। তবে সাগর চষে বেড়াবার সুযোগ হাতছাড়া করতে

রাজি হয়নি বন্ধু ভিনসেন্ট গগল। চলে এসেছে রানার ডাক পেয়ে।

মার্ভেল জাহাজে রয়েছে বাংলাদেশের মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ, আর্মির ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, বাংলাদেশ নেভির লেফটেন্যান্ট সানজিদা স্বর্ণা, কমাণ্ডো কাশেম, জলিল, এজেন্ট রায়হান রশিদ, ক্যাপ্টেন খোরশেদ নবী এবং বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ থেকে লিয়েন-এ আসা কয়েকজন তরুণ যোদ্ধা। হল্যাণ্ডের ফারা রাইনারও ডাক্তার হিসাবে এসেছে।

আরেকটু আগে থেকে বলা যাক।

আজ থেকে পাঁচ মাস আগে মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের সঙ্গে আলাপ করে রানা। তাঁকে জানায়, সাগরে ও রানা এজেন্সির একটা ফ্রন্ট খুলতে চায়।

বস্ বলেন, তাঁর বন্ধু পাপাগোপালার সঙ্গে রানা আলাপ করে দেখুক, ওঁর প্রিয় জাহাজটা পাওয়া যায় কি না।

এরপর দ্বিধা নিয়ে শিপিং টাইকুন চ্যাণ্ড্রো পাপাগোপালার কাছ থেকে মার্ভেল অভ গ্রিস জাহাজটা ভাড়া নিতে চাইল রানা।

কিন্তু এক কথায় মানা করে দিলেন ভদ্রলোক। দেবেন না।

দমে গেল রানা।

তবে গ্রিক ব্যবসায়ী কয়েক মুহূর্ত পর বললেন: 'জাহাজ তো দিতেই পারি, কিন্তু ভাড়া নেব না। আগেও বলেছি, তোমাকে নিজের ছেলের মত দেখি আমি। রানা এজেন্সি সাগরে ভাসতে চাইছে জেনে আমি খুবই সন্তুষ্ট। তাতে আমার নিজেরও অনেক সুবিধে। আমার শিপিং ফ্লিটের যে-কোনও সমস্যায় তোমাদের সাহায্য আমি আশা করব। ব্যাপারটা হবে পারস্পরিক সাহায্য বিনিময়, বুঝেছ? ...এই প্রস্তাবে যদি রাজি থাকো, মার্ভেল অভ গ্রিস তুমি নিতে পারো। ...নেবে?'

'নেব,' রাজি হয়ে গেছে রানা।

এবারের মিশনে তাই এসেছে রানা এজেন্সির বিভিন্ন শাখার

কয়েকজন দুর্ধর্ষ তরুণও। এরা আসলে বিসিআই-এর এজেন্ট, তবে বেসরকারী সংস্থা রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ছত্রছায়ায় কাজ করে।

ফেরা যাক বর্তমানে। প্রথম যখন সোমালিয়ান জলদস্যুরা জাহাজে উঠল, সে মুহূর্তটাই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। দস্যুরা কীভাবে ক্রুদের নেবে তার কোনও ঠিক ছিল না। তখন বো-র কাছে অপেক্ষা করেছে বাংলাদেশ আর্মির দুর্ধর্ষ কমাণ্ডো স্নাইপার কাশেম ও জলিল। ডেকের ক্রুদের পরনে ছিল অস্বাভাবিক পাতলা আর্মার। জার্মানির এক কোম্পানি জিনিসটা তৈরি করেছে ন্যাটোর যোদ্ধাদের জন্য।

জাহাজের প্রতিটি হলওয়ে ও ঘরে পেতে রাখা আছে পিনহোল ক্যামেরা ও লিসেনিং ডিভাইস। একই জিনিস রয়েছে জাহাজের খোলা সব জায়গায়। দস্যুদের উপর সর্বক্ষণ নজর রাখা সহজ হয়েছে তার ফলে। প্রতিজন দস্যুর পিছনে লুকানো কম্পার্টমেন্টগুলোর আড়ালে থেকে অনুসরণ করছে দু'জন করে এজেন্ট।

অতি পুরনো চেহারার এ জাহাজ আসলে একই সঙ্গে দুটো জাহাজ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় এটাকে জাহাজ ভাঙার ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া উচিত। যে-কোনও কাস্টমস ইন্সপেক্টর বা হার্বার পাইলট ওই একই কথা বলবে। কেউ দ্বিতীয়বার চাইবে না ওটার দিকে। আর ঠিক তা-ই চেয়েছে রানা।

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস যেন ভাঙা ও নষ্ট জিনিসের আড়ত। স্টিলের প্লেট থেকে খসে পড়ছে রং। ডেকে নানান জঞ্জাল। হুইলহাউস ও সুপারস্ট্রাকচারের কেবিনগুলো রয়েছে মানুষকে ভুল বোঝানোর জন্য। এসব ব্যবহার করে না কেউ। যে দস্যু মার্ভেলের হুইল নেড়ে চলেছে, সে জানে না তার হাতের জিনিসটা কোনও কাজ করে না। তার ইচ্ছায় জাহাজ এক ইঞ্চিও নড়বে

না। তবে কী করতে চাইছে তা কমপিউটার বলে দিচ্ছে সত্যিকারের হেলমসম্যানকে। ওই কাজ করে চলেছে রানার পরীক্ষিত বন্ধু আর্মস-ডিলার গগল। কমপিউটার সিস্টেম থেকে ওর হুইল পেয়ে চলেছে ডেটা। প্রয়োজনে কোর্স ঠিক করে নিচ্ছে।

পৃথিবীর সেরা সফিস্টিকেটেড ইনফরমেশন গ্যাদারিং শিপ এই মার্ভেল। সাগরে ভেসে যেখানে খুশি চলে যাচ্ছে, সংগ্রহ করছে প্রয়োজনীয় তথ্য। শহরভিত্তিক শাখাগুলো থেকে এর কর্মকাণ্ড আলাদা—একটাই শাখা, দুনিয়ার যেখানে দরকার চলে যাচ্ছে সেখানেই।

দিনের পর দিন এই প্ল্যাটফর্ম তৈরির পিছনে সময় দিয়েছে মাসুদ রানা। প্রয়োজনে বন্ধুদের কাছ থেকে সহায়তা নিয়েছে। ফলে এ জাহাজে সংযুক্ত হয়েছে নানান ধরনের অত্যাধুনিক, মারাত্মক অস্ত্র। মার্ভেলে রয়েছে ইজিস-ক্লাস ডেস্ট্রয়ারের মত ইলেট্রনিকস সুইট। আর্মার দিয়ে শক্ত করা হয়েছে জাহাজের খোল। সাধারণ কোনও গোলা ওটাকে ভেদ করতে পারবে না। এমন কী রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড দিয়েও কিছুই করতে পারবে না। জাহাজে রয়েছে দুটো মিনি সাবমেরিন, ওগুলো সাগরে নামানোর জন্য কিলে রয়েছে বিশেষ দরজা। আপাতত পিছনের হোল্ডে নকল কণ্টেইনারের আড়ালে বসে আছে একটা ম্যাকডোনেল ডগলাস এমডি-৫২০এন হেলিকপ্টার।

'আমাদের অতিথি ইন্সপেক্টর সাহেব কোথায়?' নিচু স্বরে জানতে চাইল সোহেল।

'গল্প করছে ফারার সঙ্গে,' বলল রানা। 'তবে তোর ভয় নেই, ফারা চান্স দেবে না।'

'সিলভিও বেনেডিক্টো হার মানবে?' আস্তে করে মাথা নাড়ল সোহেল। একটু আনমনা। 'তার উপর ব্যাটা দেখতে সত্যিই ভাল।'

রোম ইন্টারপোলের সিলভিও বেনেডিক্টো হাসিখুশি লোক, কথায়-গল্পে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। যে-কারও সঙ্গে জমিয়ে ফেলে খাতির। রানার আমন্ত্রণে জাহাজে এসেছে দালমার আলীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে। মনে মনে খুশি, এবার ওই লোককে বিশ্ব আদালতে তুলতে পারলে নাম ফাটবে তার।

রানা ও বেনেডিক্টো বহুবার নানা কাজে পরস্পরের সাহায্য নিয়েছে। কখনও কখনও ইন্টারপোল ফাইল ঘেঁটে রানা এজেন্সির কেসে সাহায্য করেছে সিলভিও, আবার তার কেসের অপরাধীদের ধরে দিয়েছে রানা এজেন্সি।

'প্রিয় শ্যালক, নিশ্চিত থাক্, ফারা পটবে না,' বলল রানা। 'বাংলাদেশ আর্মির ক্যাপ্টেন আপা তো সুযোগই পেল না, শুরু থেকেই সিলভিও ওকে বড় বোন ডাকতে শুরু করেছে। স্বর্ণা এরইমধ্যে ডেঁটে দিয়েছে সিলভিওকে। এখন বাকি ছিল ফারা।'

'খুন-খারাবির সাক্ষী থাকবে, ভাল ঠেকছে না,' বলল সোহেল।

'ক্ষতি নেই। কথা আদায় করে নিয়েছি। কনফ্রেণ্টেশনের সময় ও চুপচাপ একটা কেবিনে বসে থাকবে। ধরতে পারলে আমরা ওর ভাড়া করা ইয়টে তুলে দেব দালমার আলীকে। তারপর যা খুশি করুকগে, আমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।'

'অথচ মার্ভেলের সবাই পেয়ে যাবে দালমার আলীর মাথার উপর ঘোষণা করা কয়েক লাখ ডলার?'

'ঠিক তা-ই।' মেইন ভিউ স্ক্রিনের কোণে অ্যানেমোমিটার দেখে নিল রানা। জাহাজের গতি ও দিক দেখে বুঝে নিল ভোরের আগে তীরে পৌঁছুবে না মার্ভেল। 'চল, ডিনার সেরে নিই। শুনলাম বাবুর্চি আজ সাত-আট রকমের কাবাব আর রোস্ট দেবে।'

আস্তে করে পেটে হাত রাখল সোহেল। 'ফারার অর্ডার, আরও আধ ঘণ্টা খালিপেটে থাকতে হবে।'

'বেশ। আধ ঘণ্টা পর চলে আসিস ডাইনিং রুমে।' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'যদি হাড়গোড় কিছু অবশিষ্ট থাকে, ওতেই তোর হয়ে যাবে।'

ভোরের খানিক আগে উপকূলে পৌঁছল মার্ভেল। একপাশে আ-দিগন্ত ম্যানগ্রোভে ছাওয়া জলাভূমি। এখানে এসে জাহাজের হুইল নিজে নিল গুলবুদ্দীন। ওদের ভিতর সে-ই বেশি চেনে এদিকের চ্যানেলগুলো। গোপন আস্তানার দিকে নিয়ে চলেছে জাহাজ। আজ পর্যন্ত যত জলযান নিয়ে গেছে, সেগুলোর ভিতর এই ফ্রেইটারটাই সবচেয়ে বড়। তবে গুলবুদ্দীন আত্মপ্রত্যয়ী, মনে মনে নিশ্চিত, কোনও চরে আটকা পড়বে না। বেশি সরু খালে যদি আটকে যায়ও, দেখা যাবে তাদের আখড়া বেশি দূরে নয়। সহজেই আনলোড করা যাবে কার্গো।

জলাভূমির চারপাশের বাতাস গুমোট, ভেজা-ভেজা। দিগন্তে সূর্য উঠতেই লাফ দিয়ে বেড়ে গেল তাপমাত্রা।

জলার আরও গভীরে ঢুকছে বিশাল ফ্রেইটার। ওটার প্রপেলার পিছনে তৈরি করছে কাদাপানির স্রোত। হেলমের বাল্কহেডে ঝুলন্ত ফ্যাদোমিটার কীভাবে পড়তে হয়, জানে না গুলবুদ্দীন। জানা নেই জাহাজের নীচে মাত্র নয় ফুট পানি, তারপর শুধু থকথকে কাদা। সামনে আরও ঘন হয়ে জন্মেছে বৃক্ষসারি। এরইমাধ্যে দু'পাশ থেকে এসে জাহাজের উপরে চাঁদোয়া তৈরি করেছে গাছগুলো।

গুলবুদ্দীন যে চ্যানেল ধরে চলেছে তা বড় জোর জাহাজের চেয়ে সামান্য চওড়া। তেমন একটা নড়াচড়ার সুযোগ নেই এখানে। ওর মনে হলো আগে চ্যানেলটা অনেক চওড়া ছিল। আসলে কখনও এত বড় জাহাজের হুইলহাউস থেকে নীচে তাকায়নি। নিমজ্জিত এক গাছের গুঁড়ি বো-র ধাক্কা খেয়ে সরে গেল। ওই গুঁড়ি ফুটো করে দিতে পারত গুলবুদ্দীনের ট্রলার, অথচ

জাহাজ যেন একটু নড়লও না। কেউ যেন চুলকে দিয়ে গেল ওটার খোল। সামনে রয়েছে তীক্ষ্ণ বাঁক, তারপর আস্তানায় পৌঁছবে সে। কিন্তু ওইখানে বাঁক নেওয়া খুবই কঠিন। উল্টো দিকের তীরের দিকে চাইল গুলবুদ্দীন। ভাবছে, দূরত্ব জাহাজের দৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক কম! বাঁক নেয়া কঠিন হবে।

'পারবে, গুলবুদ্দীন?' জানতে চাইল শাহিন।

ছোকরার দিকে চাইল না গুলবুদ্দীন। গতরাতের ঘটনা এখনও ভোলেনি। 'আমরা আস্তানা থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে। জাহাজ যদি আটকা পড়ে, সমস্যা নেই। এখান থেকে মালামাল সরিয়ে নিতে সময় লাগবে না।'

দু'হাতে শক্ত করে হুইল ধরল গুলবুদ্দীন, পা দুটো একটু ফাঁক করে দাঁড়াল। দেখা গেল জাহাজের প্রাউ সহজে বাঁক নিতে লাগল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল গুলবুদ্দীন, তারপর বনবন করে ঘোরাতে লাগল হুইল। কিন্তু ওর মনে হলো, যথেষ্ট সাড়া দিচ্ছে না জাহাজ। বড় দ্রুত তীরের দিকে চলেছে বো।

সত্যি, বড় ধীরে ঘুরছে জাহাজ। দেরি হয়ে গেছে, তীরে ধাক্কা লাগতে চলেছে। গুলবুদ্দীন গায়ের জোরে ইঞ্জিনের টেলিগ্রাফ পুরো রিভার্সে দিল। বিপরীত গতি তুলে থামতে চাইছে।

কয়েক ডেক নীচে অপারেশন্স সেণ্টারে কাজ করে চলেছে গগল। চারপাশের চ্যানেল যেন চেপে এসেছে। ইঞ্জিন রিভার্সে চালাতে চাইছে গুলবুদ্দীন। তবে তার নির্দেশ অগ্রাহ্য করল গগল। বদলে চাপ দিল বো থ্রাস্টারের উপর। একই সঙ্গে ডিরেকশনাল পাম্প জেটের নাযল সরিয়ে নিল, যত দূর যায়।

গুলবুদ্দীন ব্রিজে অবাক হয়ে ভাবল, জোরালো কোনও বাতাস সরিয়ে নিয়েছে জাহাজটাকে। অথচ চারপাশের গাছে নড়ছে না একটা পাতাও। তীরের মত বাঁক নিল বো, মনে হলো অদৃশ্য কোনও হাত সঠিক দিকে সরিয়ে নিল জাহাজকে। অবাক চোখে

পরস্পরের দিকে চাইল গুলবুদ্দীন ও শাহিন। জানে না কীভাবে এত বড় জাহাজ ঘুরল। খেয়াল নেই, জাহাজ বাঁক নেয়ার পর সঠিক পথে চ্যানেলের মাঝে এসেছে। প্রয়োজন ছাড়াই হুইলে মোচড় দিল গুলবুদ্দীন। ভাবছে, নিজেই জাহাজ চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

'এবারের কাজে প্রথম থেকে দেখছি, স্বয়ং আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন,' বলল শাহিন।

সে এবং গুলবুদ্দীন ধার্মিক লোক নয়। কত মানুষ খুন করেছে নিজেরাও জানে না।

'ওসব বলতে পারো, কিন্তু আসল কথা অন্য। আমার জানা আছে কীভাবে জাহাজ চালাতে হয়,' একটু তীক্ষ্ণ শোনাল গুলবুদ্দীনের কণ্ঠ।

জলাভূমির ডানদিকের তীরে জলদস্যুদের আস্তানা। ওখানে মাটির উচ্চতা মার্ভেলের ডেকের সমান। জোয়ার বা বর্ষার বন্যা থেকে ওদের রক্ষা করছে ওই উঁচু জমি। তীরের পাশে এক শ' ফুটি ডক, কাঠের তৈরি। শক্ত তীরে গেঁথে দেয়া হয়েছে ইস্পাতের কয়েকটা ধাপ, এসে উঠেছে ডকের উপর। প্রথম দিকে হাইজ্যাক করা এক জাহাজ থেকে সরিয়ে নেয়া হয় ওই সিঁড়ি। খানিক দূরে জেটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে চারটে ট্রলার। সেগুলোর ভিতর রয়েছে গুলবুদ্দীনের ট্রলারটা।

তীরের খানিক দূর থেকে শুরু হয়েছে জলদস্যুদের ক্যাম্প। কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই তৈরি হয়েছে জনবসতি। যে যা পেয়েছে তা দিয়ে গড়ে তুলেছে বাসস্থান। এখানে ওখানে তাঁবু। আগে ওগুলো ছিল রিফিউজিদের। এ ছাড়া রয়েছে কাদামাটির ঘর ও কাঠের কেবিন। কোনও কোনওটার ছাত করাগেটেড পাতের তৈরি। এ বসতিতে বাস করছে আট শ' মানুষ। জনসংখ্যার বড় অংশ শিশু-কিশোর। আস্তানার চারপাশে চারটে ওয়াচ-টাওয়ার,

পাইপ দিয়ে তৈরি। তার উপর কাঠের তক্তার প্ল্যাটফর্ম। মাটিতে আবর্জনা ও মানুষের বর্জ্য। এক পাল আধ-বুনো হাড়জিরজিরে কুকুর ঘুরছে যত্রতত্র।

একদল লোক নদীর তীরে হৈ-চৈ শুরু করেছে এত বড় জাহাজ দেখে। অনেকে উঠে পড়েছে ডকের উপর। আরও ভিড় হলে ধসে পড়বে ডক। ভিড়ের ভিতর রয়েছে অর্ধ-নগ্ন কিশোর ও ধূলিমলিন পোশাক পরা মেয়েমানুষ। তাদের পিঠে বাঁধা থলেতে ঝুলছে দুধের শিশু। ডক ও তীরে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে কমপক্ষে এক শ' লোক। অনেকে গুলি ছুঁড়ছে আকাশে। চারপাশের আওয়াজে সবাই অভ্যস্ত। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে শিশুরা। সবার আগে ডকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দালমার আলী। দলের বিশ্বস্ত জনাকয়েক লোক তাকে ঘিরে রেখেছে।

দালমার আলীকে যতই ভয়ঙ্কর লোক বলা হোক, শারীরিক দিক থেকে সে মোটেও বিশাল কেউ নয়। বড়জোর পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হবে দৈর্ঘ্যে। চিকন কাঁধ থেকে ঝুলছে শখের ইউনিফর্ম, দেখতে লাগছে কাকতাড়ুয়ার মত। চোখের নীচ থেকে মুখের বাকি অংশ ঢাকা পড়েছে কাঁচা-পাকা ঘন দাড়িতে। লালচে চোখ দুটো জ্বরে আক্রান্ত রোগীর মত। দেহ এমনই পাতলা, কোমরে ঝুলন্ত বড়সড় পিস্তলটা তাকে একপাশে একটু ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। ঠোঁটে হাসির চিহ্ন নেই। চেহারা একদম ভাবলেশহীন। এটা তার বৈশিষ্ট্য। কখনও কোনও অনুভূতি প্রকাশ করে না। রাগের মাথায় কাউকে খুন করলেও না। যখন শতাধিক বউয়ের কারও বাচ্চা হয়, তখনও থাকে না কোনও হাসি। কণ্ঠ থেকে ঝুলছে অসমতল অনেকগুলো সাদা বিচি। কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায়, ওগুলো আসলে মানুষের দাঁত, সোনা দিয়ে ফিলিং করা।

বিশাল ফ্রেইটারটা ডকে ভিড়াতে গিয়ে পুরো পনেরো মিনিট ব্যয় করল গুলবুদ্দীন হেকমত। একবার এত দ্রুত ডকের দিকে

ধেয়ে গেল যে, ভীষণ ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকজন। কেউ কেউ লাফিয়ে উঠে গেল তীরে। ডকে ভিড়তে আরও অনেক সময় নিত গুলবুদ্দীন, কিন্তু বিরক্ত হয়ে গেল গগল, শেষে দেরি না করে জাহাজ ভিড়িয়ে দিল ডকে। মার্ভেলের ডেক থেকে নীচে দড়ি ছুঁড়ে দিল জলদস্যুরা। এরপর দেরি হলো না পিয়ারের সঙ্গে দড়ি বাঁধতে।

মোটা চিমনি থেকে বেরুচ্ছিল ঘন ধোঁয়া, একটু পর দেখা গেল ওটা অনেক কমে এসেছে। গুলবুদ্দীন একবার ভেঁপু বাজাল। তাতে হৈ-হৈ করে উঠল তীরের সোমালিয়ানরা। শাহিনকে কাজে পাঠিয়ে দিল গুলবুদ্দীন, সে লোক জোগাড় করে সিঁড়ি নামাবে। উঠে আসবে দালমার আলী, নিজ চোখে দেখবে কী মহার্ঘ্য লুটে এনেছে সে।

অপারেশন্স সেন্টারে মনিটরের দিকে আঙুল তুলল সিলভিও বেনেডিক্টো। 'ওই যে, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের মহানায়ক।'

'ওই লোক?' বলল সোহেল। 'মনে হচ্ছে ওর গাল থেকে বেরিয়েছে মুরগির পালক।'

'সি। দেখতে তেমন কিছু না। কিন্তু পাক্কা খুনি।' আর্মি ফ্যাটিগ পরেছে সিলভিও। পায়ে চকচকে কালো বুট। দুর্দান্ত সুদর্শন লোক সে। ঠোঁটের কোণে হাসি। রানার দিকে চাইল। 'মার্ভেলে দালমার উঠলে, তারপর? তারপর কী?'

'ওকে বন্দি করব,' নরম গলায় বলল রানা।

'কাজটা অত সহজ হবে না। এত লোকের মাঝ থেকে ওকে ছিনিয়ে নেয়া...' মাথা নাড়ল সিলভিও এপাশ ওপাশ। 'যাই হোক, এখন মার্ভেলে উড়ছে কোন্ দেশের পতাকা?'

'তাইওয়ানের। কাজেই আইন অনুযায়ী জাহাজ ওই দেশের সম্পদ। ওকে তুলে নিয়ে আবারও বেরিয়ে যাব সাগরে। তখন

জ্যাক স্টাফ থেকে উড়বে গ্রিসের পতাকা। গ্রিসের জাহাজ থেকে দালমার আলীকে ডেলিভারি নিবি তোর ইয়টে।'

'অসুবিধে নেই। ওয়ার্ল্ড কোর্ট কোনও প্রশ্ন তুলবে বলে মনে করি না। তা ছাড়া, ধরে নেয়া হবে লোকটা যে মুহূর্তে জাহাজে উঠবে, তখন থেকে সে সোমালিয়ায় নেই।'

'কিন্তু কোর্টে অনেক কথাই বলবে লোকটা,' বলল সোহেল।

হাসল বেনেডিক্টো। 'আমার সঙ্গে দারুণ একটা ড্রাগ আছে। ওটা ব্যবহার করব দালমার আলীর উপর। আজকের সব কথা বেমালুম ভুলে যাবে ও। জীবনের হেভিয়েস্ট হ্যাংওভার নিয়ে ঘুম থেকে উঠবে কাল। খুবই কষ্ট পাবে... কিন্তু তাতে আমাদের ক্ষতি কী? এদেশের জল-সীমার বাইরে অপেক্ষা করছে ইয়ট। ওকে তুলে নিয়ে সোজা ইতালি ফিরব। সেখান থেকে হেগ শহরে, ওয়ার্ল্ড কোর্টে।'

ওঅর্ক স্টেশন থেকে নিচু স্বরে ডাকল নবী, 'মাসুদ ভাই।'

অনিল চ্যাটার্জি নেই, ওয়েপন্স অপারেটর হিসাবে কাজ করছে বাংলাদেশ আর্মি থেকে বিসিআইয়ে আসা ক্যাপ্টেন খোরশেদ নবী। আগেই শেখা ছিল ওঅর্ক স্টেশনের কাজ। টর্পেডো, সার্ফেস টু সার্ফেস, সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল, জাহাজের ডেকের .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান, রেডার-গাইডেড ২০ এমএম ভালক্যান কামান বা বো-তে বসানো ১২০ এমএম কামান সবই খুব দ্রুত নখদর্পণে নিয়ে এসেছে।

একবার তার দিকে চেয়ে স্ক্রিনে চাইল রানা। বোর্ডিং স্টেয়ার নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ওটার দিকে এগুতে শুরু করেছে দালমার আলী।

'মাকড়সা এমন করেই ভাবে: ভাই মাছি, কোনও ভয় নেই, আমার জালের ভিতর এসো,' নিচু স্বরে বলল বিসিআই এজেন্ট রায়হান রশিদ।

পাঁচ

রুক্ষ মরুভূমির দেশ, তিউনিশিয়া। সবুজের দেখা মেলে না বললেই চলে।

সীমান্ত অঞ্চল। বাহিরেত আল বিবান।

ধূ-ধূ বালির প্রান্তর আর ঢেউ খেলানো মরুভূমি হতে উঠে আসা প্রচণ্ড তাপ-প্রবাহ নিয়ে কোনও নালিশ নেই স্মৃতি মাহমুদের। ওর সমস্ত নালিশ মাছির বিরুদ্ধে। ঠিক মাছিও না, মাছির মত দেখতে কোটি কোটি খুদে পোকা সারাক্ষণ জ্বালিয়ে মারছে ওকে। ও-ও চড় চাপড় মারতে মারতে ব্যথা করে ফেলেছে নিজের গা-হাত-পা। অনবরত কামড়ে চলেছে ওগুলো। যতই ক্রিম ব্যবহার করুক, ওকে ছাড়ছে না তারা। প্রতি রাতে তাঁবুর ভিতর মশারিতে ঢুকে দেখে ডানাওয়ালা শয়তানগুলো ঠিকই উপস্থিত। প্রায় দু'মাস হলো খনন কাজ তদারকি করতে এসেছে স্মৃতি। কবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাবে, বলতে পারে না। অথচ, হাতে মোটেই সময় নেই।

এখন ওসব নিয়ে ভাবছে না স্মৃতি, ওর মাথায় ঘুরছে একটাই প্রশ্ন: স্থানীয় কর্মীরা পোকাগুলোকে পাত্তা দিচ্ছে না কেন? হয় ওদেরকে কামড় দেয় না, নয়তো টেরই পায় না ওরা ওদের জ্বালাতন! এসব ভাবতে গিয়েই মেজাজ গরম হয়ে উঠছে স্মৃতির।

নয়জন আমেরিকান, স্মৃতি ও তিন বাঙালি, মোট তেরোজন এসেছে এ দেশে আর্কিওলজিকাল খননের কাজে। সঙ্গে রয়েছে

পঞ্চাশজন শ্রমিক। সবার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রফেসর চার্লস ডুডলি। তিনি, প্রফেসর ট্যাগার্ট, স্মৃতি এবং দুই বাংলাদেশি ছাড়া অন্য সদস্যরা এখনও ইউনিভার্সিটি অভ অ্যারিযোনার গ্রেড স্কুলের ছাত্র। তাদের ভিতর মাত্র দু'জন মেয়ে। তবে এ নিয়ে কোনও ঝামেলা হয়নি।

সবাইকে বলা হয়েছে, তাদের আনা হয়েছে ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে আধ মাইল ভিতরের জমিতে খনন কাজ করতে। এখানে রয়েছে একটি রোমান সাইট। অনেকে বলে ওটা ছিল ক্লডিয়াস স্যাবিনাসের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ। এ ভদ্রলোক ছিলেন রিজিওনাল গভর্নর। প্রায় বিধ্বস্ত কিছু বাড়িঘর খুঁজে বের করার পর খুব খুশি হয়ে কাজ করে চলেছে হবু প্রত্নতাত্ত্বিকরা। পাওয়া গেছে বিশাল এক মন্দির। আগে এ ধরনের মন্দির দেখা যায়নি। ছাত্ররা ক্যাম্প জুড়ে গুঞ্জন তুলছে, স্যাবিনাস অন্য ধর্মের অনুসারী ছিলেন। যে সময় তিনি এ এলাকা শাসন করতেন, তা থেকে আন্দাজ করা চলে, তিনি ক্রিস্টের ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

অবশ্য কোনও বক্তব্য দেননি প্রফেসর ডুডলি। শুধু ভুরু কুঁচকে চেয়ারে বসে থেকেছেন।

স্মৃতিও এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। চারজনের এই ছোট্ট দল খনন কাজে এলেও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। শুধু অতীত খুঁড়ে বের করবে না, সুন্দর করতে চাইবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে।

তবে এখন পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায়নি। পেরিয়ে গেছে সাত সপ্তাহ। ওরা ভাবতে শুরু করেছে বাংলাদেশ সরকার ওদের পাঠিয়েছে বুনো হাঁসের পিছনে ছুটতে।

স্মৃতির মনে পড়ছে, প্রথম যখন ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে সেকেণ্ড অফিসার কবির হায়দার এই প্রজেক্ট নিয়ে আলাপ করল, খুব উৎসাহী ছিল ও। কিন্তু প্রায় দুই মাস মরুভূমির ভিতর কঠোর পরিশ্রম করে, রোদে পুড়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে

ওর প্রাণ-চাঞ্চল্য। কই, কিছুই তো পাওয়া গেল না!

স্মৃতি দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। আমেরিকান ছাত্ররা প্রথমে ওকে সুন্দরী টিন-এজার মনে করে খাতির জমানোর চেষ্টা করেছিল। তারপর ওর অনাগ্রহ দেখে সরে যায়। ওর আসল বয়স পঁচিশ। গত ক'দিন ধরে খেয়াল করছে ওর দুই পুরুষ সহকর্মী ওর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। রীতিমত প্রতিযোগিতার ভাব এসে গেছে ওদের মধ্যে। এ নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে স্মৃতি। চাইছে না কোনও ঝামেলা বাধুক। ছোটবেলা থেকে দেখেছে বাবা-মা সর্বক্ষণ ঝগড়া করছেন। ব্রোকেন ফ্যামিলির মেয়ে সে। খুব কম বয়সেই ঠিক করে, কোনওদিন বিয়ে করবে না। আর যখন ওর বিয়ের বয়স হলো, প্রস্তাব পাঠাতেই সাহস হলো না, একটু এগিয়েই মেয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা শুনে পত্রপাঠ বিদায় নেয় পাত্রপক্ষ। মাত্র এই পঁচিশ বছর বয়সে একই সঙ্গে আর্কিওলজি এবং জিয়োলজির উপর দুটো ডক্টরেট পেয়েছে ও অ্যারিযোনা ইউনিভার্সিটি থেকে।

মরুভূমিতে কাজ করতে এসে হাঁটু ছাড়িয়ে যাওয়া চুলগুলো ছেঁটে বব-কাট করে নিয়েছে। তারপরও মিষ্টি লাগে ওকে দেখতে। এখানে আসবার পর থেকে ওর ডিগ্রি দুটো কাজে লাগছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ওরা যা খুঁজতে এসেছে, তা কি সত্যি রয়েছে এদিকটায়?

স্মৃতি ও তার ছোট্ট দল শুকনো নদী-খাতের কয়েক মাইল এলাকা চষে দেখেছে। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। লক্ষ বছর ধরে স্যাণ্ডস্টোনের ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে বয়েছে নদী। কোথাও দেখবার মত কিছুই নেই। তারপর এক জায়গায় এসে দেখা গেছে নদী-খাত এসে মিশেছে একটা জল-প্রপাতে।

ওটার পর থেকে আর উজানে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি স্মৃতি। দু' শ' বছর আগে যখন এখানে নদী বইত, ওই জল-

প্রপাতের ওপাশে যাওয়ার উপায় ছিল না।

পাথরে ড্রিল ঢুকবার আওয়াজে ধ্যান ভাঙল স্মৃতির। মেশিনটা দিগন্তের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা ট্রাকের পিঠে বসে আছে। সহজেই ড্রিল করছে ভঙ্গুর স্যাণ্ডস্টোন টিলার বুকে। পিছন থেকে রিগ নিয়ন্ত্রণ করছে টেক্সাস থেকে আসা আসাদ চৌধুরি। দক্ষ জিওলজিস্ট সে। অয়েল ফিল্ডে ভাল অভিজ্ঞতা। হীরার মত তীক্ষ্ণ কাটার-হেড ভেদ করছে বহু আগের কোনও ভূমি-ধস। খুঁজে চলেছে কোনও ধরনের গুহা।

গত দেড় মাসে ওরা জমিতে তৈরি করেছে কয়েক শ' গর্ত। এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া যায়নি।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট দেখল স্মৃতি। কিছুক্ষণ পর পর ঘাম মুছল কপাল ও গলা থেকে। ড্রিল পঁয়ত্রিশ ফুট জমি ভেদ করবার পর আসাদ চৌধুরি বন্ধ করে দিল ডিজেল ইঞ্জিন। গোঙাতে গোঙাতে থেমে গেল মোটর। আবারও বাতাসের শ্-শ্ আওয়াজ শুনতে পেল স্মৃতি।

'কিছু নেই,' বলল আসাদ।

'তারপরও বলব ভাটির দিকে আরও কয়েকটা গর্ত করা উচিত,' বলল সবুর রহমান। এই যুবক রাজনীতি নিয়ে বড় বেশি আলাপ করে। কাউকে কিছু বলেনি স্মৃতি, তবে ওর ধারণা এ বাংলাদেশ সরকারের কোনও গোপন সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। এ-কাজে আসবার জন্য সবুর রহমানের কোনও অ্যাকাডেমিক বা প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন নেই, অথচ সে হাজির।

অবশ্য তার বক্তব্য খুব একটা পাত্তা দেয় না স্মৃতি বা আসাদ চৌধুরি। ওরা খুশি, সবুর কোনও কাজ হাতে নিলে ওটা ঠিক ভাবে সম্পন্ন করে। আরেকটা ভাল দিক, চমৎকার আরবি বলে ও। এ দেশে এ জ্ঞান বেশ কাজে লাগছে।

ছোট্ট দলের চতুর্থ সদস্য ব্রাম ট্যাগার্ট, অটোম্যান (ওসমান)

সাম্রাজ্যের উপর বিশেষজ্ঞ। বয়স্ক মানুষ। ভাল জানেন বারবারি দেশগুলোর বিষয়ে। তবে স্মৃতির ধারণা, তিনি কুচুটে লোক। রোমান ধ্বংসাবশেষের ক্যাম্প থেকে কোথাও একপা নড়েননি। বলেছেন, তাঁর জ্ঞান কাজে লাগবে কিছু খুঁজে পাওয়ার পর। তার আগে কোথাও গিয়ে লাভ নেই।

পুরোপুরি মিথ্যা বলেননি তিনি।

অবশ্য, যখন ওয়াশিংটন ডি.সি.তে বাংলাদেশ দূতাবাসের সেকেণ্ড অফিসার কৃষ্ণা হায়দার তাঁকে কাজ দিল, তিনি নিজেই বলেছিলেন, এই মাঠে বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। 'নখের নীচে ধুলো না থাকলে ভালই লাগে না আমার!' কিন্তু এখানে আসবার পর থেকে দেখা যাচ্ছে ম্যানিকিউর করা নখের নীচে ধুলো জমার সুযোগই পাচ্ছে না। সবসময় ফিটফাট। তাঁর অন্যতম প্রিয় কাজ ঘন ঘন সাফারি জ্যাকেটের ভাঁজ সমান করা।

'তোমার লেটেস্ট পরামর্শ?' সবুর রহমানের দিকে চাইল আসাদ চৌধুরি। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল নিয়ে ভালই আলাপ হয় তাদের। অন্য বিষয়ে জমে না গল্প।

'ক্ষতি কী ওদিক দেখলে?' বলল সবুর।

'ক্ষতি নেই?' একটু বেশি তীক্ষ্ণ শোনাল স্মৃতির কণ্ঠ। ট্রাকের ছায়ায় বসে পড়েছে। নিজেকে সামলে নিল। 'দুঃখিত। আসলে বিরক্তি ধরে গেছে। ওদিকের টিলা অনেক বেশি খাড়া। ওখান থেকে মালবাহী উট নামানো অসম্ভব। তীরে ভিড়বে না জাহাজ।'

'আমরা কি নিশ্চিত সঠিক নদী-খাত এটা?' বলল আসাদ। 'স্যাণ্ডস্টোনে বড় গুহা থাকে না। স্যাণ্ডস্টোন হয় অনেক বেশি নরম। যে-কোনও সময় নেমে আসে ছাত। দস্যুরা নিশ্চয়ই এমন জায়গায় গোটা একটা জাহাজ লুকিয়ে রাখবে না।'

একই কথা ভেবেছে স্মৃতি। ওদের লাইমস্টোনে খোঁজা উচিত। সেখানে থাকতে পারে বড় গুহা। যদিও ওই পাথর পানি

ধা বাতাসে ক্ষয় হয়, টিকে থাকে হাজার হাজার বছর ধরে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ওরা এদিকে স্যাণ্ডস্টোন বা সামান্য কিছু ব্যাসল্ট ছাড়া কিছুই পায়নি।

'জেমস রবার্টসের চিঠিতে পরিষ্কার লেখা ছিল কোথায় রয়েছে ইমাম ইউনুস আল-কবিরের গোপন আখড়া,' বলল স্মৃতি। 'মনে আছে, জেফ মার্টেল ওখানে পুরো দু' বছর বাস করেন। তারপর মৃত্যুবরণ করেন ধার্মিক জলদস্যু। স্যাটালাইট ইমেজারি থেকে বোঝা যায় চারপাশের এক শ' মাইলের ভিতর এটাই একমাত্র নদী-খাত। তার মানে এখানেই ছিলেন মার্টেল।'

'ভাবতে ভাল লাগছে আমরা লিবিয়ান সীমান্তের এপাশে,' বলল সবুর। 'ওরা ধরতে পারলে এক বছরের ভিতর জেল থেকে আর বেরুতে হবে না।' তার পরনে ফুলহাতা শার্ট ও নীল জিন্স। মাথার উপর শনের হ্যাট। 'যতই ঘনিয়ে আসছে সম্মেলন, সতর্ক হয়ে উঠছে মুয়াম্মার গাদ্দাফি। সে নিশ্চয়ই চাইবে না কেউ তার পিছন-উঠানে খোঁড়াখুঁড়ি করুক।'

'আমার বাবা লিবিয়ান অয়েল ফিল্ডে কাজ করতেন,' বলল আসাদ চৌধুরি। 'তারপর হঠাৎ তেলক্ষেত্রগুলো জাতীয়করণ করেন গাদ্দাফি, আর চাকরি থাকল না।' সবুরের চেয়ে লম্বা সে, তবে হালকা-পাতলা। প্রচুর কাজ করেছে সূর্যের আলোয়। চোখের কোণে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। বুড়ো ওক গাছের বাকলের মত কড়া পড়া দুই হাতের তালু। গালের ভিতর সারাক্ষণ থাকে গুলতির বলের মত তামাকের গুলি। 'বাবার কাছে শুনেছি লিবিয়ার সাধারণ মানুষ অন্যদেশের মানুষের চেয়ে অনেক সভ্য।'

'হতে পারে। কিন্তু শুনেছি সরকার খুব কঠোর।' ক্যান্টিন থেকে এক ঢোক উষ্ণ পানি গলায় ঢালল স্মৃতি। ভুরু কুঁচকে গেল। 'হতেই পারে সম্মেলন আয়োজন করছে; কিন্তু নিজেদের মনোভাব পাল্টে নেয়নি।' সবুরের দিকে চাইল। 'শুনেছি অতীতের

সেই জলদস্যুর কাছ থেকে নামটা নিয়েছে বর্তমানের ইউনুস আল-কবির। একসময় তাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছিল সিআইএ। এখন ছোবল দেবে লোকটা। ...এ ব্যাপারে কিছু জানেন?'

টোপ গিলল না সবুর। 'আমি পেপারে পড়েছি আল-কবির লিবিয়ায় ফিরতে চেয়েছিল। কিন্তু সরকার তাকে ঢুকতে দেয়নি।'

'এই নদী-খাত ধরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ এসেছি, এখানে আসলে কিছুই নেই,' বিরক্ত স্বরে বলল আসাদ চৌধুরি। 'এই মিশন পুরোপুরি ব্যর্থ। আমরা এখানে অযথা সময় নষ্ট করছি।'

'কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো বলছে এখানে আছে ইউনুস আল-কবিরের আস্তানা,' নরম স্বরে বলল স্মৃতি। ওর মনে পড়ে গেল ওয়াশিংটন ডিসিতে কৃষ্ণা হায়দারের সঙ্গে আলাপ হয়। তখন চিকন এক বাঙালি লোক উপস্থিত ছিলেন। মজা করে কথা বলেন তিনি। স্মৃতি ঘরে ঢুকতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান, কুর্নিশ করবার ভঙ্গিতে বলেন, তিনি খেদমত দেয়ার জন্য তৈরি।

দু'জনের ভিতর পরিচয় করিয়ে দেয় কৃষ্ণা হায়দার। স্মৃতিকে বলে, 'আমাদের সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ, ডক্টর।'

'ডেকে নেয়ার জন্য ধন্যবাদ,' বলে স্মৃতি। 'আমরা কেউ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ভাল ব্যবহার পাই না। এতদিনে একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে।'

'অথচ দেখুন, এদের মত লোক ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়,' হেসে ফেললেন আহমেদ শরীফ। 'যে-কোনও পার্টিতে বাতি জ্বেলে দিন, দেখবেন তেলাপোকার মত খ্যাচর-ম্যাচর করে ভাগছে এরা। ...না, না, কৃষ্ণা, তুমি তো ভদ্রমহিলা। তোমার কথা বলছি না। তুমি তো বেহেস্তি হুর-পরী। তোমার কি তুলনা আছে?'

'আবার যদি ফাজলামো করো, এম্বেসির ডিনারগুলো থেকে তোমার নাম ব্ল্যাক লিস্টেড করে দেব,' হুমকি দিল কৃষ্ণা।

'এটা পেটে লাথি দেয়ার মত হবে। ঠিক আছে, আমি চুপ,' বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আহমেদ।

'ডক্টর...'

'শুধু স্মৃতি বললেই চলবে।'

'স্মৃতি, আমরা আপনাকে ডেকেছি গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে। এ কাজে আপনার দক্ষতা থেকে বাংলাদেশ উপকৃত হতে পারে। ...দু' সপ্তাহ আগে কপাল জোরে আহমেদ শরীফ একটা চিঠি পেয়ে যায়। ওটা ছিল জেমস রবার্টস নামের বিখ্যাত এক মার্কিন অ্যাডমিরালের লেখা। সময়কাল ছিল আঠারো শ' বিশ সাল। ওই চিঠিতে অবিশ্বাস্য কাহিনি লেখেন তিনি। এক নাবিক হারিয়ে যান বারবারি উপকূলের লড়াইয়ে। সময়কাল ছিল আঠারো শ' তিন সাল। ওই নাবিকের নাম ছিল জেফ মার্টেল।'

এরপর কৃষ্ণা খুলে বলতে শুরু করল, জেফ মার্টেলের ভূমিকা কী ছিল। তারা ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়া জাহাজটা পুড়িয়ে দেয়। এরপর এক যুদ্ধে সাগরে হারিয়ে যায় লেফটেন্যান্ট। কৃষ্ণা এখানে আসবার পর মুখ খুললেন আহমেদ শরীফ।

'জেফ মার্টেল এবং ইউনুস আল-কবির তীরে পৌঁছতে পারে। খালি হাতে জলদস্যুর শরীর থেকে পিস্তলের বল খুঁড়ে বের করেন মার্টেল। পাথরে লেগে থাকা লবণ লাগিয়ে বুজিয়ে দেন ক্ষত। তিনদিন কোনও জ্ঞান ছিল না জলদস্যুর। তারপর চেতনা ফিরে পেলেন, ধীরে ধীরে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন। ওদের কপাল ভাল যে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে পেরেছিলেন মার্টেল। তা দিয়ে তৃষ্ণা মিটল। তীর থেকে সংগ্রহ করা শামুক-ঝিনুক খেয়ে প্রাণ বাঁচল।

'এখানে বলে রাখি, ইমাম ইউনুস আল-কবির জলদস্যু হলেও কখনও নিজের জন্য সম্পদ অর্জন করেননি। তাঁর রাগ-ঘৃণা-ক্ষোভ ছিল বিধর্মীদের উপর। এককথায় বলতে গেলে তিনি

ছিলেন অতীত কালের কোনও ওসামা বিন লাদেন। অসংখ্য মানুষ ছিল তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত।'

'তাঁর কাছ থেকেই নাম নিয়েছে বর্তমানের ইউনুস আল-কবির?' জানতে চাইল স্মৃতি। আজকাল প্রায়ই শোনে ওই নাম।

'হ্যাঁ। নামটা গ্রহণ করেছে বর্তমানের আরেক জঙ্গি নেতা।'

'জানতাম না অতীত ইতিহাস থেকে নাম নিয়েছে।'

'খুব সর্তকতার সঙ্গে এটা করেছে। ইসলাম ধর্মে যারা চরমপন্থী, তাদের কাছে সত্যিকারের ইউনুস আল-কবির ছিলেন মহানায়ক। শুধু তা-ই নয়, তিনি অনেককে ধর্মের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। জলদস্যুতা শুরু করার আগে ছিলেন ইমাম। তাঁর বেশির ভাগ লেখা এখনও পাওয়া যায়। এখনও লাখো মুসলিম ওগুলো পড়ে। সেখানে লেখা আছে কেন অবিশ্বাসীদের উপর হামলা করা উচিত।

'তাঁর প্রথম সাগর-যাত্রার আগে একটা তৈলচিত্র আঁকা হয়,' বলল কৃষ্ণা। 'বহুবার জঙ্গিদের ধরতে গিয়ে তাদের আস্তানায় পাওয়া গেছে ওই ছবি। মুসলিম জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসীদের কাছে ইউনুস আল-কবির এক মহান নেতা। তিনি সত্যিকারের জিহাদি মানুষ, প্রথম পুরুষ, যিনি যুদ্ধকে নিয়ে গেছেন পশ্চিমাদের উঠানে।'

এবার মুখ খুলল স্মৃতি, 'দুঃখিত, তবে এসবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? আমি তো আর্কিওলজিস্ট।'

'আসছি ওই প্রসঙ্গে,' বললেন আহমেদ শরীফ। 'সংক্ষেপে বলছি। মার্টেল আর আল-কবির ভিন্ন জগতের মানুষ। বলতে পারেন একজন পৃথিবীর, অন্যজন মঙ্গলগ্রহের। কিন্তু তাঁদের ভিতর গড়ে উঠেছিল অদ্ভুত এক বন্ধন। বুঝতেই পারছেন, মার্টেল একবার নয়, দুই-দুইবার ইউনুস আল-কবিরের জান বাঁচিয়েছেন। প্রথমবার সাগর থেকে উদ্ধার করে, দ্বিতীয়বার সেবাযত্ন করে।

কোনও মুসলিম এই ঋণ ভুলতে পারে না। আরেকটা ব্যাপার ছিল, ইউনুস আল-কবিরের বহুকাল আগে মরে যাওয়া ছেলের মত দেখতে ছিলেন জেফ মার্টেল।

'তাঁরা আটকা পড়েন মরুভূমিতে, ত্রিপোলি শহর থেকে এক শ' মাইল দূরে। ইউনুস আল-কবির জানতেন একবার শহরে পৌঁছলে বাশাও ঠিক বন্দি করবেন মার্টেলকে। তাঁকে থাকতে হবে ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়ার নাবিকদের সঙ্গে। তার চেয়ে ঢের খারাপ হতে পারে, ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। বাশাওয়ের শখের ইউএসএস ক্যালিফোর্নিয়াকে পুড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

'যা-ই হোক, ভেবেচিন্তে অন্য পথ বের করলেন ইউনুস আল-কবির। এখন কথা হচ্ছে, তিনি শুধু শহর থেকে সাগরে যেতেন না। তাঁর ছিল গোপন এক আস্তানা। ওটা ছিল পশ্চিমের মরুভূমিতে। ওখান থেকে বহুবার হামলা করেছেন। কোনও নেভাল ফোর্স ঠেকাতে পারেনি তাঁকে। তিনি ধারণা করলেন তাঁর জাহাজ শেষপর্যন্ত আমেরিকান রণতরী সিগনালকে যুদ্ধে হারিয়ে দেবে। তারপর ফিরবে আস্তানায়।'

সব কথা গুছিয়ে বলেন আহমেদ শরীফ, তৈরি করে ফেলেন পরিবেশ।

'কাজেই তাঁরা দু'জন রওনা হলেন পশ্চিমে। হেঁটে চললেন তীরের পাশ দিয়ে। বারবার তীর থেকে সরে গিয়ে মরুভূমির উপর দিয়ে চলতে হলো। জেফ মার্টেল বলতে পারেননি কত দিন হেঁটেছেন তাঁরা। আন্দাজ সময় পেরিয়েছে চার সপ্তাহ। সে সময়ে নরকযন্ত্রণায় ভুগেছেন দুজনেই। প্রায় দিনই দেখা যেত একফোঁটা পানিও জোগাড় হয়নি। বারবার মনে হয়েছে তাঁরা তৃষ্ণায় মরতে চলেছেন। ব্যাপারটা যেন কোলরিজের সেই কবিতার মত: "ওয়াটার, ওয়াটার, এভরিওয়্যার/নর এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক"। মাঝে মাঝে বৃষ্টি এসে তৃষ্ণা দূর করেছে। বেশির ভাগ সময় ঝিনুকের

রস খেয়ে বেঁচে থেকেছেন।

'এদিকে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে তাঁদের ভিতর। একটু একটু করে দু'জন হয়ে উঠছেন পরস্পরের বন্ধু। ইউনুস আল-কবির খানিক ইংরেজি বলতে পারেন। আর দ্রুত আরবি শিখতে শুরু করেছেন মার্টেল। জানি না তাঁরা কী নিয়ে আলাপ করতেন, কিন্তু যতদিনে পৌঁছে গেলেন গোপন আস্তানায়, ততদিনে দু'জন দু'জনকে ভালবেসে ফেলেছেন। তা ছাড়া, ইউনুস আল-কবির তো আগে থেকেই ঋণী, তিনি স্থির করলেন দস্যুদের সমস্ত বৈরিতা থেকে যেমন করে হোক বাঁচিয়ে রাখবেন ছেলেটাকে। তরুণ অফিসার শুধু যে প্রাণে বাঁচল, তা নয়, কিছুদিন পর থেকে ইউনুস আল-কবির তাঁকে পুত্র বলে ডাকতে লাগলেন। বদলে মার্টেলও ইউনুস আল-কবিরকে পিতার স্থান দিলেন।

'গোপন আস্তানায় ফিরে দেখা গেল রক নামের জাহাজটা অনেক আগেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু ইউনুস আল-কবিরের অনুসারীরা ধরে নেয় তাদের নেতা সাগরে মারা গেছেন। কাজেই তারা ফিরে যায় বারবারি উপকূলে নিজেদের বাড়িঘরে। নেভি ডিপার্টমেন্টে রিপোর্ট করেন জেমস রবার্টস: শেষ যখন দেখেন, আগুনে পুড়ছে রক জাহাজটা। যুদ্ধ তখন প্রায় শেষ। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, যেভাবেই হোক জাহাজটা ধ্বংস হয়নি। ফিরে আসে নদীতে নিজ গোপন আস্তানায়।

'মার্টেলের ভাষ্য অনুযায়ী, ওই আস্তানায় খাবার বা অন্য কোনও কিছুর অভাব ছিল না। ওঁদের দু'জনের দেখাশোনার জন্য ছিল বয়স্ক এক চাকর। কয়েক মাস পর পর ওখানে আসত উটের কারাভাঁ, পৌঁছে দিয়ে যেত খাবার ও প্রয়োজনীয় সব কিছু। বদলে পেত ইউনুস আল-কবিরের লুট করা সম্পদ থেকে সামান্য কিছু মোহর। ওই লোকগুলোকে ইমাম শপথ করিয়ে নেন। ফলে তারা ইউনুস আল-কবিরের অনুসারী দস্যুদের কিছুই জানায়নি।'

'সম্পদ?' জানতে চাইল স্মৃতি।

'জেফ মার্টেল লিখেছেন, ওখানে ছিল এক-পাহাড় উঁচু স্বর্ণ-মুদ্রা,' জবাবে বললেন আহমেদ। 'আরও বহু কিছু ছিল ওখানে।'

কৃষ্ণার দিকে চাইল স্মৃতি। 'আপনি কি চান আমি ট্রেজার হান্ট করব?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল কৃষ্ণা। 'এককথায় ওরকম বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা সোনা বা মাণিক্য নিয়ে ভাবছি না। আপনি কখনও ফতোয়া সম্পর্কে কিছু পড়েছেন?'

'ওটা তো বিজ্ঞ মুসলিমদের জন্য এক ধরনের মতামত বা নির্দেশ। ঠিক বলছি তো? যেমন সালমান রুশদি স্যাটানিক ভার্সেস লেখায় ফতোয়া দেয়া হয়, তাঁকে খুন করে ফেলা হোক।'

'একদম ঠিক। কে বা কারা ওই ঘোষণা দিল, তার উপর নির্ভর করে মুসলিম জগৎ কতটা আন্দোলিত হবে। আয়াতোল্লাহ খোমেনি ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় একটা ফতোয়া দেন: শত্রু ধ্বংস করতে বোমা ফাটিয়ে আত্মহত্যা করা বৈধ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন কোরানে পরিষ্কার লিখে দেয়া হয়েছে, কোনও মুসলিম কখনও আত্মহত্যা করতে পারবে না। কিন্তু ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় সাদ্দাম হোসেন সহজে হারাতে থাকেন খোমেনি বাহিনীকে। তখন আর কোনও উপায় না দেখে খোমেনি ঘোষণা দেন, বোমা দিয়ে নিজেদের উড়িয়ে দিলেও কোনও পাপ হবে না। আসল কথা হচ্ছে শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। খোমেনির পরিকল্পনা সফল হয়। ইরানিরা নতুন করে ইরাকি সেনাবাহিনীকে তাদের নিজেদের মাটিতে পৌঁছে দেয়। এরপর দুই দেশ সিজ-ফায়ার করে। তবে ওই ফতোয়া চালু থাকে ইরানে। আর এখন ওটা ব্যবহার করছে আত্মঘাতী বোমারুরা। ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে ইজরায়েল পর্যন্ত সবখানে চলছে নিজেকে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয়া। এদের আক্রমণে নিহত হচ্ছে দোষী-নির্দোষ শত শত মানুষ। যা-ই

হোক, যা বলছিলাম, খোমেনির এই ফতোয়াকে গভীর ভাবে সম্মান জানায় অনেকে। কিন্তু তাঁরই মত আর কোনও ইমাম যদি এ ব্যাপারে পাল্টা ফতোয়া দেন, তা মানবে জঙ্গিরা। তা হলে হয়তো পৃথিবী থেকে দূর হবে আত্মঘাতী বোমাবাজ জঙ্গিরা।'

কী বলা হচ্ছে বুঝতে শুরু করেছে স্মৃতি। 'ইউনুস আল-কবির?'

সামনে ঝুঁকে বসলেন আহমেদ। 'দেশে ফিরে জেমস রবার্টসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন জেফ মার্টেল। বলেন, ইউনুস আল-কবির নিজের অতীত কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেন, অন্য কোনও ধর্মের প্রতি ঘৃণা রাখা উচিত নয়। অথচ আগে তিনি কোনও খ্রিস্টানের সঙ্গে কথা বলতেন না। উদ্ধার করবার পর এক সময় মার্টেল ইউনুসকে বাইবেল পড়ে শুনিয়েছেন। আর এর ফলেই ইমাম দুই ধর্মগ্রন্থের তফাতের দিকে মনোযোগ না দিয়ে মিলগুলো দেখতে শুরু করেন। তিনি মারা যাওয়ার আগের দুই বছর গোপন আস্তানায় মনোযোগ দেন কোরান পাঠে। এবং লিখে রাখেন কীভাবে মিলন হতে পারে ক্রিস্ট ধর্ম ও ইসলামের। মূল বক্তব্য ছিল: দুই ধর্ম পাশাপাশি ঠাঁই পেতে পারে। তাতে কোনও পক্ষেরই কোনও ক্ষতি হবে না; বরং লাভ হবে। এই ফতোয়াগুলো লিখেছেন বলেই ইউনুস আল-কবির আর কখনও চাননি তাঁর সঙ্গীরা জানুক তিনি বেঁচে আছেন। এর কারণ বোধহয়, দলের সবাই চাইত আবার সাগরে দস্যুতা করতে। কিন্তু তিনি তা আর চাননি।'

কৃষ্ণা হায়দার বলে উঠল, 'এখন যদি ওই ফতোয়াগুলো পাওয়া যায়, ওগুলো হয়ে উঠবে গোটা দুনিয়ার উঠতি জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শক্ত অস্ত্র। অনেক ফ্যানাটিক টেরোরিস্ট বাধ্য হয়ে ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে সরবে।' এক চুমুক পানি নিল সে, তারপর বলল, 'জানি না আপনি একটা বিষয়ে অবগত কি না। আগামী

কয়েক মাস পর লিবিয়ার ত্রিপোলিতে প্রতিটি দেশের প্রধানকে নিয়ে শান্তি সম্মেলন হতে চলেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনও এত বড় শান্তি সম্মেলন হয়নি। আর সেখানে পৃথিবীর শান্তির জন্য, লড়াই বন্ধ করবার জন্য, আরও অনেকের পাশাপাশি বক্তব্য রাখতে চলেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও। তাঁদের প্রচেষ্টায় হয়তো এবার থামবে জঙ্গিদের নিষ্ঠুর হানাহানি, হত্যা, বোমাবাজি। প্রত্যেকে তাঁরা পরস্পরকে সুবিধা দেয়ার কথা বলছেন। উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে শুধু বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অনুদানই নয়, দেবে প্রয়োজনীয় সবরকম কারিগরি সাহায্য, সহযোগিতা। আমরা চাইছি ওখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইউনুস আল-কবিরের লিখিত ফতোয়া পাঠ করুন। ওটা হয়তো সব ধরনের দলকে শান্তি বজায় রাখবার জন্য নতুন দিক নির্দেশনা দেবে।'

ভুরু কুঁচকে গেল স্মৃতির। 'যা বুঝছি, ওই ফতোয়া তো সিমবোলিক?'

'হ্যাঁ, আসলেই তা-ই,' বললেন আহমেদ। 'কিন্তু কূটনীতির বেশিরভাগ কিন্তু শান্তি বজায় রাখবার জন্যই। সব ধরনের দল চাইছে আলোচনা করতে। আর শান্তি বিষয়ক বক্তব্য যদি আসে সম্মানিত কোনও ইমামের কাছ থেকে, তা হবে শক্তিশালী একটা মাধ্যম। আর তিনি যদি হন এমন একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, যিনি নিজের মতবাদ পাল্টে শান্তিকে প্রধান অস্ত্র মনে করেছেন তা হলে কূটনীতিতে ওটাকে বলা যেতে পারে বিশাল এক বিজয়।'

কৃষ্ণা হায়দার ও আহমেদ শরীফের সঙ্গে আলাপ করে স্মৃতির মনে হয়েছে, কাজটা নেয়াই উচিত। কিন্তু এখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ পেরিয়ে মনে হচ্ছে, খামোকা খুঁজছে ইউনুস আল-কবিরের আস্তানা। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে স্মৃতি। ট্রাকের পিছন থেকে উঠে দাঁড়াল। ছায়া থেকে বেরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'রোমান ধ্বংসাবশেষে ফিরবার আগে এখনও এক ঘণ্টা কাজ করা যায়। দু' ঘণ্টা পর ডিগ সুপারভাইযারের সঙ্গে মিটিং।' তিউনিশিয়ার সরকারের সঙ্গে ওদের যে-কথা হয়েছে, তাতে প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে ফিরতে হবে ক্যাম্পে। রাতে থাকতে হবে ওখানে, ভুলেও সন্ধ্যার পর মরুভূমিতে বেরুনো চলবে না। 'আসুন, রহমান সাহেবের কথামত ভাটির দিকে দেখা যাক। কিছু পেয়েও যেতে পারি!'

ছয়

দালমার আলীকে বন্দি করতে সহজ উপায় বেছে নিয়েছে মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ। সঙ্গী-সাথী নিয়ে সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকবে লোকটা, আর ঠিক তখনই অস্ত্র হাতে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে মার্ভেলের ক্রুরা। আশা করা যায় সাহস দেখিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না লোকটা। তাকে নিয়ে পিয়ার থেকে পিছু হটবে মার্ভেল, আবারও ফিরবে সাগরে। কোনও ট্রলারের সাধ্য নেই ওদের ফ্রেইটারকে ধাওয়া করবে। আর এই ক্যাম্পে হেলিকপ্টার নেই যে পিছু নেবে।

রানা ও সোহেল ঠিক করেছে নিজেরা সরাসরি কিছু না করে একটু দূরে থেকে দেখবে কে, কতটা নিখুঁত ভাবে দায়িত্ব পালন করে। সবার দক্ষতার পরীক্ষা হয়ে যাবে এই অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে। চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের গ্যাং ফেং চেয়ে নিয়েছে ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব। আশা করা যায় পরিকল্পনা অনুযায়ী ভালই

করবে ক্র্যাক টিম। ফু-চুঙের বক্তব্য: দ্রুত অন্যতম সেরা এজেন্ট হয়ে উঠছে গ্যাং ফেং। আর তার পাশে থাকছে আর্মির ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা, নেভির লেফটেন্যান্ট সানজিদা স্বর্ণা, কমাণ্ডো কাশেম, জলিল ও আরও কয়েকজন।

এই প্রথম মার্ভেলে যোগ দিয়েছে ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। তার সম্পর্কে কিছু বলা উচিত। বয়সে রানার চেয়ে চার বছরের বড় নিশাত, আর্মিতে দেরি করে যোগ দেয়ায় এখনও ক্যাপ্টেন রয়ে গেছে। বিশালদেহী মহিলা, দৈর্ঘ্যে পুরো ছয় ফুট। রানার চেয়ে এক ইঞ্চি বেশি। দশাসই শরীরটাও রীতিমত শক্ত-পোক্ত, বাঙালি মেয়েরা সাধারণত এত লম্বা-চওড়া হয় না। দেখে মনে হতে পারে: পুরুষ হিসেবে গড়তে শুরু করেছিলেন ওকে বিধাতা; শেষ মুহূর্তে দু-একটা জায়গা সামান্য পাল্টে মেয়ে বানিয়ে দিয়েছেন। বেচারির শৈশব-কৈশোর খুবই খারাপ কেটেছে এর ফলে। ছেলে বা মেয়ে... কেউ ওকে সহজভাবে নেয়নি কোনদিন। বন্ধুত্ব করতে চাইত না কেউ। নিঃসঙ্গ জীবন বিরক্ত করে তুলেছিল ওকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করবার পর তাই যোগ দেয় সেনাবাহিনীতে... একটু বেশি বয়সে। ওখানেই ওর সত্যিকার প্রতিভার বিকাশ হয়। মেয়ে হয়েও ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত পারফর্মেন্স দেখায় প্রশিক্ষণে, নাম লেখায় কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের জন্য। শুরুতে সবাই নারী-কমাণ্ডোর ব্যাপারে নাক সিঁটকেছিল, নিশাতের বয়সও নাকি কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের জন্য বড্ড বেশি; কিন্তু ও হাতেনাতে প্রমাণ করে দেয় আর দশটা বাঙালি মেয়ের মত অবোলা বা অবলা নয় ও, ছেলেদের সবাইকে হারিয়ে দিয়ে কমাণ্ডো ট্রেইনিঙে প্রথম হয়।

এই অর্জনের স্বীকৃতি দিতে কখনও কার্পণ্য করেনি রানা, নির্দ্বিধায় ক্র্যাক টিমের সেকেণ্ড-ইন কমাণ্ড বানিয়েছে ওকে। এর পিছনে নারী জাতির প্রতি কোনও দুর্বলতা কাজ করেনি, আসলেই

মেয়েটা এই পদের উপযুক্ত। শুধু সৈনিক হিসেবে দক্ষ তা-ই নয়, স্বভাবজাত নেতার মত দলের সবার ভাল-মন্দের দিকে কড়া নজর ওর। সহকর্মীদের দেখাশোনা এতটাই আন্তরিকতার সঙ্গে করে যে, ওরা তাকে আড়ালে-আবডালে *আম্মু* বলে ডাকে।

এ দলটার ভিতর অদ্ভুত এক বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে। ইচ্ছে করেই রানা নিজেদের ভিতর সামরিক ফর্মালিটি রাখেনি, তাতে পরস্পরের অনেক কাছে আসতে পেরেছে ওরা। সম্পর্ক হয়ে উঠেছে অনেক বেশি আন্তরিক। প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী *স্যর-ম্যাডাম* ডাকা, কিংবা স্যালিউট দেয়ার মত আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করেছে রানা। একান্তে ওরা একই পরিবারের সদস্যের মত। রানা যেমন অন্যদেরকে *মাসুদ ভাই* বলে ডাকতে দেয়, তেমনি নিজেও ওর চেয়ে বয়সে বড় নিশাতকে *আপা* বলে ডাকতে দ্বিধা করে না। অন্যদেরকেও একই সম্বোধনে উৎসাহিত করে। রানা *আপা* বলায় নিশাত খুশি, কিন্তু কিছুতেই রানাকে নাম ধরে ডাকতে বা তুমি বলতে রাজি হয়নি, ওকে 'স্যর' এবং 'আপনি' বলেই সম্বোধন করে।

এ মুহূর্তে বিশাল স্ক্রিনের দিকে চেয়ে রয়েছে রানা। বুঝতে পারছে ওদের সাধের পরিকল্পনা জানালা দিয়ে পাখি হয়ে উড়ে চলে গেছে!

একটা ক্রেনের উপর রাখা ওদের ক্যামেরা। ওটা থেকে পরিষ্কার দেখা গেল ডক। জাহাজের উঠবার আগে একটু থমকে গেল দালমার আলী, নিচু স্বরে কী যেন বলতে শুরু করেছে সঙ্গীদেরকে। একটু সরে দাঁড়াল। গ্যাংপ্লাঙ্ক বেয়ে দৌড়ে উঠে এল এক ডজন সোমালিয়ান, চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে।

একটু জোরে ডাকল নবী, 'মাসুদ ভাই!'

'দেখেছি।'

'কী করবি, রানা?' জানতে চাইল সিলভিও বেনেডিক্টো।

'এক মিনিট,' স্ক্রিন থেকে চোখ সরাল না রানা। চেয়ারে সংযুক্ত মাইক চালু করল। 'ফেং, শুনছ?'

'মনিটরে সব দেখছি। ভেস্তে গেছে "এ প্ল্যান"। এবার?'

'মেস হলের কাছে অপেক্ষা করো।'

গ্যাংওয়ে বেয়ে উঠতে শুরু করেছে দালমার আলী। কিন্তু ততক্ষণে কমপক্ষে এক শ' সোমালিয়ান উঠে পড়েছে জাহাজে। নেতার পিছু নিয়ে পিলপিল করে উঠছে আরও অনেকে।

মনের ভিতর এক এক করে পরিকল্পনা তৈরি ও বাতিল করে চলেছে রানা। মার্ভেলে যে পরিমাণ ফায়ার-পাওয়ার আছে, তাতে পুরো ক্যাম্পের সবাইকে শেষ করে দেয়া সম্ভব। কিন্তু এ কথা একবারও ভাবল না রানা। এই ক্যাম্পে যেমন রয়েছে একে-৪৭ রাইফেল হাতে বহু দুর্বৃত্ত, তেমনই রয়েছে অসংখ্য মেয়েমানুষ ও শিশু-কিশোর, সশস্ত্র লোকগুলোর চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা, 'ওয়াটার-সাপ্রেশান কামান তৈরি রাখো, রায়হান।'

'আগেই কাজ শুরু করেছি, মাসুদ ভাই।'

ঘরে এসে ঢুকেছে লেফটেন্যাণ্ট সানজিদা স্বর্ণা। ভাল কবিতা লেখে সে, কিন্তু তার চেয়ে ভাল পারে বেয়াড়া লোক পেটাতে। ওর কথার ধারে তটস্থ থাকে পুরুষ কমাণ্ডোরা, খুব সমঝে কথা বলে।

'স্বর্ণা,' বলল রানা, 'তুমি দালমার আলীর উপর চোখ রাখো। ইণ্টারনাল ক্যামেরা থেকে যেন হারিয়ে না যায়। হোল্ডে ঢুকলেই সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

মাইক্রোফোনে আবারও বলল রানা: 'ফেং, ক্যাপ্টেন নিশাত, দেরি না করে জাদুর দোকানে চলে আসুন।'

একটা পোর্টেবল রেডিও পকেটে রাখল রানা, কানে পরে নিল

হেডফোন। এবার কমিউনিকেশন গ্রিড থেকে তথ্য পাবে। দ্রুত চলে গেল পিছন দরজার কাছে, কাঁধের উপর দিয়ে সোহেলকে দেখে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করল না, টিক-প্যানেল্ড সিঁড়িঘর দিয়ে নামতে শুরু করে রেডিওতে নির্দেশ দিতে শুরু করল: 'সোহেল, সবার কাজ বুঝিয়ে দে।'

'নিজে লড়তে পারলে খুশি হতাম,' বলল সোহেল।

'পরে সুযোগ পাবি। আমার সময় নেই, তুই যোগাযোগ কর্ চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে।'

সোহেলের কণ্ঠ শোনা গেল । দ্রুত নির্দেশ দিয়ে চলেছে।

লেফটেন্যান্ট আফতাব একটু গাঁইগুঁই করল। যা করতে বলা হচ্ছে, তাতে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে পরে পরিষ্কার করতে হবে গোটা জাহাজ।

প্রায় একই সঙ্গে জাদুর দোকানে পৌঁছে গেল রানা, ফেং ও নিশাত সুলতানা। এই প্রকাণ্ড ঘর একইসঙ্গে সেলুন এবং স্টোর। একদিকের দেয়ালে মেকআপ কাউণ্টার। সামনে বিস্তৃত আয়না। দূরে র‍্যাক ভরা পোশাক, স্পেশাল এফেক্ট গিয়ার ও সব ধরনের প্রপ্‌স্।

ফেং ও নিশাতের পরনে কালো কমব্যাট ইউনিফর্ম। কোমর থেকে ঝুলছে অ্যামিউনিশনের থলি, কমব্যাট ছোরা ও অন্যান্য গিয়ার। হাতে ব্যারেট আরইসি৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। এম১৬ রাইফেলকে ছাড়িয়ে এটাই এখন দুনিয়ার সেরা হিসাবে নাম করেছে।

'যা করার জলদি, বিল্লাহ,' তাড়া দিল রানা। 'আপা, ফেং, শার্ট পরে নিতে হবে।'

জাদুর দোকানে এক অংশে নানা ধরনের ছদ্মবেশ। মেকআপ আর্টিস্ট দু'হাত ভরা দিশদাশা নিয়ে তৈরি। আফ্রিকার এদিকে

অনেকে এই দীর্ঘ শার্ট পরে। সুতির কাপড় আগে সাদা ছিল, তবে পুরনো বানিয়ে ফেলেছে ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে। এখানে ওখানে নানা দাগ। ইউনিফর্মের উপর দিয়ে ঢিলাঢালা পোশাক পরে নিল ওরা। মনে হলো নিশাতকে সসেজ কেসিঙের ভিতর ভরা হয়েছে। ইউনিফর্ম ঢাকা পড়ল, তবে বেরিয়ে রইল কমব্যাট বুট।

সবার মাথায় কাফিয়ের মত করে কাপড় পেঁচিয়ে দিল মোফিজ বিল্লাহ। গায়ে মেখে দিল কালো মলম। প্রত্যেকে হয়ে উঠল সত্যিকারের আফ্রিকান। মোফিজ আরও কী করবে ভাবতে শুরু করেছে, কিন্তু বাধা দিল রানা, 'নিখুঁত হতে হবে না। মানুষ যা দেখতে চায় তা-ই দেখে। ছদ্মবেশের প্রথম শর্ত ওটা।'

রানার মাইক্রোফোনে ভেসে এল স্বর্ণার কণ্ঠ, 'আর দু'মিনিট পর মেইন হোল্ডে ঢুকবে দালমার আলী।'

'এত তাড়াতাড়ি? আমরা তৈরি নই। ...ব্রিজে কেউ আছে?'

'দুটো ছেলে। জাহাজের হুইল নিয়ে খেলছে।'

'ফগহর্নের ভেঁপু বাজিয়ে স্পিকার দিয়ে আওয়াজ পাঠিয়ে দাও হোল্ডে।'

'কেন, মাসুদ ভাই?'

'পরে বুঝবে, যা বলছি করো।'

ম্যানগ্রোভ জলাভূমির ভিতর ভয়ঙ্কর আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল। ফগহর্নের শব্দে চমকে গেল পাখিদল, ডাল ছেড়ে ছিটকে উড়ে গেল আকাশে। কেঁউ-কেঁউ করে উঠল ক্যাম্পের কুকুরগুলো, দুই পায়ের ফাঁকে ঢুকে পড়েছে লেজ। দালমার আলী ও তার সঙ্গীরা করিডোর ধরে মহা প্রাপ্তি দেখতে চলেছে, কিন্তু বিকট আওয়াজে ভড়কে গেল সবাই। দু' হাতে চেপে ধরল কান। আওয়াজ কমল না। প্রচণ্ড শব্দে থরথর করছে চারপাশ।

'দারুণ,' বলল স্বর্ণা। 'থমকে গেছে দালমার। এই মাত্র এক লোককে পাঠাল হুইলহাউসে। ছেলে দুটোর কান ছিঁড়বে এখন।'

'চারপাশের অবস্থা কী?'

'হর্ন বাজলে কী হবে, সোমালিয়ানরা যা পাচ্ছে লুঠ করছে। দুই মেয়েলোককে দেখলাম ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে ম্যাট্রেস নিয়ে গেল। ছবিগুলো নিয়েছে আরও দুই মেয়েলোক। জানি না কেন, এক লোক টয়লেট থেকে কমোড উপড়ে নেয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।'

'ওটায় বসেই তো রাজ্য চালাবে,' সোহেলের মন্তব্য।

রানাদের মেকআপ শেষ করে এনেছে মোফিজ বিল্লাহ্, এমন সময় দালমারের লোক পৌঁছুল ব্রিজে। পিছন থেকে দুই ছোকরার কান পাকড়ে ধরল সে, ভাল মত মুচড়ে দিল। কান ছাড়িয়ে নিয়ে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালাল ছেলেদুটো। কন্ট্রোলের উপর হাত রাখতেই ভেঁপু থামিয়ে দিল স্বর্ণা। অবাক চোখে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে চাইল লোকটা। এখনও কিছু ধরেনি সে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল দালমার আলীর সঙ্গে কথা বলতে।

মার্ভেলের আর্মারার এল জাদুর দোকানে। প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দিল একটা করে কালাশনিকভ একে-৪৭। দেখে মনে হয় বহু বছর ব্যবহার করা। ঠিক জলদস্যুদের অস্ত্রের মত। তবে আসলে একদম নতুন। এ ছাড়া প্রত্যেককে দিল একটা করে ফিল্টার মাস্ক। রানা, ফেং ও নিশাতের শার্টের পকেটে চলে গেল ওগুলো।

'স্যর, কুচকুচে কালো আফ্রিকান হয়ে গেলাম, কিন্তু আপনার প্ল্যান তো বললেন না?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন নিশাত।

মৃদু হাসল রানা। 'নিনযা কালো পোশাকে দালমারকে ধরা যাবে না। তা ছাড়া, জাহাজে উঠেছে একদল লোক। কারও সন্দেহ উদ্রেক না করে দালমারের কাছে পৌঁছতে হবে। তারপর সঠিক সুযোগের জন্য অপেক্ষা।'

'আর দালমার যদি অ্যামোনিয়ামের ড্রাম খোলে?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'দেখবে ভিতরে সাগরের পানি,' বলল সোহেল। 'সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ করবে। পালাতে চাইবে মার্ভেল ছেড়ে।'

'পালাতে পারলে খুব দুঃখজনক হবে,' বলল বেনেডিক্টো।

'তাই তাড়াতাড়ি করছি,' বলল রানা। 'বিল্লাহ?'

দু' পা পিছিয়ে নিজের কাজ দেখল মেকআপ আর্টিস্ট। একটা ড্রয়ার থেকে দুটো সানগ্লাস বের করে ফেং ও রানার হাতে ধরিয়ে দিল। 'এ দুটো পরলে ভাল হয়।' হাতে সময় নেই, নইলে মাসুদ ভাই ও নিশাত সুলতানাকে বানিয়ে দিতে পারত দালমার আলীর যমজ ভাই। একটু অসন্তুষ্টি নিয়ে সরে দাঁড়াল মোফিজ।

তার আগেই রওনা হয়ে গেছে রানা। পিছু নিল নিশাত সুলতানা ও গ্যাং ফেং।

'স্বর্ণা, দালমার এখন কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিক হোল্ডের সামনে। সঙ্গে কমপক্ষে বারোজন গানম্যান। দালমারের সঙ্গে আলাপ করছে তার সাগরেদ গুলবুদ্দীন। এই কান থেকে ওই কান পর্যন্ত হাসি তার মুখে।'

'হাসছে বটে, কিন্তু আশা করা যায় খুব বেশিক্ষণ হাসবে না,' বলল সোহেল।

ফেং ও নিশাতকে নিয়ে একটা দরজা পেরিয়ে ঝকঝকে করিডোরে ঢুকে পড়ল রানা। পিপহোলের সামনে থামল। ওটা টু-ওয়ে আয়না। ওপাশের ঘরে কেউ নেই, অন্ধকার। সঙ্গীদের নিয়ে ঢুকে পড়ল রানা। একটা ওভারহেড ফিক্সচার সরাতেই দেখা গেল ইউটিলিটি ক্লজিট বেরিয়ে এসেছে। মেঝেতে রাখা বালতির ভিতর ভেজা মপ। দেয়ালের তাকে সাবান, হারপিক ইত্যাদি। মার্ভেল জুড়ে অনেক গোপন প্যাসেজ রয়েছে, ওগুলোকে বলা হয় *ভিন জগতে যাওয়ার পথ*।

দরজার নবে হাত রেখে টের পেল রানা, দাঁড়িয়ে গেছে ঘাড়ের খাটো চুলগুলো। শীতল অনুভূতি নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। কড়া ওষুধের মত শিরা দিয়ে দ্রুত চলছে অ্যাড্রেনালিন। জীবন হাতে নিয়ে লড়তে চলেছে। মনের ভিতর ভয় ও উত্তেজনা। সব দুঃসাহসী সৈনিকেরই এ অনুভূতি হয়। স্বীকার করে নেয়, সে ভয় পেয়েছে। নিজের ভয়কে জয় করে ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধের ময়দানে।

না থেমেই দরজা খুলল রানা, বেরিয়ে এল বাইরে। জাহাজের এদিকে দুই মেয়েলোক কার্পেট মুড়িয়ে কাঁধে নিয়ে চলেছে। ওগুলো কোনও কেবিনে ছিল। রানা বা ওর দলের কারও দিকে ঘুরেও চাইল না।

দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে রানা, ফেং ও নিশাত। পৌঁছে গেল স্টেয়ারওয়েলে। ওটা ধরে ফ্রেইটারের আরও গভীরে যেতে হবে। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সশস্ত্র প্রহরী। তাকে পাশ কাটাতে চাইল রানা, কিন্তু খপ করে ওর হাত ধরল লোকটা। যেতে দেবে না। সোমালিয়ান ভাষায় কী যেন বলল।

'দালমার আলীর সঙ্গে জরুরি কথা,' আরবিতে বলল রানা। ভাবছে, এই লোক আরবি বোঝে কি না কে জানে!

'না।' থমকে থমকে বলল লোকটা, 'তাকে এখন বিরক্ত করা যাবে না।'

'তোমার যা ইচ্ছে,' বাংলায় বলেই এক পা পিছিয়ে গেল রানা, পরক্ষণে কাঁধের পুরো জোর দিয়ে ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটার চোয়ালে। মেঝে ছেড়ে আধ ইঞ্চি উপরে উঠল লোকটার দুই পা।

ডানহাতের কব্জি বাম হাতে ধরল রানা। আরেকটু হলে মচকে যেত হাত। নিশাত ও ফেং ধরে ফেলেছে অজ্ঞান লোকটার দেহ। গুঁজে দিল ধাতব সিঁড়ির নীচে।

'মনে রাখতে হবে এ লোক সিঁড়ির নীচে থাকল, আপা,' বলল রানা। দেরি না করে রওনা হয়ে গেল ওরা। স্বর্ণার কথা অনুযায়ী তিন মিনিট হলো হোল্ডে ঢুকেছে দালমার আলী। আশা করা যায় এখনও ড্রাম খোলেনি।

'লোকটা কী করে, স্বর্ণা?'

'পিকআপ ট্রাক দেখছে। ভাবটা এমন, চকলেটের দোকানে ঢুকেছে।'

'ঠিক আছে। সোহেল, আফতাবের সঙ্গে যোগাযোগ কর্। ধোঁয়া দিয়ে মশা দূর করুক। রায়হানের জল-কামান তৈরি?'

'তৈরি। হুড়মুড় করে নেমে যাবে লোকজন।'

'তা হলে কাজ শুরু করা যাক।'

মার্ভেলের বড় সুবিধা ওটার ইঞ্জিন সাধারণ কোনও মেরিন ডিজেল নয়। জাহাজ চলে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন দিয়ে। তরল হিলিয়াম স্ট্রিপ শীতল করে চুম্বকগুলোকে, সেগুলো সাগরের পানি থেকে মুক্ত করে অজস্র ইলেকট্রন। মেলে বিপুল পরিমাণে ইলেকট্রিসিটি। তা আবার শক্তি দেয় চারটে জেট পাম্পকে। ওই প্রচণ্ড ক্ষমতা সাগরের পানিকে বইয়ে দেয় জোড়া ডিরেকশনাল ড্রাইভের ভিতর দিয়ে। এগারো হাজার টনি জাহাজ অবিশ্বাস্য দ্রুত গতি তুলতে পারে। মার্ভেল পুরনো জাহাজ, তা বোঝাতে রয়েছে দুটো জেনারেটার। প্রয়োজনে ওগুলো তৈরি করে ধোঁয়া, ভকভক করে বের হয় চিমনি থেকে। যে কারও মনে হবে, জাহাজের ইঞ্জিন অতি পুরনো, কোনও যত্ন নেয়া হয় না।

লেফটেন্যান্ট আফতাব আপাতত জেনারেটারের ধোঁয়া পাচার করবে ভেন্টিলেশন সিস্টেমে।

তিন নম্বর হোল্ডের সামনে পৌঁছে গেল রানা, ফেং ও নিশাত, চারপাশ দেখে নিল। ভেন্টিলেশন গ্রিল থেকে বেরুতে শুরু করেছে ধোঁয়া। নিচু সিলিঙে দ্রুত জমছে। জাহাজের ভিতর অংশে বিষাক্ত

ধোঁয়া তৈরি হতে কয়েক মিনিট লাগবে, পাগল করে দেবে সোমালিয়ানদের।

'ওই যে, হৈ-চৈ শোনা যায় হোল্ডের ভিতর,' বলল নিশাত।

'তৈরি?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল ফেং ও নিশাত। দৌড়ে হোল্ডে ঢুকল ওরা।

'আগুন! আগুন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

হেভি ডিউটি পিকআপগুলোর একটার সামনে দাঁড়িয়েছে দালমার আলী ও তার দলবল।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল দালমার।

'জাহাজে আগুন ধরে গেছে, খুব ধোঁয়া,' বলল রানা। জানে, আরবি শুনে অবাক হবে সোমালিয়ান গান-লর্ড। 'চারপাশে আগুন।'

ড্রাম ভরা অ্যামোনিয়ামের দিকে চাইল দালমার আলী। রানা নিশ্চিত নয় লোকটা কী ভাবছে। হয়তো আগুন ধরবার আগেই সরাতে চাইবে ড্রামগুলো। অথবা ভাবছে, একটু পর পুরো জাহাজ উড়ে যাবে। হোল্ডে ভেন্টিলেশন নেই, কিন্তু নাকে লাগছে ধোঁয়া। দরজার সামনে কুয়াশার মত ভাসছে। গুলবুদ্দীনের দিকে চাইল রানা। লোকটা টের পেয়েছে তার দিকে চেয়েছে কেউ। ঘুরে চাইল সে। যদি জানত ওই লোক জলদস্যুদের কতটা ঘৃণা করে, দেরি না করে পিস্তল বের করে গুলি করত গুলবুদ্দীন।

রেডিও করল স্বর্ণা, 'মাসুদ ভাই, মেয়েলোক আর বাচ্চারা যাচ্ছে গ্যাংপ্লাঙ্কের দিকে। তবে ধোঁয়াকে একটুও পাত্তা দিচ্ছে না যোদ্ধারা।'

'তুমি নিজের চোখে আগুন দেখেছ?' জানতে চাইল দালমার।

'ঠিক তা-না, স্যর।'

কড়া চোখে রানার দিকে চাইল দালমার। 'আমি তো তোমাকে চিনি না! তোমার নাম কী?'

'জব্বার, স্যর।'

'কোত্থেকে এসেছ?'

মহাবিরক্ত হলো রানা। আরে শালা, জাহাজে আগুন ধরেছে, দরজার কাছে ঝুলছে ধোঁয়া, আর আমার জীবনের ইতিহাস জানার সময় হলো তোর?

'স্যর, এখন কথার সময় না।'

'ঠিক আছে, দেখা যাক এত ভয় কীসের। আমার তো ধারণা গ্যালিতে খাবার পুড়িয়ে ফেলেছে কেউ।'

ফেংকে হাতের ইশারা করল রানা, ভঙ্গি নিল আবার ফিরবে সিঁড়ির গোড়ায়।

দলবল নিয়ে হোল্ডের মাঝে দাঁড়িয়েছে দালমার আলী। ভাব দেখে মনে হলো, নড়বে না। আবার ইশারা করল রানা। হোল্ডের ওয়াটার-টাইট দরজার ওপাশে গিয়ে থামল ফেং, ঘুরে চাইল। আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। দালমার আলী দরজার কাছে আসতেই তাড়া দিল, 'দেরি করবেন না।' একহাতে লোকটার কনুই ধরল, অন্য হাত ধরেছে নিশাত।

দরজা পেরিয়ে গেল তিনজন। পিছু নিল দালমারের যোদ্ধারা। আর তখনই সিলিং থেকে সড়াৎ করে নামল স্টিলের প্যানেল। হাইড্রোলিক শক্তি মেঝের সঙ্গে আটকে দিল ওটাকে। সব এত দ্রুত ঘটল, ওপাশে রয়ে গেল দালমারের কয়েকজন লোক। এক সেকেণ্ড আগে ছিল খোলা পথ, পরমুহূর্তে ধাতব দরজা বন্ধ করে দিল করিডোর।

ট্র্যাপডোরের কারণে দালমারের অর্ধেক লোক আটকা পড়েছে হোল্ডের ভিতর। তবুও রয়ে গেছে অন্তত ছয়জন। মুখোমুখি গোলাগুলি হলে কে বাঁচবে আর কে মরবে, ঠিক নেই!

'কী হলো ওটা?' কাউকে নয়, যেন নিজেকে জিজ্ঞেস করল দালমার আলী।

গুলবুদ্দীনের মনে পড়ল শাহিনের বলা বিদঘুটে কাহিনি। খালি পড়ে ছিল মেস হল। কুসংস্কার নিয়ে চারপাশে চাইল গুলবুদ্দীন, চোখে ভয়। এ জাহাজে ভুতুড়ে কিছু ঘটছে, কোনও সন্দেহ নেই। তার মনে হলো প্রথম কাজ হওয়া উচিত জাহাজ থেকে নেমে পড়া।

দুই দস্যু চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু স্টিলের পাত তোলা গেল না। ওপাশ থেকে চেঁচামেচি করছে সঙ্গীরা। এদিকে ঘন হয়ে উঠছে ধোঁয়া।

'ওরা থাকুক,' হঠাৎ গলা উঁচু করল দালমার। বুঝতে পেরেছে কোথাও বড় ধরনের গোলমাল দেখা দিয়েছে। আর দেরি না করে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল। ধাপ বেয়ে উঠছে, খেয়াল করল না, এক লোককে সিঁড়ির গোড়ায় রেখে গেছিল, কিন্তু সে নেই। হোল্ড থেকে দ্রুত হেঁটে বেরিয়েছে দালমার, কিন্তু এখন লাফিয়ে ধাপ পেরুচ্ছে। সুযোগ পেলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে।

লোকটার সহজাত বোধ-বুদ্ধি ইঁদুরের মত, ভাবল রানা। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে টের পেয়ে গেছে, এবার তাকে পালাতে হবে। পিছু নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে তার লোক।

হাঁটার গতি কমিয়ে দিল রানা, কারও সন্দেহ না জাগিয়ে অপারেশন্স সেন্টারে যোগাযোগ করল। 'স্বর্ণা, আমাদের ট্র্যাক করছ?'

'জী।'

'অত গার্ড থাকলে দালমারকে ধরা সম্ভব নয়। আমরা যখন ডেকে বেরুব, নবী যেন আমাদের দিকে জল-কামান তাক করে।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল রানা। করিডোর পেরিয়ে সামনে পড়ল গোপন এক দরজা। ওটা পাশ কাটিয়ে বেরুল ডেকে। একটু দূরে গ্যাংপ্লাঙ্ক। ছায়াচ্ছন্ন সুপারস্ট্রাকচার থেকে সূর্যালোকে

বেরুতেই ওদের দিকে ছিটকে এল পানির শক্তিশালী ধারা। ফায়ার-সাপ্রেশন কামান সোজাসুজি লাগল দালমারের বুকে। পিছিয়ে নিজের লোকের উপর পড়ল সে। সেখান থেকে হুড়মুড় করে ডেকে। তিন সোমালিয়ান পড়েছে তার সঙ্গে। দু'জন এখনও পড়েনি। বিরাট দুই হাত দিয়ে তাদের ধরল ক্যাপ্টেন নিশাত, ঠাস্ করে ঠুকে দিল মাথা দুটো। ভোঁতা আওয়াজ হলো। আস্তে ঠুকেছে, চাইলে মাথা ফাটিয়ে মগজ বের করে দিতে পারত। তবে এতেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল দুই সোমালিয়ান।

গুলবুদ্দীনের দুই উরুর ফাঁক দিয়ে গেছে জল-কামানের ধারা। সেদিকে চোখ নেই তার, অবাক হয়ে গেছে রানাকে দেখে। সাগরের পানি ধুইয়ে দিয়েছে রানার মেকআপ। এখন আর ও আফ্রিকান নয়! চোখ থেকে খসে পড়েছে সানগ্লাস। জল-কামানের ধাক্কা খেয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করেছে কিছু মেয়েলোক, কিন্তু তাদের চিৎকার ছাপিয়ে উঠল গুলবুদ্দীনের বেসুরো কণ্ঠ: 'আরে, আরে! এ কে!' দু'হাতে কোমরের কাছে তুলে ফেলল একে-৪৭। কিন্তু সুযোগ পেল না, ওর বুকে কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিল রানা। ধাক্কা খেয়ে রেলিঙে গিয়ে পড়ল গুলবুদ্দীন। কোমরে ব্যথা পেয়েছে, কিন্তু তর্জনী পেঁচিয়ে ধরল ট্রিগারটা।

এক পশলা বুলেট বেরিয়ে গেল রাইফেল থেকে। কপাল ভাল মেয়েমানুষ ও বাচ্চাদের মাথার উপর দিয়ে গেল গুলি। তবে ওটার কারণে পাগল হয়ে উঠল তারা। এমনিতেই ভয়ে ছিল, কিন্তু এবার শুরু হলো স্ট্যাম্পিড। সশস্ত্র লোকগুলোর চোখে পড়ল এ দৃশ্য।

নিজের রাগ ঝাড়ল রানা গুলবুদ্দীনের পেটে, গেঁথে দিল এক কনুই। ডেকে ছিটকে পড়ল কালাশনিকভ। গলফ বলের মত হয়ে উঠল লোকটার দুই চোখ। ফুসফুস ফাঁকা হওয়ায় বিশাল হাঁ করল। দ্বিতীয়বারের মত হাত তুলল রানা, লোকটার চোয়ালে

নামল প্রচণ্ড ঘুসি। ধাক্কা সামলাতে পারল না গুলবুদ্দীন, রেলিং টপকে পড়ে গেল। সামনে বেড়ে নীচে চাইল রানা। গুলবুদ্দীনের কপাল মন্দ, এক চিলতে পানি নেই ওখানে, লোকটা নেমেছে একটা ট্রলারের ট্র্যানসমের উপর। ওই ট্রলার থেকেই মার্ভেলে উঠেছিল। এখন বেকায়দা ভাবে কাত হয়ে পড়ে আছে। ঘাড়ের ওই অ্যাঙ্গেল দেখেই বোঝা গেল, প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

অখুশি হতে পারল না রানা। সোমালিয়ান মেয়েলোকদের ভিতর দিয়ে এগুতে শুরু করল। জল-কামান থেকে বেরুচ্ছে শক্তিশালী ধারা। ছিটকে লাগছে জাহাজের গায়ে। চারপাশে এত জলকণা, যেন সাইক্লোন বইছে। চারপাশে ছেলে-মেয়েরা কাঁদছে মায়েদের সঙ্গে নেমে যেতে চাইছে জাহাজ থেকে।

ওদের কেউ দেখল না রানা কুচকুচে কালো নয়, বাদামী রঙের। কিন্তু ঠিকই লক্ষ্য করল এক লোক। মোটা এক তোড়া অফসেট কাগজ ও একটা প্লাস্টিকের টুল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল, কিন্তু এবার বিকট হাঁ করল চিৎকার দিয়ে লোক জড়ো করতে। এক লাফে তার পাশে পৌঁছুল রানা, কাঁধ ঘুরিয়ে ঘুসি মারল থুতনির নীচে।

ধপ করে ডেকের উপর পড়ল সে। কিন্তু পড়েই জড়িয়ে ধরল রানার বাম গোড়ালি। পা ছাড়িয়ে নিতে চাইল রানা, কিন্তু লোকটা যেন শক্তিশালী মোরে ঈল। দেরি করল না রানা, ধপাস করে ডান পা নামিয়ে আনল লোকটার মুখের উপর। বুটের চাপে মুড়মুড় করে ভাঙল আট-দশটা দাঁত। কাত হয়ে শুয়ে পড়ল লোকটা, গ্যাঁ-গ্যাঁ আওয়াজ করছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুখ।

ঝটকা দিয়ে পা ছাড়িয়ে নিল রানা, এক দৌড়ে হাজির হলো গ্যাং ফেং ও নিশাতের পাশে।

এদিকে উঠে দাঁড়াতে চাইছে দালমার আলী। প্রবল পানির ধারা সরিয়ে দিয়েছে গায়ের শার্ট। বুকে দেখা গেল কিছু

শ্র্যাপনেলের দাগ। দাড়ি থেকে চুইয়ে ঝরছে পানি। লোকটা যেন পানিতে চুবানি খাওয়া ইঁদুর। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, যে করে হোক মার্ভেল থেকে নেমে পড়বে। টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল, পরক্ষণে শুরু করল দৌড়।

কিন্তু সোমালিয়ান ওয়ার লর্ডের সামনে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল ক্যাপ্টেন নিশাত। 'এত জলদি না, দোস্ত,' দালমারের ডানহাত পেঁচিয়ে উপরের দিকে ঠেলল সে, আরেক হাতে হোলস্টার থেকে তুলে নিল পিস্তল।

'আমাকে বাঁচাও! তোমরা কোথায়!' সঙ্গীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

জল-কামান চালু হওয়ার পর দশ ফুট দূরেও কিছু দেখা যায় না। কিন্তু দালমারের চিৎকারে সাড়া দিল তার লোক। এক হাতে চোখ ঢেকে এদিকে আসছে, আরেক হাতে রাইফেল। ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল। পলকের নোটিসে গুলি করবে।

'জলদি!' নির্দেশ দিল রানা। নিশাতের পাশে সাহায্য করছে দালমারকে টেনে নিয়ে যেতে। সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকে পড়ল দলটি। পিছন দিক কাভার করছে ফেং।

জল-প্রপাতের মত পানির ধারা ভেদ করে বেরিয়ে এল কয়েকজন জলদস্যু। আঁধার জায়গায় পৌঁছে অপেক্ষা করল দৃষ্টি পরিষ্কার করতে। আর তখনই খেয়াল করল, তাদের নেতাকে ধরে নিয়ে চলেছে তিন লোক। দালমারের নিরাপত্তার কথাও ভুলে গেল সোমালিয়ানরা, শুরু করল গুলি-বর্ষণ।

রানার ঘাড়ে গরম তাপ লাগল, বুলেটগুলো সিলিঙে পিছলে চলে গেল প্যাসেজওয়ে ধরে।

পিছানোর ফাঁকে গুলি করছে প্যাং ফেং, ওর দুটো গুলি ফেলে দিল এক লোকের একে-৪৭, তারপর সিলেক্টর সুইচ অটোমেটিক ফায়ারে নিয়ে খালি করে ফেলল ম্যাগাজিন। তিন জলদস্যু মেঝের

উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।' সেই সুযোগে একটা বাঁক ঘুরল রানা, নিশাত ও ফেং।

সবার সামনে ছুটছে রানা, খেয়াল করে শুনছে স্বর্ণার সতর্ক-বাণী। জলদস্যুরা এখনও রয়ে গেছে জাহাজে। আরেকটা বাঁক ঘুরবে ওরা, তখনই জানাল স্বর্ণা ক' ফুট সামনেই এক সশস্ত্র সোমালিয়ান। থমকে গিয়ে উঁকি দিল রানা, লোকটার পিঠ ওর দিকে তাক করা। সামনে বেড়ে লোকটার মাথার পিছনে রাইফেলের বাঁট নামিয়ে নামল রানা।

হিসাবে ভুল করেছে, অথবা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত খুলি ওই লোকের। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল, কারবাইনের নল দিয়ে গুঁতো দিতে চাইল রানার পেটে। একবার পিছিয়ে গেলেই গুলি করবে।

বাম পা তুলে নলটা দেয়ালে ঠেকিয়ে দিল রানা। হ্যাঁচকা টানে ব্যারেল ছাড়িয়ে নিতে চাইল সোমালিয়ান, কিন্তু পারল না। হাতের একে-৪৭ বেস ব্যাটের মত চালাল রানা, দ্বিতীয়বারের মত রাইফেল নেমে এল লোকটার মাথার উপর। এবার ফট্টাশ্ আওয়াজ তুলে ফাটল মাথা, ধপাস্ করে পড়ল সে মেঝের উপর। অজ্ঞান।

এক সেকেণ্ড পর আবার সতর্ক-বাণী এল স্বর্ণার কাছ থেকে। করিডোরের দূরে চোখ পড়ল রানার। মেস হল থেকে বেরিয়ে আসছে দুই জলদস্যু, রাইফেলের নল থেকে বেরুচ্ছে কমলা ঝলকানি। একটা গুলি লাগল রানার পেটে, প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল। বুলেট-প্রুফ ভেস্ট না থাকলে মরত আজই। বেকায়দা ভাবে কাত হয়ে পড়ে যেতে শুরু করেছে রানা, কিন্তু বাহু ধরে সোজা করে দিল ফেং, একটানে সরিয়ে নিল বাঁকের এপাশে।

'আপনার কী অবস্থা, স্যর?' উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চাইল নিশাত।

পেটে হাত বোলাল রানা, ভীষণ ব্যথা করছে। 'কমে আসছে ব্যথা।' ওর কান থেকে খসে পড়েছে হেডসেট। ওটা ঠিক করে নিল। 'সামনে কী ঘটছে, স্বর্ণা?'

'ওই দু'জন মেস হলের দরজার আড়ালে কাভার নিয়েছে। এ দিকে পিছন থেকে আসছে আরও ছয়জন।'

'ফেং, তুমি পিছন করিডোর সামলাও।'

করিডোরের আরেক পাশে একটা কেবিনে ঢুকতে চাইল রানা। কিন্তু দরজা লক্‌ করা। সময় পায়নি বলে তালা ভেঙে লুটপাট করতে পারেনি সোমালিয়ানরা। হ্যাণ্ডেলের ভিতর মাস্টার কী ঢোকাল রানা, তালা খুলে ঢুকে পড়ল কেবিনে। এটা চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নকল কেবিন, ক্যাপ্টেনের ঘরের থেকে ছোট। মার্ভেলকে ধচাপচা জাহাজ বোঝাতে বাইরের সব ফার্নিচার সস্তা কেনা হয়েছে। দেয়ালে বুল-ফাইটিঙের পোস্টার। আরেক দেয়ালে কয়েকটা সেইলিং বোটের ছবি। কেবিনের আরেক প্রান্তে পৌঁছে গেল রানা, থামল পোর্সেলিন বেসিনের সামনে। আয়নাটা বাল্কহেডের সঙ্গে গ্লু দিয়ে আটকানো। একে ৪৭-এর নল দিয়ে আয়নায় খোঁচা দিতেই ভেঙে পড়ল কাঁচ। টুকরোগুলো থেকে একটা বেনসনের প্যাকেটের সমান কাঁচ তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল করিডোরে।

বাঁক নেয়ার আগে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। সাবধানে আয়নার টুকরো ওদিকে বের করল। হলওয়েতে দেখা গেল দুই সোমালিয়ানকে। প্রথমজন উবু হয়ে বসেছে মেস হলের দরজার পাশে। পিছনে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয়জন। এরা করিডোরের বাঁকের দিকে তাক করে রেখেছে রাইফেল। তবে স্বল্প আলোয় আয়না দেখতে পেল না।

অতি ধীরে বাঁকের ওপাশে পার করিয়ে দিল রানা ব্যারেলের আধ ইঞ্চি। একটু দূর থেকে চোখে পড়বে না। আরেকবার আয়না

দেখে নিল। আন্দাজের উপর নির্ভর করে কালাশনিকভের ব্যারেল আরও এক ইঞ্চি উঁচু করল। পরক্ষণে স্পর্শ করল ট্রিগার।

মেস হলের দরজার পাশে লেগে পিছলে গেল বুলেট, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। সরু ফাটলে বেকায়দা ভাবে আটকা পড়েছে লোকদুটোর রাইফেলের ব্যারেল। দরজা ঠিক ভাবে বন্ধ হওয়ার আগেই ছুটতে শুরু করেছে রানা। জলদস্যুরা অস্ত্র সরিয়ে নিতে পারল না, দরজা খোলা আর হয়ে উঠল না তার আগেই এক দৌড়ে পৌঁছে গেল রানা। সামান্য ফাঁক হওয়া দরজার পাশ দিয়ে ভরে দিল রাইফেলের নল পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করল এক পশলা। কবাটে ছলাৎ করে লাগল উষ্ণ রক্ত। এক টানে ব্যারেল বের করে নিল রানা। ভিজে গেছে ওটা। দরজা খুলতেই দেখা গেল চিত হয়ে পড়ে আছে দুই জলদস্যুর লাশ, বুলেটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত।

নিশাত ও ফেংকে হাতের ইশারা করে রওনা হয়ে গেল রানা। দালমার আলীকে প্রায় কোলে নিয়ে ছুটছে নিশাত। সঙ্গীদের দিকে পিঠ দিয়ে দৌড়ে পিছিয়ে আসছে ফেং।

'ওরা আসছে,' সাবধান করল স্বর্ণা।

ছ'জন সোমালিয়ান, জানে রানা। একে-৪৭ থেকে ম্যাগাজিন খুলে ফেলল, বদলে নতুন ক্লিপ আটকে নিল। চেম্বারে এখনও একটা বুলেট। নিয়ম এটাই, যতই লড়তে হোক, অস্ত্র পুরোপুরি খালি করা চলবে না। এর ফলে নতুন করে কক করতে হয় না অস্ত্র। করিডোরের বাঁকে ছায়া পড়তেই গুলি শুরু করল রানা। লোকগুলোকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে। ওদের নিজেদের সময় লাগবে কাভার খুঁজে নিতে।

বদ্ধ পরিবেশে গুলির আওয়াজ কান ফাটানো। ভেণ্টিলেটার থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে করডাইটের দুর্গন্ধ। বেশিদূর দেখা যায় না। দম আটকে আসছে।

পিছনে ফেলে আসা করিডোরে দেখা গেল কমলা ঝিলিক। লোকগুলো ওখান থেকে গুলি শুরু করেছে। হাত-পা ছড়িয়ে পড়তে লাগল ফেং। দেখে মনে হলো পিছন থেকে কেউ হ্যাঁচকা টান দিয়েছে। দু'হাত দিয়ে পতন ঠেকাতে পারল না, পিছলে পড়ল রানার পায়ে। বাম হাতে খপ করে ওর কলার ধরল রানা, টেনে নিয়ে ঢুকে পড়ল মেস হলে। অন্য হাতে গুলি ছুঁড়ছে করিডোর লক্ষ্য করে।

শক্তিশালী দুই হাতের ভিতর ছটফট করছে দালমার আলী, ছুটে যেতে চাইছে, ঘাড়-পিঠে ধাক্কা দিয়ে তাকে মেস হলে ঢুকিয়ে দিল নিশাত। এত বিপদের ভিতর এখনও দুই লোক কিচেনের দরজা দিয়ে স্টোভ বের করতে চাইছে, নিয়ে যাবে বাড়িতে। এক মুহূর্তে বুঝল আরেকদল ঢুকেছে ঘরে, এরা তাদের নিজেদের লোক নয়। হাত থেকে স্টোভ ফেলে দিল তারা, বার্নার পেরিয়ে তুলে নিতে চাইল অস্ত্র।

কোমরের কাছে রাইফেল তুলেই গুলি করল রানা, নিখুঁত হলো লক্ষ্য-ভেদ। বিস্ফোরিত হলো লোকদুটোর বুকের চামড়া, ছিটকে বেরুল রক্ত ও ছেঁড়া পেশি।

লুকানো ক্যামেরা থেকে মার্ভেল টিমকে দেখছে স্বর্ণা। খুলে গেল একটা বাল্কহেডের গোপন দরজা। সাহায্য করবার জন্য দু'জন ক্রুকে পাঠিয়ে দিয়েছে সোহেল। দশ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই দালমার আলীকে ধাক্কা দিয়ে দরজা পার করিয়ে নিজেরাও ঢুকে পড়ল গোপন কক্ষে। নিচু স্বরে গোঙাচ্ছে ফেং। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে। সাবধানে তাকে কাঁধে তুলে নিল রানা, ঢুকে পড়ল দরজা দিয়ে। এরপর ঢুকল নিশাত সুলতানা, পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা। হাঁপাচ্ছে সবাই। টপ-টপ করে পানি পড়ছে দুর্লভ কার্পেটের উপর।

দুই মুহূর্ত বিশ্রাম নিল রানা, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'এর

চেয়ে অনেক ভাল করা উচিত ছিল আমাদের।'

'ঠিক বলেছেন, স্যর,' সায় দিল নিশাত।

ফেঙের দিকে চাইল রানা। 'এখন কেমন বোধ করছ?'

'বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের একটা প্লেটে লেগেছে গুলি। ব্যথার চোটে জান খারাপ, তবে পাঁচ মিনিট পর লড়তে পারব।'

সিলভিও বেনেডিক্টোর পাশে হেঁটে এসে থামল ডাক্তার ফারা। পারনে সাদা ল্যাব কোট, ডান হাতে চামড়ার মেডিক্যাল ব্যাগ। মেয়েটির বয়স বড়জোর ছাব্বিশ, দক্ষ ডাক্তার না হয়ে সুপার মডেল হতে পারত।

'তোর মাল তো আস্ত পেলি,' সিলভিওর দিকে চাইল রানা।

মাথা দোলাল ইন্টারপোল ইন্সপেক্টর। দৃষ্টি ফেলল দালমার আলীর উপর। 'আস্ত কে চেয়েছে? হাত-পা ভাঙা থাকলেও চলত। জান থাকলেই হলো।'

'আপনারা কারা?' বিশ্রী উচ্চারণে ইংরেজি বলল দালমার। 'আপনারা আমাকে বন্দি করতে পারেন না। আমি সোমালিয়ান নাগরিক, কাজেই আমার আইনগত অধিকার আছে।'

'কাস্টম্স্ পার হয়ে জাহাজে উঠবার পর তুমি সোমালিয়ায় নেই,' বলল সিলভিও। 'তুমি আছ অন্য আরেক দেশে।'

রানার মন চাইল, লোকটার কণ্ঠ থেকে নেকলেস ছিঁড়ে নিয়ে গিলিয়ে দেয়।

মেঝের উপর ব্যাগ রাখল ফারা, ভিতরে কী যেন খুঁজতে শুরু করেছে। পাঁচ সেকেণ্ড পর বের করল একটা সিরিঞ্জ ও সার্জিকাল কাঁচি। দু'হাতে দালমারকে পাকড়ে ধরেছে নিশাত। কাঁচি দিয়ে লোকটার আস্তিন কাটল ফারা, অ্যালকোহলে চোবানো তুলা দিয়ে পরিষ্কার করল ত্বক।

'আপনি কী করতে চাইছেন?' বিস্ফারিত হলো লোকটার চোখ। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চাইছে। কিন্তু নিশাতের দুই

হাত যেন লোহার পাত দিয়ে তৈরি। 'আপনারা আমাকে নির্যাতন করতে পারেন না!'

পাশে দাঁড়িয়েছে রানা। নিশাতের কাছ থেকে দালমারকে ছুটিয়ে নিল, এক হাত রাখল লোকটার গলার উপর। পরক্ষণে করিডোরের উল্টো দেয়ালে ঠেসে ধরেই উপরের দিকে তুলে ফেলল। দু'জনের চোখ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। শ্বাস আটকে যাওয়ায় ঘড়ঘড় শব্দ শুরু করল দালমার। কেউ সাহায্য করছে না তাকে। থমকে গেছে সিলভিও বেনেডিক্টো। ভাবতে পারেনি এত রাগ থাকতে পারে রানার মনে। থমথম করছে ওর মুখটা।

'নির্যাতনের কথা বলছ? নির্যাতনের কী দেখেছ তুমি?' বাম হাতের বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী দিয়ে দালমারের কাঁধের নার্ভে চাপ তৈরি করল রানা। লোকটা বুঝতে শুরু করেছে আগুনে ঝলসালে কেমন লাগতে পারে। কুকুরের বাচ্চার মত কিঁউ-কিঁউ করে উঠল দালমার। করিডোর ভরে উঠল কাতর ধ্বনিতে। চাপ আরও বাড়াল রানা। প্রাণপণে চিৎকার করতে চাইল দালমার। যদিও সেটাকে মনে হলো কোনও বেসুরো বেহালার উপর ছড় বোলানো হচ্ছে। 'মানুষের এমনই লাগে, যখন তোমরা তাদের সব কেড়ে নাও।'

'যথেষ্ট, রানা,' কাঁপা স্বরে বলল ফারা।

হাত সরিয়ে নিল রানা। ধপ্ করে মেঝের উপর পড়ল দালমার আলী। এক হাতে ধরেছে গলা, অন্য হাতে কাঁধ। সশব্দে কেঁদে চলেছে। ঠোঁটের দুই কষায় জমে উঠেছে ফেনা।

'জানতাম,' চাপা স্বরে বলল রানা। 'তোমার মত লোক আসলে ভিতু হয়।'

'এখন ওর চ্যালারা দেখলে অবাক হতো,' বলল নিশাত।

আত্ম-প্রচারকারী খুনির উপর ঝুঁকে পড়ল ফারা, বাহুতে গেঁথে

দিল্ল নিভল। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পেরুনোর আগেই মণি দুটো উল্টে গেল দালমারের। অচেতন।

'কংগ্র্যাচুলেশন্স, রানা,' বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে দিল সিলভিও। 'দারুণ একটা মিশন শেষ হলো।'

'এখনও শেষ হয়নি। এ দেশের জল-সীমা থেকে সরে যেতে হবে, আর ওই কুকুরটাকে মার্ভেল থেকে বিদায় করতে হবে।' রেডিওতে বলল রানা, 'সোহেল, আফতাবকে জানিয়ে দে ধোঁয়া বন্ধ করুক। ...স্বর্ণা, পরিস্থিতি বুঝিয়ে দাও সোহেলকে।'

'যে জলদস্যুরা পিছন থেকে এসেছিল, তারা মেস হলের ভিতর ঘুরঘুর করছে। একজন পরীক্ষা করছে লাশ। জল-কামান যথেষ্ট ভাল ফলাফল দেখিয়েছে ডেকে। দ্রুত নেমে পড়ছে লোকজন।'

'আন্দাজ কতজন রয়ে গেছে জাহাজে?'

'বিয়াল্লিশ। হোল্ডের খানিক আগে সিঁড়ির নীচে যে লোক ছিল, তাকে ধরে। তাকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। পানিতে ফেলে দিলেই জ্ঞান ফিরবে।'

'মার্ভেলকে ডক থেকে সরানোর জন্য তৈরি থাকো, গগল।' বিরতি নিল সোহেল, তারপর রানার কাছে জানতে চাইল, 'যেসব জলদস্যু সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর ঘুরছে, তাদের কী করবি?'

'প্রতিটা দরজা বন্ধ করে দে। আর্মারারকে বল, এখানে পৌঁছে দিক ট্র্যাঙ্কুলাইযার গান। সঙ্গে নাইট ভিশন গগলস।'

অপারেশন্স সেণ্টারে নির্দেশ দিতে শুরু করেছে সোহেল।

'বন্ধ করে দিচ্ছি দরজা,' ওঅর্ক স্টেশন থেকে জানিয়ে দিল রায়হান রশীদ। কি-বোর্ডে শেষ টোকা দিতেই সুপারস্ট্রাকচারের চারপাশের সমস্ত দরজা-জানালা ও হ্যাচ হারিয়ে গেল স্টিলের পাতের আড়ালে। কোথাও যাওয়ার পথ থাকল না। অন্ধকার বাক্সে পরিণত হয়েছে সুপারস্ট্রাকচার।

বিড়াল এই গাঢ় আঁধারে হয়তো দেখবে, কিন্তু নাইট ভিশন গগলস না থাকলে যে-কোনও লোক এখানে অন্ধ।

ইণ্টারনাল ক্যামেরাগুলোর থার্মাল ইমেজিং চালু করল স্বর্ণা। ফিডগুলো স্ক্যান করতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পর প্রতিটি কমপার্টমেণ্ট ও হলওয়ে দেখা হয়ে গেল। সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর রয়ে গেছে তেরোজন লোক। ক্যামেরার লো-লাইট মোড দিতেই বোঝা গেল, প্রত্যেকে সশস্ত্র। স্পিকারে ভেসে আসছে তাদের আলাপ। ঘুটঘুটে আঁধারে নড়বার সাহস নেই কারও।

স্বর্ণা ওর ফাইনাল রিপোর্ট দিল সোহেলের কাছে।

রেডিওতে জানতে চাইল রানা, 'কী বুঝছিস, সোহেল?'

'ভিতরে তেরোজন। মেস থেকে বেরিয়ে গেছে জলদস্যুরা, এখন আছে হলওয়েতে। ...পরিস্থিতি খারাপ না। শিকারে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে পৌঁছে গেল আর্মারার।

সোহেলদের দুই ডেক উপরে হলওয়ের বাতি নিভিয়ে দিল রানা। পরে নিল থার্ড জেনারেশন নাইট ভিশন গগলস। হাতে আধুনিক চেহারার পিস্তল। ওয়ালনাট দিয়ে তৈরি বাঁট। ব্যারেলটা বেশ লম্বা। কমপ্রেস্‌ড্ গ্যাস দিয়ে চলে ট্র্যাঙ্কুলাইযার পিস্তল। ভিতরে রয়েছে ঘুমের ওষুধ মাখানো দশটি নিডল। স্বাভাবিক কোনও লোককে নয় সেকেণ্ডে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। কেউ ভাবতে পারে অল্প সময়ে অচেতন করা যায়। কিন্তু ওই সময়ে অটোমেটিক অস্ত্রের পুরো ম্যাগাজিন খালি করবে যে-কোনও লোক। তাই আঁধারেই শিকার করতে হবে।

গ্যাং ফেং ও নিশাত অস্ত্র নিয়ে তৈরি।

আবারও গোপন দরজা খুলল রানা। গগলসের কারণে চারপাশ ভুতুড়ে সবুজ মনে হচ্ছে। কিছু জায়গা উজ্জ্বল সাদা লাগল চোখে। নাইট ভিশন গগলস পরে ট্রেইনিং করেছে বলে

সহজে কোনটা কীসের প্রভা বুঝতে পারছে ওরা। পিছনে দরজা আটকে যেতেই নিঃশব্দে এগুলো তিন শিকারি। মেস হলের দরজার সামনে একটু থামল রানা। বাতাসে ভাসছে ধোঁয়ার গন্ধ।

'আপনার ডানদিকে তিনজন, মাসুদ ভাই,' ট্যাকটিকাল নেটে বলল স্বর্ণা। 'করিডোরে, দশ ফুট দূরে। পা টিপে টিপে উল্টো দিকে এগুতে চাইছে।'

হাতের ইশারা করে তথ্য বিনিময় করল রানা। ভূতের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। একই সঙ্গে তাক করল তিন শিকারের উপর। ফিসফিস আওয়াজ তুলল ট্র্যাঙ্কুলাইযার গান। সুইগুলো লক্ষ্যে পৌঁছুবার আগেই আবার মেস হলে ফিরল ওরা।

অতি সূক্ষ্ম পিন কোনও সমস্যা না করেই পোশাক ভেদ করে বিঁধল কাঁধের মাংসে। তীক্ষ্ণ অনুভূতি হওয়ায় পাঁই করে ঘুরল লোকগুলো। তাদের একজন ভয় পেয়ে ট্রিগার টিপে দিল। মাযল ফ্লাশ দেখিয়ে দিল করিডোর ফাঁকা। বারো ঘণ্টার ভিতর আবারও ভূতের কবলে পড়েছে শাহিন ও হাকিম।

'এই জাহাজ চালায় খুব খারাপ জিন,' কাতর স্বরে বলল শাহিন। পরক্ষণে তাকে ধরে বসল কড়া ড্রাগ। ঢলে পড়ে গেল। হাকিম তার চেয়ে শক্তিশালী, কয়েক সেকেণ্ড টলল সে, তারপর ধপাস্ করে পড়ল মেঝের উপর। তার উপর পড়েছে তৃতীয় লোকটা।

'আরও দশজন,' জানিয়ে দিল স্বর্ণা।

'আরেকটা সমস্যা তৈরি হয়েছে,' বলল সোহেল।

'বল্?' জানতে চাইল রানা।

'তীরে দালমারের লোক সংগঠিত হয়ে উঠছে। তাদের কেউ কেউ মার্ভেলে উঠে নেতাকে মুক্ত করতে চাইছে। ত্রিশজন মত লোক উঠে আসতে পারে।'

'কী করবি?'

'নবীকে বলছি ডেকের .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান চালু করুক, ভয় পাইয়ে দিক ওদেরকে। এদিকে ডক থেকে মার্ভেলকে সরিয়ে নিক গগল।'

'আমি হলেও একই নির্দেশ দিতাম,' সায় দিল রানা।

নির্দেশের অপেক্ষা করেনি ক্যাপ্টেন নবী, ডেকে তেলের ড্রাম থেকে নাক বের করল মেশিনগান। সোজা তাক করল তীরের উপর। অস্ত্র বিশেষজ্ঞের কমপিউটার আদেশ দিতেই একটা ক্যামেরা ওদিকের দৃশ্য দেখাতে লাগল। সেই সঙ্গে বোঝা গেল ঠিক কোথায় গিয়ে আঘাত হানবে বুলেট।

খ্যাট্-খ্যাট্ শব্দ তুলল মেশিনগান। ডেকে ছিটকে পড়ছে বুলেট কেসিং। ভিড় করা সোমালিয়ানদের মাথার উপর দিয়ে গেল প্রথম ধাতব শিলা-বৃষ্টি। মাটিতে ধুপধাপ শুয়ে পড়ল বেশিরভাগ লোক। একটা উঁচু বাঁধের ওপাশে লুকালো কয়েকজন। কেউ কেউ পাল্টা গুলি করল। ধূমায়িত মেশিনগানের চারপাশে লেগে ছিটকে গেল বুলেট। ৭.৬২ এমএম রাউণ্ড গণ্ডার ঠেকাতে পারে না, ডেক ভেদ করা অনেক দূরের কথা।

এদিকে ডায়াল করে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিনকে শক্তি দিল গগল। জলাভূমির ভিতর অংশ অত্যন্ত ক্লেদাক্ত, তবে তার সঙ্গে মিশেছে ভাল পানি। তা ছাড়া পানিতে রয়েছে যথেষ্ট লবণ, ফলে মার্ভেলের ইঞ্জিনের আশি ভাগ শক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হবে। রিভার্স থ্রাস্ট এনগেজ করল গগল। বিশাল হাইড্রো পাম্পগুলো কাজ শুরু করল। মার্ভেলের বো'র সামনে টগবগ করে ফুটছে পানি। কাঠের ডক থেকে পিছাতে শুরু করেছে বিশাল ফ্রেইটার।

জলদস্যুদের বেঁধে রাখা দড়িগুলো ধনুকের ছিলার মত টানটান হলো, পরক্ষণে হ্যাঁচকা টান খেয়ে ছিঁড়ে গেল। ডক থেকে কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট পিছিয়ে গেল গগল, তারপর চালু করল

ডাইনামিক পজিশনিং সিস্টেম। এবার জিপিএস কোঅর্ডিনেটস পাবে মার্ভেল।

কিন্তু বাঁধের ওপাশ থেকে হিস্‌হিস্‌ আওয়াজ উঠল।

পিছনে ধোঁয়ার দীর্ঘ লেজ রেখে একের পর এক আসছে রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড!

সাত

কলিশন অ্যালার্মের বাটন টিপে দিল খোরশেদ নবী। প্রতিটি ডেক ও কম্পার্টমেন্টে শুরু হলো ইলেকট্রনিক সতর্কসঙ্কেত। জাহাজের সবাই ভাল করে চেনে ওই আওয়াজ।

এত কম রেঞ্জে ২০ এমএম গ্যাটলিং গান চালু করে ফায়দা হবে না। তবে দ্বিতীয় দফা হামলার জন্য তৈরি থাকল নবী।

লক্ষ্য ভুল করে বেরিয়ে গেল কয়েকটা রকেট, পাক খেয়ে গিয়ে পড়ল ম্যানগ্রোভ বনভূমির ভিতর। তীরের দিকে মুখ করেছে মার্ভেলের বো, তারপরও জাহাজটা টার্গেট হিসাবে যথেষ্ট বড়। কয়েকটা আরপিজি এসে লাগল প্রাউ-এর উপর অংশে, ছিটকে পানিতে পড়ল রেলিং। একটা রকেট ছিঁড়ে ফেলল সামনের নোঙরের চেইন। অন্যগুলো বো'র উপর দিয়ে এল, বিস্ফোরিত হলো ব্রিজের জানালার উপর। কিন্তু পুরু স্টিলের পাত ঠেকিয়ে দিল সবই।

সাধারণ জাহাজ এ হামলায় বিপর্যস্ত হতো। তবে আক্রমণ ঠেকিয়ে দিল মার্ভেলের আর্মার। ইস্পাতের পাতে তৈরি হলো

নতুন কয়েকটা ট্যাপ। কোনও গর্ত হয়নি, তবে সুপারস্ট্রাকচারের এদিকে ওদিকে পুড়ে গেল রং। মার্ভেলে দুর্বল কিছু জায়গা রয়েছে, ওখানে রকেট গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলে বিপদ হবে। যেমন চিমনি, ওটা আড়াল করেছে সফেসটিকেটেড রেইডার ডিশ, সেটা যে কোনও সময় বিধ্বস্ত হতে পারে।

প্রথম আরপিজি হামলা শুরু হতেই রেডিও ইয়ারবাডে শুনতে পেয়েছে রানা। 'ওগুলো আসছে!'

দেরি করেনি ওরা, গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ার আগেই দু'হাতে কান ঢেকেছে। প্রতিটা বিস্ফোরণ ঝাঁকি দিয়ে গেল ওদেরকে। সামনের কম্পার্টমেন্টগুলোর ভিতর অনেক বেশি কনকাশন হয়। এক দস্যু দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, ওপাশে এসে লাগল রকেট। প্রচণ্ড আওয়াজ ও বিস্ফোরণের ফলে জেলি হয়ে গেল লোকটার দেহ। দুই সোমালিয়ান ধড়াস্ করে পড়ল মেঝের উপর। বাকি জীবন কিচ্ছু শুনতে পাবে না ওরা।

'গগল্, রওনা হয়ে যাও!' সোহেলের কণ্ঠ শুনল রানা।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কী যেন বলছে স্বর্ণা।

খোরশেদ নবী কলিশন বাটন টিপে দেয়ার পর জিপিএস ডিজএনগেজ করে মেইন স্ক্রিনকে রিকনফিগার করেছে গগল। ওটা এখন দুই দৃশ্য দেখাচ্ছে। জাহাজের ফ্যানটেইল দেখছে একটা ক্যামেরা, অন্যটা দেখিয়ে চলেছে তীর। হাতে সময় বা যথেষ্ট জায়গা নেই যে পাঁচ শ' ষাট ফুটি জাহাজ ঘুরিয়ে নেবে গগল।

থ্রটল দ্বিতীয়বারের মত রিভার্সে নিল সে। বুঝতে পারছে এ চ্যানেল অনেক বেশি সরু। তবে কপাল ভাল, প্রথম একমাইল গেছে সোজা হয়ে। ইঞ্জিনের পাওয়ার আরও বাড়াল গগল, সাবধানে মার্ভেলকে পিছিয়ে নিয়ে চলেছে। সমস্যা তৈরি করল ঝিরিঝিরি হাওয়া। জাহাজের খোল ও সুপারস্ট্রাকচার যেন পালের কাজ করছে।

ডক থেকে দুটো আরপিজি লঞ্চ করা হলো। এবার তৈরি ছিল নবী, ছয় ব্যারেলের গ্যাটলিং গান থেকে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল। বিশ্রী যান্ত্রিক আওয়াজ তুলল ভালক্যান, ওটার ব্যারেলগুলোর ঘুরবার গতি প্রায় এক হাজার আরপিএম।

২০ এমএম রাউণ্ডের তেরছা বৃষ্টির ভিতর ঢুকল রাশান রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড, সঙ্গে সঙ্গে গতি হারিয়ে পানিতে পড়বার সময় বিস্ফোরিত হলো। ওভারশট হওয়ায় বাঁধের মাটি খাবলে তুলল গ্যাটলিঙের বুলেট। নবী লক্ষ করেছে, জলদস্যুরা ট্রলার নিয়ে অনুসরণ করতে চাইছে। মার্ভেল একবার সাগরে বেরুতে পারলে কোনও ভয় নেই, কিন্তু জলাভূমির ভিতর অনেক বেশি সুবিধা পাবে জলদস্যুরা।

প্রথম ট্রলারের খোলের দিকে গ্যাটলিং গান তাক করল নবী, ট্রিগার টিপল এক সেকেণ্ডের জন্য। ট্রলারের পাশের পানি টগবগ করে উঠল, ভিজিয়ে দিল জলদস্যুদের। শেষবারের মত সতর্ক করা হলো তাদেরকে। ট্রলার থেকে লাফিয়ে ডকে নামল তারা, গ্রামের দিকে ঝেড়ে দৌড় শুরু করেছে। নবী আবার চালু করল অটোক্যানন।

ছিন্নভিন্ন হলো ট্রলার, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ভাঙা কাঠ, লোহা ও কাঁচ। বিস্ফোরিত হলো গ্যাস ট্যাঙ্ক। ওটার শকওয়েভ ডকের উপর শুইয়ে দিল জলদস্যুদের। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে তেলতেলে ধোঁয়া।

ডক থেকে রওনা হয়ে গেছে দ্বিতীয় ট্রলার। দু' সেকেণ্ড পর লোকগুলো টের পেল, তাদের দিকে তাক করা হয়েছে গ্যাটলিং গান। দেরি না করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা, সাঁতরে দূরে যেতে চাইছে। ক' মুহূর্ত সুযোগ দিল নবী, তারপর শুরু করল গুলি-বর্ষণ। যেন টর্নেডোর তোড়ে উড়ে গেল পাইলট হাউস। টুকরো টুকরো হয়ে গেল বো। তখনও চলছে ইঞ্জিন। হুড়মুড় করে

খোলের ভিতর ঢুকল পানি। দেখতে না দেখতে ডুবে গেল ট্রলার। মনে হলো যেন ডুব দিল সাবমেরিন।

মার্ভেলের সুপারস্ট্রাকচারে আবার শিকার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে রানা, ফেং ও নিশাত। স্বর্ণার কথা কানে আসছে না। বিস্ফোরণের আওয়াজে ঝনঝন করছে মাথার ভিতর। শিকারী চেতনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে ওরা। থমকে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছে চারপাশ। এক এক করে খুঁজে দেখছে কেবিন। বিধ্বস্ত এক কেবিনে ঢুকল ওরা। এখানে আঘাত হেনেছে রকেট। দুই বধির জলদস্যুর কাঁধে ডার্ট গেঁথে দিল রানা ও ফেং। তৃতীয় দস্যু পড়ে আছে ছেঁড়া কাঁথার মত, লাশ।

বিস্ফোরণের আওয়াজ চলছে, ওরা টের পেল রওনা হয়ে গেছে জাহাজ। ভীত হয়ে উঠছে জলদস্যুরা, আঁধারে পরস্পর আলাপ করছে। সিল করা এক দরজার উপর আছড়ে পড়ল কয়েক দস্যু। দুই হাতে খামচি দিয়ে খুলতে চাইছে ধাতব কবাট। টেরও পেল না একে একে তাদেরকে শিকার করা হচ্ছে।

জাহাজ ডাকাতি না করলে এদের প্রতি সহানুভূতি থাকত রানার। কিন্তু এখন আছে শুধু ঘৃণা। দ্বিধা করল না শেষ ডার্ট খরচ করতে। লোকগুলো চলে গেল ঘুমের রাজ্যে।

'ঠিক আছে, সোহেল, আমাদের কাজ শেষ,' দু সেকেণ্ড পর বলল রানা। 'সুপারস্ট্রাকচার আন সিল কর্। ক্রুদের আসতে বল। ফারা চিকিৎসা দিক, কিন্তু আধ ঘণ্টার ভিতর এদেরকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিতে চাই।'

নাইট ভিশন গগলস খুলল ওরা। সমস্ত দরজা-জানালা ও পোর্টের সামনে থেকে উঠে গেল ইস্পাতের প্লেট। জ্বলে উঠল ফ্লুরেসেন্ট বাতি। কিছুক্ষণ পর সুপারস্ট্রাকচারে এসে ঢুকল ক্রুরা, সরিয়ে নিতে লাগল জলদস্যুদের। তাদের সঙ্গে এসেছে সিলভিও, ঠাণ্ডা পানির বোতল এগিয়ে দিল রানার দিকে।

ওটার মুখ খুলে চুমুক দিল রানা।

'দোস্তো, আমার মনে হয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিলে খারাপ হয় না,' বলল সিলভিও।

'তোর সঙ্গে বাড়তি অ্যামনেশিয়া আছে?'

'আরও দু'জনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারব।'

'তা হলে নিতে পারিস।'

অপারেশন্স সেন্টারে এসে ঢুকেছে ওরা। পরিস্থিতি আন্দাজ করতে চাইল রানা। দালমার আলীর আখড়া থেকে সরে এসেছে মার্ভেল। এখন আর আরপিজির হামলা হবে না। কোনও ট্রলার পিছু নেয়নি ওদের। ওগুলো বোধহয় ডুবিয়ে দিয়েছে নবী। মার্ভেলকে পিছিয়ে নিয়েছে গগল, প্রায় পৌঁছে গেছে বাঁকের কাছে।

'কী অবস্থা, গগল?' জানতে চাইল রানা।

'খুব ভাল না। জোয়ার আসছে, এদিকে বাড়ছে হাওয়া। বাঁক নিতে গিয়ে ঝামেলা হতে পারে।'

'রকেট্স ইনকামিং!' হঠাৎ বলে উঠল নবী।

মার্ভেলের কেউ বুঝতে পারেনি, চ্যানেলের পাশে কাঁচা-মাটির রাস্তা তৈরি করেছে দস্যুরা। ধীরে ধীরে জলা থেকে বেরুনোর চেষ্টা করছে মার্ভেল, কিন্তু দালমারের দলবলও বসে নেই। কয়েকটা ট্রাক নিয়ে পিছু নিয়েছে তারা। চ্যানেলে বাঁক নেয়ার সময় গতি মন্থর হয়ে গেল মার্ভেলের, আর এ সুযোগে রাস্তা থেকে আরপিজি লঞ্চ করা হলো।

গ্যাটলিং গান তৈরি রেখেছে নবী, কিন্তু ব্যারেলগুলো এখন ঘুরছে না। নতুন করে চালু করল সে, বাটন টিপে শুরু করল গুলিবর্ষণ। ততক্ষণে প্রথম দুটো রকেট আঘাত হেনেছে খোলে। পরের দুটো বিধ্বস্ত হলো আকাশে।

বাঁকে পৌঁছে গেছে মার্ভেল, ইঞ্জিনের র‍্যাম্প বাড়িয়ে দিল

গগল, এনগেজ করল বো থ্রাস্টার। খেয়াল রেখেছে মার্ভেল পিছিয়ে চলেছে, উল্টো তীরে আটকে যেতে পারে স্টার্ন।

ভালক্যান থেকে আবারও যান্ত্রিক করাতের আওয়াজ উঠল। বাঁকের পাশে এক টেকনিকালের সামনের অ্যাক্সেল ভেঙে গেল। আকাশে উঠল গাড়িটা, একবার ডিগবাজি খেয়ে নীচে পড়ল, ছাত হয়ে গেল মেঝে। পাথুরে জমিতে ছেঁচড়ে থামল গাড়িটা। অস্ত্র ও ভাঙা কাঁচ নিয়ে ঝরে পড়ল লোকগুলো। পিকআপের পিছনের চাকা দুটো বনবন করে ঘুরছে।

পাশ থেকে গুলির তোড়ে পড়ল আরেকটা পিকআপ। টাংস্টেন বুলেটের প্রচণ্ড শক্তি কাত করে দিল দুই টনি ট্রাককে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো গ্যাস ট্যাঙ্ক। চারদিকে ছিটকে গেল আগুন ও ধোঁয়া। তৃতীয় ট্রাকের দিকে তাক করবার আগেই গাছের জটলার আড়ালে হারিয়ে গেল ওটা। আবারও বেরুবে সেজন্য অপেক্ষা করল নবী, তবে ওটা আর বেরুল না।

জুম ক্যামেরা লেন্সে চোখ রেখেছে নবী। হঠাৎ মনে হলো ওদিকে নড়াচড়া চলছে। তবুও গুলি করল না। গতি তুলতে শুরু করেছে মার্ভেল। বদলে গেছে গুলিবর্ষণের অ্যাংগেল। একটু পর খোলের পাশের ভালক্যান আর কাজে লাগবে না, তখন স্টার্নের অস্ত্রটা তৈরি রাখতে হবে। হাইড্রলিকগুলো অ্যাক্টিভেট করল নবী, খুলে গেল ফ্যানটেইলের দরজা। বেরিয়ে এল বহুনলা অস্ত্র। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত লাগবে ওটার তৈরি হতে, ক্যামেরা দৃশ্য বদলাতে শুরু করেছে। আর ঠিক তখনই ছিন্নভিন্ন হলো পাশের বনভূমি। একটা ট্রাক থেকে ২০ এমএম অ্যান্টিএয়ারক্রাফট কামানের গোলা এল একের পর এক। এগুলো আরপিজির মত সাধারণ জিনিস নয়, কঠিন ধাতু দিয়ে তৈরি রাউণ্ড। অনায়াসে স্টিলের আর্মার ভেদ করছে। দুটো গোলা একই জায়গা ভেদ করতেই শুরু হলো জাহাজের ভিতর ভয়ানক তাণ্ডব।

শুধু এটুকু সান্ত্বনা, মার্ভেলের ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কগুলো পুরোপুরি ভরা। পানিতে ডেবে রয়েছে জাহাজ, গোপন ডেকগুলোর একটি শুধু পানির উপর। একটা রাউণ্ড লণ্ডভণ্ড করল বোর্ডরুমটা, দুটো চেয়ার ফুটো করে বিঁধল দূরের দেয়ালে। আরেকটা ঢুকল প্যাণ্ট্রিতে, তিন বস্তা ময়দা খুন করে তারপর থামল। ঘরে ভাসতে লাগল পাউডারের মত সাদা গুঁড়ো। তৃতীয় গোলা বিস্ফোরিত হলো একটা কেবিনের ভিতর। এক অফ ডিউটি ইঞ্জিনিয়ার একটুর জন্য বেঁচে গেল। নিজ ডেস্কে বসে ছিল, লড়াই দেখছিল ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশনে, তার পায়ের তলা দিয়ে গেল গোলা। পা রক্ষা পেল, কিন্তু গোলা লাগল দেয়ালে। ফলে পিঠ ও কাঁধে বিঁধল অজস্র শ্র্যাপনেল।

এসব হলো এক পলকে। অসহায় হয়ে দেখল নবী। আরও ক' মুহূর্ত পর কমপিউটার জানিয়ে দেবে দ্বিতীয় গ্যাটলিং গান তৈরি।

'নবী, কী হলো?' জানতে চাইল রানা।

ফ্রেইটার পিছিয়ে নিয়ে চলেছে গগল।

'এক সেকেণ্ড, মাসুদ ভাই...' নবীর বোর্ডে জ্বলে উঠল সবুজ বাতি। দেরি না করে অস্ত্র ব্যবহার করল সে। যে গাছগুলোর আড়ালে টেকনিকাল, সেখানে শুরু হলো প্রচণ্ড তাণ্ডব। এক-দেড় ফুট চওড়া গাছ যেন করাত দিয়ে কেটে ফেলা হলো। গুঁড়ি কাটা পড়ায় প্রকাণ্ড গাছগুলো আছড়ে পড়তে লাগল। চারপাশে উড়ছে কাঠের কুচি। সরাসরি টেকনিকালের বেডের উপর পড়ল একটা বিশাল গাছ। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হলো দুইনলা অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান। গুলিবর্ষণ থামাল না নবী, কয়েক সেকেণ্ড পর চারপাশে একটা গাছও থাকল না। পড়ে রইল বিধ্বস্ত ট্রাক ও কুচি হয়ে যাওয়া রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড।

বাঁকের অর্ধেক পেরিয়ে এল মার্ভেল। হিসাবে কোনও ভুল

করেনি গগল। ভাব দেখে মনে হলো ভিড় ভরা পার্কিং লট থেকে বের করে আনছে ট্রাক। স্টার্ন থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে থাকল কর্দমাক্ত তীর। কেউ জ্যাক স্টাফের কাছে দাঁড়ালে গাছের পাতা ছিঁড়তে পারবে। তারপর পুরো বাঁক ঘুরে এল মার্ভেল। পুবের দিকে তাক হলো ফ্যানটেইল, ওদিকে রয়েছে খোলা সাগর।

নবী শ্রদ্ধা নিয়ে চেয়ে রইল গগলের দিকে। ভাল করেই জানে, ওদের সাধ্য নেই এত সরু চ্যানেল দিয়ে এভাবে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। অথচ ওদের যথেষ্ট ট্রেইনিং রয়েছে।

'দারুণ দেখালেন, মিস্টার গগল!' মুগ্ধ হয়ে বলল নবী। 'এমনটা আর দেখিনি! দুনিয়ার সেরা ক্যাপ্টেন আপনি!'

'আগেও দেখেছ বাপু, চিনতে পারোনি,' বলল কট্টর গগল। 'রানা আমার চেয়ে ঢের ভাল চালায় যে কোনও জাহাজ।'

'তোমার মত অত বেশি চালাইনি আমি মার্ভেল,' আপত্তি তুলল রানা। 'তীরে ঠিক গুঁতো লাগিয়ে দিতাম। তারপর তোমার বকা শুনতাম।'

রানার দিকে চেয়ে রইল স্বর্ণা, রায়হান ও নবী। ভাবছে, সত্যিকারের নেতা পেয়েছে ওরা। গুণের কদর দিতে মুহূর্ত মাত্র দেরি নেই।

মার্ভেল স্বয়ংক্রিয় ভাবে জিপিএস স্যাটালাইট থেকে তথ্য পাচ্ছে। রেকর্ড করে রাখা হয়েছে সবই। এবার কি-বোর্ড টিপে দিতেই নাভা-কমপিউটার রিভার্স কোর্স ধরল। বিপজ্জনক জলাভূমির ভিতর দিয়ে পিছিয়ে চলেছে জাহাজ। এরইমধ্যে জানা গেল বেনেডিক্টোর ইয়ট কোথায় অপেক্ষা করছে। এর পরের কাজ দালমার আলীকে ইয়টে তুলে দেয়া।

সিলভিও বেনেডিক্টোর দিকে চাইল রানা। 'ঠিক করে ফ্যাল কাদের সঙ্গে নিবি। অন্যদের ফেলে যাব এখানে।'

বন্ধুকে নিয়ে অপারেশন্স সেন্টারের পিছন দরজায় চলে গেল

রানা, কয়েক ডেক পেরিয়ে চলে এল বোট গ্যারাজে। সাগরের দিকের প্রকাণ্ড দরজা এখন বন্ধ। ভিতরের অংশে ট্যাফলন দিয়ে মোড়ানো র‍্যাম্প, ওখান দিয়ে নামিয়ে দেয়া হয় বোট। নামানো যায় যোডিয়াক, জেট স্কি ও রিজিড হাল্‌ড্‌ ইনফ্লেটেবল বোট। শেষেরটা তৈরি করা হয়েছে নেভি সিলদের জন্য। হালের ভিতর রয়েছে বাতাসের ব্লাডার, ফলে যে-কোনও পরিস্থিতিতে ভাসতে পারে। সঙ্গে থাকে দুটো শক্তিশালী আউটবোর্ড ইঞ্জিন। প্রয়োজনে গতি তুলতে পারে পঞ্চাশ নট। আপাতত গ্যারাজের ভিতর ফ্লুরেসেন্ট বাতি জ্বলছে। তবে রাতের অপারেশনে গেলে জ্বেলে নেয়া হয় লাল ব্যাটল ল্যাম্প।

ক্রুরা বড়সড় এক কালো বোট তৈরি রেখেছে। ওটার উপর বেঁধে রাখা হয়েছে অচেতন জলদস্যুদের। জ্ঞান ফিরলে একে অপরের বাঁধন খুলবে, বৈঠা মেরে পৌঁছে যাবে তীরে। মেডিকেলে ফারার দায়িত্বে এখনও রয়ে গেছে আহত কয়েকজন। মৃতদের ফেলে দেয়া হবে সাগরে।

'এটা,' আঙুল দিয়ে দেখাল সিলভিও। 'আর ওদিকের লোকটাও।' হাকিম ও শাহিন। 'এরা যখন জাহাজে উঠল, মনে হলো নেতৃত্ব দিচ্ছিল। এদের সঙ্গে নেব, হয়তো দেখা যাবে পেট থেকে প্রচুর তথ্য বেরুচ্ছে।'

'কমবয়সী লোকটা কাজে আসবে না। গাঁজা টেনে ভোম হয়ে থাকে।'

'তাও থাক্, ডিটক্সিফিকেশন করলে উপকার হবে ওর।'

আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তারপর বোট গ্যারাজে এল ফারা। তার সঙ্গে আর্দালি হিসাবে কয়েকজন ক্রু। সঙ্গে এনেছে কয়েকটা স্ট্রেচার। শুইয়ে রাখা হয়েছে আহত জলদস্যুদের।

'কী অবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

'ভালই। তবে আমাদের একজন আহত,' বলল ফারা।

'আগে তো বলোনি! কে?'

'স্টেবল হওয়ার আগে বলতে চাইনি। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার, রাশেদ।'

'কী ভাবে আহত হলো?'

'একটা ট্রিপল-এ রাউণ্ড ঢোকে কেবিনে। পিঠে শ্র্যাপনেল বিঁধেছে। অনেক রক্ত হারিয়েছে। দুটো পেশির ক্ষতি হয়েছে। তবে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'আর এদের কী হাল?'

'দু'জন কালা হয়ে গেছে,' বলল ফারা। 'চিরজীবনের জন্য কি না, জানি না। আরও কয়েকজন সামান্য আহত। শ্র্যাপনেল বের করে ড্রেসিং করেছি। কিছু অ্যান্টিবায়োটিকও দিয়ে দিয়েছি। ইনফেক্টেড হলে ভুগবে। বিশ্রী পরিবেশে থাকে এরা।'

গুলি খেয়েছে দুই সোমালিয়ান, তাদের দেয়া হয়েছে একটা করে নাইলন স্যাচেল। ভিতরে মেডিকেশন ও কীভাবে ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার পরামর্শ। লোকগুলো ওষুধ খাবে না, আন্দাজ করল রানা, বিক্রি করে দেবে কালো বাজারে।

বোটে তুলে দেয়া হলো লোকগুলোকে। খটাং আওয়াজে খুলে গেল বোট গ্যারাজের কপাট। অপারেশন্স সেন্টারে যোগাযোগ করল রানা। দেখতে না দেখতে কমে এল গতি। র‍্যাম্পের নীচের দিকে ছল-ছলাৎ করে লাগছে সাগরের ঢেউ। দরজার প্রান্ত থেকে সাগর দেখল রানা। জলাভূমি শেষ হয়ে এল। জোয়ার আসছে, পশ্চিমে ভেসে যাবে কালো বোট, ঢুকে পড়বে ম্যানগ্রোভ জলার ভিতর। আর এক ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙবে লোকগুলোর, সামান্য ডিহাইড্রেশন ছাড়া কোনও ক্ষতি হবে না।

ক্রুদের সঙ্গে হাত লাগাল রানা, র‍্যাম্প বেয়ে নেমে গেল কালো বোট। কোনও আওয়াজ ছাড়াই পানিতে নেমেছে। জাহাজ থেকে কয়েক ফুট দূরে গিয়ে ভাসছে। ইণ্টারকম বাটন টিপল

রানা। 'ঠিক আছে, গগল, চলো এবার। সিকি মাইল যাওয়ার পর গতি তুলবে। দ্রুত সিলভিওর ইয়টে পৌঁছতে চাই।'

'ঠিক আছে।'

আধঘণ্টা পর উইং ব্রিজে দাঁড়িয়ে আলাপ করছে রানা ও সিলভিও। আরপিজির তৈরি ক্ষতগুলো মেরামত করছে ক্রুরা। আবারও বসিয়ে নেয়া হয়েছে রেলিং। পোড়া দাগগুলো হারিয়ে গেছে মেরিন রঙের নীচে। কয়েকজন বোসান চেয়ারে বসে খোল মেরামত করছে। ওয়েল্ডিং করে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গোলার ক্ষত বুজিয়ে দেয়া হচ্ছে। আরও ক'জন ক্রু কেবিন গোছাতে ব্যস্ত। মার্ভেলের স্টোর-রুম থেকে নেয়া হয়েছে ম্যাট্রেস ও আসবাবপত্র। লিস্টি করছে সোহেল, লিখে রাখছে মার্ভেলকে আগের মত *অপরূপা* করবার জন্য কী কী কিনতে হবে।

শান্ত সাগরে ত্রিশ নট গতি তুলে ছুটছে মার্ভেল। নীলাকাশ ঝিকমিক করছে, বইছে মাঝারি হাওয়া। হঠাৎ ছোট্ট স্পিকারে স্বর্ণার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল।

'সামনে চার মাইল দূরে রেইডার কন্ট্যাক্ট, মাসুদ ভাই।'

সাগরের দিকে বিনকিউলার তুলল রানা। খাঁ-খাঁ করছে সাগর, আশপাশে কোথাও কেউ নেই। কিন্তু বহু দূরে বিন্দুর মত কী যেন। আরও কিছুক্ষণ পর চেনা গেল সিলভিওর ইয়ট, সাদা ও নীল রঙা, যেন ময়ূরপঙ্খী।

'আমেরিকান ডেস্ট্রয়ার কখন আসছে?' বন্ধুর দিকে চাইল রানা।

'আগামীকাল ভোরে। ততক্ষণে আমরা অনেক দূরে। এর আগে ঘুম ভাঙবে না দালমার আলীর। তা ছাড়া, সবার নেশা ছুটতে আরও কয়েক ঘণ্টা। আমাদেরকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোর। ধীরে সুস্থে যাব সুয়েজ ক্যানেলের দিকে।'

আরও কিছুক্ষণ পর ইয়টের পাশে ভিড়ল মার্ভেল। বোট

গ্যারাজের দরজা দিয়ে যে কেউ নামতে পারবে ইয়টে। দু'জন নেমে গিয়ে দড়ি বাঁধল। দালমার আলীকে পাইলট হাউসের নীচের এক কেবিনে নিয়ে গেল রানা ও সিলভিও। লোকটার হাত-পা বাঁধা। শুইয়ে দেয়ার সময় বাঙ্কের সঙ্গে খটাং করে লাগল মাথা। তাকে এক পলক দেখল রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'জগতে এমন জেল নেই যেখানে যথেষ্ট শাস্তি হবে তোমার।'

ডেকে বেরিয়ে ওরা দেখল, নবী আর রায়হান মিলে হাকিম ও শাহিনকে বসিয়ে দিয়েছে দুটো ফিশিং চেয়ারে। ডানহাতে ছিপ, বাঁ হাতে খালি বিয়ারের বোতল। ঘুমে বিভোর।

সিলভিওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোট গ্যারাজে উঠে পড়তে যাচ্ছিল রানা, টেনে ধরল সে হাতটা।

'দোস্ত, তোর সাহায্য না পেলে...'

'রাখ্ তো ওসব!' ধমক দিল রানা। 'তা হলে কিন্তু আর কোনদিন কোনও সাহায্য নেব না তোর।'

হাসল সিলভিও, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানাকে, তারপর ছেড়ে দিল।

ক্রুরা পিছু নিল রানার। দড়িগুলো খুলে নেয়া হলো।

মিশরের দিকে রওনা হয়ে গেল সিলভিওর ইয়ট।

ইণ্টারকমে স্বর্ণার কণ্ঠ শুনল রানা: 'মাসুদ ভাই, বিসিআই থেকে মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান।'

'লাইন দাও,' নিচু স্বরে বলল রানা। একটু চমকে গেছে। বুকের ভিতর ছলাৎ করে উঠছে উষ্ণ রক্ত।

'রানা,' ভেসে এল জলদ গম্ভীর কণ্ঠ। 'কাজ শেষ?'

'জী, স্যার। এইমাত্র শেষ হলো।'

'বেশ। রিপোর্ট পাঠাও।' সামান্য বিরতি। 'এবার কত দ্রুত ত্রিপোলিতে পৌঁছতে পারবে?'

'সুয়েজ খাল হয়ে ত্রিপোলিতে, স্যার? ট্রাফিক কম থাকলে চার

দিন।'

'আমাদের প্রধানমন্ত্রী শান্তি মহাসম্মেলনের জন্য প্রাথমিক আলাপ সারতে রওনা হন, কিন্তু তাঁর বিমানের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যোগাযোগ। ধারণা করছি, ভূ-পাতিত হয়েছে বিমানটা।'

'স্যাবোটাজ?'

'দুর্ঘটনাও হতে পারে।'

'তিন দিনের ভিতর পৌঁছতে পারব, স্যর।'

'ঠিক আছে। পরবর্তী নির্দেশ সময় হলেই পাবে। রওনা হয়ে যাও।' খুট্ করে কেটে গেল লাইন।

আট

অনেক নীচে তপ্ত সাহারা।

দশ হাজার ফুট উপরে গোঁ-গোঁ আওয়াজে ছুটছে বাংলাদেশ বিমানের এয়ারবাস। কয়েক ঘণ্টা আগে নিউ ইয়র্ক ছেড়েছে। এখন চলেছে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলিতে। পৌঁছুতে বড়জোর আর এক ঘণ্টা।

এইডরা ফিসফিস করে আলাপ করছেন।

সামনে, বাঁ পাশের সিটে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী। কিছুক্ষণ আগে পড়ে শেষ করেছেন মহাসম্মেলনের জন্য তৈরি কাগজপত্র। তারপর চোখ বুজে মনে মনে সুরা ইউনুস পাঠ করলেন পৃথিবীর সব মানুষের মঙ্গল কামনা করে। মনে পড়ছে তাঁর, সেই ছোট বেলায় বাবা বলতেন, 'আম্মু, আল্লাহ্ ও রাসুলের উপর বিশ্বাস

রাখবি। সব বিপদ থেকে রক্ষা পাবি, ইনশাল্লাহ্।'

বাবার সেই কণ্ঠ এখনও মনে পড়ে তাঁর। সত্যি, এই জীবনে মস্ত সব বিপদে পড়েছেন। কখনও হাল ছেড়ে দেননি। ভরসা রেখেছেন আল্লাহর উপর। তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছে অনেকে। বারবার নিজ বাড়িতে গৃহ-বন্দি হয়েছেন। গুলি করা হয়েছে তাঁকে লক্ষ্য করে। বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে সন্ত্রাসীরা। মনে মনে বারবার বলেছেন, 'রাব্বুল আলামিন যা চান তা-ই ভাল। আমি শুধু তাঁর উপর ভরসা রাখলাম।'

এখনও স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করলেন, ওই মহাসম্মেলন যেন সফল হয়। বহুকিছু রয়েছে দেয়ার, বহুকিছু রয়েছে পাওয়ারও।

বাস্তবে ফিরলেন তিনি, গ্রীবা ডানদিকে ফিরিয়ে জানতে চাইলেন, 'আশরাফ ভাই, কতক্ষণ লাগবে ত্রিপোলিতে পৌঁছতে?'

'পাইলট বলেছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর নামছি। ওয়েট্রেস আপনাকে কিছু এনে দেবে?'

'এক গ্লাস পানি।'

চেয়ারের বাটন টিপে দিলেন সালাম বিন আশরাফ, আসতে বলছেন এয়ার ওয়েট্রেসকে।

এক তোড়া কাগজ তুলে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। এগুলো বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ডোশিয়ে। সঙ্গে বায়োগ্রাফি ও ফটোগ্রাফ। এঁরা আসছেন মহাসম্মেলনে যোগ দিতে। বহুবার এসব কাগজ পড়েছেন তিনি। তবুও নিশ্চিত হতে চাইছেন কিছু যেন বাদ না পড়ে। কার কী অভ্যাস, কারা মন্ত্রী, ক'টা স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কিছুই বাদ পড়েনি। এখন কেউ জানতে চাইলে গড়গড় করে বলে দিতে পারবেন তিনি।

সুন্দরী ওয়েট্রেস এসে ট্রেসহ পানির গ্লাস বাড়িয়ে দিল।

'ধন্যবাদ।' ওটা নিলেন প্রধানমন্ত্রী, এক চুমুক পানি খেয়ে

পাশে রেখে দিলেন গ্লাস। প্রথম কাগজটা পড়ছেন। লিবিয়ার নতুন ফরেন মিনিস্টার মোহাম্মদ ফতে আলী যে কারও মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেন। ছোটখাটো ডোশিয়ে। লেখা হয়েছে মোহাম্মদ ফতে আলী নিচু পর্যায়ের সিভিল সার্ভেন্ট ছিলেন। তারপর মনোযোগ কাড়েন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির। মাত্র একটিবার মিটিং শেষে গাদ্দাফি তাঁকে ফরেন মিনিস্টার করেন। এবং এরপর গোটা বিশ্বে চরকির মত ঘুরে বেড়িয়েছেন ভদ্রলোক। প্রথমে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শীতল ব্যবহার পান। পরে দেখা গেল তাঁর চমৎকার ব্যক্তিত্ব সবাইকে আকর্ষণ করছে। মধ্য-প্রাচ্য জয় করে এশিয়ার অন্য দেশগুলো, ইউরোপ, আমেরিকা— সবখানে গেছেন। শুরু থেকেই শান্তি মহাসম্মেলনের জন্য তাঁর চেষ্টায় আন্ত রিকতার কোনও অভাব দেখা যায়নি।

পাশের সারির সিটে বসেছেন সালাম বিন আশরাফ।

মোহাম্মদ ফতে আলীর ছবি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ফরেন মিনিস্টার রয়ে গেছেন নিউ ইয়র্কে, নইলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেন। 'ছবি দেখে কী মনে হয়, আশরাফ ভাই?'

ছবিটা নিয়ে জানালার পাশে চলে গেলেন ভদ্রলোক, মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। অফিশিয়াল ফটোগ্রাফ, মোহাম্মদ ফতে আলীর পরনে পশ্চিমা সুট। চমৎকার মানিয়েছে। মুখে বেরিয়ে আসছে সুস্বাস্থ্য। চুলগুলো কাঁচা-পাকা। গোঁফে পাক ধরেছে। মানানসই ঠোঁটে মৃদু হাসি।

ছবিটা ফিরিয়ে দিলেন আশরাফ। 'ভুল লোকের কাছে জানতে চাইছেন, আপা। তবে অভিনেতা ওমর শরিফের সঙ্গে মিল আছে চেহারার। মনে হয় ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোক। দেখতে রীতিমত ভাল।'

'কিন্তু চোখ দুটো?'

'চোখ?' দ্বিধার মধ্যে পড়লেন আশরাফ। 'খেয়াল করিনি।

চোখে কী, আপা?'

'ঠিক জানি না। কী যেন আছে। বা থাকা উচিত, কিন্তু নেই।'

'ছবিটা হয়তো ভাল তুলতে পারেনি ফটোগ্রাফার।'

'হতে পারে।'

'আপা...' কী যেন বলতে গিয়েও থমকে গেলেন আশরাফ, চারপাশে জোরালো আওয়াজ শুরু হয়েছে। মনে হলো ধাতব কী যেন ছিঁড়ে পড়ছে। পরস্পরের দিকে চাইলেন তাঁরা। শত ঘণ্টার বেশি থেকেছেন বিমানে, দু'জনই বুঝলেন বড় কোনও সমস্যা হয়েছে। অজান্তে আটকে ফেলেছেন শ্বাস।

তারপর ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাড়া বাড়তি কোনও শব্দ থাকল না।

ক' মুহূর্ত পর উঠে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী, পাইলটের কাছে গিয়ে জানতে চাইবেন কী ঘটেছে। পাঁচ পা যেতে না যেতেই হঠাৎ ভীষণ দুলে উঠল বিমান, আকাশ থেকে খসে পড়তে লাগল। সিলিঙের দিকে উঠে গেলেন সালাম বিন আশরাফ, তারপর ধপ করে পড়লেন সিটে। দু'হাতে মোল্ডেড প্লাস্টিক ওভারহেড ধরে সামলে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। পিছন থেকে চিৎকার শুনতে পেলেন। সবাই ওজন-শূন্য হয়ে যাওয়ায় চমকে গেছেন। কেউ কেউ পড়ছেন কলেমা।

'জানি না কী ঘটল,' ইন্টারকমে বলে উঠলেন এয়ার ফোর্সের ক্যাপ্টেন, 'তবে দেরি না করে সবাই সিট বেল্ট বেঁধে নিন।' ইন্টারকম খোলা রইল, আর এর ফলে শোনা গেল কো-পাইলট ও পাইলটের আলাপ। ঝরা পাতার মত খসে পড়ছে বিমান, নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছেন তাঁরা। 'কী বলছ! রেডিও নষ্ট? এই তো দু'মিনিট আগে ত্রিপোলির সঙ্গে কথা বললাম।'

'এর কোনও ব্যাখ্যা নেই,' বললেন কো-পাইলট। 'তবে রেডিও কাজ করছে না।'

'এখন এ নিয়ে ভাবলে চলবে না, আমাকে সাহায্য করো... ধুশ্‌শালা! পোর্ট ইঞ্জিন থেমে গেছে! আবার চালু করার চেষ্টা করো।' এরপর বন্ধ হয়ে গেল ইন্টারকম।

'আমরা ক্র্যাশ করছি,' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন আশরাফ। সিট ধরে ধরে চলে এলেন প্রধানমন্ত্রীর পাশে, চোখে ভীষণ দুশ্চিন্তা।

'আমরা পড়ে যাচ্ছি কি না জানি না,' শান্ত স্বরে বললেন প্রধানমন্ত্রী। টের পেলেন ঘামতে শুরু করেছে দু'হাতের তালু। 'তবে শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।'

'কিন্তু হলোটা কী?' কাঁপা স্বরে জানতে চাইলেন এক এইড।

'জানি না। মনে হয় মেকানিকাল কিছু নষ্ট হয়েছে।' অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেল প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে। নীচের দিকে ধেয়ে চলেছে বিমান, অথচ এমন যাওয়ার কথা নয়। ঠিক ভাবে চলছে দুটো ইঞ্জিন। মাত্র একটি ইঞ্জিনই ওড়াতে পারে এসব বিমানকে। গোলমাল হয়েছে অন্য কোথাও, নইলে এভাবে নামত না বিমান। ধাতব আওয়াজটা কীসের ছিল? প্রধানমন্ত্রী ভাবছেন, আঘাত হেনেছে কোনও মিসাইল, নষ্ট করে দিয়েছে কলকজা? এখনও তো চলছে বিমান।

এয়ারবাসের নেমে যাওয়ার গতি খানিক কমল, সোজা হলো মেঝে। বোধহয় নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছেন ক্যাপ্টেন। তবে এখনও নেমে চলেছে প্লেন। এভাবে নীচে পড়লে কেউ বাঁচবে না।

সাবধানে যে যার সিটে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী ও এইড, বেঁধে নিলেন সিট বেল্ট। প্রধানমন্ত্রী নিচু কণ্ঠে সাহস দিলেন সবাইকে। একটু কাঁপছে তাঁর কণ্ঠ।

নীরবে কাঁদতে শুরু করেছেন দুই মহিলা এইড।

'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহাদয়,' শোনা গেল কো-পাইলটের কণ্ঠ: 'আমরা জানি না কী ঘটেছে। এইমাত্র থেমে গেছে একটা ইঞ্জিন। অন্যটাও যথেষ্ট শক্তি পাচ্ছে না। মরুভূমিতে নামতে হবে

আমাদের। তবে কেউ দুশ্চিন্তা করবেন না। আমাদের ক্যাপ্টেন আগেও ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং করেছেন, কোনও ভয় নেই। আমি বললেই ক্র্যাশ পজিশনে বসে পড়বেন। দুই হাঁটুর মাঝে রাখবেন মাথা। দুই হাত দিয়ে বেঁধে রাখবেন দুই হাঁটুকে। বিমান থেমে যাওয়ার পর স্টুয়ার্ডেস কেবিনের দরজা খুলে দেবে। সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল প্রথমে বিমান থেকে নামিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রীকে।'

বিমানে বিসিআইয়ের মাত্র একজন এজেন্ট। অন্যরা প্রধানমন্ত্রীর স্টাফ ও এইড। এজেন্টের নাম সাদাত হোসেন, নিজ সিট বেল্ট খুলে ফেলল যুবক। বিমানের ঝাঁকি কমে আসতেই চলে এল প্রধানমন্ত্রীর কাছে, পাশের সিটে বসে বেল্ট বেঁধে নিল। ঠিক তখনই আবার প্রবল ঝাঁকি খেল বিমান। পাথরের মত নীচে পড়ছে। একবার বালিতে নামলে প্রধানমন্ত্রীকে সিট থেকে তুলবে সাদাত হোসেন, নিয়ে যাবে দরজার কাছে। নামিয়ে দেবে বিমান থেকে। তাতে সময় লাগবে বড়জোর দশ সেকেণ্ড।

চুপচাপ বসে রইলেন প্রধানমন্ত্রী, নীরবে প্রার্থনা করছেন। নিজের বা কোনও নির্দিষ্ট মানুষের জন্য নয়। ভাবছেন সামনের কনফারেন্স যে সুযোগ এনে দিয়েছে, তা যেন গ্রহণ করে মানব-সভ্যতা। বোধহয় আর কখনও বিশ্বশান্তির জন্য এতবড় সুযোগ মিলবে না।

জানালা দিয়ে বাইরে চাইলেন তিনি। নীচে রুক্ষ মরুভূমি। এখানে ওখানে ছোরার মত টিলা-টক্করের চূড়া। তিনি পাইলট নন, তবে পরিষ্কার বুঝলেন কো-পাইলট যাই বলুক কোনও আশা নেই। আসল কথা: তাঁদের বাঁচবার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়।

'ঠিক আছে, আপনারা তৈরি হোন,' ঘোষণা দিল কো-পাইলট। 'আমরা নামতে শুরু করেছি। সবাই চলে যান ক্র্যাশ পজিশনে।'

যাত্রীরা শুনলেন পাইলট বলছেন: 'তুমি কি ওটা দেখেছ...'

তারপর বন্ধ হয়ে গেল ইন্টারকমের স্পিকার। কেবিনে নেমে এসেছে নিচ্ছিদ্র নীরবতা। কেউ জানেন না কী দেখেছেন পাইলট। আর তা না জানাই বোধহয় সবার জন্য ভাল।

নয়

ড্রিল ট্রাকের প্যাসেঞ্জার সিটে বসেছে স্মৃতি, পাশে আসাদ চৌধুরি, গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলেছে। পুরনো নদী-খাতের মেঝে গোলাকৃতি পাথরে ভরা। কিছু সহজে নাড়ানো যায়, অন্যগুলো সরাতে চাইলে গায়ের জোর লাগে। এই এবড়োখেবড়ো পথে আসা-যাওয়া করতে গিয়ে গত কয়েক সপ্তাহে পিঠের ত্বক ছিলে গেছে স্মৃতির।

গতরাতে ক্যাম্পে ফিরে তিউনিশিয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভের সঙ্গে আলাপ করেছে। লোকটার ধারণা, ওরা রোমান মিল ও ওয়াটার হুইল খুঁজছে। স্মৃতি জানিয়েছে, প্রতিরাতে ক্যাম্পে ফিরতে না হলে ভাল হয়। কয়েক দিনের জন্য মরুভূমিতে ক্যাম্প করতে চায়। সবুর রহমানের স্যাটালাইট ফোন দেখিয়ে বলেছে, দরকার পড়লে যে-কোনও সময়ে সে আর্কিওলজিকাল টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

স্মৃতি ভাবছে, মূল আর্কিওলজিকাল টিম রোমান সাইটে ভাল কাজ দেখিয়েছে, কিন্তু ওরা নিজেরা কিছুই পায়নি। হয়তো কিছু পাবে, যদি ক' দিনের জন্য মরুভূমিতে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বড় এলাকা নিয়ে খুঁজতে পারবে। বলা যায় না, হয়তো খুঁজে

পাবে পুরনো বারবারি দস্যু ইউনুস আল-কবিরের আখড়া।

বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিউনিশিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভ মানা করে দিচ্ছে দেখে লোকটাকে একটু দূরে নিয়ে গেছে সবুর রহমান, দু'মিনিট কী যেন বলেছে। এরপর যখন ডাইনিং টেন্টে ফিরল দু'জন, তখন লোকটার চোখদুটো চকচক করছিল। খুশি মনে বলল, স্মৃতি চাইলে মরুভূমিতে এক বছর থাকতে পারে। শর্ত মাত্র একটা, প্রতি তিনদিন পর একবার করে ক্যাম্পে ফিরতে হবে।

লোকটা বিদায় নেয়ার পর সবুরকে ধরল স্মৃতি।

সে নির্বিকার মুখে বলল, 'সব কিছু নির্ভর করে বকশিসের উপর।'

'কিন্তু লোকটা যদি ঘুষ না নিতে চাইত?' জানতে চেয়েছে স্মৃতি। 'যদি কর্তৃপক্ষকে জানাত?'

'কী যে বলেন, এটা মধ্যপ্রাচ্য। এখানে টাকার ক্ষমতা সাঙ্ঘাতিক। ঘুষ এখানে জায়েজ।'

'কিন্তু...' আর কিছু বলতে পারেনি স্মৃতি। নিজে কখনও ঘুষ দেয়নি। জীবন কেটেছে নিয়ম মেনে। কখনও কোনও পরীক্ষায় নকল করেনি। নিয়মিত আয়কর দিয়েছে। গাড়ির স্পিডো মিটার মেনে চলেছে। কখনও আইনের বাইরে যায়নি। ফলে পরিষ্কার থেকেছে মন। কখনও মেনে নেবে না দুনিয়া জুড়ে চলছে ভয়ঙ্কর সব দুর্নীতি। কিন্তু গত রাতে নিজের কাছে হেরে গেছে। একটা বাড়তি সুযোগ পেয়ে তা হারাতে চায়নি।

আজও রওনা হয়েছে নদী-খাতের দিকে। আগামী তিন দিন পর ক্যাম্পে ফিরলেই চলবে। ঠিক হয়েছে, জলপ্রপাতের ওপাশে কী আছে তা জানতে হবে। হয়তো ওদিকেই ছিল ইউনুস আল-কবিরের আস্তানা, ঢেউ খেলানো টিলা ও বালির ঢিবির ভিতর।

ট্রাকে পর্যাপ্ত পানি ও খাবার নিয়েছে ওরা। তাতে চলবে চার

দিন। সঙ্গে এনেছে মাত্র একটা তাঁবু। ঠিক হয়েছে পুরুষ সঙ্গীরা ট্রাকে ঘুমাবে, আর তাঁবু থাকবে স্মৃতির জন্য। ট্রাকে তোলা হয়েছে পঞ্চাশ গ্যালনের ডিজেল ড্রাম। ওটার কারণে তিন শ' মাইল চলবে ট্রাক। অবশ্য ড্রিল বেশি ব্যবহার না করলে, তবেই।

এই ছোট্ট দলের কেউ আশাবাদী নয়। ওই জলপ্রপাত বেশ উঁচু, টপকে যেতে পারবে না কোনও জাহাজ। তবু একবার অন্তত ওদিকটা ভাল করে দেখতে হবে। আর করবেই বা কী? ঘনিয়ে এসেছে শান্তি মহাসম্মেলন। সবুর ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল, তখন স্মৃতি জেনেছে, আজই নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা হয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সবার সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ সেরে নেবেন তিনি। কোণঠাসা বোধ করছে স্মৃতি। বারবার মনে হচ্ছে, নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারেনি।

'আরে ভাই, বারবার গর্তে ফেলতে হবে চাকা?' অধৈর্য হয়ে বলে উঠল সবুর। পিছনের বেঞ্চ সিটে বসেছে সে।

'আপনি চালালেও এ-ই হয়,' বলল গম্ভীর আসাদ।

আজ ঝকমকে একটা দিন। দুপুরের দিকে তাপমাত্রা হলো এক শ' আশি ডিগ্রি। কুলার থেকে ঠাণ্ডা পানির বোতল বের করল স্মৃতি, দুই সঙ্গীর হাতে ধরিয়ে দিল। এবার দিল ক্যাম্প থেকে আনা স্যাণ্ডউইচ। ওডোমিটার বলছে সত্তর মাইল পেরিয়েছে। তার মানে আর ত্রিশ মাইল গেলে জলপ্রপাত।

'ওদিকটা দেখে কী মনে হয়?' জানতে চাইল আসাদ চৌধুরি। চিবিয়ে চলেছে স্যাণ্ডউইচ। বাকি অংশ তাক করল একদিকে। বেশির ভাগ সময় নদী চলেছে খাড়া টিলার মাঝ দিয়ে। কিন্তু সামনে বাঁক নিয়েছে। একদিকে ঢালু পাড় গিয়ে উঠেছে মরুভূমির মেঝেতে।

'ষাট পার্সেন্ট ঢাল, বা আরও খাড়া,' বলল সবুর।

'যদি উপরে বড় পাথর পাই, তার সঙ্গে ট্রাক বেঁধে মরুভূমিতে

উঠতে পারব।'

'ভাবতে ভালই তো লাগছে,' বলল স্মৃতি।

খাবার শেষে ঝিমানি ধরল তিনজনের দলটিকে। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি। ট্রাক নিয়ে নদীর এক ধারে থামল আসাদ। সাবধানে দেখল সামনের পাড়। দূর থেকে অনেক কম ঢালু মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে রীতিমত পাহাড়। বেয়ে উঠতে হলে কমপক্ষে ত্রিশ ফুট পেরুতে হবে। ট্রাক নিয়ে রওনা হয়ে গেল আসাদ, খানিক উঠবার পর পিছলাতে লাগল পিছনের চাকা। ছিটকে পিছনে পড়ছে পাথর ও বালি। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল স্মৃতি ও সবুর। ট্রাকের বাম্পারের সঙ্গে লাগানো উইঞ্চের সামনে থামল ওরা। উইঞ্চ থেকে স্টিলের কেবল নিল স্মৃতি। দলের ভিতর সবচেয়ে শক্তপোক্ত সবুর, সে কেব্‌ল্‌ নিয়ে উঠতে লাগল। বুট জুতোর পিছন থেকে শুরু হলো ছোটখাটো অ্যাভালাঞ্চ। প্রতি পদক্ষেপে ঝুরঝুর করে পড়ছে নুড়ি পাথর ও বালি। দশ ফুট উঠতে না উঠতেই চার হাত-পা ব্যবহার করতে হলো। দমকা বাতাসে মাথা থেকে উড়িয়ে নিল শনের হ্যাট, নীচে গিয়ে পড়ল ওটা। বিড়বিড় করে কপালকে অভিশাপ দিল সবুর। বেল্টের পিছন অংশে আটকে নিল কেবলের হুক। পাথর খামচে ধরে উঠতে হচ্ছে। দুই হাতের নখ জ্বলছে।

দশ মিনিট লাগল সবুরের মরুভূমির প্রান্তে উঠতে। ততক্ষণে দরদর করে ঘামছে। ভিজে গেছে শার্টের পিঠ। পাড় থেকে সরে গেল সে, আর দেখা যাচ্ছে না। পিছনে টেনে নিয়ে চলেছে কেবল।

তিন মিনিট পর আবারও দেখা দিল, সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'বড় একটা পাথরের সঙ্গে আটকে দিয়েছি কেবল। আসাদ, চেষ্টা করে দেখুন। এবার বোধহয় উঠে আসবে ট্রাক।'

ক্যাবের ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় উইঞ্চ। সবুরের হ্যাট

কুড়িয়ে নিল স্মৃতি, উঠে বসল প্যাসেঞ্জার সিটে। গিয়ার ফেলল আসাদ, চাপ দিল অ্যাক্সেলারেটারে। সেইসঙ্গে চালু করল উইঞ্চের টগল। খুব শক্তিশালী নয় উইঞ্চের মোটর, তবে তিনটি গিয়ার দেয়ার পর উঠতে লাগল। রাজকীয় ভঙ্গি নিয়ে ধীরে উঠছে ট্রাক। পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসল আসাদ ও স্মৃতি। উপর থেকে বিজয়ের চিৎকার দিল সবুর। ওরা জিতছে।

মুখের উপর কীসের ছায়া পড়তে উপরের দিকে চাইল স্মৃতি। ধারণা করেছে, ওটা শকুন বা বাজপাখি।

কিন্তু বিদঘুটে শোঁ-শোঁ আওয়াজ কীসের?

চমকে গেল স্মৃতি। মাত্র এক হাজার ফুট উপর দিয়ে পেরুল প্রকাণ্ড বিমান। আওয়াজ নেই, ইঞ্জিনগুলোকে থামিয়ে দেয়া হয়েছে। চিলের মত গ্লাইড করছে।

কিন্তু বিমান এখানে কেন?

স্মৃতি জানে, আশপাশে তিউনিশিয়ার কোনও এয়ারপোর্ট বা রানওয়ে নেই। থাকলে থাকতে পারে লিবিয়া সীমান্তের ওদিকে।

ওর মন বলে দিল, মস্ত বিপদে পড়েছে ওই বিমান।

নিঃশব্দে ভেসে চলেছে বিমান। দুটো বিষয় লক্ষ্য করল স্মৃতি। বিমানের লেজে- গোল একটা গর্ত। ওখান থেকে ঝরে পড়ছে হাইড্রলিক ফ্লুইড। তার চেয়ে বড় কথা, বিমানের ফিউজেলাজে বড় করে লেখা: *বাংলাদেশ বিমান*।

হৈ-চৈ থামিয়ে দিয়েছে সবুর রহমান। কপালের উপর হাত রেখে দেখছে আকাশ। দূর থেকে দূরে সরছে বিমান। দ্রুত নেমে আসছে মরুভূমি ও টিলার দিকে!

হাঁ হয়ে গেল স্মৃতি। টের পেয়েছে ওই বিমানে কে থাকতে পারেন!

পাথুরে মরুভূমিতে উঠবার জন্য পুরো মনোযোগ দিয়েছে আসাদ চৌধুরি। কিছুই দেখতে পায়নি। স্মৃতি কাতরে ওঠায়

ভাবল টো কেবলে সমস্যা। 'কী হয়েছে বলুন তো?'

'যত দ্রুত সম্ভব উঠুন।'

'সে চেষ্টাই তো করছি। কিন্তু অত তাড়াহুড়ো কীসের?'

'এইমাত্র যে বিমান পেরিয়ে গেল, ওটা বাংলাদেশ বিমানের। ওটার ভিতর রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী!'

কিন্তু কিছুই করবার নেই আসাদের। উইঞ্চটা খুব ধীরে কেবল টেনে উপরে তুলছে ট্রাককে।

সবুরের দিকে চেয়ে জানতে চাইল স্মৃতি, 'কিছু দেখছেন?'

'না,' রিগের মোটরের উপর দিয়ে বলল সবুর। 'কয়েকটা টিলার ওপাশে চলে গেছে। জায়গাটা এখান থেকে কয়েক মাইল হবে। কোনও ধোঁয়া দেখছি না। বোধহয় নিরাপদে নামতে পেরেছে।'

পরের এগারো মিনিট বড় ধীরে কাটল, মরুভূমির দিকে উঠে এল ট্রাক। বার কয়েক তথ্য দিল সবুর, চারপাশে কোনও ধোঁয়া নেই।

এটা একটা বড় সান্ত্বনা।

শুকনো নদী থেকে মরুভূমির মেঝেতে উঠে এল ট্রাক। টো হুক খুলে নিল সবুর। গুটিয়ে নিতে চাইল কেবল। রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মত প্রকাণ্ড এক পাথরে বেঁধেছে কেবল। নরম পাথরে গেঁথে গেছে ওটা। পাথরে পা ঠেকিয়ে গায়ের জোরে কেবল বের করে নিতে হলো।

'বিমানটা বোধহয় লিবিয়ায় নেমেছে,' বিড়বিড় করে বলল আসাদ।

'কী বললেন?' জানতে চাইল স্মৃতি।

'বলছি বিমান নেমেছে লিবিয়ার জমিতে,' এবার স্বাভাবিক স্বরে বলল সে।

স্মৃতি দলের নেত্রী, কিন্তু চাইল সবুরের দিকে। ওর ধারণা

হয়েছে সবুর রহমান এনএসআই বা এ ধরনের কোনও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। সে হয়তো বলবে এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত।

'এমন হতে পারে পঞ্চাশ মাইলের ভিতর আমরা একমাত্র মানুষ,' বলল সবুর। 'বিমান যদি নেমে থাকে, হয়তো ওখানে অনেকে আহত হয়েছে। আমাদের উচিত ট্রাক নিয়ে যাওয়া।'

'কাদের হয়ে কাজ করেন আপনি?' জানতে চাইল স্মৃতি।

'আমরা সময় নষ্ট করছি।'

'সবুর, ব্যাপারটা জরুরি। যদি লিবিয়ার সীমান্তের ওপাশে যাই, তার আগে জানতে চাই আপনি কী ধরনের কাজ করেন।'

'আমি সরকারী সংস্থার সঙ্গে আছি। ওটার নাম আপনি শোনেননি। বিসিআই। আমার কাজ আপনাদের উপর চোখ রাখা। ডক্টর ব্রাম ট্যাগার্ট তো ক্যাম্প থেকে বের হন না, কাজেই আমি আপনাদের দু'জনের উপর চোখ রাখছিলাম। স্মৃতি, আপনি তো ওই বিমান দেখেছেন?' আস্তে করে মাথা দোলাল আর্কিওলজিস্ট। 'আপনি কি জানেন ওই বিমানে কে রয়েছেন?'

'হ্যাঁ, বোধহয় জানি।'

'আপনি বা আসাদ নিশ্চয়ই চাইবেন না উনি মারা যান? আমাদের দায়িত্ব তাঁকে উদ্ধার করা। এখন ভয় পেলে চলবে না। দরকার পড়লে লিবিয়ান বর্ডার বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করব। লিবিয়ার সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আশা করি সরকার আমাদের কোনও ক্ষতি করবে না।'

আসাদ চৌধুরির দিকে চাইল স্মৃতি। তার মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না। নির্বিকার দাঁড়িয়ে রয়েছে যুবক। 'আপনার কী মনে হয়?' জানতে চাইল স্মৃতি।

'আমি নায়ক নই, তবে মনে হয় গিয়ে দেখা উচিত।'

'তা হলে চলুন,' তাড়া দিল স্মৃতি।

খোলা মরুভূমিতে বেরিয়ে এল ট্রাক। চাঁদের মাটির মত

ফাটল ধরা জমিন। কোথাও কোনও গাছ নেই। শুষ্ক প্রান্তর। কিছু দূর যাওয়ার পর শুরু হলো টিলাময় অঞ্চল। চারপাশে বড় বড় বোল্ডার। মরুভূমির এই গভীর অংশে টিকে থাকে শুধু গিরগিটি ও পোকা-মাকড়। সন্ধ্যা নেমে এলে শিকারে বের হয়।

ট্রাক চলেছে। সবুর রহমান স্যাটালাইট ফোনে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। খানিক পর টের পেল তার ফোনের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। ন্যাপস্যাক থেকে বের করল আরেকটা রিচার্জেবল ব্যাটারি, কিন্তু ওটা ঠিক থাকলেও বিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না সান স্পটের কারণে।

'শুনুন, এটা প্রায়োরিটি মিশন,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল সে। 'আমরা যদি ইউনুস আল-কবিরের ফতোয়া আবিষ্কার করতে পারি, খুব ভাল। কিন্তু যদি না পারি, তা-ও চলবে কনফারেন্স।'

'তাই ধারণা করছি,' বলল আসাদ চৌধুরি।

'কিন্তু কনফারেন্সে গুরুত্বপূর্ণ বক্তাদের একজন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে ঠিক চলবে না কিছুই।'

সবুরের কথাগুলো মিলিয়ে গেল, চুপ করে থাকল স্মৃতি ও আসাদ। থমথম করছে পরিবেশ। খ্যারর-খ্যারর আওয়াজে চলেছে ডিজেল ট্রাক। সবাই ভাবছে: বিমান যেখানে নেমেছে, সেখানে পৌঁছে কী দেখবে? ভয়ঙ্কর কোনও দৃশ্য? কখনও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি ওদের। তবে শুনেছে, ভদ্রমহিলা মুহূর্তে সবাইকে আপন করে নেন। উনি নানা দেশে শান্তি বজায় রাখবার জন্য বহুবার বক্তব্য দিয়েছেন জাতি-সংঘে। বলতে গেলে তাঁর উদ্যোগেই সংঘটিত হচ্ছে শান্তি মহাসম্মেলন। দিনের পর দিন কাজ করেছেন দেশগুলোর প্রধানদের একত্রিত করতে। ...উন্নত দেশের তৈরি গ্রিন হাউস এফেক্টের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গরীব দেশগুলোর সরকার প্রধানদের সংগঠিত করেছেন। উন্নয়নশীল

দেশের সমস্যা তুলে ধরেছেন সবার কাছে। ...ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। এক কথায় বললে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এমনই একজন নেত্রী দরকার ছিল। আর এ মানুষটি বিমান ক্র্যাশে হারিয়ে গেলে তা সবার জন্য মস্ত ক্ষতি।

টিলার ভিতর এঁকেবেঁকে গেছে এক ক্যানিয়ন। ওটা ধরে চলল ট্রাক। এখানে খোলা মরুভূমির চেয়ে তাপমাত্রা একটু কম। সাপের মত পেঁচিয়ে সামনে বেড়েছে ক্যানিয়ন, তারপর বেরিয়ে এল ওরা উল্টো মুখে। এখন পর্যন্ত বিমানটার দেখা নেই। কোথায় ক্র্যাশ করেছে বোঝা গেল না। আকাশে কোথাও ধোঁয়ার আভাস নেই। যত নীচ দিয়ে গেছে বিমান, তাতে ধারণা করা যায় এতক্ষণে মাটিতে নেমে পড়েছে।

মনে মনে প্রার্থনা করল স্মৃতি, নিরাপদে থাকুন মানুষগুলো।

আরও একঘণ্টা এগোলো ট্রাক। ওরা সবাই জানে অনেক আগেই লিবিয়া সীমান্ত পেরিয়েছে, এখন ওরা সম্পূর্ণ বেআইনী অনুপ্রবেশকারী। স্মৃতি ও আসাদের ভরসা সবুর, সে ভাল আরবি জানে। কোনও বর্ডার প্যাট্রল টিমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে হয়তো নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবে।

বারবার উঁচু-নিচু হচ্ছে মরুভূমির মেঝে। নুড়ি পাথরের টিবির পর টিবি। সেখান থেকে আসছে প্রচণ্ড তাপ-প্রবাহ। দূরে চাইলে মনে হয় থরথর করে কাঁপছে সব। আরেকটা টিবির উপর উঠল ট্রাক। উল্টোদিকে নামতে শুরু করেছে আসাদ, এমন সময় হঠাৎ ব্রেক কষল। দ্রুত ব্যাক গিয়ার দিয়ে পিছন দিক দেখে নিল, ট্রাক পিছিয়ে নিতে চাইছে।

'কী হলো?' ভড়কে গেল স্মৃতি। ঢাল বেয়ে পিছন দিকে নামতে চাইছে ট্রাক।

আসাদের বদলে জবাব দিল সবুর, 'লিবিয়ান প্যাট্রল!'

টিবির উপর উঠে এসেছে মিলিটারি ভেহিকেল। উপরের হ্যাচ থেকে মাথা তুলেছে এক সৈনিক, হাতে ভয়ঙ্কর দর্শন মেশিনগান। গাড়ির সাসপেনশন উঁচু, টায়ারগুলো বেলুনের মত ফোলানো। বাক্সের মত ক্যাব। গাড়িটা মরুভূমিতে চলার জন্য তৈরি।

'ভুলেও পিছাবেন না, আসাদ,' ইঞ্জিনের শব্দের উপর দিয়ে বলল সবুর, 'সে চেষ্টা করলে ওরা গুলি করবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধার ভিতর পড়ল আসাদ, তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল। ঠিকই বলেছে সবুর। অ্যাক্সেলারেটার থেকে পা সরিয়ে নিল সে, চেপে ধরল ব্রেক। একটু হড়কে গিয়ে থামল ট্রাক। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

লিবিয়ান ট্রাক বিশ গজ দূরে থেমেছে। ছাতের গানার পরিষ্কার দেখছে তিনজনকে। পিছন-দরজা খুলে লাফিয়ে নামল চার সৈনিক, পরনে মরুভূমির ফেটিগ। একে-ফোরটিসেভেন বাগিয়ে ধরে ছুটে আসছে যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে।

জীবনে এত ভয় পায়নি স্মৃতি। সব যেন ঘুমের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত আগে ওরা নিশ্চিন্ত মনে একা চলছিল, আর পরমুহূর্তে অস্ত্র হাতে ধেয়ে এল সৈনিক। চারটে রাইফেল তাক করে আছে ওদের দিকে!

চিৎকার করে কী যেন বলছে লিবিয়ান সৈনিকরা, সঙ্গে হাতের ইশারা। বোধহয় ট্রাক থেকে নামতে বলছে। আরবি ভাষায় তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়তে চাইল সবুর। কিন্তু লোকগুলো শুনতে রাজি নয়। এক সৈনিক পিছিয়ে গেল, এক পশলা গুলি ছুঁড়ল ট্রাকের পাশে। ছিটকে উঠল বালি ও পাথর, বাতাসে ভেসে গেল বালিকণা। পাথরগুলো ছিটিয়ে গেল চারদিকে।

প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল স্মৃতি, নিজেও জানে না কখন কাঁদতে শুরু করেছে।

ওরা তিনজন মাথার উপর দু'হাত তুলল। বোঝাতে চাইছে

আত্মসমর্পণ করছে। এক সৈনিক খপ করে ধরল স্মৃতির হাত, হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে নিল ক্যাব থেকে। এই দুর্ব্যবহার দেখে আপত্তি তুলতে চাইল আসাদ, কিন্তু পাশ থেকে তার কাঁধের উপর নামল একে-৪৭-এর বাঁট। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে শুরু করে আঙুলের ডগা পর্যন্ত অবশ হয়ে গেল ওর, বিকৃত হয়ে গেল মুখ।

টান খেয়ে বালির উপর আছড়ে পড়ল স্মৃতি। ব্যথা তো আছেই, তার চেয়ে বেশি লাগল মনে। এত অপমান কী করে সইবে?

পিছন সিট থেকে লাফিয়ে নামল সবুর, দু'হাত মাথার উপর তুলে রেখেছে। 'দয়া করে শুনুন,' আরবিতে বলল। 'আমরা জানতাম না লিবিয়ার ভিতর ঢুকে পড়েছি।'

'বিমানটার কথা বলুন,' বলল স্মৃতি। উঠে দাঁড়াল। পোশাক থেকে ঝাড়তে শুরু করেছে বালি।

'ঠিক আছে, বলছি,' সৈনিকদের দিকে চাইল সবুর। 'আমরা একটা বিমান দেখতে পাই। ওটা ক্র্যাশ করছিল। তাই কী হয়েছে দেখতে আসি।'

সৈনিকদের পোশাকে কোনও ইনসিগনিয়া নেই। তবে মনে হলো একজন এদের নেতা। লোকটা জানতে চাইল, 'এসব কোথা থেকে দেখেছ?'

কথা বলবার সুযোগ পেয়ে খুশি হলো সবুর। 'আমরা একটা আর্কিওলজিকাল এক্সপিডিশনে এসেছি। তিউনিশিয়ার ভিতর সীমান্তের পাশেই ক্যাম্প। কাজ করছিলাম, এমন সময় দেখি মাত্র এক হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে গেল বিমানটা। অর্থাৎ, ধরুন, তিন শ' মিটার উপর দিয়ে।'

'তোমরা প্লেন ক্র্যাশ করতে দেখেছ?' সৈনিকদের নেতার গালে চাপ দাড়ি।

'না। দেখিনি। ধারণা করেছি যে-ভাবেই হোক, মরুভূমিতে

নেমে গেছে। কোনও ধোঁয়া দেখিনি।'

'এটা তোমাদের জন্য একটা ভাল সংবাদ,' নির্বিকার সুরে বলল লোকটা।

'কী বলতে চাইছেন?' নরম স্বরে জানতে চাইল সবুর।

পাত্তা দিল না লিবিয়ান, ঘুরে চলে গেল প্যাট্রল ভেহিকেলে। এক মিনিট পর ফিরে এল। বাঙালিরা বুঝতে পারল না তার হাতে কী। তারপর এক সৈনিকের হাতে দেয়া হলো। জিনিসগুলো হ্যাণ্ডকাফ!

'আমাদের আটক করছেন কেন?' ইংরেজিতে বলল স্মৃতি। কিন্তু এক সৈনিক পিছন থেকে খপ্ করে ওর কাঁধ ধরল। 'আমরা তো কোনও অপরাধ করিনি!'

ওর দুই কবজি আটকা পড়ল হ্যাণ্ডকাফে। অপমানে লাল হয়ে গেল স্মৃতি, থুতু ছুঁড়ল লোকটার মুখ লক্ষ্য করে। ঠিক লেগেছে! এতে ভীষণ রেগে গেল লিবিয়ান, উল্টো হাতে প্রচণ্ড এক চড় দিল স্মৃতির গালে। বেচারি হোঁচট খেয়ে পড়ল বালির উপর।

ধাক্কা দিয়ে সামনের সৈনিককে সরিয়ে দিল আসাদ, লোকটা হ্যাণ্ডকাফ পরাতে চাইছে ওর হাতে, কিন্তু পাত্তাই দিল না। দু' পা সামনে বাড়ল স্মৃতিকে তুলতে, বালির উপর প্রায় অচেতন মেয়েটি। ঠিক তখনই নড়ে উঠল সৈনিকদের নেতা। ওয়েইস্ট হোলস্টার থেকে ছোঁ মেরে বের করে ফেলেছে পিস্তল, পরক্ষণে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করল আসাদের ডান চোখ লক্ষ্য করে।

ছিটকে পিছনে গেল আসাদের মাথা, স্মৃতির কয়েক ফুট দূরে ধপ্ করে পড়ল লাশ। বিবশ হয়ে চেয়ে রইল স্মৃতি, আসাদের কপালে তৈরি হয়েছে রক্তাক্ত আরেকটা চোখ! ওখান থেকে গড়িয়ে পড়ছে ঘন লাল রঙের ধারা।

স্মৃতি টের পেল, উঠে দাঁড়িয়েছে। কোনও বোধ কাজ করছে না। কাউকে বাধা দিল না, ওকে টেনে নিয়ে চলেছে দুই সৈনিক,

তুলে দিল ট্রাকে।

দরদর করে অশ্রু ঝরছে স্মৃতির দুই গাল বেয়ে।

থমকে গেছে সবুর রহমান। নীরবে স্মৃতির পাশে গিয়ে বসল। ট্রাকের ভিতরটা ভ্যাপসা গরম। খোলা মরুভূমি এর চেয়ে অনেক শীতল ছিল।

এক সৈনিক কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল ওদের দু'জনকে।

দশ

বাংলাদেশ এম্বেসি। ত্রিপোলি।

নিজ অফিসে বসে আছেন অ্যাম্বাসেডার নাহিদ কামাল। তাঁর সেক্রেটারি ঘরের দরজা খুলে দিতেই সচেতন হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে দামি কার্পেট মাড়িয়ে চললেন দরজার দিকে। ঘরের মাঝ পর্যন্ত চলে এলেন।

অফিসে ঢুকেছেন লিবিয়ান ফরেন মিনিস্টার, মোহাম্মদ ফতে আলী।

'আসুন, মাননীয় মন্ত্রী, জরুরি শিডিউল রেখে এসেছেন বলে আন্তরিক ধন্যবাদ,' থমথম করছে অ্যাম্বাসেডারের মুখ।

'গুরুতর এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি চেয়েছেন আমাদের সরকারের তরফ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে সমবেদনা জানাতে। সত্যিই, দেশের কাজ ফেলে রাখা কঠিন। তবে নিশ্চয়ই আমার উপস্থিতি থেকে বুঝছেন, এই দুঃখজনক দুর্ঘটনায় আমরা সত্যি গভীর সমবেদনা জানাতে চাই?' অ্যাম্বাসেডারের দিকে হাত

বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন নাহিদ কামাল। হাতটা ছেড়ে দিলেন না, নিয়ে চললেন ভদ্রলোককে সোফার দিকে। জানালা দিয়ে চোখে পড়ল ঝিকমিকে নীল ভূমধ্যসাগর। বহু দূরে পশ্চিমে চলেছে এক সুপার ট্যাঙ্কার।

বাংলাদেশি অ্যাম্বাসেডার মাঝারি আকৃতির মানুষ। তাঁর পাশে ঝাড়া ছ' ফুটি লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী যেন রীতিমত পাহাড়। চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো তাঁর। পরনে স্যাভিল রো-র দামি সুট। আয়নার মত ঝিকঝিক করছে শু জোড়া। নিখুঁত ইংরেজি বলেন। প্রায় ধরাই যায় না তিনি আরব। মুখোমুখি সোফায় বসে বাম উরুর উপর ডান উরু রাখলেন, ঠিক করে নিলেন সুটের প্যান্টের ভাঁজ।

'আমাদের সরকারের তরফ থেকে বলতে পারি, ইতিমধ্যে ওই এলাকায় তল্লাশী ও উদ্ধারের জন্য তিনটি দল পাঠানো হয়েছে। পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে রিকনেসেন্স বিমান। ওই বিমানের কী ঘটেছে তা জেনে যাব আমরা শীঘ্রিই, তার আগে ক্ষান্ত দেব না।'

'সেজন্য অজস্র ধন্যবাদ, মাননীয় মন্ত্রী।' আনুষ্ঠানিক ভাবে বললেন অ্যাম্বাসেডার। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কূটনীতিক, তাঁর জানা আছে শুধু মূল বক্তব্য শুনলে চলবে না; তা কী সুরে কীভাবে বলা হলো, তা বুঝতে হবে। 'এই পরিস্থিতিতে আমাদের সরকার কোনও সাহায্যে আসতে পারে? আপনি উপস্থিত হওয়ায় ধারণা করছি লিবিয়ান সরকার ভাবছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দুর্ঘটনার ভিতর পড়েছেন।'

'বাংলাদেশ সৃষ্টির আগে থেকেই আমাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না,' বললেন লিবিয়ান মন্ত্রী। আস্তে করে মাথা নাড়লেন। 'এ ছিল দু' দেশের মানুষের জন্য দুঃখজনক। আপনারা স্বাধীনতা পাওয়ার পরও আমাদের ভিতর সম্পর্ক বিরূপ ছিল। তবে পরে আলাপের

মাধ্যমে বিরোধগুলো নিষ্পত্তি হয়। এ দেশে হাজারো বাংলাদেশি লোক চাকরি নিয়ে আসে। হয়তো এ থেকে প্রমাণ হয় আমরা আপনাদের বন্ধু রাষ্ট্র। আপনি তো জানেন আমরা চেয়েছি শান্তি মহাসম্মেলন আমাদের দেশে আয়োজিত হোক। সেজন্য আপনাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে একই সাথে কাজ করে গেছেন।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন অ্যাম্বাসেডার। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মাননীয় মন্ত্রী। আমরা চাই জগতে শান্তি ফিরে আসুক।' নড়েচড়ে বসলেন তিনি। 'এবার ফিরি বিমান দুর্ঘটনা বিষয়ে। আমাদের সরকার থেকে ধারণা করা হচ্ছে, ওই বিমানে কোনও সন্ত্রাসী হামলা হয়নি। তবে আপনাদের পাশাপাশি আমরা নিজেরাও তদন্ত করে দেখতে চাই।' কামাল সাহেব বুঝতে পারছেন জবাব কী হতে পারে। 'আপনারা অনুমতি দিলে আমাদের তদন্ত দল এ দেশে আসতে পারে।'

'খুবই খুশি হতাম, যদি অনুমতি দেয়া যেত,' বললেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। 'তবে লিবিয়ান সরকারের ধারণা আমাদের নিজস্ব মিলিটারি এবং সিভিলিয়ান সার্চ ইউনিটগুলো এ কাজে যথেষ্ট পারঙ্গম।'

থম মেরে রইলেন অ্যাম্বাসেডার।

আস্তে করে মাথা নাড়লেন মোহাম্মদ ফতে আলী। 'আমরা সত্যিই দুঃখিত। তবে ভাববেন না। আমাদের ইউনিটগুলো ওই বিমান খুঁজে বের করবে। ...এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। কনফারেন্সের বিষয়ে প্রতিটি দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমরা। আমাদের অনুরোধে সবাই জানিয়েছে, এই দুঃখজনক দুর্ঘটনার পরও তাঁরা পীস সামিটে যোগ দেবেন। আপনারা কী ভাবছেন?'

'আজ সকালে আমাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,' বললেন নাহিদ কামাল। 'তিনিও ওই একই কথা বলেছেন।

আমরা পীস সামিটে যোগ দেব। খোদা মাফ করুন, সত্যিই যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর খারাপ কিছু ঘটে থাকে, তারপরও আমরা বলব, তিনি নিজেও চাইতেন এই মহাসম্মেলন সফল হোক। আগে কখনও শান্তি প্রতিষ্ঠার এত বড় সুযোগ আসেনি। হয়তো ভবিষ্যতেও আসবে না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বোধহয় অন্য সবার চেয়ে বেশিই চেয়েছেন শান্তি সম্মেলন।'

'ভাল বলেছেন। খারাপ কিছু না হোক। তবুও বলতে হয় তা-ই বলছি তিনি সম্মেলনে যোগ না দিতে পারলে সেক্ষেত্রে আপনাদের সরকারের তরফ থেকে কে আসছেন?'

'এখনও জানি না। আমাদের সরকার এই মুহূর্তে বিমূঢ়।'

'বুঝতে পারছি। খবরের কাগজে যা পড়েছি, সত্যিই আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর কোনও রিপ্লেসমেন্ট নেই।' কাঁধ ঝাঁকালেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। 'মিস্টার অ্যাম্বাসেডার, আপনার বাড়তি সময় নেব না। অন্তর থেকে বলছি, এ ঘটনায় আমি দুঃখিত। কথা দিতে পারি, যে মুহূর্তে কোনও খবর পাব, তা দিন হোক বা রাত, আমি নিজে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'জানি না কেন এ ধরনের খেলা খেলেন আল্লাহ।'

'ধন্যবাদ,' আর কিছু বললেন না কামাল। পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে নিজে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে আসতে বললেন, 'মিস্টার মিনিস্টার, একটা কথা। যদি ওখানে কোনও ধ্বংসাবশেষ থাকে, আমাদের কর্তব্য কী হবে?'

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

'বিমান যদি ভূ-পাতিত হয়, বাংলাদেশ সরকার অনুরোধ করবে আমাদের নিজেদের পরীক্ষক টিম যেন ওখানে যেতে পারে। তারা খুঁজে বের করবে কী কারণে বিমান পতিত হয়েছে।'

'ও, হ্যাঁ, বুঝেছি।' চোয়াল ঘষলেন আলী। 'ওই একই কাজ

করবার জন্য আমাদের গবেষক দল রয়েছে। তবে কোনও অসুবিধা হবে বলে মনে করি না। তারপরও প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথাটা নিয়ে আলাপ করে তাঁর মতামতটা পরে জানিয়ে দেব।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

দু'মিনিট পর নিজের অফিসে ফিরলেন নাহিদ কামাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টোকা পড়ল দরজায়।

'কাম ইন।'

'আপনার কী মনে হলো?' জানতে চাইল বিসিআইয়ের সলীল সেন। গদিমোড়া সোফায় বসল রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। আট ঘণ্টা আগে পৌঁচেছে সে এ-দেশে। বিসিআইয়ের তুখোড় স্পাই ছিল সে, শারীরিক কিছু অসুবিধার জন্য বর্তমানে ডেস্কে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত- প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের দায়িত্বে ছিল। ডেস্ক ওঅর্কের জন্য ওকে আবারও বিসিআই-এ ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

'এরা যদি কিছু করেও থাকে, মোহাম্মদ ফতে আলী সেসবের সঙ্গে জড়িত না,' বললেন কামাল।

'যা শুনেছি, এই লোক গাদ্দাফির প্রিয় পাত্র। বিমান যদি পড়ে গিয়ে থাকে, ফতে আলি তা জানে।'

'আমার মন বলছে লিবিয়ানরা কিছুই করেনি। যা ঘটেছে সেটা নেহায়েতই দুর্ঘটনা।'

'আমরা এখনও নিশ্চিত নই। ধ্বংসাবশেষ পেলে আমাদের তদন্ত দল বলতে পারবে কী ঘটেছে।'

'তা তো বটেই।'

'মোহাম্মদ ফতে আলীর কাছে জানতে চেয়েছেন আমাদের ছেলেদের আসতে দেবে কি না?'

'জানতে চেয়েছি। মনে হলো আপত্তি নেই। তবে আগে গাদ্দাফির সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছে। বুঝলাম দ্বিতীয়বার এ কথা শুনবার জন্য তৈরি ছিল না। জবাব দিতে সময় নিয়েছে।

তবে কূটনৈতিক ভাবে রাজি না হয়ে উপায় ছিল না তার।'

'আমাদের নিজেদের লোক ঠিকই বুঝবে কী হয়েছে,' বলল সলীল। 'কী ধরনের লোক মোহাম্মদ ফতে আলী?'

'আগেও দেখা হয়েছে। তবে এই প্রথম মনে হলো কূটনৈতিক ভদ্রতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। খুব ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোক, আচরণ অত্যন্ত ভদ্র। তবে খানিক বিচলিত মনে হলো। গভীর ভাবে জড়িয়ে আছে শান্তি মহাসম্মেলনের সঙ্গে। যেন ওটা সফল হওয়ার উপর নির্ভর করছে তার ব্যক্তিগত সম্মান। টপ সামিটের আগেই ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। খুব বিব্রত মনে হলো। বিশ্বাস হয় না গাদ্দাফির মত লোকের সরকারে এ ধরনের ভদ্রলোক থাকবে।'

'গাদ্দাফি ভাল করেই বুঝছেন সব। আমেরিকা দখল করে নিয়েছে ইরাক। মারা গেছেন সাদ্দাম হোসেন। বোধহয় এর পর তাঁর নিজের উপর হামলা আসবে। তাই শান্তি সম্মেলনের ব্যাপারে তাঁর এই আগ্রহ।'

'সত্যিই আর বেশি দিন নেই, পশ্চিমারা লেলিয়ে দেবে সরকার-বিরোধীদের।' প্রসঙ্গ পাল্টালেন কামাল, 'নতুন কোনও তথ্য পেলেন?'

'আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছি আমেরিকার ন্যাশনাল রিকনেসেন্স অফিস তাদের এক স্পাই স্যাটালাইটকে গালফ কাভার করতে পাঠিয়েছে। তবে ওটার ছবি পেতে দেরি হবে। বিমান যদি ওদিকে থাকে, ছবি আমরা পাবই।' রানা ও তার জাহাজ মার্ভেলের কথা অ্যাম্বাসেডারকে বলল না সলীল।

'লক্ষ লক্ষ স্কয়্যার মাইল কাভার করতে হবে,' বললেন কামাল। 'তার ভিতর রয়েছে পাহাড়ি এলাকা।'

'শুনেছি ওসব স্যাটালাইট হাজার মাইল উপর থেকে যে-কোনও গাড়ির লাইসেন্স প্লেট পড়তে পারে।'

বেশ মুষড়ে পড়েছেন অ্যাম্বাসেডার, বললেন না ওই এলাকা বাংলাদেশের চেয়ে কয়েক গুণ বড়। 'আর কিছু বলবেন?'

'না, আর কিছু নয়। এখন শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা।' সলীল বুঝে নিয়েছে ভদ্রলোক একা থাকতে চাইছেন। উঠে দাঁড়াল সে।

'আমার সেক্রেটারিকে একটু আসতে বলবেন?'

'পাঠিয়ে দিচ্ছি।' অফিস থেকে বেরিয়ে গেল সলীল।

থম মেরে বসে রইলেন অ্যাম্বাসেডার। প্রার্থনা করছেন প্রধানমন্ত্রী সুস্থ থাকুন।

'এই যে আপনার অ্যাসপিরিন,' এক হাতে গ্লাস ও অন্য হাতে মাঝারি একটা বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ সেক্রেটারি।

মুখ তুলে চাইলেন অ্যাম্বাসেডার। 'দু'চারটা ট্যাবলেটে কিছুই হবে না, হারুন। পুরো বোতল রেখে যাও। ওটা লাগবে।'

•

এগারো

দ্য মার্ভেল অভ গ্রীস।

অপারেশন্স সেন্টার।

রায়হান রশিদ ও খোরশেদ নবী দেখছে ভিডিও ডিসপ্লে, খেয়াল নেই কোনও দিকে। দু'জন মিলে সিআইএ ও আমেরিকান ন্যাশনাল রিকনেসেন্স অফিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হ্যাক করছে। মিলছে কাঁচা স্যাটালাইট ইমেজারি। ওরা জানে না কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে মাসুদ ভাই। একটু আগে মেজর জেনারেল

(অবঃ) রাহাত খানের সঙ্গে মিটিং হয়েছে রানার। তখনই ঠিক হয়েছে ওরা সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিম তৈরি করে ঢুকে পড়বে লিবিয়ার ভিতর। খুঁজে বের করবে কোথায় রয়েছে ওই ভূ-পাতিত বিমান। কেউ যদি বেঁচে থাকেন, সম্ভব হলে তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে আসবে ওই দেশ থেকে।

বেসিক প্যাটার্ন রিকগনিশন সফটওয়্যার দিয়ে ইমেজারি সার্চ করছে রায়হান ও নবী। আশা করছে, শিগ্গি জানা যাবে কোথায় পড়েছে বিমান। ওদের মত একই কাজ করছে আমেরিকানদের একটি দল। তাদের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার রায়হানদের চেয়ে অনেক বেশি সফেসটিকেটেড। তবে অন্তর থেকে জানে রানা, ওর ছেলেরা অন্যদের অনেক আগেই আবিষ্কার করবে এয়ারবাসটা।

'এবার তোর ছাগলা দাড়িটা কেটে ফ্যাল,' কাজের ফাঁকে বলল রায়হান।

মাথা নাড়ল নবী। 'ফেসবুকে যে মেয়ের সঙ্গে খাতির হয়েছে, তুই তো চিনিস, ও কিন্তু বলেছে দাড়িতে আমাকে দারুণ লাগে।'

'তা হলে ওকে বিয়ে করে ফ্যাল। আর কেউ চান্স দেবে না। ওদিকটা দ্যাখ্। ওদিকে ওটা কী?'

'দাঁড়া, ভাল করে দেখি।'

দু'জন ঝুঁকে পড়ল স্ক্রিনের উপর।

কয়েক মুহূর্ত পর ওভারহেড বাতি জ্বেলে দিল রানা। স্ক্রিন থেকে চট্ করে মুখ তুলল রায়হান ও নবী।

তারা একই ব্র্যাণ্ডের জিন্স পরেছে। একই প্রিন্টেড শার্ট। দেখে মনে হয় যমজ। দারুণ খাতির দু'জনের। বিসিআইয়ে আসবার পর গত দু'বছরে বুজম ফ্রেণ্ড হয়ে গেছে।

'মাসুদ ভাই, এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন,' লাজুক স্বরে বলল নবী। লালচে হয়ে গেছে মুখ। ধারণা করছে তিনি ওদের কথা শুনে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি স্ক্রিনের মানচিত্রের দিকে আঙুল

তুলল। ওখানে ভূমধ্য সাগর মিশেছে সাহারা মরুভূমিতে। ত্রিপোলি থেকে বড়জোর পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে। লিবিয়ার তীর গেছে টানা লাইনের মত, কিন্তু এখানে এসে ঢুকেছে সাগর। জায়গাটা নিখুঁত এক ত্রিকোণের মত। আন্দাজ করা যায় ওটা তৈরি হয়েছে মানুষের কল্যাণে। মনিটরের স্কেল বলছে ওই ত্রিকোণ বিশাল আকৃতির।

'নতুন টাইডাল পাওয়ার স্টেশন,' বলল রায়হান। 'মাত্র এক মাস আগে কাজ শেষ করেছে।'

'জানতাম না ভূমধ্য সাগরে জোরালো জোয়ার হয়,' আপন মনে বলল রানা।

'হয় না তো,' বলল নবী। 'তবে জোয়ার বা ভাটা লাগে না ওই পাওয়ার স্টেশনের। জায়গাটা একটা উপসাগরের সরু মুখ। ভিতর অংশ ভাল ভাবে খনন করেছে। উপসাগরের সরু মুখে প্রকাণ্ড বাঁধ দিয়েছে। তারপর শুকিয়ে নিয়েছে ওই এলাকা। চারদিকের চওড়া জমি গিয়ে মিশেছে মরুভূমিতে। বাঁধের উপর বসিয়েছে অসংখ্য স্লুইস গেট। ওগুলো ঢালু ভাবে বসানো। যখন জোয়ার আসে, গেটের ভিতর দিয়ে আসতে থাকে সাগরের পানি, ঢুকে পড়ে ঢালু পাইপের ভিতর। ঘুরতে শুরু করে টারবাইন, তৈরি হয় ইলেকট্রিসিটি।'

'ভাল বুদ্ধি না,' বলল রায়হান। 'ওই উপসাগর যত বড়ই হোক, শেষ পর্যন্ত ভরে উঠবে সাগরের পানিতে।'

'ওই এলাকার কথা মাথায় রাখো,' বলল রানা। যখন প্রথম ওই প্রজেক্টের কথা শোনে, তখনই বুঝেছে ওটার রহস্য কোথায়। রানার দিকে প্রশ্ন নিয়ে চাইল রায়হান। 'ওই মরুভূমি হচ্ছে আসল রহস্য।'

চট্‌ করে বুঝে নিল রায়হান। 'দারুণ তো! নিয়মিত শুকিয়ে যাবে পানি!'

'রিযারভয়ের প্রকাণ্ড ও চওড়া হতে হবে, তবে গভীর না হলেও চলবে,' বলল নবী। 'ওরা টিপিকাল ইভাপোরেশন রেট ক্যালকুলেট করেছে, ঠিক করে নিয়েছে কী পরিমাণ ইলেকট্রিসিটি প্রোডিউস করবে। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর প্রতি সন্ধ্যায় দেখা যায় প্রায় খালি হয়ে গেছে নকল হ্রদ। তারপর আবারও আসে জোয়ার, বাঁধের ওপাশে উঁচু হয় পানি, স্লুইস গেট খুলে দিলেই পাওয়ার হাউস পায় ইলেকট্রিসিটি। দিনের পর দিন চলবে এ-ই।'

'কিন্তু...' আপত্তি তুলল রায়হান।

'বাড়তি লবণ?' হাসল নবী। 'প্রতি রাতে ট্রাক দিয়ে সরিয়ে নেয়। বিক্রি হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে। রাস্তার জন্য ব্যবহার হয় এই লবণ। কমপ্লিট রিনিউয়েবল, পরিষ্কার এনার্জি আর বোনাস হিসাবে প্রতি বছর লিবিয়ান সরকার পকেটে পুরবে কয়েক মিলিয়ন ডলার।'

'কিন্তু সমস্যা তো রয়েই গেল,' বলল রায়হান। 'বছরের পর বছর ইভাপোরেশন হলে ওই সাইট থেকে শুরু করে পিছনের সমস্ত এলাকা বদলাতে থাকবে। পরিবেশ দূষণ হবে।'

'রিপোর্টে লিখেছে ক্ষতির পরিমাণ খুব কম,' বলল নবী।

'ওই রিপোর্ট তৈরি করেছে এক ইতালিয়ান কোম্পানি। ওরাই কিন্তু তৈরি করেছে ওই প্লান্ট।' মৃদু হাসল রানা।

'ওরা তো বলবেই ক্ষতি নেই, আসলে এটা ষড়যন্ত্র,' বলল রায়হান। পশ্চিমা বিশ্বের চক্রান্ত ধরে দেয়ার পর থেকে অতি কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। সব কিছুকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে।

'ওসব নিয়ে এখন না ভাবলেও চলবে,' বলল রানা। 'আমাদের প্রথম কাজ প্রধানমন্ত্রীর বিমান খুঁজে বের করা।'

'মাসুদ ভাই, আপনি জানতে চাইছেন কিছু পেলাম কি না,' বলল নবী। 'কয়েকটা সিনারিয়ো নিয়ে ভেবেছি আমরা। প্রথম কথা, ওই বিমান মাঝ আকাশে বিস্ফোরিত হতে পারে। এমনও

হতে পারে মেশিনারিজে বড় ফেলিওর ছিল। কোনও মিসাইলের আঘাতে বিধ্বস্ত হতে পারে। যদি তা-ই হয়, ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়বে কয়েক শ' স্কয়্যার মাইল জুড়ে। সব নির্ভর করে বিমানের গতি ও উচ্চতার উপর।'

'সেক্ষেত্রে টুকরোগুলো খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে,' বলল রায়হান। 'মিসাইল কোথায় আঘাত হেনেছে তা না জানলে কিছুই বুঝব না।'

'আমরা জানি বিমানের ট্র্যান্সপণ্ডার ও কমিউনিকেশন কখন বন্ধ হয়েছে,' বলল নবী। 'তাদের কোর্স, স্পিড ও কখন ত্রিপোলি এয়ারপোর্টে পৌঁছাত, এসব থেকে বেরিয়ে আসে অনেক তথ্য। ধারণা করা যায় বিমান পৌঁচেছে তিউনিশিয়ার সীমান্তে। তবে বিধ্বস্ত হয়েছে লিবিয়ার বর্ডার পেরিয়েই।'

'তোমরা ম্যাপে সেখানে গেছ?' মাল্টিপ্যানেল ডিসপ্লেতে মরুভূমির ইমেজারি দেখছে রানা।

মাথা নাড়ল রায়হান। 'এটা ওখানকার ছবি নয়। ওদিকটা আগেই দেখেছি আমরা। প্রায় কিছুই নেই। ছিল শুধু একটা পরিত্যক্ত ট্রাক। ওদিকে চাকার অনেক দাগ। আমার ধারণা ওগুলো এসেছে সীমান্ত প্রহরীদের তরফ থেকে। তবে ওদিকে বিমান নেই।'

'ভাল,' বলল রানা। 'হয়তো প্রধানমন্ত্রীর বিমান আকাশে বিস্ফোরিত হয়নি।'

'এটা ভাল, আবার একই সঙ্গে খারাপ,' বলল নবী। 'আমরা জানি না ঠিক কী ঘটেছিল। কাজেই বোঝা কঠিন। অক্সিজেন সিস্টেম ফেইল করে সবাই মরল, নাকি ফিউয়েল শেষে অনেক দূরে গিয়ে পড়ল বিমান? হয়তো আরও পাঁচ শ' মাইল গেছে, হয়তো পড়েছে ত্রিপোলির পুবে। কে বলবে ভূমধ্যসাগরে পড়েনি? আসলে হয়তো ইঞ্জিন নষ্ট হয়। সেটা হলেও, বিমান গ্লাইড করে

মাইলের পর মাইল যেতে পারে, তারপর পড়তে পারে।'

'তা হলে রেডিও বন্ধ হলো কেন?' জানতে চাইল রানা। 'ওরা তো যোগাযোগ করত।'

'আমরা এ নিয়ে ভেবেছি,' বলল রায়হান। 'আসলে প্রতিটি দিক বুঝে এগুতে হবে, নইলে বেরুবে না কোন এলাকায় পড়েছে বিমান। এটা খুব অস্বাভাবিক যে ইঞ্জিন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হলো রেডিও। কিন্তু অনেক কিছুই ঘটতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে এফবিআই তদন্ত করছে। নিউ ইয়র্কের এয়ারপোর্টের গ্রাউণ্ড টিমের সঙ্গে কথা বলেছে। শেষবার ওখানে সার্ভিস করা হয় ওই বিমান।'

'হ্যাঁ, তাদের তদন্ত শেষ হয়নি,' বলল রানা। 'এদিকে বিসিআই ফ্লাইট ক্রুদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে। প্রত্যেকে ছিল বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের। কেউ সিকিউরিটির বিষয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল না।'

'এয়ারফোর্সের কাউকে কিনে নেয়া যাবে না, তা ধরে নেয়া ঠিক হবে?' বলল রায়হান। 'হয়তো গোপন কোনও লিবিয়ান বেসে গিয়ে নেমেছে। আর সে লোক আল-কায়েদার মত কোনও দলের হতে পারে। এ মুহূর্তে নির্যাতন করছে প্রধানমন্ত্রীকে।' চকচক করছে ওর দুই চোখ। আবেগ এসে গেছে। ভাবতে গিয়ে বহু কিছু আসছে মনে।

'কল্পনার ডানায় চড়ে ভাসতে হবে না,' ধমক দিল নবী।

'আচ্ছা, ঠিক আছে,' নাখোশ হয়ে বলল রায়হান। 'ধরে নিই দুই ইঞ্জিন বন্ধ হলো। আমরা জানি গতি ও উচ্চতা কী ছিল, আন্দাজ করা যায় প্রতি মিনিটে পনেরো শ' ফুট নেমে এসেছে। তা হলে পাই আশি নটিকাল মাইল। তার ভিতর নেমেছে বিমান।'

'স্ক্রিনে তা-ই দেখছ?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিক তা নয়,' বলল নবী।

রায়হান বলল, 'আমরা দেখছি ইঞ্জিন ও রেডিও নষ্ট হওয়ার সিনারিয়ো। এসব খুঁজে বের করতে বেশিক্ষণ লাগেনি। আর তাই আরও ভাল কিছু পেয়েছি।'

ধৈর্য হারাল না রানা। তখনই কিছু বলল না। ওর জানা আছে, সুযোগ পেলে দুই তরুণ এজেন্ট বুদ্ধিমত্তা দেখাতে চায়। ক' মুহূর্ত পর জানতে চাইল, 'বললে আরও ভাল কিছু পেয়েছ, কী সেটা?'

'বিমানের লেজ খসে পড়ে, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান।

'বা লেজের বড় একটা অংশ,' সায় দিল নবী।

'লেজের স্ট্রাকচারাল ফেলিওর হলে রেডিও অ্যান্টেনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর সে-কারণে যোগাযোগ করেনি,' বলল রায়হান। 'একই সঙ্গে নষ্ট হয়েছে বিমানের ট্র্যান্সপণ্ডার।'

'যে ধরনের ক্ষতি, তারপরও বহু দূর যেতে পারে,' শুরু করল নবী। 'আনস্টেবল থাকবে বিমান, পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ পাবে না পাইলট। তবে ইঞ্জিনগুলোর অল্টারনেটিভ থ্রাস্ট দিয়ে সরতে পারবে।'

'আমরা জানি বিমানে যথেষ্ট ফিউয়েল ছিল। হয়তো ফেলে দিয়েছে, নইলে ওই ওজন নিয়েই নামতে শুরু করেছে। কী ঘটেছে জানা নেই।' মাথা দোলাল রায়হান। 'ভাবতে দোষ কী ওটা কয়েক শ' মাইল গেছে?'

'কিন্তু তা করেনি, নইলে ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিং করতে পারত ত্রিপোলিতে।'

'গুড পয়েন্ট, নবী,' বলল রানা। 'কিন্তু তারা কোথায়?' বিরক্ত বোধ করছে। বোঝা যাচ্ছে, রায়হান ও নবী কিছু পেয়েছে।

'আমরা আমাদের দুই ধরনের সিনারিয়োকে একত্র করেছি,' বলল নবী। 'ইঞ্জিন ফেলিওর আর লেজ খসে পড়া ছিল মূল সমস্যা। ওসব হওয়া খুব কঠিন। কিন্তু হতেই পারে। আর

সেক্ষেত্রে আমরা পাই এক শ' স্কয়্যার মাইল। আমরা বিশেষ এলাকা বাছাই করে পেলাম বিমান আকৃতির জিওলজিকাল ফর্মেশন।'

কি বোর্ডে টোকা দিল রায়হান। স্ক্রিনের মাঝখানে আঙুল রাখল। 'আর এই যে, এটা মিলল।'

ঝুঁকে দেখল রানা। স্ক্রিনে পাহাড়ি এলাকা। হেলিকপ্টার ছাড়া ওখানে নামা প্রায় অসম্ভব। হয়তো যেতে পারবে ফোর হুইল জিপ। প্যানেলের কন্ট্রোলে কয়েকটা কি টিপল রায়হান। জুম হয়ে এল ছবি।

'দেখে তো মনে হচ্ছে ওটাই,' বলল রানা।

'বিধ্বস্ত বিমান, আমাদেরও তা-ই ধারণা,' একসঙ্গে বলল রায়হান ও নবী।

যোগ করল নবী, 'তবে নিশ্চিত না হয়ে বলি কী করে!'

'এখন নিশ্চিত হয়েছ?' ঠাণ্ডা স্বরে বলল রানা। 'ভবিষ্যতে আগেই বলবে কী পাওয়া গেছে।'

লজ্জা পেয়ে বলল দুই বন্ধু, 'জী, মাসুদ ভাই।'

একটা পাহাড়ের উপর পড়েছে বিমান। কয়েক টুকরো হয়ে গেছে। পাহাড়ি ঢালের উপর আধ মাইল জুড়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রথম যখন বিমান মাটিতে নেমে আসে, সে জায়গা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। লাফিয়ে ওঠে বিমান, তারপর পেট দিয়ে আবারও পড়ে। গতি কমবার সঙ্গে ছিঁড়তে থাকে। দ্বিতীয়বার নেমে আসবার পর টুকরো টুকরো হয়। সেগুলোর মাঝে মাটি পুড়ে গেছে। ফিউজেলাজের তিন ভাগের দুই ভাগ একইসঙ্গে রয়ে গেছে। আগুনে পুড়ে কালো। দু'পাশে পড়ে আছে ডানার টুকরো। এয়ারক্রাফট থেকে এক শ' ফুট দূরে একটা ইঞ্জিন। দ্বিতীয়টা দেখতে পেল না রানা।

'জীবিত কেউ নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রায়হান।

'নতুন স্যাটালাইট ইমেজারি পাব আবার দশ ঘণ্টা পর,' বলল নবী। 'তখন দুটো মিলিয়ে দেখব। কিছু বদলে থাকলে, তা ধরা পড়বে। কিন্তু মনে করি না ওই ক্র্যাশের পর কেউ বাঁচবে। আগুন ধরে গিয়েছিল বিমানে।'

থমথম করছে রানার মুখ। বলল, 'অনেক দেরি করিয়ে দিলে, তবে গুড ওঅর্ক বয়েজ। আমার কমপিউটারে নোট সহ পাঠিয়ে দাও কোঅর্ডিনেট্‌স্। আমাদের চিফ চাইবেন আমরা তদন্ত করি। ধরে নিতে পারো ওই সাইটে যেতে হবে। এবং পৌঁছুতে হবে লিবিয়ানদের আগেই। এবার দেখো ওরা কোথায় খুঁজছে।'

'প্রায় আড়াই শ' মাইল দূরে,' বলল রায়হান। 'আমার ধারণা ভান করছে। ভাল করেই জানে আমেরিকানদের স্যাটালাইট খুঁজে বের করবে বিমান। লিবিয়ান সরকার তথ্য পেলে নিজেদের লোকদের বলবে কোথায় পড়েছে এয়ারবাস।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'কিন্তু ওদের আগেই হাজির হতে হবে। হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারব না, কাজেই ম্যাপ দেখে পথ বেছে রাখো।' বিমান দুর্ঘটনার কথা ভাবতে তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে ওর। মানুষগুলো কতটা ভয় পেয়েছিল? পাহাড়ের কাঁধে নেমে আসছে বিমান! কী ছিল মানুষগুলোর শেষ ভাবনা?

এক ঘণ্টা পর। নিজের কেবিনে বসে আছে রানা, হাতে জ্বলছে সিগারেট। কুণ্ডুলি পাকিয়ে সিলিঙের দিকে উঠছে ধোঁয়া। ঠিক হয়েছে আজ রাতে ত্রিপোলি বন্দরে ভিড়বে মার্ভেল। এক লিবিয়ান ডিআইজিকে ঘুষ দিয়ে কাস্টমসের কড়াকড়ি এড়িয়ে গেছে বিসিআইয়ের স্থানীয় এজেন্ট। জাহাজ থেকে নামিয়ে নেয়া হবে বিশেষ একটি ট্রাক। ওটা তৈরি করেছেন বিসিআইয়ের অস্ত্র বিশেষজ্ঞ ডক্টর শামশের আলী ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স গবেষণাগারে। মাস দুয়েক আগে ওটা তুলে দেয়া হয়েছে জাহাজে। এদিকে

লিবিয়ান ডিআইজির মাধ্যমে জোগাড় হয়েছে রানা-স্বর্ণা-নিশাত-ফেং-নবী ও কাশেমের ভিসা।

মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান জানিয়ে দিয়েছেন, ওদের খুঁজে দেখতে হবে কেন ধ্বংস হলো বিমান। কেউ বেঁচে থাকলে তাঁকে সরিয়ে নিতে হবে।

স্যাটালাইট ইমেজের হার্ড কপির দিকে চাইল রানা। বিমান পতিত হওয়ার প্যাটার্ন দেখবার পর থেকে খচ্ খচ্ করছে মন। কী যেন মেলে না। কিন্তু কী মিলছে না, জানে না। ইন্টারনেট থেকে নানা বিমানের ধ্বংসাবশেষের ছবি ডাউনলোড করেছে, কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে এয়ারবাসের তফাত খুঁজে পায়নি। অবশ্য কোনও ধ্বংসাবশেষ একই রকম হয় না। এমন কিছু নেই যা দেখে মনে হয় অস্বাভাবিক। তবু কেন যেন অস্বস্তি বোধ করছে।

আরবদের মতই গড় গড় করে আরবি বলে রানা। বেশ কয়েকবার এসেছে লিবিয়ায়। ওর ধারণা খুব সচেতন নয় লিবিয়ার জনতা, রাজনীতি নিয়ে আলাপ করতে ভীষণ দ্বিধা তাদের। দেশে স্বৈর-শাসক থাকলে যা হয়। তবে বদলাতে শুরু করেছে পরিস্থিতি। এখন একদল লোক চাইছে মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে। তাদের সহায়তা দিয়ে চলেছে পশ্চিমা বিশ্ব।

শেষে হয়তো লাভ হবে শুধু শ্বেতাঙ্গদেরই।

এয়ারবাসের বিষয়টি জেঁকে বসেছে রানার মনে। বুঝতে পারছে এ মিশনে নিজ লোক ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করা মস্ত ভুল হবে। ওই পাহাড়ে গিয়ে খুঁজে নেবে ওরা ফ্লাইট ভয়েস রেকর্ডার, সংগ্রহ করবে লাশের ডিএনএ। ডিএনএ-র ফলাফল না পাওয়া পর্যন্ত ধরে নেয়ার কারণ নেই প্রধানমন্ত্রী মারা গেছেন।

এয়ারবাস ধ্বংসাবশেষে কী যেন অস্বাভাবিক, কিন্তু তা ঠিক কী, ধরতে পারছে না রানা।

বারো

দেখা গেল, মার্ভেলকে যে বন্দরে ভিড়াবে, সেই হার্বার পাইলটই ওদের কন্ট্যাক্ট। হাসিখুশি, মাঝারি উচ্চতার লোক সে। কোঁকড়া চুলগুলো এখানে-ওখানে ধূসর হচ্ছে। উঁচু কপাল, নীচে ঘন জোড়া ভুরু। ডান দিকেরটা খানিক কাটা পড়েছে। বোধহয় ছুরি বা বাসনের কানার আঘাতে। যখন চুপ থাকে, মাড়ির ফোকর বুজে রাখে জিভ দিয়ে। সামনে বেড়ে থাকে চিবুক। বোধহয় গত কিছুদিনের ভিতর ভেঙেছে দুই দাঁত। ঠোঁটের এক কোণে কালসিটে। মারধর খাওয়ার চিহ্ন।

রানাকে বলেছে, এ কাজ নিয়েছে শুধু বাড়তি টাকা পাওয়ার জন্য। তার পরিবারের সদস্য বারোজন। আট ছেলে-মেয়ে, বুড়ো বাবা-মা এবং তারা স্বামী-স্ত্রী। শুধু তাই নয়, তার এক শালা দুবাইয়ে কনস্ট্রাকশনের চাকরি খুইয়েছে, ফলে ওই পরিবারও এসে উঠেছে তার বাড়িতে। এদিকে বড় মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে। সব মিলে বিপদের ভিতর রয়েছে সে।

এসবই জানা গেল বোর্ডিং ল্যাডার বেয়ে উঠবার সময়। তাকে সুপারস্ট্রাকচারে ক্যাপ্টেনের কেবিনে নিয়ে এল রানা।

'কোনও সন্দেহ নেই আপনি অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ, জনাব হারিস,' গম্ভীর চেহারায় বলল রানা। যা বলছে নিজে তার এক ফোঁটাও বিশ্বাস করে না। ওর ধারণা, শহরে কোথাও উপ-পত্নী রাখতে গিয়ে চুরি-বাটপাড়ি করে লোকটা। আর সে কারণেই স্ত্রী

বা উপ-পত্নীর হাতে নিগৃহীত হয়ে তার দাঁত ভেঙেছে।

হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিল সারেং। প্রায় অন্ধকার কেবিনে জ্বলজ্বল করছে তার সিগারেটের ডগা। দিগন্তে হারিয়ে গেছে সূর্য, নেমে এসেছে আঁধার। বন্দর এলাকা থেকে বেশ দূরে থেমেছে মার্ভেল। লবণ ভরা পোর্টহোল দিয়ে শহরের মৃদু আলো আসছে। রং-জ্বলা ডেস্ক ল্যাম্প জ্বেলে দিয়েছে রানা। নিজে মেকআপ করে সামান্য পাল্টে নিয়েছে চেহারা। কাঁধ ছেয়ে যাওয়া নকল চুলগুলো কালো। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। তুলার কারণে ফুলে আছে দুই গাল। চায় না হারিস ওকে ভাল করে চিনে রাখুক। অবশ্য ওর অভিজ্ঞতা বলে, এ ধরনের লোক কখনও কারও দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে না।

'আমরা সবাই বাধ্য হয়ে কত কিছুই না করি,' বলল কণ্ট্যাক্ট হারিস। একটা অতি ব্যবহৃত লেদার ব্রিফকেস ডেস্কের উপর রেখে ঢাকনি খুলে ফেলল। 'আমাদের উভয়ের কমোন বন্ধু বলেছে একটা ট্রাক নামাতে হবে জাহাজ থেকে। সেই সঙ্গে লাগবে কয়েকজনের ভিসা। পাসপোর্টে স্ট্যাম্প দিতে হবে।' কয়েকটা কাগজ বের করল সে। উপরেরটা কাস্টমসের স্ট্যাম্প। এই রুটিন ভাল করেই জানে রানা, পাসপোর্টগুলো বাড়িয়ে দিল। মোফিজ বিল্লাহ্‌র জাদুর দোকান থেকে এসেছে এগুলো। ছবি ছাড়া সব তথ্য মিথ্যা।

কয়েক মিনিট ধরে নাম ও তথ্যগুলোর রেকর্ড টুকল হারিস, তারপর প্রতিটি পাসপোর্টে বসিয়ে দিল স্ট্যাম্প। কাজ শেষে রানার হাতে দিল। এবার আরও কয়েকটা কাগজ বের করল। 'এগুলো দেবেন কাস্টম্‌স্ ইন্সপেক্টরকে। এসব ট্রাকের জন্য। আর এগুলো...' ব্রিফকেস থেকে দুটো লাইসেন্স প্লেট বের করে ডেস্কের উপর রাখল। 'এ দুটো রাখুন। কেউ প্রশ্ন তুলবে না, অনায়াসে যেতে পারবেন দেশের যে-কোনও জায়গায়।'

ভালই হলো, শহরতলী থেকে কোনও গাড়ির লাইসেন্স প্লেট চুরি করতে হবে না। রানা বলল, 'দেখছি, নিখুঁত কাজ করেন আপনি। অনেক ধন্যবাদ।'

চওড়া হাসল লিবিয়ান। 'সব ব্যবসা, বুঝলেন? কাস্টমারকে সেরা সেবা দিই আমি। সব সময়।'

'কোনও সন্দেহ নেই।'

'আর ওই প্লেটের জন্য লাগছে আপনার মাত্র পাঁচ শ' ডলার।'

শালা ক্ষুধার্ত কুমিরের মত মস্ত হাঁ করেছে, মনে মনে বলল রানা।

'নম্বর কেমন মনে রাখেন?' জানতে চাইল হারিস।

'নম্বর?'

'হ্যাঁ, নম্বর। আমার মোবাইল ফোনের নম্বরটা দিতে চাই। কিন্তু ওটা আবার কাগজে টুকে রাখবেন না।'

'বলুন, মনে থাকবে।'

একের পর এক ডিজিট বলে গেল হারিস। 'এই নম্বরে যোগাযোগ করলে এক লোক ধরবে। সে খবর দেবে আমাকে। এক ঘণ্টার ভিতর আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি।' হাসি ফুটল তার মুখে। 'অবশ্য আমার বউয়ের সঙ্গে বিছানায় থাকলে... বুঝতেই তো পারছেন!'

বাধ্য হয়ে ওর হাসিতে যোগ দিল রানা। 'মনে করি না আপনার সার্ভিস আবার লাগবে, তবে ধন্যবাদ।'

মুখের হাসি হাসি ভাব বদলে গেল হারিসের, জোড়া ভুরুর নীচে সরু হয়ে গেল দুই চোখ। 'আমার ধারণা ক'জন লোক বা মেয়েলোক এ দেশের বড় কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তবে কোনও সংবাদপত্রে অস্বাভাবিক কিছু যদি দেখি, সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠব। আর সেক্ষেত্রে দেরি না করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমার জানা আছে কী ভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা

যায়। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কী বলতে চাই?'

এ সতর্কবাণী শুনে রাগল না রানা। এ শুনবার জন্য তৈরিই ছিল। প্রতিবছর কমপক্ষে এক ডজন লোক ওকে বলে এসব। তাদের কারও কারও ক্ষমতা নেই, তা-ও নয়। হয়তো হারিস তাদের একজন। দেখে প্যাঁচালো লোক মনে হয় না, কিন্তু হতে পারে অন্য রকম। এ যদি ওদেরকে বিপদে ফেলে, বদলে বিপদ হবে তার নিজেরই। ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে ওরা।

'নিশ্চয়ই তাদের প্রধানমন্ত্রী মারা যাওয়ায় বাংলাদেশ সরকার বিচলিত,' মন্তব্য করল হারিস।

'হওয়ারই কথা,' বলল রানা। 'তবে আমার পাসপোর্টে নিশ্চয়ই দেখেছেন, আমি ভারতীয় নাগরিক। পুবের ওই দেশের সরকার কী করছে তার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই।'

'ওরা নিশ্চয়ই বিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে চাইছে?'

'তা-ই তো মনে হয়,' নির্বিকার স্বরে বলল রানা।

'আর আপনারা ঠিক কোথা থেকে এসেছেন?' হঠাৎ জানতে চাইল হারিস।

'নেপ্‌ল্‌স্‌।'

'তার মানে ইতালি?'

'হ্যাঁ।'

আস্তে করে মাথা দোলাল হারিস। এবার বলল, 'আপনি তো ভারতীয়। হয়তো আপনাদের সরকার চাইছে বাংলাদেশকে সাহায্য করতে?'

রানা বুঝল লোকটা আসলে নিশ্চয়তা চাইছে ওরা ওই বিমান খুঁজতে এসেছে, এর চেয়ে খারাপ কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। লোকটাকে খানিক স্বস্তি দিতে বলল, 'নিশ্চয়ই বাংলাদেশ সরকার ওই বিমান খুঁজতে লিবিয়ার সরকারকে সহায়তা দিতে চাইবে।'

হাসি ফিরল সারেঙের মুখে। 'গতরাতে টেলিভিশনে বক্তৃতা

দিয়েছেন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আলী। তিনি বলেছেন ওই হারিয়ে যাওয়া বিমানের ব্যাপারে কেউ কিছু জানলে, যেন দেরি না করে জানায়। ওটা পাওয়া গেলে কারও ক্ষতি নেই, কী বলেন?'

'তা-ই তো মনে হয়,' বলল রানা। বিরক্ত বোধ করছে। লোকটা একের পর এক প্রশ্ন করছে। ডেস্কের ড্রয়ার টেনে খুলল রানা। ঝুঁকে এল হারিস। পেট-মোটা এনভেলপ বের করল রানা, থপ্ করে রাখল ডেস্কের উপর। বুক পকেট থেকে বের করল কয়েকটা নোট, পাঁচটা এক শ' ডলার বের করে এনভেলপের সঙ্গে যোগ করল। 'এই যে আপনার সম্মানী।'

খামটা খপ্ করে তুলে নিল হারিস, রেখে দিল ব্রিফকেসের ভিতর। ধপ্ করে বন্ধ হলো ঢাকনি। 'আমার যে বন্ধু আমাদের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন আপনি খুব সম্মানিত, ভদ্র লোক। তাঁর কথা মেনে নিয়েছি বলেই আর গুণব না টাকাগুলো।'

এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করল না রানা। ওর ধারণা এ লোক মার্ভেলকে বার্থে রাখবার আগে কমপক্ষে দু'বার গুণবে ডলারগুলো। 'আপনি আগেই বলেছেন, ব্যবসা হচ্ছে কাস্টমারকে সন্তুষ্ট রাখা,' বলল রানা। 'সেই সঙ্গে নিজের সুনাম বজায় রাখা।'

'ঠিক কথা।' উঠে দাঁড়াল দু'জন, করমর্দন করল। 'এবার, ক্যাপ্টেন রানা, দয়া করে ব্রিজে চলুন। আর দেরি করাতে চাই না আপনাকে।'

'চলুন, যাওয়া যাক।'

রানা শুনেছে, সংগঠিত অপরাধ চক্রের শুরু প্রাচীন ফিনিশিয়ান বন্দরগুলোতে। ক'জন মজুর মিলে একটা মদের বোতল চুরি করে। কাজটা করতে গিয়ে কয়েক চুমুক গিলতে দেয় প্রহরীদেরকে। এবং দেখে ফেলে কেউ, সে লোকই মজুরদের

উৎসাহিত করে আরও জিনিস চুরি করতে। একটা চুরির জন্য লাগে তিনটি জরুরি জিনিস, চোর, অপরাধপ্রবণ প্রহরী এবং ওই এলাকার দুর্নীতি-পরায়ণ কর্তৃপক্ষ। হাজারো বছর পেরিয়ে গেলেও সব একই রকম চলছে, তবে চুরির মাত্রা বেড়েছে কোটি গুণ। বন্দর এলাকা মানেই চোর-বাটপার ও ডাকাতের আস্তানা। কেউ সরকারী পদে আসীন ডাকাত, কেউ বেসরকারী ভাবে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে।

কণ্টেইনার আবিষ্কার হওয়ার পর কমে গেল চুরি-ডাকাতি। জিনিস থাকত তখন বাক্সের ভিতর। তারপর নানা ধরনের মাফিয়া ডন বুঝল, কী করতে হবে। তারা পুরো কণ্টেইনারই লোপাট করতে লাগল।

একটু দূরে ডক। এ মুহূর্তে উইং ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ওর পাশে প্রিয় বন্ধু সোহেল আহমেদ, ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। তবে ধোঁয়া দিয়ে ভাগাতে পারছে না ডকের বাঙ্কার অয়েল ও পচা মাছের দুর্গন্ধ। মার্ভেল যে বার্থে থেমেছে, তার পাশ দিয়ে গেছে মোবাইল ক্রেন। ক্রলার ট্রেডগুলো থেকে ঝুলছে কণ্টেইনার। ওটা তুলে নেয়া হয়েছে এক কোস্টাল ফ্রেইটার থেকে। ক্রেনে কোনও বাতি জ্বলছে না। বন্ধ রাখা হয়েছে গ্যান্ট্রি লণ্ঠনগুলো। ট্রাকটর ট্রেইলার অপেক্ষা করছে মাল বহন করতে। ওটার হেডলাইট নেভানো। কণ্টেইনারের পাশে দাঁড়িয়েছে এক কর্মী, হাতে একটু পর পর জ্বলছে টর্চ। সেই আচমকা আলো-আঁধারিতে খানিক দেখা যায়। মিস্টার হারিস মার্ভেলকে এখানে রেখেই ছুটে গেছে আনলোডিং দেখতে। ডকে তাকে দেখছে রানা। ওই জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কী যেন বলছে সে। এত আলো নেই যে খাম বদলের দৃশ্য চোখে পড়বে। অবশ্য মার্ভেলের লো লাইট ক্যামেরা সবই ধরছে।

'আমাদের কণ্ট্যাক্ট ভাল মক্কেলই ধরেছে,' বলল সোহেল।

'খুব ব্যস্ত লোক এই হারিস!'

'ক্যাসাব্লাঙ্কায় ক্লড রেইন্স বলে, "আমি শুধু বেচারা এক দুর্নীতি-পরায়ণ কর্তৃপক্ষ।"'

ওয়াকি-টকিতে স্বর্ণার কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা। 'হ্যাচের ঢাকনা খুলে নেয়া হয়েছে। আমরা তৈরি।'

'ঠিক আছে। হারিস জানিয়েছে আমরা চাইলে মার্ভেলের ক্রেন দিয়ে ট্রাক আনলোড করতে পারি। সবাই কাজে নেমে পড়ুক।'

'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই।'

রহস্যময় জাহাজের উল্টো ডকে থেমেছে মার্ভেল, ঘুটঘুটে অন্ধকারে। দূরে বিশাল এক কন্টেইনার শিপ থেকে মাল নামিয়ে চলেছে উঁচু ক্রেনগুলো। সোডিয়াম-ভেপার আলোয় দিন হয়ে গেছে ওদিক। সিকিউরিটি ফেন্সের ওপাশে আলোর বাইরে অন্ধকারে শত শত কন্টেইনার। ওখানে রয়েছে একের পর এক ওয়্যারহাউস ও বিশাল উঁচু অয়েল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক।

দিগন্তের দিকে বাহু বাড়িয়ে কাজ শুরু করেছে মার্ভেলের ডেক ক্রেন। ড্রাম থেকে বেরুচ্ছে স্টিলের কেবল। খোলা এক হ্যাচের উপর গেল ক্রেনের বাহু। স্টিলের তার নেমে গেল হোল্ডের ভিতর। দু' মিনিট পর ট্যাকলের মাধ্যমে উঠে আসতে লাগল মাল। সহজেই ওজন নিল বুম।

আঁধারে বিস্তারিত কিছু দেখা গেল না। তবে বোঝা গেল উঠে আসছে ডক্টর শামশের আলীর গর্বের সেই বস্তু। যে-কেউ দেখে বলবে ওটা অতি সাধারণ এক মাল-টানা ট্রাক। এক পাশে নকল অয়েল এক্সপ্লোরেশন কোম্পানির নাম। ট্রাকের বাইরের অংশ যেমন তেমন, কিন্তু চেসিসটা মার্সিডিজ ইউনিমগ। ওটাই একমাত্র জিনিস যা মডিফায়েড নয়। নানা দিক দিয়ে বদলে নেয়া হয়েছে টার্বোডিজেল ইঞ্জিন, ঠিক ভাবে টিউন্ড্ থাকলে শক্তি মেলে আট শ' হর্সপাওয়ার। আর নাইট্রিয়াস অক্সাইড বুস্ট দেয়া হলে ইঞ্জিন

দেবে এক হাজার হর্সপাওয়ার। পুরু সেলফ সিলিং টায়ারগুলোর উপর আর্টিকিউলেটিং সাসপেনশন। প্রয়োজন পড়লে উঁচু-নিচু করবে ট্রাককে। উঁচু করলে তখন দুই ফুট নীচে থাকবে মাটি। অর্থাৎ আমেরিকান আর্মির দোতলা হামভির চেয়ে ছ' ইঞ্চি উঁচু। চারজন আরোহী অনায়াসে বসতে পারে ক্যাবে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে রাইফেলের গুলিতে কিছুই হয় না সামনের চাকার। বাক্সের মত ক্যাব একই ভাবে আর্মার্ড।

প্রথম যখন বিসিআইয়ের সবাই জানল ডক্টর শামশের আলী কী পরিকল্পনা করেছেন, মেজর জেনারেল, রানা ও সোহেল ছাড়া অন্যরা পেট কাঁপিয়ে হেসেছে। পাগলা বৈজ্ঞানিকের নাম দিয়েছে "কিউ", জেমস বণ্ড বই বা সিনেমার সেই বিখ্যাত আর্মারার। ট্রাকের সামনের বাম্পারে রয়েছে .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান। যন্ত্র-দানবের দু'পাশে র‍্যাকের ভিতর রয়েছে গাইডেড রকেট। রয়েছে জেনারেটার, এতই ঘন ধোঁয়া তৈরি করে, চারপাশ আঁধার করে দেয়। ছাতে রয়েছে একটা হ্যাচ, ওখান দিয়ে ছোঁড়া যায় একের পর এক মর্টার। ওটার বদলে রাখা যায় .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান বা অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার। মিশন বুঝে কার্গো এরিয়া বদলে নেয়া যায়। ওটা হয়ে উঠতে পারে মোবাইল সার্জিকাল সুইট, হতে পারে লুকানো রেইডার স্টেশন। সেসব যদি না লাগে, পিছন অংশ ব্যবহার করা যায় ট্রুপ ক্যারিয়ার হিসাবে। সেখানে বসতে পারে পুরোপুরি সশস্ত্র দশজন সৈনিক।

ট্রাকের চাকা স্বাভাবিকের চেয়ে খানিক বড়, এটুকুই তফাত, এ ছাড়া কেউ সন্দেহ করবে না এই জিনিস ব্যতিক্রম কিছু। ডক্টর শামশের আলী ট্রাকের নাম দিয়েছেন 'সুন্দরী'। মার্ভেলের মতই শক্তপোক্ত, তফাৎ শুধু সুন্দরী মাটিতে চলে। কোনও ইন্সপেক্টর পিছনের দরজা খুললে দেখবে সোজা ছয়টি পঞ্চান্ন গ্যালনের ড্রাম। লোকটা যদি সন্দেহের বশে পিছনের সারি ড্রাম সরায়, সেক্ষেত্রে

বেরুবে দ্বিতীয় সারি ড্রাম। পিছনেরগুলো সত্যিই বাড়তি ফিউয়েল। ওগুলোর কারণে সুন্দরী আট শ' মাইল চলতে পারে। দ্বিতীয় সারির ড্রামগুলো আড়াল দিয়েছে ট্রাকের ভিতর অংশকে। আশা করা হয়েছে কেউ এই সারির ড্রাম সরাবে না।

'দেখা যাক পাগলা প্রফেসরের প্রেমিকা কেমন কাজের,' নিচু স্বরে বলল সোহেল।

'আমার পুরো বিশ্বাস আছে তাঁর উপর,' বলল রানা। বন্ধুর দিকে চাইল। 'তোরা মার্ভেলকে কখন সরিয়ে নিবি?'

'তোরা ত্রিপোলি থেকে সরে গেলেই। গগলের সঙ্গে কথা হয়েছে। বন্দর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমে যাব। বিমান যেখানে ক্র্যাশ করেছে, ঠিক তার উত্তরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় বসে থাকব। দশ মিনিটের নোটিসে আকাশে উঠবে হেলিকপ্টার।'

'তোরা যেখানে থাকবি, তাতে হেলিকপ্টারের ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ ব্যবহার করতে হবে। তবুও ভাল। হাতের পাঁচ থাকল। সব যদি পরিকল্পনা মত চলে, তোরা সাগরে থেকে আমাদের অনুসরণ করবি। এদিকে আমরা ঢুকে পড়ব তিউনিশিয়ার জমিতে।'

'আশা করা যায় তোর ''সি প্ল্যান'' প্রয়োজন পড়বে না।'

হুইলহাউসের স্পিকারে স্ট্যাটিকের আওয়াজ শুরু হলো। ঘরে ঢুকে মাইক্রোফোন নিল রানা, 'রানা বলছি।'

'সুন্দরীকে ডকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে, মাসুদ ভাই,' বলল স্বর্ণা। 'রায়হান ভাইয়ের কাছে জানলাম লিবিয়ানদের সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিম কাজ করছে ক্র্যাশ এলাকা থেকে তিন শ' মাইল দূরে।'

'ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট পর গ্যাংওয়ের উপর দেখা হবে,' বন্ধুর পাশে এসে ফ্লাইং ব্রিজে ফিরল রানা।

ফুরিয়ে আসা সিগারেট টোকা দিয়ে বাতাসে ভাসিয়ে দিল সোহেল। একটু দূরে গিয়ে সাগরে পড়ল আগুন। সঙ্গে সঙ্গে নিভে

গেল। 'আমার ভাল লাগছে না, রানা। তোদের মিশন আছে। কিন্তু আমি? জাহাজের পাহারাদারের মত শুধু বসে থাকব।'

'জাহাজের পুরো দায়িত্ব তোর হাতে,' বলল রানা। 'আর কখন তোকে লাগবে কেউ জানে না।'

'কয়েক মাস পেরুল কোনও অ্যাকশনে নেই। এতে মন ছোট হয়।'

'বুঝি। প্রথম সুযোগেই উড়াল দিবি তুই।'

'যদি কোনও মিশন পাই।'

'হয়তো পাবি,' বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে দিল রানা। 'আপাতত চললাম রে। দুই থেকে তিন দিন পর দেখা হবে।'

'চল, তোকে পৌঁছে দিই ডক পর্যন্ত।'

পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দুই অকৃত্রিম বন্ধু।

সুন্দরীকে নিয়ে চলেছে রানা, পাশে শটগান হাতে খোরশেদ নবী। পিছনের বেঞ্চ সিটে পাশাপাশি লেফটেন্যান্ট সানজিদা স্বর্ণা ও ক্যাপ্টেন নিশাত সুলতানা। প্রত্যেকের পরনে খাকি জাম্পসুট। উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য-প্রাচ্যে অয়েল ওঅর্কারদের ইউনিফর্ম বলতে, এ-ই। চুলগুলো বেসবল ক্যাপের নীচে গুঁজে রেখেছে স্বর্ণা। একই কাজ করেছে নিশাত। দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে ওভারসিজ কাজের জন্য এসেছে দুই তরুণ, এখনও গোঁফ-দাড়ি গজায়নি।

ভোরের ধূসর আলো ফুটতে বেশ দেরি। ওরা পিছনে রেখে এসেছে ত্রিপোলি শহরের ঝলমলে আলো। উপকূলবর্তী সড়কে ট্রাফিক নেই বললেই চলে। এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে কোনও রোডব্লকের সামনে পড়েনি। সাইরেন বাজিয়ে গেছে এক পুলিশ ক্রুজার। মাথার উপর জ্বলছিল আলো। তবে ট্রাক থামায়নি, দ্রুত গতিতে চলে গেছে। তারপর থেকে কোনও গাড়ি চোখে পড়েনি।

নকল কাগজপত্রের বিষয়ে পুরো নিশ্চিন্ত রানা। এখন যতক্ষণ পারা যায় এগুতে চাইছে। নিয়ম মাফিক তল্লাসী নিয়ে ভয় নেই, যত চিন্তা দুর্নীতি-পরায়ণ পুলিশ নিয়ে। এরা রোডব্লক তৈরি করে ঘুষ দাবি করে। কখনও থানায় ধরে নিয়ে যেতে চায় ঝগড়াটে পুলিশ। সেক্ষেত্রে সমস্যা হবে। পরিস্থিতি প্যাঁচালো হতে পারে, কাজেই পকেটে লিবিয়ান দিনার রেখেছে রানা।

আরও দুই মাইল গেলে ডানে মরুভূমিতে যাওয়ার সরু পথ। সুন্দরীর ইন্টিগ্রেটেড ন্যাভিগেশন সিস্টেম ওদের নিয়ে যাবে ভূ-পাতিত বিমানের কাছে।

নীরবে পেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল রানা।

দূরে রোডব্লক দেখা যাচ্ছে। ঠিক যেখানে ওরা হাইওয়ে ছেড়ে মরুভূমিতে প্রবেশ করবে, তার মাত্র দুই শ' ফুট এদিকে রোডব্লক! চেক করা হচ্ছে একটা সিভিলিয়ান গাড়ি। পাশের লেন ব্লক করা হয়েছে দুটো ক্রুজার পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে। বোঝা যাচ্ছে, রানাদের নয়, থামাতে চাইছে মরুভূমির দিক থেকে আসা গাড়ি। কিন্তু তাই বলে সতর্কতায় ঢিল পড়ল না রানার। এটা পুলিশের ধোঁকা দেবার একটা কৌশলও হতে পারে।

ব্রেক কষে গতি কমাতে শুরু করেছে রানা।

'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়,' বিড়বিড় করে বলল নবী।

রিফ্লেকটিভ ভেস্ট পরনে এক পুলিশ ঝুঁকে পড়েছে সেডানের জানালায়। ভিতরে ফেলছে ফ্ল্যাশলাইট। একটা ক্রুজারের ভিতর আরও দু'জন পুলিশকে দেখল রানা। ওর ধারণা হলো, চতুর্থ আরেকজন আড়ালে কোথাও অপেক্ষা করছে।

গতি আরও কমিয়ে এনেছে রানা। জানতে চাইল, 'নবী, রোডব্লক এড়িয়ে আর কোনও রাস্তায় মরুভূমিতে ঢোকা সম্ভব?'

মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন। 'না, মাসুদ ভাই। স্যাটালাইটের ইমেজ থেকে রুট ঠিক করেছে রায়হান। রোডব্লক পেরুলে খানিক বাদেই সরু পথ। ওই পথেই যেতে হবে, নইলে শুরু হবে খাড়া টিলা। তবে কিছুদূর পিছিয়ে গেলে পাব আরেকটা কাঁচা ট্রেইল, ওটা পৌঁছে দেবে টিলার উপর। ওখান দিয়ে মরুভূমিতে নামা যেতে পারে।'

'এখন আর পিছানো সম্ভব নয়। তার মানে আমাদের সামনেই এগুতে হবে।'

'আসলে তা-ই।'

রোডব্লকের বিশ ফুট দূরে রাস্তার বাম ঘেঁষে থামল ট্রাক। সিভিলিয়ান গাড়িটা ছাড়া পেলে ট্রাকের পাশ কাটিয়ে সহজেই যেতে পারবে।

সিটের পাশের পকেটে হাত রাখল রানা, একবার স্পর্শ করে নিল প্রিয় ওয়ালথার পি.পি.কে-টা। প্রয়োজন পড়লে বের করবে। রোডব্লকের দিকে চাইল, সেল্‌ফ্‌-ড্রিভেন ওই গাড়িতে রয়েছে মালিকের গোটা পরিবার। স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে মহিলা। টর্চের আলোয় দেখা গেল চাঁদের মত গোল মুখ। মহিলা কাঁধের উপর দুলিয়ে চলেছে এক শিশুকে। ভেসে এল বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। ব্যাক সিটে তার ভাই, বছর চারেকের। চালক বা পুলিশের বক্তব্য বুঝল না রানা। তবে মনে হলো উত্তপ্ত কথা চলছে। গলা উঁচিয়ে কী যেন বলছে ছেলের বাবা।

'কী অপরাধে আটকালো?' আপন মনে বলল স্বর্ণা।

রানা জবাব দেয়ার আগেই, জানালা থেকে এক পা পিছিয়ে গেল পুলিশ, ঝটকা দিয়ে বের করল পিস্তল। তীক্ষ্ণ সুরে চেঁচিয়ে উঠল মহিলা, কাঁদছে ব্যাকসিটের বাচ্চাটাও। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার উপর দু'হাত তুলেছে মহিলার স্বামী।

পুলিশ ক্রুজারের দুই দরজা খুলে গেল, ছিটকে বেরিয়ে এল

গাড়িতে বসা দুজন। হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল। একজন চলল প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা লক্ষ্য করে। আর তার সঙ্গী অপ্রত্যাশিত ভাবে ছুটে এল রানাদের দিকে। পিস্তল তাক করেছে ক্যাবের উইণ্ডশিল্ড বরাবর।

সবই বুঝল রানা, তবে দেরি করে। আসল টার্গেট ওরাই, এতক্ষণ অভিনয় চলছিল। প্রচণ্ড রেগে গেল ও নিজের উপর।

সুইচ টিপে গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট খুলে ফেলেছে ক্যাপ্টেন নবী, স্বয়ংক্রিয় ভাবে বেরিয়ে এসেছে ট্রে। উপরে ফ্ল্যাট-প্যানেল ডিসপ্লে, কি-বোর্ড ও খুদে জয়স্টিক। আঁধারে কি-বোর্ড টিপতে গিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ল নবী, অথচ এখনই চালু করতে হবে মেশিনগান।

সামনের সিভিলিয়ান গাড়ির জানালা দিয়ে গুলি করল পাশে দাঁড়ানো পুলিশটা। লাল কুয়াশার ভিতর হারিয়ে গেল চালকের মাথা, আচমকা বিস্ফোরিত হয়েছে। উইণ্ডশিল্ডে ছিটকে লাগল চটচটে রক্ত ও হলদেটে মগজ। ভিতরের দৃশ্য হারিয়ে গেল রানার চোখ থেকে। আরও দু'বার গুলি করল লোকটা। মহিলা ও শিশুর কান্না থামল মাঝপথে। চতুর্থবার গুলি হলো। রানা নিশ্চিত, মেরে ফেলেছে পিছন সিটে দাঁড়ানো ছেলেটিকেও!

ঘুষ না দেয়ার অপরাধে? আশ্চর্য!

ভুরুজোড়া কুঁচকে গেছে রানার, যন্ত্রের মত চলছে হাত-পা, গিয়ার দিয়েই চেপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। দ্রুত গতি তুলবার ক্ষমতা নেই সুন্দরীর, তবে ক্রুদ্ধ সিংহীর মত গর্জে উঠে হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল। ওদের দিকে ছুটে আসছিল ক্রুজারের দ্বিতীয় জন, হঠাৎ থমকে গেল মাঝপথে, ট্রাকের মতলব ভাল না বুঝে পিস্তল তুলে গুলি শুরু করল। প্রথম দুটো বুলেট লাগল সেফটি গ্লাসে, তৈরি হলো খুদে গর্ত। পরেরগুলো ছিটকে গেল ট্রাকের আর্মার্ড প্লেটে লেগে।

'পেয়েছি!' বলল নবী।

চট্ করে ওদিকে চাইল রানা। ভিডিও স্ক্রিনে দেখা গেল ক্যামেরা, গোপন মেশিনগানের নীচে। এইমিং রেফারেন্স দেবে নবীকে। নীচে নেমে গেল মেশিনগান, বাম্পারের তলা থেকে বেরুল ব্যারেল।

'জলদি, নবী!' তাড়া দিল রানা।

কি-বোর্ডে টোকা দিল ক্যাপ্টেন। বিশ্রী খ্যাট-খ্যাট আওয়াজ শুরু হলো, মৃদু কাঁপতে লাগল পুরো ট্রাক। ক্যাবের নীচ থেকে বেরুল কমলা আগুনের শিখা। সামনে রাস্তার পিচ বিস্ফোরিত হলো। ঘুরেই বামদিকে ছুটতে চাইল লোকটা, তবে বেশি তাড়াহুড়ো করেছে। বাম গোড়ালির ভিতর ঢুকল দুটো গুলি। অন্যগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে দিল গোটা দেহ। মেশিনগান থেকে প্রতি মিনিটে বেরোয় চার শ' গুলি। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে অ্যাসফল্টের উপর চিত হয়ে পড়ল লোকটা। যেন হামলা করেছে সিংহ, খাবলে নিয়ে গেছে বুকের মাংস।

যে লোকটা এইমাত্র ওই পরিবারটাকে খুন করেছে, মূর্তির মত জায়গায় জমে গেল সে। ট্রিগার থেকে আঙুল তুলেছে নবী, ব্যারেল তাক করেছে সিভিলিয়ান গাড়ির বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ানো দ্বিতীয় লোকটার দিকে। অজস্র বুলেট বিঁধল তার গায়ে, শরীর ভেদ করে বিস্ফোরিত করল উইণ্ডশিল্ড ও পাশের জানালা। স্টিলের বডিতে ঠকাঠক লাগল বুলেট। দুই চাকা ফেটে যেতেই নিচু হয়ে বসে গেল গাড়ি। কয়েক সেকেণ্ড মন্ত্রমুগ্ধের মত আধ খোলা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে অবস্থাটা বুঝে নিল খুনি লোকটা। টের পেল, এখন এখানে থাকা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। ধপ করে পড়ল সে রাস্তার উপর, খানিক দূরেই তার ক্রুজার, হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল গাড়ির সামনের চাকার আড়ালে। এবার বৃষ্টির মত ক্রুজারের দিকে আসতে শুরু করল বুলেট।

আপাতত আশ্রয় ছাড়বে না লোকটা।

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ক্রুজারের দিকে চলল রানা। খুনি প্রায় উঠে পড়েছে সামনের সিটে, কিন্তু তার উপর পড়ল সুন্দরীর শক্তিশালী হ্যালোজেন বাতি। দিন হয়ে গেল গাড়ির ভিতরের অংশ। টার্গেট পেয়েও হারাল নবী। পিস্তল উঁচু করে দ্রুত ট্রিগার টিপছে খুনি। কিন্তু ট্রাকের পুরু আর্মারে একটা বুলেটও বিঁধল না।

শীতল রাগ ছাড়া কিছু নেই রানার মনে। সোজাসুজি চলল গাড়িটার দিকে। 'শক্ত হয়ে বসো সবাই,' চাপা স্বরে বলল।

দু' সেকেণ্ড পেল রায়হান-স্বর্ণা-নিশাত, তারপর ক্রুজারের উপর চড়াও হলো ট্রাক। শুরু হলো ভয়ঙ্কর ধাতব মুড়মুড়ে আওয়াজ। ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেল ক্রুজারের দরজা। চ্যাপ্টা করে দিল লোকটাকে। তার বাম পা ও কব্জি কাটা পড়েছে ডোর ফ্রেমে। একটা গুলি ঢুকল কপালে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে হেঁচড়ে চলল ক্রুজার, চাকাগুলো পিচের উপর হোঁচট খেল। তারপর কাত হয়েই চিত হয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে।

'প্রথম ক্রুজার, মাসুদ ভাই!' পিছন থেকে বলল স্বর্ণা।

চতুর্থ লোকটা অন্ধকার থেকে দৌড়ে এসে ঢুকে পড়েছে ক্রুজারের ভিতর, বোধহয় পুলিশ স্টেশনে রেডিও করতে চাইছে। ট্রাক ঘুরিয়ে মেশিনগান তাক করার সময় নেই। সিটের পাশের পকেট থেকে ওয়ালথার বের করে পিছনে স্বর্ণার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা।

ওটা ডানহাতে নিল লেফটেন্যান্ট, বাম হাতে নামাচ্ছে বুলেট প্রুফ জানালার কাঁচ। সেফটি ক্যাচ নামানো হতেই জানালা দিয়ে বের করল ওয়ালথার। ফিল্ড অভ ফায়ার দেয়ার জন্য উবু হয়ে গেল নিশাত সুলতানা।

তবে সঠিক অ্যাংগেল পেল না স্বর্ণা, গানম্যানকে পাওয়ার জন্য জানালা দিয়ে কোমর পর্যন্ত বের করে দিল। বামহাতে শক্ত

করে ধরেছে বড়সড় সাইড মিরর। পরক্ষণে গুলি করল। এত দ্রুত ট্রিগার টিপছে, যেন একের পর এক পটকা ফুটছে।

স্বর্ণাকে সাবধান করতে চাইল রানা, এই চেক পয়েন্টে আরও কেউ থাকতে পারে। কিন্তু মুখ ফুটে বলবার আগেই দেখা গেল একটা বালির ঢিবি থেকে ছুটে আসছে পঞ্চম লোকটা দু' হাতে ধরেছে মেশিন পিস্তল। তবে দূরত্বের কারণে লক্ষ্যভেদে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো সে। ওই অস্ত্র প্রতি মিনিটে পাঁচ শ' রাউণ্ড বর্ষণ করে, ঠিক চার সেকেণ্ড লাগল ম্যাগাজিন খালি হতে। ট্রাকের উইণ্ডশিল্ড ও আর্মারে লেগে ছিটকে গেল বুলেট। কাঁচের উপর তৈরি হয়েছে কয়েকটা খুদে নক্ষত্র। স্বর্ণার উপর দিয়ে ভিতরে ঢুকল একটা রাউণ্ড, এখানে-ওখানে ঠোকর খেয়ে থামল ওর মাথার ঠিক পাশে, ট্রাকের জানালার ফ্রেমে। ইস্পাতের চল্টা উঠল ওখান থেকে, লাগল নিশাতের ঘাড়ে। ওই শ্র্যাপনেল একটু এদিক-ওদিক গেলে কাটা পড়ত জাগিউলার ভেইন।

বামহাতে ঘাড় চেপে ধরল নিশাত, ডানহাতে শক্ত করে ধরেছে স্বর্ণার গোড়ালি পড়তে দেবে না। বনবন করে হুইল ঘোরাল রানা, মেশিন পিস্তলওয়ালার এপাশে রাখতে চাইছে ট্রাকের বাম পাশ। ফলে রাস্তার উপর পড়ার উপক্রম করল স্বর্ণা। ওকে দ্রুত টেনে নিল নিশাত।

'আপনার গুলি লেগেছে, আপা!' সোজা হয়ে বসেই জানতে চাইল স্বর্ণা।' এইমাত্র দেখেছে রক্তে ভেজা নিশাতের হাত। 'কোথায় লাগল?'

'ঘাড়ে। আলু ছিলতে গিয়ে হাত কাটলেও এর চেয়ে বেশি রক্ত বের হয়,' নির্বিকার স্বরে বলল নিশাত। তবে স্বর্ণা সিটের নীচ থেকে ফার্স্ট এইড কিট বের করেছে দেখে আপত্তি তুলল না।

রানা ঘুরিয়ে নিয়েছে ট্রাক, সুযোগ করে দিল মেশিনগান ব্যবহার করবার। কয়েক সেকেণ্ড বাড়তি এনে দিয়েছে স্বর্ণা।

চতুর্থ লোকটা লুকিয়ে পড়েছে ক্রুজারের আড়ালে, দুই হাতে খুঁজছে রেডিওর মাইক।

সুযোগ পেয়ে মেশিনগান চালু করল নবী। ড্রাইভারের কম্পার্টমেণ্টের দিকে খেয়াল নেই। ওদিকটা দুর্গের মত। তার বদলে বেছে নিয়েছে ক্রুজারের পিছন অংশ। অজস্র বুলেট বিঁধল ট্যাঙ্কে, সঙ্গে সঙ্গে ছলকে বেরিয়ে এল গ্যাসোলিন। মেশিনগানের প্রতিটি সপ্তম রাউণ্ড ম্যাগনিফিয়াম-টিপড ট্রেসার, এক সেকেণ্ড লাগল অকটেনের পুকুরে আগুন ধরতে। ক্রুজারের নীচে তৈরি হলো আগুনের বিশাল কুণ্ডলি। হুউশ্ শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। ক্রুজারের পিছন অংশ অ্যাসফল্ট থেকে উপরে উঠল।

অবস্থা বেগতিক দেখে রেডিওর পিছনে সময় নষ্ট না করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে খুনি লোকটা, মরুভূমির দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে। তবে অনেক দেরি করে ফেলেছে।

অকটেন ও বাতাসের কারণে বিস্ফোরিত হলো গ্যাস ট্যাঙ্ক। প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল চারপাশ। দশ ফুট উপরে উঠল ক্রুজার, পরক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে নেমে এল বড়সড় উল্কার মত। রাস্তার পাশে বালির উপর পড়ল ওটা, পলায়নরত পুলিশের এক ফুট দূরে। আগুন ও ধুলো ঘিরে ধরল লোকটাকে। কয়েক সেকেণ্ড পর ধুলো সরে যেতে দেখা গেল, মশালের মত জ্বলছে তার পোশাক। ধপ করে বালির উপর পড়ল সে, নিভাতে চাইছে আগুন। কিন্তু সারা শরীর অকটেনে ভেজা, নিভবে কেন। আগুনের ভিতর ছটফট করতে লাগল ডাঙায় তোলা মাছের মত।

দয়া করল নবী, এক সেকেণ্ডের জন্য ট্রিগার টিপল।

'পঞ্চম লোকটা কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'মনে হলো মরুভূমির দিকে ছুটছে,' বলল নিশাত। ওর ঘাড়ে গজ প্যাড আটকে দিয়েছে স্বর্ণা, পরিষ্কার করছে হাত।

মনে মনে কপালের দোষ দিল রানা। এখন হোক বা একটু

পর কোনও না কোনও গাড়ি আসবে, কাজেই সাক্ষী রাখা চলবে না। হুইল ঘুরিয়ে সড়ক থেকে মরুভূমিতে নামল রানা। কঠিন সাসপেনশন সহজেই বালির উপর দিয়ে নিয়ে চলেছে প্রকাণ্ড ট্রাককে। দেখতে না দেখতে গতি উঠল চল্লিশ মাইলে। হ্যালোজেন বাতির কারণে পরিষ্কার চোখে পড়ল লোকটার পদচিহ্ন। প্রাণপণে ছুটে চলেছে।

লোকটাকে খুঁজে বের করতে মাত্র এক মিনিট লাগল, ভীত খরগোশের মত ছুটছে সে। পিছন থেকে তেড়ে আসছে বিশাল ট্রাক, তারপরও আত্মসমর্পণ করছে না। দৌড়ে চলেছে। তার ঠিক পিছনে পৌঁছে গেল রানা। পিঠের কাছে ইঞ্জিনের গরম অনুভব করে ঘাড় কাত করে চাইল, তারপর নতুন উদ্যমে ছুটতে লাগল।

'একে নিয়ে কী করব আমরা?' জানতে চাইল নবী। চিন্তিত।

কোনও জবাব দিল না রানা। মানুষের নানা ধরনের মৃত্যু দেখেছে, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে খুন করতে চায় না। প্রার্থনা করছে, লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি শুরু করুক।

কিন্তু তা করবে না সে। হাত থেকে পড়ে গেছে অস্ত্র।

অন্য উপায় বের করতে হবে। পিছু নিয়ে চলেছে সুন্দরী। তিন ফুট সামনে লোকটা।

ঘাড়ের কাছে প্রকাণ্ড ট্রাক ভীত করে তুলেছে তাকে, হঠাৎ করেই ডজ দিয়ে অন্য দিকে সরতে চাইল—কিন্তু নরম বালিতে সড়াৎ করে পিছলে গেল বাম পা। ব্রেক কষল রানা, একই সঙ্গে বনবন করে ঘোরাল হুইল। চাইছে না ট্রাক লোকটার উপর উঠুক। দু' সেকেণ্ড পর থামল যন্ত্রদানব। তার আগেই বিশ্রী ঝাঁকি লাগায় টের পেল ওরা কী ঘটেছে।

সাসপেনশনের দুলুনি থামবার আগেই দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। এক পলক দেখল দেহটা। যা বুঝবার বুঝে নিয়েছে। আবারও উঠল ক্যাবে, গম্ভীর হয়ে গেছে। ওর মনে পড়ল লোকটা

ট্রাকের দিকে গুলি করছিল। জানালা থেকে ঝুলছিল লাশ। মাথার উপর ক্ষত তৈরি হয়েছে নিশাতের। কিন্তু এসব ভেবে মন থেকে দূর করতে পারল না লোকটার এই পরিণতি। আবার সড়কে এসে উঠল সুন্দরী, সিভিলিয়ান গাড়ির সামনে গিয়ে থামল। এখানেও জ্বলছে একটা পুলিশ ক্রুজার।

স্বর্ণার কাছ থেকে ওয়ালথার নিল রানা, নতুন ম্যাগাজিন ভরে টেনে নিল স্লাইড। অস্ত্র হাতে ক্যাব থেকে নামল, চার দিকে নজর রেখেছে। চলে গেল প্রথম ক্রুজারের পাশে। ওটার ভিতর থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিল রেডিওর মাইক্রোফোন, ছুঁড়ে মারল মরুভূমির দিকে। এখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না কেউ। দ্বিতীয় ক্রুজারের ভিতরের মাইক্রোফোন প্লাস্টিকের কাদা হয়ে গেছে। ওটা নিয়ে আর ভাবতে হবে না।

ফ্যামিলি সেডানের পাশে থামল রানা, একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভিতরে চাইল। গাড়ির ভিতর রক্তের আঁশটে গন্ধ। স্বামী-স্ত্রী ও দুই বাচ্চা, চারজনই মারা গেছে। একমাত্র সান্ত্বনা: এদের আঘাত ছিল গুরুতর, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে।

এসব অহেতুক মৃত্যু সবসময় ছোট করে দেয় মনটা। পরিবার কর্তার কোলে সরু ওয়ালেট দেখল রানা, ওটা তুলে নিল। ড্রাইভারের নাম আলী আহাম্মেদ। ত্রিপোলিতে থাকত। আইডি কার্ড অনুযায়ী সে হাই-স্কুলের শিক্ষক। মানিব্যাগে মাত্র কয়েকটা দিনার।

হঠাৎ রানার মনে হলো পাঁচ দুর্নীতিবাজ পুলিশ মারা যাওয়ায় কারও ক্ষতি হয়নি।

এই তরুণ পরিবার মরল, কারণ তারা গরীব ছিল, যথেষ্ট ঘুষ দিতে পারেনি।

তেরো

লিবিয়ার এদিক মরুভূমিময় রুক্ষ প্রান্তর ও উঁচু-নিচু পাহাড়ি এলাকা। চারপাশে বড়বড় বোল্ডার। একটানা সাত ঘণ্টা চলছে সুন্দরী। অনেক আগেই দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশাত। এর ভিতর রানাকে বিশ্রাম নিতে বলেছে স্বর্ণা ও নবী, ট্রাক চালাবে ওরা; কিন্তু রাজি হয়নি রানা। ওর মনে জেঁকে বসেছে নানা ভাবনা।

পাহাড়ি মরুভূমির ভিতর দারুণ রুট বাছাই করেছে রায়হান। কোনও সমস্যা না করে চলছে ডক্টর শামশের আলীর প্রিয়তমা। খাড়াই জমি বেয়ে উঠতে সামান্যতম আপত্তি তুলছে না ইঞ্জিন। চূড়া থেকে নেমে যাওয়ার সময় ঠিক ব্রেক কষছে। ডক্টর পিছন চাকাগুলোর পর বসিয়েছেন এক সারি চেইন। ওগুলো জমিতে আঁচড় বুলিয়ে চলেছে। চাকার চিহ্ন থাকছে না।

কারও বুঝবার কথা নয় ওরা চেক পয়েন্ট থেকে এদিকে এসেছে। তারপরও তাড়া অনুভব করছে রানা। হাইওয়েতে কী ঘটেছে বুঝবে লিবিয়ান কর্তৃপক্ষ। ওই পুলিশ অফিসাররা ঘুষখোর হোক বা না হোক, তাদের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করতে চাইবে তারা।

মার্ভেল থেকে নিয়মিত আপডেট পাঠিয়ে চলেছে সোহেল। আমেরিকান নেভি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তীর থেকে তিরিশ মাইল দূরে এক স্কোয়াড্রন ই-২সি হওকি বিমান চক্কোর মারছে, নজর

রাখছে লিবিয়ান সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিমগুলোর উপর।

একটু আগে ভোর হয়েছে। তার মানে লিবিয়ান *সার* টিমগুলোর এয়ারক্রাফট আকাশে উঠে পড়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এদিকে আসেনি। সমস্ত মনোযোগ ক্র্যাশ সাইট থেকে এক শ' মাইল দূরে।

'জিপিএস অনুযায়ী আর মাত্র দুই ক্লিক বাকি ক্র্যাশ সাইটে পৌঁছুতে,' বলল নবী। 'ট্রাক লুকাবার জন্য ভাল জায়গা বেছে নিয়েছে রায়হান।'

চারপাশ দেখে নিল রানা। ওরা আছে পাহাড়ের উপর এক উপত্যকায়, সাগর সমতল থেকে চার হাজার ফুট উপরে। কোনও গাছ জন্মেনি। ন্যাড়া পাথুরে জমিন। মাঝে মাঝে ঘাসের চাপড়া।

'বামে চলুন, মাসুদ ভাই,' বলল নবী। 'আর পাঁচ শ' গজ যেতে হবে।'

ওর দেখানো পথে চলল সুন্দরী, সামনে উঁচু জমি। তবে ঢাল বেয়ে উঠতে হলো না, চোখে পড়ল সরু পাথুরে ফাটল। আগেই স্যাটালাইট ইমেজে দেখেছে রায়হান। ফাটলটা যথেষ্ট গভীর ও চওড়া, অনায়াসে রাখা যাবে ট্রাক। আকাশ থেকে সরাসরি না তাকালে আশপাশ থেকে কেউ বুঝবে না।

'ভাল জায়গা,' বলল রানা। ফাটল দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ট্রাক, খানিকদূর গিয়ে থামল। সুন্দরীর ট্যাঙ্কে এখনও দুই তৃতীয়াংশ ফিউয়েল রয়েছে। ডক্টর শামশের আলী যতটা ভেবেছেন, তার চেয়ে ঢের ভাল করছে তাঁর প্রেমিকা।

ডিজেল ইঞ্জিনের গর্জন থেমে যেতেই চারপাশ থমথম করতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইল ওরা নিথর নীরবতায়।

'আমরা পৌঁচেছি?' ঘুম জড়ানো কণ্ঠে প্রশ্ন করল নিশাত।

'প্রায়,' বলল স্বর্ণা। 'এবার উঠুন, আপা।'

হাই তুলে সোজা হয়ে বসল নিশাত, হাত বাড়িয়ে টিপে দিল

গোপন এক সুইচ। কিরকির আওয়াজ তুলে সরে গেল পিছনের দেয়াল, বেরিয়ে এল কার্গো হোল্ড। এ মিশনের জন্য যথেষ্ট কম গিয়ার এনেছে ওরা। সাবমেশিন গান ও গ্রেনেড লঞ্চার ছাড়া রয়েছে চারটে ন্যাপস্যাক। তার ভিতর প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট। ব্যাগগুলো বিলি শুরু করল নিশাত। নিজেরটা নিয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল রানা, টের পেল শিরশির করছে মেরুদণ্ড।

খাতের ভিতর অংশে গাঢ় ছায়া, কিন্তু বাতাস গরম ও শুকনো। নাকে এল ধুলোর গন্ধ। আন্দাজ করা কঠিন এ অঞ্চলে বাস করে মানুষ। কিন্তু হাজারো বছর ধরে সাহারা মরুভূমিতে টিকে রয়েছে তারা। এ থেকে বোঝা যায় সব পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয় মানুষ।

কয়েক মুহূর্ত পর রানার পাশে থামল সবাই। হাতের জিপিএস ডিভাইস পরীক্ষা করল নবী, তারপর উত্তর দিক দেখিয়ে দিল।

ট্রাকে প্রায় কোনও কথাই হয়নি ওদের। এখনও আলাপ করবার ইচ্ছে রইল না কারও। রানার পিছনে রওনা হয়ে গেল ওরা, উঠতে লাগল নামহীন এক টিলার উপর। সবার চোখে সানগ্লাস। সূর্য পুড়িয়ে দিতে চাইছে ঘাড়। হিপ পকেট থেকে রুমাল বের করে গলায়-ঘাড়ে বেঁধে নিল রানা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বদ্ধ পরিবেশে থাকবার পর এখন হাঁটতে অবশ্য ভালই লাগছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে ওরা পৌঁছে গেল এক পাহাড়ের ঢালে। এখানেই প্রথমবারের মত দেখা গেল বিমানের অংশ। অ্যালুমিনিয়ামের ট্র্যাশক্যানের মত দুমড়ে গেছে। ডানার ওই অংশ দেখে এভিয়েশন এক্সপার্ট বলবে, ওটা ফ্রন্ট গিয়ার এসেম্বলির হ্যাচের অংশ।

ঢালের উপর দিকে চাইল রানা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জঞ্জাল। টিলার চূড়ার কাছে ফিউজেলাজের বড় এক অংশ। মনে

হচ্ছে যেন এখান দিয়ে বয়ে গেছে ভয়ঙ্কর টর্নেডো।

আকাশ থেকে প্রায় খাড়াভাবে আছড়ে পড়েছিল বিমান। ভাঙা ফিউজেলাজ আগুনে পুড়ে যায়। নানাদিকে মুঠোর চেয়ে ছোট ধাতু ও প্লাস্টিকের টুকরো। নীচে পড়েই খুবলে নিয়েছে পাথুরে জমি, যেন দু' হাতে আঁচড় কেটেছে কোনও বিশাল দানব। এভিয়েশন কেরোসিন বিস্ফোরিত হয়ে পুড়িয়ে দেয় চারপাশের জমি। শুরু হয় দাবাগ্নি, তবে আশপাশে কোনও গাছ ছিল না বলে ঝোপঝাড় ও আগাছা জ্বালিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে।

এতক্ষণ পিছন থেকে এসেছে হাওয়া, ফলে পোড়া ফিউলের দুর্গন্ধ আসেনি। খানিক চলবার পর কেরোসিনের ভারী গন্ধে আটকে আসতে চাইল শ্বাস। কাপড় দিয়ে নাক ঢাকল ওরা, একটু কমল ফিউলের ধক।

চারদিক দেখবার জন্য ছড়িয়ে পড়ল সবাই। ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে বড় টুকরোগুলোর ছবি তুলছে নবী। বুঝতে চাইছে জিনিসটা কোথা থেকে এসেছে। ছিঁড়ে যাওয়া কয়েকটা বল্টু তুলে নিল, রেখে দিল প্লাস্টিকের ব্যাগে। এসব বল্টু কেবিনের মেঝেতে আটকে রাখত সিটগুলোকে। নবী এরইমধ্যে খুঁজতে শুরু করেছে বিমানের লেজ। ওদের দুই বন্ধুর ধারণা, ওটার কারণে ধ্বংস হয় বিমান। আর তাই যদি হয়, ওই জিনিস পাওয়া যাবে কয়েক মাইল দূরে।

'মাসুদ ভাই,' ডাকল স্বর্ণা। বাঁ দিকে চলে গেছে। দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমানের সিএফএম ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনের পাশে।

দ্রুত পায়ে ওর পাশে পৌঁছে গেল রানা। নীরবে জমির দিকে দেখিয়ে দিল স্বর্ণা। ধুলোর ভিতর ডুবে আছে জিনিসটা।

হাত থেকে কাটা কবজি, বিশ্রী ভাবে পোড়া। থাবা দেখে বোঝা যায় পুরুষের। দু'হাতে লেইটেক্স গ্লাভস্ পরে নিল রানা, ঝুঁকে তুলে নিল হাতটা। ন্যাপস্যাক থেকে বের করল প্লাস্টিকের

টিউব, এক দিকের অংশ খুলে কাটা কব্জি থেকে রক্তের স্যাম্পল নিয়ে রেখে দিল এভিডেন্স কালেকশন টিউবে। লোকটার অনামিকা থেকে খুলে নিল আঙটি। পাতের ভিতর অংশে খোদাই করা কয়েকটা অক্ষর।

চোখ সরু করে পড়ছে স্বর্ণা। 'তনিমা ও সাদাত। ১/১/২০০৮ ইং।' রানার দিকে চাইল স্বর্ণা। 'বিবাহিত। আট সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিন বিয়ে হয়। আমি প্যাসেঞ্জার ম্যানিফেস্ট পড়েছি। সাদাত হোসেন ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইল।'

একটু থমকে গেল রানা। ছেলেটি কয়েক বছর আগে যোগ দেয় বিসিআইয়ে। হাসিখুশি ছেলে। নিজের বিয়েতে দাওয়াত দেয়। নিজেই নিয়ে যায় ওদেরকে। খুব হুলুস্থুল করে বিয়ে করে প্রেমিকাকে।

দিগন্তের দিকে চেয়ে রইল রানা। একটু আগে মনের ভিতর আশা ছিল: মানুষগুলো যেভাবেই হোক, বেঁচে থাকবে। কিন্তু এখন সব আশা শেষ। কেউ নেই। প্লেনের সবাই মারা গেছে। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে চাইল রানা। গম্ভীর চেহারায় এদিকে আসছে নিশাত সুলতানা।

'পোর্ট ইঞ্জিনের এক অংশে আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগের টুকরো পেয়েছি। সিরিয়াল নম্বর মিলে গেছে। এটাই বাংলাদেশের বিমান এয়ারবাস।'

কোনও এভিয়েশন এক্সপার্ট টিম না আসা পর্যন্ত বোঝা যাবে না কী কারণে ভূ-পাতিত হয়েছে বিমান। এখন আর না খুঁজলেও চলে। রানা একবার ভাবল সবাইকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরবে, ওদের কারণে নষ্ট হতে পারে প্রমাণগুলো। কিন্তু মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান ওদের কাছ থেকে সব শুনতে চাইবেন। আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। ওর মন বলছে, কাজ শেষ না করে

যাওয়া ঠিক হবে না।

'ঠিক আছে,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল। 'আমরা স্যাম্পল জোগাড় করব। তবে খুব সাবধান, কোনও প্রমাণ যেন নষ্ট না হয়।' নিজ পায়ের দিকে চাইল। ওদের সবার পায়ে ট্রেড ছাড়া সোল। কোনও ছাপ পড়বে না। বিচ্ছিন্ন হাতের অনামিকায় আঙটি পরিয়ে দিল রানা, ঠিক আগের মত করে রেখে দিল ধুলোর ভিতর।

একাই ফিউজেলাজের কাছে চলে গেছে নবী, সব খুঁটিয়ে দেখছে। তার পাশে চলে গেল রানা-স্বর্ণা-নিশাত। ফিউজেলাজের এই অংশ ছিল ককপিটের ঠিক পিছনে। এটার শেষ অংশে যোগ হয়েছে ডানা। পোর্ট সাইডে জানালা থাকার কথা, কিন্তু সব ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে অ্যালুমিনিয়ামের পাত। জায়গাটা বিশ্রীভাবে প্রসারিত ঠোঁটের মত লাগছে। এয়ারক্রাফট থেকে ঝুলছে কাটা পড়া তার ও হাইড্রলিক লাইন। টপটপ করে ফ্লুইড পড়েছে পাথুরে জমির উপর।

অনেক সামনে গিয়ে প[illegible]ছে ককপিট। পাথুরে জমির ভিতর দশ ফুট গেঁথে গেছে এয়ারক্রাফটের নাক। ধাতব চামড়া দেখে মনে হয় অ্যাকর্ডিয়ানের ট্যাণ্ডেম বাসের জয়েণ্ট।

ফিউজেলাজের ভিতর ঢুকল রানা। চমৎকার কেবিন পুড়ে ছারখার হয়েছে। মেঝের উপর প্লাস্টিকের স্তূপ। কঙ্কালের মত ইস্পাতের ফ্রেম বলছে ওখানে সিট ছিল।

চট্ করে গুণল রানা, সব মিলে এগারোটা লাশ। সাদাতের হাতের মতই পুড়ে বিকৃত সবাই। কাউকে চেনা যায় না। ছাই হয়েছে পোশাক। থেঁতলানো পোড়া মাংস ছাড়া কিছুই নেই। প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়বার ফলে দেহগুলো চারদিকে ছিটকে পড়েছে। পোড়া মাংসপচা দুর্গন্ধ হারিয়ে দিয়েছে এভিয়েশন ফিউয়েলকে। হাজির হয়েছে কয়েক হাজার মাছি। কোনও লাশের পাশে থামলে

ভনভন করে উড়াল দিচ্ছে।

হঠাৎ রানার মুখে জমে গেল লালা, বমি আসতে চাইছে। ঢোক গিলে অন্য দিকে চাইল।

একটু দূরে একটা ক্লাব চেয়ারের নীচে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে মেঝে দেখছে নবী, দাঁতে ধরা ফ্ল্যাশলাইট। চারদিকের ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও লাশ থেকে মনোযোগ সরাতে গুনগুন করে গান গাইতে চাইছে, কিন্তু হচ্ছে না কিছুই। যেন গুঙিয়ে চলেছে অসুস্থ কেউ।

'নবী,' ডাকল রানা। 'তোমার কাজ শেষ হলে, চলো বেরিয়ে যাই।'

মনোযোগ দিয়ে কী যেন করছিল, রানার কণ্ঠ শুনে চমকে গেল। মুখ থেকে টর্চ সরিয়ে উপরে চাইল। 'মাসুদ ভাই, বহুত বুদ্ধি খাটিয়ে নকল দৃশ্য তৈরি করেছে কেউ।'

'কী বলতে চাইছ?'

'এই ক্র্যাশ সাইট বোগাস। এখানে এসে আগেই প্রমাণগুলো সরিয়ে ফেলেছে কেউ।'

'বুঝলে কী করে? আমার কাছে তো সব স্বাভাবিক লাগছে।' রানার মনে পড়ল বিসিআইয়ে যোগ দেয়ার পর এভিয়েশন অ্যাক্সিডেন্টের উপর একটা কোর্স করেছিল নবী।

'ক্র্যাশ ঠিক আছে। এটাই প্রধানমন্ত্রীর বিমান, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু একদল লোক এখানে সব ওলটপালট করেছে।'

হাঁটুর উপর দু'হাত রেখে ঝুঁকে এল রানা। 'আমাকে বুঝিয়ে দাও।'

ওর দিকে না চেয়ে স্বর্ণার দিকে চাইল নবী। 'আপনি ধরতে পেরেছেন?'

'কী ধরব?' বলল স্বর্ণা। 'একটা বিমান ধ্বংস হয়েছে, মারা

গেছে সব ক'জন মানুষ—আল্লাহ জানেন, বাকি জীবন এই দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফিরবে কি না। আবার কী দেখব?'

'আপনার রুমালটা নাক থেকে সরান,' বলল নবী।

'মরতে?'

'যা বলছি করুন।'

'এর মাথা খারাপ,' বিড়বিড় করে বলল স্বর্ণা, তবে নাক থেকে সরাল রুমাল। খুব সাবধানে শ্বাস নিল। পরের মুহূর্তে বড় করে দম নিল। 'কিছুই তো বুঝলাম না?'

নিজের রুমাল সরাল রানা। দু'বার শ্বাস নেয়ার পর বিস্ফারিত হলো দুই চোখ। ওর দিকে চেয়ে আছে নিশাতও।

'আমি যা পেয়েছি তা-ই কি পেলেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'জেলিড গ্যাসোলিন।'

'নাপামের মত,' তথ্য জুগিয়ে দিল নবী।

নিশাতও বুঝতে পেরেছে।

'আপনি নেভিতে আছেন, কাজেই বুঝবেন না, স্বর্ণা,' বলল নবী। 'এ জিনিস ব্যবহার করে না নেভি।'

'জিনিসটা পুরনো আমলের ফ্লেমথ্রোয়ারের মত,' বলল রানা।

'ঠিক তাই, মাসুদ ভাই,' বলল নবী। 'আমার ধারণা, একদল লোক এই বিমানকে নামতে বাধ্য করে। সে এলাকা এখান থেকে দূরে। নামিয়ে নেয়া হয় প্রধানমন্ত্রীকে। আবার আকাশে ওড়ে এয়ারবাস, তারপর এখানে এসে ক্র্যাশ করে পাহাড়ের উপর। হয়তো ব্যবহার করা হয় রিমোট কন্ট্রোল্ড সিস্টেম। আবার হতে পারে, ক্র্যাশ করিয়েছে আত্মঘাতী পাইলটকে দিয়ে।

'বিমান পড়ে যাওয়ার পর একদল লোক আসে, মরা পাইলটকে সরিয়ে নেয়। তখনই বুঝেছে ঠিক ভাবে পোড়েনি কেবিন। বাধ্য হয়ে ফ্লেমথ্রোয়ার ব্যবহার করেছে। আমরা যদি এই

গন্ধ না পেতাম, বাতাসে মিলিয়ে যেত। পরে কেউ বলতে পারত না প্রমাণ সরানো হয়েছে। বাংলাদেশি টিম স্যাম্পলগুলো অ্যানালাইয করবে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফে, কাজেই এভিয়েশন ফিউয়েল ছাড়া কিছুই ধরা পড়বে না।'

'আমাদের কোনও ভুল হচ্ছে না তো?' বলল স্বর্ণা।

'না,' জোর দিয়ে বলল নবী।

পরস্পরের দিকে চাইল ওরা সবাই।

মন বলছে রানার, আরেকটা সুযোগ পেয়েছে। এমন তো হতেই পারে প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

একটা কথা মনে পড়তেই নবীর দিকে চাইল স্বর্ণা। 'ক্যাপ্টেন নবী, আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব বিমান আগে নামানো হয়েছে? বিমান এখানে পড়বার পরেও ফ্লেমথ্রোয়ার ব্যবহার করতে পারে।'

'প্রমাণ থাকবে ল্যাণ্ডিং গিয়ারে,' বলল রানা। 'চলো, দেখি।'

ফিউজেলাজ ধরে এগুলো ওরা, নেমে এল অন্ধকারচ্ছন্ন কার্গো এরিয়ায়। বদ্ধ বাতাসে ভাসছে পোড়া ফিউয়েলের কটু গন্ধ। ওটা কয়েক দিনে পচা লাশের দুর্গন্ধের চেয়ে অনেক বেশি সহনীয়। মেঝের উপর বসানো অ্যাক্সেস প্যানেলের সামনে থামল নবী, খুলে ফেলল টগল। হ্যাচ তুলে দিতেই বেরিয়ে এল দীর্ঘ পিয়ানো হিঞ্জ। ফোকরের নীচে এয়ারবাসের প্রকাণ্ড চাকা ও পোর্ট সাইড ল্যাণ্ডিং স্ট্রাট। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

একবার রানার দিকে চেয়ে গর্তের ভিতর নেমে পড়ল নবী, চাকার নীচের অংশে ফেলল ফ্ল্যাশলাইট। হামাগুড়ি দিয়ে এড়িয়ে গেল চাকা, নাক থাকল রাবার থেকে আধ ইঞ্চি দূরে। 'কিছুই নেই,' বলল। আরও নিচু হয়ে দেখতে চাইল অন্য চাকাগুলো।

এক মিনিট পেরুল, তারপর গর্ত থেকে উঠে এল। রানার দিকে মেলে ধরেছে ডান হাত। 'এই যে আমাদের প্রমাণ, মাসুদ ভাই।'

'একটা বিচ্ছিরি পাথর?' আপত্তির সুরে বলল স্বর্ণা।

'চাকার ট্রেডের ভিতর ছিল, নীচের হ্যাচে পাবেন বালি,' বলল নবী। 'এই বিমান রওনা হয়েছে নিউ ইয়র্ক থেকে। তারপর লিবিয়ার এই পাহাড়ে এসে ক্র্যাশ করেছে। তা হলে মাঝখান থেকে কোথেকে এল স্যাণ্ডস্টোন আর বালি? এই জিনিস নিউ ইয়র্কে মিলবে না। তবে আছে লিবিয়ায়।'

মাথা দোলাল রানা। 'প্রমাণ হয়েছে বিমান নামানো হয়েছে মরুভূমিতে।' পাথরের খণ্ড বাড়িয়ে দিল নবীর দিকে। 'এক্সপার্টরা এটা না-ও দেখতে পারে। তবে মার্ভেলে অ্যানালাইয করা যায়।'

হঠাৎ কোত্থেকে যেন এল আওয়াজটা। অজান্তে মাথা নিচু করে নিল ওরা। এইমাত্র ফিউজেলাজের উপর দিয়ে গেছে প্রকাণ্ড এক হেলিকপ্টার। এত নীচ দিয়ে গেছে, শুরু হয়েছে বালিঝড়। শব্দ এসেছে উত্তর-পুব থেকে। ওদিকেই ত্রিপোলি শহর। শহরের বাইরের অংশে রয়েছে লিবিয়ান মিলিটারি বেস। আমেরিকান নেভির অ্যাওয়্যাক্স বিমানকে ফাঁকি দিতে কপ্টার মাটি ছুঁয়ে এসেছে।

আগে নড়ে উঠল রানা, তারপর অন্যরা। দেরি না করে কার্গো এরিয়া হয়ে কেবিনে ঢুকল ওরা, বেরিয়ে এল ফিউজেলাজ থেকে। দূর আকাশে স্থির হয়ে আছে রাশান এমআই-৮ কার্গো কপ্টার, বোধহয় নামবে। প্রকাণ্ড এই ফড়িং প্রায় পাঁচ টন ওজন নেয়। টারবাইনের আওয়াজ বদলে গেল, ভাঙা ফিউজেলাজ থেকে পাঁচ শ' গজ দূরে নামতে লাগল টিলার উপর।

'নতুন করে প্রমাণ হলো এরা জানত বিমান কোথায় ক্র্যাশ করেছে,' বলল স্বর্ণা। চেয়ে রইল খাকি রং করা কপ্টারের দিকে। 'পাইলট ভাল করেই জানে কোথায় নামতে হবে।'

'এসো, ধুলো নেমে যাওয়ার আগেই কাভার পেতে হবে,' পা বাড়াল রানা। সবাইকে নিয়ে চলেছে ফিউজেলাজের অপর পাশে।

ফিউজেলাজের আশপাশে কোনও আড়াল নেই। হালকা চালে দৌড়াতে শুরু করল বাংলাদেশি টিম, নেমে চলেছে টিলা বেয়ে। খানিক ছুটবার পর শীর্ণ এক ড্রাই ওয়াশ পড়ল। পাহাড়ে তুমুল বৃষ্টির সময় এটা হয়ে ওঠে গভীর এক ঝর্না। এখানে থামল ওরা, শুয়ে পড়ল রানার নির্দেশে। মুঠো মুঠো বালি ছড়িয়ে দেহগুলো আড়াল করে দিল রানা। যতটা পারে নিজেও লুকিয়ে পড়ল। খুব বেশি ভাবছে না। সরে এসেছে ওরা, তা ছাড়া কপ্টার থেকে এত দূরে কারও আসবার কথা নয়।

'মাসুদ ভাই, আপনার কী ধারণা? ওরা ওখানে কী করছে?' ফিসফিস করে বলল নবী।

'জানি না। আপা, স্বর্ণা, তোমাদের কী মনে হয়?'

'আল্লাহ মাবুদ জানেন,' বলল নিশাত।

'কেউ হয়তো ভেবেছে ঠিক করে স্টেজ সাজানো হয়নি,' বলল স্বর্ণা। 'কাজেই নতুন করে নিখুঁত করতে এসেছে।'

চূড়ার কাছে নেমেছে কপ্টার। থামছে টারবাইন। কমে এল রোটরের গতি। সিলিং ফ্যানের মত ছড়িয়ে দিল হাওয়া। তারপর লেজের বুম থেকে খানিক নীচে খুলে গেল শামুকের মত দরজা। একেকবারে নেমে এল তিনজন করে লোক, পরনে ডেজার্ট ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম। প্রত্যেকের মাথায় লাল-সাদা কেফিয়ে। মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম জঙ্গিরা শখ করে ব্যবহার করে ওটা।

'রেগুলার আর্মি, না গেরিলা?' জানতে চাইল নিশাত।

প্রায় এক মিনিট চেয়ে রইল রানা, তারপর বলল, 'চারপাশে যেভাবে ঘুরছে, মনে হয় না রেগুলার আর্মি। এরা সৈনিক হলে প্যারেড ফরমেশনে নেয়া হতো। জানি না লিবিয়ান মিলিটারির মার্কিংওয়ালা কপ্টার এখানে কী করছে।'

চুপচাপ অপেক্ষা করছে ওরা, ক' মুহূর্ত পর বিস্ফারিত হলো ওদের চোখ। দুই লোক পিছন হেঁটে বেরিয়ে এসেছে কপ্টার

থেকে, রাশ ধরে টেনে আনছে একটা উটকে! প্রাণপণে পিছিয়ে যেতে চাইছে প্রাণীটা, থরথর করে কাঁপছে চার পা। বিকট স্বরে আপত্তি তুলছে, গ্যাঁজলা ওঠা ফেনা পড়ছে লোক দুটোর মুখের উপর। তারপর ডানদিকের লোকটার উপর বমি করে দিল উট। আকাশ পথে আসবার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। দুই পশুচারকের দিকে চেয়ে হো-হো করে হাসছে অন্যরা। এত দূরেও পৌঁছে গেল সেই আওয়াজ।

'কী করছে ওরা?' আনমনে বলল নবী। 'দেখে তো মনে হয় ওই উট আধ-মরা।'

মনে মনে সায় দিল রানা। সুস্থ লাগছে না জন্তুটাকে। জড়িয়ে পেঁচিয়ে রয়েছে লোমগুলো, কেমন ম্লান বর্ণের। এক দিকে কাত হয়ে গেছে কুঁজ, আকৃতি স্বাভাবিকের অর্ধেক। কী ঘটে চুপচাপ দেখছে রানা।

একুশজন লোক নেমে এসেছে কপ্টার থেকে, জঞ্জাল ভরা ঢালে ঘুরে দেখছে। উট নিয়ে যে দু'জন হাঁটছে, তারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে চারপাশে হাঁটাহাঁটি করছে। কখনও এগিয়ে যাচ্ছে, আবার ফিরছে কপ্টারের কাছে। পরে ছাপ দেখলে মনে হবে ওখানে একাধিক উট ছিল। রানা খেয়াল করল লোকগুলোর কারও কারও পায়ে চামড়ার স্যাণ্ডেল। এবার নিশ্চিত হয়ে গেল ও।

'স্বর্ণার কথা ঠিক। ওরা ভেবেছে ফরেনসিক টিম ক্র্যাশ সাইট দেখলে বহু কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। তাই এখন প্রমাণ নষ্ট করছে। এমন ভাব নিয়েছে, ওরা একদল যাযাবর।'

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলল এসব। হাতের কাছে যা পেল, লোকগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। ছুঁড়ে ফেলে দিল এদিক ওদিক। দু'জনের হাতে স্লেজহ্যামার। ওগুলো দিয়ে বড় টুকরোগুলোকে পেটানো হলো। ককপিট ও ফিউজেলাজের তার এবং মাঝারি অংশগুলো নিয়ে ফেলা হলো দুই শ' গজ দূরে। বুঝবার উপায়

রইল না বিমান কীভাবে পড়েছে। ল্যাণ্ডিং গিয়ার ডোর খুলে বের করা হলো বিশাল চাকাগুলো। রাইফেলের গুলিতে ফুটো হলো সব। বিমানের কিছু অংশ টেনে নেয়া হলো কপ্টার পর্যন্ত, তুলে দেয়া হলো ফড়িঙের পেটে। জায়গা ভরে যেতেই রওনা হলো ওটা। সঙ্গে গেল চারজন। পঁচিশ মিনিট পর আবারও ফিরল কপ্টার। বিমানের টুকরো ফেলে আসা হয়েছে মরুভূমির ভিতর।

আগেই বিমানের ধ্বংসাবশেষ ছিল অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল ও প্লাস্টিকের জঞ্জাল, কিন্তু এখন যে অবস্থা, ক্র্যাশ এক্সপার্টরা এসব থেকে কিছুই বুঝবে না। লাশগুলোকে খানিক দূরে নিয়ে পুঁতে ফেলা হলো। জ্বলে উঠল কয়েকটা আগুন। পরে কেউ এলে ভাববে এখানে ক্যাম্প করেছিল একদল যাযাবর, কমপক্ষে দু'দিন ছিল এখানে। উটের কাজ শেষ। ওটা যে লোকের উপর বমি করেছে, সে পিস্তল বের করে জন্তুটার দুই চোখের মাঝখানে গুলি করল।

এর কিছুক্ষণ পর সন্তুষ্ট হলো সবাই। কয়েকজন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মনে হয় প্রকৃতির ডাকেই। কাজ শেষে কপ্টারে উঠে বেসে ফিরবে।

সঙ্গীদের দিকে ফিরল রানা। 'আমার কথা মন দিয়ে শোনো, ট্রাক নিয়ে তিউনিশিয়া সীমান্তে পৌঁছবে তোমরা। তবে তখনই সাগরের দিকে যাওয়ার দরকার নেই। আমি সোহেলের মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। ওকে জানিয়ে দিয়ো আমরা কী দেখেছি। ও যেন আমাকে ট্র্যাক করে।'

মার্ভেলের অপারেটিভদের উরুতে অপারেশন করে বসানো হয়েছে ট্র্যাকিং চিপস। ওটা দেহের নড়াচড়া থেকে শক্তি পায়। ছ' মাসে একবার ট্র্যান্সডারমাল রিচার্জ করলেই চলে। জিপিএস টেকনোলজিকে ব্যবহার করে জিনিসটা, ফলে অনায়াসে জানা যায় ওরা কে কোথায় আছে।

'আর আপনি কী করবেন, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'আমি ওদের সঙ্গে যাব।'

'আমরা তো জানিই না এরা কারা।'

'তা-ই তো যেতে হবে।'

ওই দলের এক লোক এসেছে শ' খানেক গজ দূরে। উচ্চতা ও আকৃতি প্রায় রানার মতই। তাকে দেখেই বুদ্ধি এসেছে রানার মাথায়। ভাষা নিয়ে সমস্যা হবে না। আর মুখ-মাথা ঢেকে রাখবে কাফিয়ে দিয়ে। আশা করা যায় অনায়াসে এ দলের সঙ্গে যাওয়া যাবে।

সুন্দরীর চাবি নিশাতকে দিল রানা। গোপন অবস্থান থেকে খুঁড়ে তুলছে নিজেকে। ওর বাহু স্পর্শ করল স্বর্ণা। 'মাসুদ ভাই, যার বদলে যাবেন, তার কী করব?'

'ফেলে যাবে। আমার ধারণা আগামী চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর লিবিয়ান সরকার ঘোষণা দেবে: আমরা বিমান খুঁজে পেয়েছি। তারপর এখানে ছুটে আসবে তাদের লোক। ও-ই ভেবে বের করুক কী ব্যাখ্যা দেবে তাদের।'

ড্রাই ওয়াশ থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এল রানা, খানিক যাওয়ার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল। এক মিনিট পেরুনোর আগেই পৌঁছে গেল লোকটার পিছনে। কিছুই সন্দেহ করেনি সে। ঘুরতে শুরু করেছে কপ্টারের টারবাইন। পায়ের আওয়াজ পাওয়ার কথা নয়, আওয়াজটা এমনই তীক্ষ্ণ, দাঁতে দাঁত পিষতে হয়।

ছোট এক ঢিবির পিছনে অপেক্ষা করল রানা। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে লোকটা, গুলতির মার্বেলের মত পাথর তুলল পবিত্র হতে। দেরি করল না রানা, হাতে তুলে নিয়েছে ক্রিকেট বলের সমান একটা পাথর, পৌঁছে গেল শেষ দু'গজ। তখনই চট করে ঘুরে চাইল লোকটা। তার মাথার তালুর উপর জোরেসোরে নেমে

এল পাথর। রানার মনে পড়ল, ক'দিন আগে এক সোমালিয়ানকে এভাবে ঘুম পাড়াতে গিয়ে বিপদে পড়েছিল। তবে এ রীতিমত ভদ্রলোক, ঘুরেই ধুপ করে পড়ল বালির উপর।

বসে পড়ে লোকটার ঘাড়ে পালস দেখল রানা, জ্ঞান ফিরলে ব্যথা ছাড়া-আর কোনও সমস্যা থাকবে না এর। দ্রুতহাতে তার পোশাক ও বুট খুলল রানা। কাফিয়ে খুলতেই দেখা গেল লোকটার বয়স ত্রিশ মত। ইউনিফর্মের পকেটে কোনও আইডেন্টিফিকেশন বা মানিব্যাগ নেই। কোনও ধরনের লেবেল রাখা হয়নি।

পোশাকগুলো নিজে পরে নিল রানা, অচেতন বন্দিকে ক্র্যাশ সাইট থেকে আরও খানিক সরিয়ে নিল। একবার পকেট থাবড়ে দেখল স্যাটালাইট ফোনটা আছে। ওটা না থাকলে এই পরিকল্পনা নিয়ে এগোত না। লোকটার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল, তারপর আধ মিনিট পেরুনোর আগেই শুনল চিৎকার। কপ্টারের আওয়াজের উপর দিয়ে ডাকছে এক লোক।

'সোবহান! সোবহান! জলদি!'

এ লোকের নাম সোবহান, তার বদলে চলেছে নিজে, দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল রানা। কাফিয়ে দিয়ে ভাল ভাবে ঢেকে নিয়েছে মুখ। ঢিবির আড়াল থেকে বেরুল। বিশ জনের এ দলের নেতা দাঁড়িয়ে রয়েছে কপ্টার থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে। হাতের ইশারা করল, এক্ষুণি এসো।

মাথা দোলাল রানা, হালকা চালে ছুটতে লাগল।

'আর এক মিনিট দেরি হলে তোমাকে ফেলে যেতাম কাঁকড়া বিছের পাহাড়ে,' রানা কাছাকাছি পৌঁছুতেই বলল সে।

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'চাপ বেশি ছিল।'

'উঠে পড়ো।' রানার কাঁধ চাপড়ে দিল লোকটা।

দু'জন পাশাপাশি উঠল কপ্টারে। কার্গো কম্পার্টমেন্টে দু'

দিকের জানালার পাশে ফোল্ড করা সিট। অন্যদের চেয়ে খানিক পিছনে বসল রানা। খুশি, এরা মুখ থেকে সরায়নি কাফিয়ে। উষ্ণ অ্যালুমিনিয়ামের দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজল।

ওর জানা নেই রেগুলার মিলিটারির সঙ্গে রয়েছে, না সন্ত্রাসী জঙ্গিদের সঙ্গে। এখন কী-ই বা যায় আসে? যদি শেষ পর্যন্ত ধরাই পড়ে, মরতে হবে। কাদের হাতে মরছে, তা জেনে কী হবে?

এক মিনিট পেরুনোর আগেই আকাশে উঠল কপ্টার।

চোদ্দ

ক' দিন হলো পাথুরে সেলে বন্দি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এ মুহূর্তে চুপ করে বসে আছেন মেঝেতে। কিছুই করবার নেই তাঁর, সঙ্গে কেউ নেই যে কথা বলে সময় কাটাবেন।

সেলে কোনও আসবাব নেই। বিছানা হিসাবে দেয়া হয়েছে চটের ছালা। একদিকে লোহার দরজা। ওদিক দিয়ে দেয়া হয় অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো বাটি। খাবার অতি নিম্ন মানের। ছাতে দিনরাত জ্বলে নগ্ন বালব। প্রধানমন্ত্রীর ঘড়িটা কেড়ে নিয়েছে ওরা। কাজেই জানার উপায় নেই এখন দিন না রাত। তবে আঁচ করেন, এখানে আছেন চারদিন ধরে।

মরুভূমিতে এয়ারবাস ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিঙের আগে, ইন্টারকমে ব্যাখ্যা দেন পাইলট: তাঁরা পুরনো এক এয়ারফিল্ড দেখতে পেয়েছেন। বিমান অনেক নেমে এসেছে, তবে দুই মাইল যেতে পারবে।

রুক্ষ ধুলোময় স্ট্রিপে নামবার সময় খুব ঝাঁকি খেয়েছে বিমান, তবে পুরো আস্ত থেকেছে। চাকা থেমে যাওয়ার পর হৈ-হৈ করে পাইলটের প্রশংসা করেছে যাত্রীরা সবাই। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া সবাই একইসঙ্গে চেয়ার ছেড়েছে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছে খুশিতে। সবার চোখে ছিল আনন্দের অশ্রু।

তারপর ককপিট থেকে বেরিয়ে এলেন পাইলট ও কো-পাইলট। তাঁদের পিঠ চাপড়ে বেগুনী বানিয়ে দেয়া হলো। সবার সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে ব্যথা হয়ে গেল তাঁদের হাত। মেইন ডোর খুলে ফেলল সিক্রেট ডিটেইল সাদাত হোসেন, মরুভূমি থেকে ধেয়ে এল তপ্ত হাওয়া। দূর করে দিল ভয়ের পরিবেশ।

আর ঠিক তখনই বিস্ফোরিত হলো সাদাত হোসেনের মাথা! পিছনে ছিল স্টুয়ার্ডেস, ছিটকে তার চোখে-মুখে পড়ল তাজা রক্ত ও ছেঁড়া মগজ। রানওয়ের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে একদল লোক, প্রত্যেকে সশস্ত্র। বালি ও তারপুলিন দিয়ে ঢাকা ফক্স হোলে লুকিয়ে ছিল। পরনে খাকি ইউনিফর্ম, মাথায় পেঁচানো কাফিয়ে। কেউ দরজা বন্ধ করবার আগেই মই নিয়ে এল ক'জন, আটকে দিল নীচের সিলে। পাইলট চট করে দরজা বন্ধ করতে চাইলেন, যেন নিজের দুর্গ রক্ষা করছেন বীর সেনাপতি। যে স্নাইপার সাদাত হোসেনকে খুন করেছে, সেই একই লোক গুলি করল পাইলটের কাঁধে। একহাতে জখমটা ধরে কাত হয়ে পড়ে গেলেন পাইলট। পরক্ষণে কেবিনে উঠে এল তিনজন লোক, হাতে একে-ফোরটিসেভেন রাইফেল।

প্রধানমন্ত্রীর এইডদের ভিতর সালাম বিন আশরাফ বাঘের মত ধমকে উঠলেন। প্রধানমন্ত্রী ভয় পেলেন, ভদ্রলোককে মেরে ফেলা হবে এখুনি। উঠে দাঁড়ালেন সিট ছেড়ে।

এরপর বড় দ্রুত ঘটে গেল সব। সবাইকে খোলা দরজার কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া হলো। আরও লোক উঠল বিমানে।

আরবিতে বারবার করে বলতে লাগল টেরোরিস্টরা, 'খবরদার, কেউ একচুল নড়বে না!'

প্রধানমন্ত্রী আরবিতে বললেন, 'আপনারা যা বলবেন আমরা তা মেনে নিচ্ছি।-ভয় না দেখালেও চলবে।' বসে পড়লেন একটা চেয়ারে।

তাঁর দেখাদেখি সবাই চেয়ারে বসলেন।

এরপর প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল এক জঙ্গি, টেনে তুলল সিট থেকে। তাঁকে ঠেলে দেয়া হলো দরজার দিকে। এমনি সময়ে মই বেয়ে উঠল এক তরুণ। পরনে ইউনিফর্ম নেই। নীল প্যান্ট ও অক্সফোর্ড সাদা শার্টে তাকে কলেজের ছাত্র মনে হলো।

জীবনে ওই মুখ ভুলবেন না প্রধানমন্ত্রী। সে যেন কোনও দেবতা। দুধের মত ধবধবে ত্বক। ওয়্যায়ার ফ্রেমের চশমার ওপাশে দীর্ঘ পাপড়ি। ভাসা ভাসা মায়াবী চোখ। মনে হয় পড়ুয়া ধরনের। ছেলেটির বয়স বড়জোর বিশ। হালকা-পাতলা। তাকে এই সন্ত্রাসীদের সঙ্গে একেবারেই মানাচ্ছে না। হাতে একটা বই ও তসবি। বইয়ের মলাটের অক্ষর থেকে বোঝা গেল, ওটা কোরান শরীফ।

লাজুক হাসল তরুণ, চলে গেল ককপিটের দিকে।

প্রধানমন্ত্রী ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে দেখলেন, তাঁর সঙ্গীদের হাত সিটের হাতলের সঙ্গে হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে আটকে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রথম তিনি পরিষ্কার বুঝলেন, এরা কী করতে চাইছে। শিউরে উঠলেন। যে লোক তাঁর হাত ধরেছে, তাকে নরম স্বরে বললেন, 'দয়া করে এ কাজ করবেন না।'

জবাবে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে মইয়ের দিকে ঠেলল লোকটা। পড়ে যেতে গিয়ে সামলে নিলেন তিনি। লোকটার কাফিয়ে সরে গেছে। লিবিয়ানদের মত সেমিটিক চেহারা নয়

তার। হতে পারে পাকিস্তানি বা আফগান। আবারও ধাক্কা দিল লোকটা, এবার আর সামলাতে পারলেন না তিনি। পড়লেন একটা সিটের পাশে। হাতলে ঠাস্ করে লাগল মাথা। সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারালেন। কার্পেটে পড়লেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর ফিরল জ্ঞান। দেখলেন তাঁকে মইয়ের দিকে বয়ে নেয়া হচ্ছে। একবার আশরাফ সাহেবের চোখে চোখ পড়ল, দেখলেন ভদ্রলোকের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। উনি বোধহয় বুঝতে পেরেছেন কী ঘটতে চলেছে।

'আল্লাহ আপনার ভাল করুন,' ভারী গলায় বললেন।

'আপনাদেরও ভাল করুন,' জবাবে বললেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর তাঁকে নামিয়ে নেয়া হলো বিমান থেকে।

তাঁর পিঠে ধাক্কা দিয়ে এক শ' ফুট দূরে নিয়ে গেল লোকগুলো, জোর করে বসিয়ে দিল মাটিতে। হাত দুটো পিছমোড়া করে আটকে দিয়েছে হ্যাণ্ডকাফে। ককপিটের খুদে জানালা দিয়ে দেখলেন তরুণ ছেলেটা প্লেনের কণ্ট্রোলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বিমানের লেজে গোল একটা গর্ত। বোধহয় কোনও মিসাইল আঘাত হানে ওখানে, তবে বিস্ফোরিত হয়নি। আন্দাজ করলেন তাঁকে বন্দি করবার জন্যই ওরা এই কাজ করেছে। সবাই ধারণা করবে তিনি মারা গেছেন।

তাঁর লোকদেরকে কেবিনের ভিতর আটকে রেখে বেরিয়ে এল সন্ত্রাসীরা। ককপিট থেকে বেরিয়ে দরজার উপর দাঁড়াল ছেলেটা, জড়িয়ে ধরল শেষ লোকটিকে। ওর কানে কী যেন বলে নেমে এল লোকটা, সরিয়ে নেয়া হলো মই। সবাই হৈ-হৈ করে উৎসাহ দিল তরুণ পাইলটকে। হ্যাচ বন্ধ করে দিল ছেলেটা, বোধহয় ফিরল ককপিটে।

প্রধানমন্ত্রীর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু। জানালায় কয়েকজনকে দেখতে পেলেন। সবাই তাঁর লোক, বাংলাদেশের

মানুষ। এরা নিজ দেশকে ভালবাসে। বছরের পর বছর একসাথে কাজ করেছেন তাঁরা। মুখ সরিয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। না, তিনি কাঁদবেন না।

কয়েক মুহূর্ত পর চালু হলো বিমানের ইঞ্জিন। গর্জন বাড়তে লাগল। যেন ফেটে যাবে কানের পর্দা। ধুলোময় রানওয়ে থেকে দূরে ছিল ক্যামোফ্লাজ করা একটা ইউটিলিটি ট্রাক্টর। ওটার উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হলো তারপুলিন। এ ধরনের ট্রাক্টর সব এয়ারপোর্টেই থাকে। বিশাল বিমানের নাকের সামনে এসে থামল ওটা, সামনের ল্যাণ্ডিং গিয়ারের সঙ্গে আটকে নেয়া হলো টো হুক।

কয়েক মিনিট ধরে বিমানের অবস্থান ঠিক করল ড্রাইভার। এয়ারবাস থামল রানওয়ের শুরুতে, সরে গেল ট্রাক্টর। বদলে গেল বিমানের ইঞ্জিনের গর্জন। রানওয়ের শুরু থেকে দৌড় দিল এয়ারবাস।

অন্তর থেকে প্রার্থনা করলেন প্রধানমন্ত্রী, বিমান যেন উড়তে না পারে। হয়তো মিসাইলের কারণে বড় ক্ষতি হয়েছে, টেকঅফ করবে না।

কিন্তু বিমানে রয়েছে অতি সামান্য তেল, যাত্রীও অনেক কম, হালকা ওজনের কারণে দ্রুত বাড়তে লাগল গতি। বিদ্যুদ্বেগে প্রধানমন্ত্রীকে পাশ কাটাল বিমান। এগযস্টের তপ্ত হাওয়া নিঃশ্বাসের মত এসে লাগল। টেরোরিস্টরা আকাশে গুলি ছুঁড়বার ফাঁকে চিৎকার করছে। বিমানের নাকের হুইল ধীরে ধীরে মাটি থেকে উপরের দিকে উঠল। দীর্ঘ এক মুহূর্ত আকাশে ঝুলে রইল, লেজের ক্ষতি এবং পাইলটের অদক্ষতার কারণে বিমানের শেষ অংশ বাড়ি খেল ধুলোময় রানওয়ের উপরে।

এয়ারবাসের নাক নেমে আসতে লাগল মাটির দিকে। প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন, আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছে পূরণ করতে চলেছেন। এদিকে ফুরিয়ে এল রানওয়ে। আর বোধহয় উঠবে না বিমান।

কিন্তু রাজকীয় ভঙ্গিতে আকাশে উঠে গেল এয়ারবাস। একটু কাত হয়ে উঠছে। জঙ্গিদের চিৎকার দ্বিগুণ হলো। শত শত গুলি ছুটল আকাশের দিকে।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী। দেখতে না দেখতে অনেক উপরে উঠে গেল বিমান। দ্রুত গতিতে চলেছে। চেয়ে রইলেন তিনি, জানেন না তাঁর সঙ্গীদের কোথায় নিয়ে চলেছে তরুণ। ওদিকে কোথাও রয়েছে ত্রিপোলি শহর। বলা যায় না, হয়তো শান্তি মহাসম্মেলনের হলঘরে আছড়ে পড়তে চলেছে। এখন পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করছে না সন্ত্রাসীরা। আকাশের দিকে চেয়ে আছে সবাই। বহু দূরে চলে গেছে এয়ারবাস। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু পারলেন না।

কাত হয়ে গেল এয়ারবাস, নাক তাক করল দূরের এক পাহাড়ের দিকে। নতুন করে উচ্চতা বজায় রাখতে চাইল পাইলট, আবার সোজা হলো বিমান। কিন্তু পরক্ষণে চিত হয়ে গেল, সোজা গিয়ে আছড়ে পড়ল টিলার উপর! ওই ভয়ঙ্কর পতনে থরথর করে কেঁপে উঠল এত দূরের জমিনও। বিভিন্ন টুকরো নানাদিকে ছিটকে গেল। ফিউজেলাজ থেকে ছিঁড়ে গেল ডানা, পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো। ছিটকে বেরিয়ে গেল একটা ইঞ্জিন। চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে থামল টিলার চূড়ার কাছে। ওখান থেকে প্রচুর ধুলো উঠছে, হারিয়ে গেল দৃশ্যটা। অনেকক্ষণ পর সরে গেল ধূলিকণা। এবার দেখা গেল দাউ-দাউ করে জ্বলছে দুই ডানা। তবে আগুনের আওতা থেকে গড়িয়ে সরে গেছে ফিউজেলাজের সাদা একটা অংশ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ নিচু করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। চারপাশে উল্লসিত চিৎকার, ওই তরুণ পাইলটের প্রশংসা করছে সবাই। চূড়ান্ত ফ্যানটিসিজম্ বোধহয় একেই বলে। বাংলাদেশে তিনি কঠোর হাতে দমন করেছেন এদের, আজকের ঘটনা কি তারই

প্রতিক্রিয়া?

এত দূর থেকে দেখেও পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর সঙ্গের মানুষগুলো আগুনে পুড়ে মরেনি, তবে ওই ক্র্যাশের পর কারও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। একটু দূরে নিচু কণ্ঠ শুনতে পেলেন। ক'জন আপত্তির সুরে বলছে বিমান আরও বেশি পোড়া উচিত ছিল। আলাপ শুরু হলো এরপর কী করবে।

তিনি যেখানে বসেছেন তার খানিক দূরে কী যেন। তারপুলিন সরে যেতে দেখা গেল ওটা মাটি সরানোর মেশিন। এক লোক গিয়ে উঠল ক্যাবে, চালু হলো ইঞ্জিন। মেশিনটা চলে গেল রানওয়ের গোড়ায়, কাজ শুরু করল। এই এয়ারফিল্ড দিয়ে এয়ারবাসকে আকর্ষণ করা হয়েছে। যে গতিতে কাজ চলছে, আগামী কয়েক ঘণ্টার ভিতর হারিয়ে যাবে রানওয়ে ও চারপাশের সব চিহ্ন।

হঠাৎ লোকগুলোর আলাপে ছেদ পড়ল। প্রধানমন্ত্রী যাকে নেতা মনে করেছেন, সে একের পর এক নির্দেশ দিল। বেশিরভাগ শুনতে পেলেন না তিনি, তবে এটা কানে এল: 'এখান থেকে মুছে ফেলো প্লেনের ছাপ। পাহাড়ে গিয়ে খেয়াল রাখবে মিসাইলের চিহ্ন যেন না থাকে। আর লাশগুলো থেকে খুলে আনবে হ্যাণ্ডকাফ।' এরপর প্রধানমন্ত্রীর দিকে এল সে।

'কেন এ কাজ করলেন?' আরবিতে জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।

ঝুঁকে এল লোকটা, কাফিয়ের ভিতর থেকে দেখা গেল সরু দুটো চোখ। তাতে ভয়ঙ্কর উন্মাদনা। 'কারণ, আল্লাহ্ এটাই চেয়েছেন।' নিজের এক লোককে ডাকল সে। 'একে নিয়ে যাও। ইউনুস আল-কবির তাঁর প্রাইজ দেখতে চাইবেন।'

মাথা ঢেকে দেয়া হলো কালো কাপড়ের ব্যাগ দিয়ে, আর কিছুই দেখতে পেলেন না। ধরাধরি করে তুলে দেয়া হলো ট্রাকের

পিছনে। আবার যখন থলে সরিয়ে নেয়া হলো, দেখলেন তিনি আছেন এই সেলে। তাঁকে আগেই পরিয়ে দেয়া হয়েছে বোরখা। জিনিসটা আফগানি ছাদ্রি। দুই চোখ ছাড়া সব ঢাকা পড়েছে। চোখের সামনে ঝুলছে নাইলনের নেট।

তারপর থেকে শুধু অপেক্ষা। কার জন্য, কীসের জন্য, তিনি জানেন না। এরা বোধহয় মেরে ফেলবে তাঁকে। তার আগে মানসিক কষ্ট দিতে চাইছে। বড় ধীরে পেরুচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ দূরে দরজা খোলার আওয়াজ শুনলেন। ধম করে বাড়ি খেল দরজা। বোধহয় খাবার আসছে। দূর থেকে এল পায়ের শব্দ। খটাং শব্দে খুলল বোল্ট, ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলতে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠল। এখন পর্যন্ত সেই তরুণ পাইলট এবং যে-লোক বিমানে তাঁকে ধাক্কা দেয়, তারা ছাড়া আর কাউকে খেয়াল করেননি। এবার দেখলেন দু'জন লোক ভিতরে ঢুকেছে। পরনে খাকি ইউনিফর্ম। তবে কোনও ইনসিগনিয়া নেই। মাথা পেঁচিয়ে রেখেছে কাফিয়ে দিয়ে।

উঠে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী।

বামদিকের লোকটা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত দাঁত খিঁচাল। তাদের বন্দির হাতে হ্যাণ্ডকাফ, তবে ছিঁড়ে ফেলেছেন ছাদ্রি। ওটা ব্যবহার করেছেন বালিশ হিসেবে। দ্বিতীয়বার তাঁর মুখের দিকে চাইল না লোকটা, বোরখা তুলে মাথা দিয়ে গলিয়ে দিল। 'তুমি এখন থেকে পুরুষকে সম্মান দেখাবে! চলো, তোমাকে নিতে এসেছি।'

'কোথায় যেতে হবে?' জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।

মুঠো করে হাত উঁচু করল লোকটা। 'কোনও প্রশ্ন নয়। আর একটা কথা বললে দাঁত ভেঙে দেব।'

প্রধানমন্ত্রীকে দু'পাশ থেকে ধরে সেল থেকে বেরুল ওরা, করিডোর ধরে এগিয়ে পেরুল চারটে ঘর, তারপর বেরিয়ে গেল দালান থেকে। জীবনে প্রথমবার বোরখার কারণে খুশি হলেন

তিনি। সামনে নেটের কাপড় না থাকলে ঝলসে যেত দুই চোখ। জ্বলজ্বলে সূর্য পোড়াচ্ছে মরুভূমিকে। সোনালী গোলকের অবস্থান থেকে আন্দাজ করলেন, এখন মাঝ-সকাল। গরম আরও বাড়বার কথা, তবে তাঁরা রয়েছেন পাহাড়ের অনেক উপরে।

ছবিতে এ ধরনের টেরোরিস্ট ক্যাম্প দেখেছেন তিনি। একটা টিলার গোড়ায় কয়েকটা পুরনো তাঁবু। টিলার খানিক উপরে অসংখ্য গুহা। যদি এই ক্যাম্পে হামলা হয়, এই লোকগুলো আশ্রয় নেবে ওখানে। সন্দেহ নেই, গুহার ভিতর রয়েছে প্রচুর গোলাবারুদ, বিস্ফোরক। প্রয়োজনে অর্ধেক পাহাড় ধসিয়ে দেবে।

বামে প্যারেড গ্রাউণ্ড। একদল লোককে ক্যালিসথেনিকস করাচ্ছে ড্রিল ইন্সট্রাকটার। লোকগুলোর নড়াচড়া থেকে বোঝা যায়, শেষ হয়ে এসেছে ট্রেইনিং। বিশাল টিলা ঝুঁকে এসেছে ক্যাম্পের দিকে। ওখানে একদল লোক টার্গেট টাঙিয়ে গুলি ছুঁড়ছে একে-৪৭ দিয়ে। জায়গাটা এত দূরে যে প্রধানমন্ত্রী বুঝলেন না ঠিক ভাবে টার্গেটে গুলি লাগছে কি না। তবে বড় কথা: এই টেরোরিস্ট দলের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। এখানে নতুন রিক্রুটও ব্যবহার করে তাজা কার্তুজ।

শুটিং রেঞ্জ থেকে আধ মাইল দূরে উঁচু উপত্যকা। ওটাকে প্রায় ঘিরে রেখেছে বিশাল উঁচু পাহাড়। বোধহয় উপত্যকার নীচের অংশ খনি, সেখানে খনন চলছে। একপাশ দিয়ে গেছে রেললাইন। একটা সাইডিঙে বেশ কয়েকটা বক্স কার। পাশে কাঠের জীর্ণ দালান। খানিক দূরে প্রকাণ্ড ডিজেল লোকোমোটিভ, চারদিকের ছোট ইঞ্জিনগুলোকে বামন করে দিয়েছে। যে ট্রাক তাঁকে এখানে এনেছে, সেটার সমান হবে ছোট ইঞ্জিনগুলো। বোরখার নেটিঙের ফলে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখা হলো না।

প্রকাণ্ড এক গুহার পাশে ছোট আরেকটা গুহা। তাঁকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল দুই জঙ্গি। ছাতে ইলেকট্রিক তার। প্রতি তিরিশ ফুট

পর পর জ্বলছে একটা করে বালব। বাইরের তুলনায় গুহার ভিতর অংশ কিছুটা শীতল। তবে চারপাশ এত বদ্ধ, আঁকড়ে আসতে চায় বুক। পুরনো বাড়িতে বাসি একটা গন্ধ থাকে, এখানেও ঠিক তেমন। কিছুদূর যাওয়ার পর থামতে হলো। সামনে পুরু দেয়াল আটকে দিয়েছে পথ। দেয়ালে বড়সড় দরজা, কাঠের। হাত বাড়িয়ে দরজায় টোকা দিল একজন, দরজা খোলার চেষ্টা না করে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল মূর্তির মত। ভিতর থেকে আদেশ পেলে নড়বে, তার আগে নয়।

কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর ডাক এল।

দরজা খুলে প্রধানমন্ত্রীকে ভিতরে ঠেলে দিল প্রহরী। পিছনে দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে রইল দুজন। বোধহয় গুহার শেষ অংশ এদিক। তিনদিকে রুক্ষ পাথুরে দেয়াল। মেঝের উপর পাঁচ ইঞ্চি পুরু পারশিয়ান কার্পেট। চতুর্থ কোণে জ্বলছে কয়লার আগুন। বিদ্যুৎবাহী তারের পাশে স্টিলের চিমনি, ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় ধোঁয়া।

ঘরের মাঝে নামাজের ভঙ্গিতে বসে আছে এক লোক। পরনে ধবধবে সাদা আলখেল্লা। মাথার উপর কালো-সাদা কাফিয়ে। বাতির মৃদু আলোয় কিছু পড়ছে। ওটা কোরান শরীফ। মুখ তুলে চাইল না। যেন জানেই না কেউ এসেছে।

দেখবার মত দৃশ্য। ঋষিদের মত খাড়া হয়ে বসে কিতাব পড়ছে সে। আধ মিনিট পেরুল, মুখ তুলল না। বিরক্ত হলেন প্রধানমন্ত্রী। লোকটা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে।

আরও দু' মিনিট পেরুনোর পর কোরান বন্ধ করল সে, যত্ন করে সরিয়ে রাখল। শান্ত স্বরে জানতে চাইল, 'আপনি কি জানেন আমি কে?'

'আলী বাবার চল্লিশ চোরের একজন,' বিরক্ত হয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী।

'সঠিক বলেননি আপনি।'

'তা হলে আপনি কে?'

মনে মনে বললেন প্রধানমন্ত্রী: তুমি নৃশংস খুনি দানব, আর কেউ নও। লোকটা কিছুই বলছে না। তিনি আবার বললেন, 'কেউ জানে না তুমি কে। বোধহয় নিজের নাম নিজেই দিয়েছ ইউনুস আল-কবির। ঘোষণা দিয়েছ ইজরায়েল ও পশ্চিমা বিশ্বকে ধ্বংস করবে। ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে মরোক্কো পর্যন্ত এক বিশাল ইসলামী রাষ্ট্র গড়বে। ...আর সন্দেহ নেই, ওই দেশের সুলতান হতে চাও তুমি।'

'আমি এখনও ঠিক করিনি কোন খেতাব নেব,' বলল নব্য আল-কবির। 'সুলতান হওয়া ঠিক আছে, কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হয় খেতাব। তা ছাড়া, আমি কাউকে নকল করা ভালবাসি না। হারেম, প্রাসাদ ইত্যাদি আমার জন্য নয়।'

অলস ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সে, যেন নড়ছে সাদা বাদুড়। পাশে রাখা টেবিল থেকে পিতলের কেতলি তুলল, গ্লাসে ঢেলে নিল চা। চিতার মত মসৃণ হাঁটা-চলা।

লোকটা অন্তত ছ' ফুট, আন্দাজ করলেন প্রধানমন্ত্রী। চওড়া কাঁধ। কব্জি বলছে শক্তপোক্ত দেহ। মৃদু আলোয় দেখা গেল না কাফিয়ে ঢাকা চেহারা। বোরখার নেট সরালে একটু ভাল দেখা যেত।

'না, বিলাসিতা আমার জন্য নয়। আমি এসেছি মানুষকে ঠিক পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য। আর আপনাদের মত একদল ভ্রষ্ট মানুষ আমার কাজে বাধা দিচ্ছেন। আপনি তাদের অন্যতম। আপনি কি মনে করেন আপনাকে মাফ করবেন আল্লাহ?'

'কাকে তিনি মাফ করবেন, কাকে করবেন না, তা তাঁর ইচ্ছে,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'তবে যারা শান্তি চায়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াশীল হন। যারা বিনা কারণে মানুষ হত্যা করে,

তাদের প্রতি তাঁর রয়েছে প্রবল ঘৃণা।'

'ভাল বলেছেন। কিন্তু কেন? কেন শান্তি চাইছেন? কেন চাইছেন সম্মেলন?'

'তা জেনে কী করবেন?' চুপ থাকতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু টের পেলেন তর্কের ভিতর জড়িয়ে পড়েছেন। বুঝছেন এই কালের ইউনুস আল-কবিরও শিক্ষিত লোক। তাঁর জানতে ইচ্ছে হলো গণহত্যাকে কীভাবে জায়েজ করবে এ লোক। যত বর্বর জঙ্গি আজ পর্যন্ত নিরীহ মানুষ হত্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই ছিল নানা ধরনের যুক্তি। আসলে ভেবে নেয়া সোজা: আল্লাহ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, মানব হত্যা করলে কিছুই হবে না, বরং পাবে বেহেস্ত।

'আপনি ইসলামের যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন,' বলল আল-কবীর। 'হাতে রেখেছেন পশ্চিমা বিশ্বকে। ...ভেবেছেন পার পেয়ে যাবেন? বড় গলা করে বলছেন পৃথিবীতে শান্তি আসুক। কিন্তু বাংলাদেশের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, শুনে রাখুন, শান্তি আসবার অর্থ উন্নতি থেমে যাওয়া। মানুষ যখন শান্তিতে থাকে, তার মন থেকে উধাও হয় সৃষ্টিশীলতা। আল্লাহ বিবাদ সৃষ্টির জন্য তৈরি করেছেন মানুষকে। প্রাণপণ যুদ্ধে প্রকাশ পায় কার বুকে কত সাহস, আমরা আত্মবিসর্জন করি। শান্তি আমাদের কী দেবে? কিছুই না।'

'তুমি ভুল বললে। শান্তি এনে দেয় সুখ, সমৃদ্ধি।'

'এগুলো তো শারীরিক আনন্দ। আত্মা কী পাবে? আপনাদের মত মানুষ ভাল কোনও টেলিভিশন সেট বা সুন্দর গাড়ি পেলে মনে করেন সুখী হয়েছেন। কিন্তু সুখ এত সহজ বিষয় নয়।'

'তোমাদের তৈরি যুদ্ধ আনে কষ্ট ও অসহায়তা,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মনে পড়ল আফগানিস্তানের পরিণতি। আর ঠিক এর মত একদল লোক বাংলাদেশে বোমা ফাটিয়ে, মানুষ হত্যা করে দখল করতে চায় ক্ষমতা।

'ঠিকই বলেছেন, যুদ্ধ কষ্ট ও অসহায়তা এনে দেয়। কিন্তু যুদ্ধ করলে আত্মা পবিত্র হয়, দেহের নোংরামি থেকে দূরে থাকা যায়। আমরা চাই স্বর্গীয় অনুভূতির পরশ। আমরা বড় কোনও বাড়ি চাই না, একসঙ্গে লড়াই করে পাশাপাশি টিকতে চাই। এই কষ্ট আমাদেরকে পৌঁছে দেয় আল্লাহর খুব কাছে। বলুন, আপনাদের গণতন্ত্র কী দেবে? আমরা খুঁজি মানবের সত্যিকারের অস্তিত্ব। পৃথিবীতে এসে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর কাছে আত্মবিসর্জন দেয়া।'

'আল্লাহ তোমাদের বলে দিয়েছেন এসব খুন-খারাবি করতে হবে?' তিক্ত হাসলেন প্রধানমন্ত্রী। 'তোমরা কী করে ধরে নিলে তিনি কী চান? কোরানে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে, কেউ যেন আত্মহত্যা না করে। অথচ তোমার মত ক্ষমতালোভী একদল মানুষ বিপথে নিয়ে গেছ তরুণ-তরুণীদের। যেমন তুমি, ওই বাচ্চা ছেলেটাকে দিয়ে ক্র্যাশ করিয়েছ বিমান।'

'সে শহীদ হয়েছে।'

'আল্লাহ তাকে শহীদ হতে বলেননি,' তীক্ষ্ণ শোনাল প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠ। 'কিন্তু তুমি তাকে বুঝিয়েছ মরলেই সে শহীদ হবে। আর তা হলেই মিলবে বেহেস্ত। খুশিতে থাকবে অসংখ্য হুর পরীকে নিয়ে। আল্লাহ ছাড়া কে বলতে পারে একজন মানুষ বেহেস্তে যাবে, না দোজখে? আমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখি। আমার মত বহু মানুষ বিশ্বাস রাখেন তাঁর উপর। কিন্তু অন্তর থেকে বলতে পারি, তুমি নিজে তাঁকে বিশ্বাস করো না। আমার ধারণা, তুমি সস্তা এক প্রতারক। খারাপ বুদ্ধি দিয়ে অন্যদের ভুল পথে নিয়ে যাও। তোমার মূল উদ্দেশ্য ক্ষমতা অর্জন করা।'

দু'বার হাত তালি দিল আল-বশির, হাসছে। প্রথমবারের মত ইংরেজিতে বলল, 'ভাল, ভাল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী।'

চুপ রইলেন প্রধানমন্ত্রী।

'একটা বিষয় ঠিকই বলেছেন, দুনিয়ার মস্ত মঞ্চে ক্ষমতা অর্জনই সবসময় সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। দুই শ' বছর আগে শক্তিশালী নেভি দিয়ে দুনিয়া দখল করে নেয় ইংল্যাণ্ড। আর এখন বিত্ত ও নিউক্লিয়ার আর্সেনালের কারণে দুনিয়া শাসন ও শোষণ করছে আমেরিকা। আর ওই দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করছে আপনাদের মত পাতি নেতা-নেত্রীরা। সে-লোক যা বলছে, মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যের কিছু মানুষ তা মানতে রাজি নয়। তারা পা চাটার বদলে বোমা দিয়ে নিজেদেরকে উড়িয়ে দেবে। হ্যাঁ, খুব নৃশংস অস্ত্র। কিন্তু তাতে কী? নিশ্চিত থাকুন আমরা আবারও ইসলাম কায়েম করব। তখন মাথার উপর আর ছড়ি ঘোরাবে না খ্রিস্টানরা।

'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলার আগে শহীদ হওয়ার জন্য তৈরি ছিল পাঁচ লাখ মুসলিম ভাই-বোন। এখন সংখ্যাটা হয়েছে তার দ্বিগুণ। শুধু আপনাদের দেশে দশ হাজার ছেলে-মেয়ে তৈরি আছে শহীদ হওয়ার জন্য—আপনারা তাদের বলেন সন্ত্রাসী। তারা যখন একের পর এক বোমা ফাটাবে, আপনাদের ক্ষমতা বাতাসে মিলিয়ে যাবে। আমরা জানি এই জিহাদীরা সামান্য ঘুঁটি ছাড়া কিছুই নয়। ওদের বোর্ডে বসিয়ে খেলছি আমরা। ওরা মারা গেলে আরও আসবে। লোকবলের অভাব নেই আমাদের। বিশেষ করে আপনাদের দেশে। দু'মুঠো খাবারের জন্য, চাকরি পাওয়ার জন্য, ওরা সব করতে পারে। আমরা যখন সত্যিই ওদেরকে যুদ্ধে নামাব, এশিয়ার কোনও সরকার টিকবে না। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে পারবে না কেউ। তখন আমি নতুন করে পৃথিবীর সীমানা নির্ধারণ করব।'

লোকটাকে উন্মাদ মনে হলো না প্রধানমন্ত্রীর। এ যেন শক্তিশালী কোনও করপোরেট প্রেসিডেন্ট। ধীরে ধীরে বলছে অদূর ভবিষ্যতে কী করবে।

'কারও সাধ্য নেই আমাদেরকে ঠেকায়। ভবিষ্যতে শান্তির নামে পশ্চিমাদের পা চাটা চলবে না।' থুতনির নীচ থেকে কাফিয়ে সরিয়ে দিল ইউনুস আল-কবির। চমকে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী, মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। 'আর ওই সম্মেলনের শুরুতেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন আপনি!'

পনেরো

পাহাড় পেরিয়ে চলে গেল কপ্টার। আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই ড্রাই ওয়াশ থেকে বেরিয়ে এল নিশাত, নবী ও স্বর্ণা, রওনা হয়ে গেল সরু ফাটলের দিকে।

বিশ মিনিট লাগল পাথুরে ফাটলে পৌঁছতে। ট্রাকের স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসল নিশাত, চালু করল ইঞ্জিন। ধীরে ধীরে বের করে আনল ট্রাক।

ট্রাকের ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড কমিউনিকেশন সিস্টেমে বলে উঠল নবী, 'সোহেল কাবাব-ঘর?'

অফরোড ট্রাকের ভিতর স্পিকারের মৃদু আওয়াজ। এ গাড়ি এতই যত্নে বানানো, ইঞ্জিনের আওয়াজ ভিতরে ঢুকছে না বললেই চলে। সুন্দরীর ভোঁতা নাক তিউনিশিয়া সীমান্তের দিকে তাক করল নিশাত।

চেনা যায় না এমন এক কণ্ঠ জবাব দিল, 'সোহেল কাবাব-ঘর। কিছু পিকআপ করতে হবে, না ডেলিভারি দিতে হবে?'

'ডেলিভারি না পিক্আপ জানি না, আমি চার প্লেট খাসির

কাবাব চাই,' বলল নবী।

'দুঃখিত, আপনি রং নম্বরে ফোন করেছেন।'

লাইন কেটে দিল নবী। আবারও ডায়াল করল, তবে ফোন এখন সিকিউর লাইনে।

সোহেলের কণ্ঠ ভেসে এল: 'হ্যালো, নবী।'

'সোহেল ভাই, আমার সঙ্গে নিশাত আপা আর স্বর্ণা।'

'রানা কোথায়?'

সংক্ষেপে বলল নবী। তারপর জানাল, 'মাসুদ ভাই চান তাঁর বায়ো ট্র্যাকিং চিপস ফলো করা হোক। আপনি অপারেশন্স সেন্টারে, সোহেল ভাই?'

'হ্যাঁ। এক মিনিট।' নীরবতা নেমে এল।

এ সুযোগে সুন্দরীর কমপিউটারে জ্যাক লাগাল নবী। এবার মার্ভেলের ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন সিস্টেম থেকে ইমেজ এল। স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে অপারেশন্স সেন্টার। কমিউনিকেশন স্টেশনে ডিউটি অফিসারের কাঁধের পিছনে দাঁড়িয়েছে সোহেল। নিচু স্বরে বলল, 'ইন্টারেস্টিং। তোমরা তিনজন চলেছ পশ্চিমে। এদিকে রানা চলেছে উত্তর-পুবে। গতিবেগ এক শ' মাইল। ব্যাপার কী, তোমাদের ভিতর ঝগড়া হয়েছে?'

'একরকম তাই,' জবাব দিল নিশাত। 'কারও কথা শুনলেন না মাসুদ ভাই, কপ্টারে উঠে চলে গেলেন।'

এবার বলল নবী, 'যারা প্রধানমন্ত্রীর বিমান ভূ-পাতিত করেছে, তাদের সঙ্গে চলেছেন। তাঁর ধারণা, প্রধানমন্ত্রী মারা যাননি। এদিকে আমরা চলেছি তিউনিশিয়া সীমান্তের দিকে।'

'তোমাদের ধারণা ওই বিমান ভূ-পাতিত করা হয়?'

'জী। বিমান যখন ধ্বংস করে দেয়া হয়, ভিতরে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না।'

'তা কী করে সম্ভব? সংক্ষেপে খুলে বলো। বিশ মিনিট আগে

লিবিয়ানরা ঘোষণা দিয়েছে: ওই বিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে। লিবিয়ান সরকার জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার চাইলে নিজেদের এভিয়েশন এক্সপার্টদের পাঠাতে পারে তদন্ত করতে। এ দল আছে এখন কায়রো এয়ারপোর্টে। বিকেলের আগে পৌঁছবে। কিন্তু তার আগেই ওই এলাকায় পৌঁছবে লিবিয়ান অফিসাররা।'

'কিন্তু ওখানে কিছুই পাবে না,' বলল নবী। 'একদল লোক কপ্টারে করে এসে ধ্বংসাবশেষ বিকৃত করেছে। ভাঙা টুকরোগুলো এদিক ওদিক সরিয়েছে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েছে। কপ্টারে করে সরিয়ে নিয়েছে অনেক কিছু। কীভাবে বিমান ক্র্যাশ করে তা আর জানার উপায় নেই। এদের সঙ্গে ছিল খোঁড়া এক উট, ওটা দিয়ে চারপাশে ছাপ ফেলেছে।'

'খোঁড়া উট?'

'যাতে মনে হয় ওখানে গিয়ে মূল্যবান সবকিছু সরিয়ে নিয়েছে যাযাবররা।'

'তা হলে আমাদের কয়েক পা আগে হাঁটছে কেউ,' বলল সোহেল।

'মিডিয়ার মাধ্যমে জানা গেছে যে বাংলাদেশি এভিয়েশন টিম আসছে?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'না। বিসিআই চিফ জানিয়েছেন, এ-তথ্য জানে শুধু উপর পর্যায়ের লিবিয়ান অফিসাররা। কিছুই ফাঁস করা হয়নি।'

'তার মানে শত্রুপক্ষ নিজের লোক রেখেছে সরকারের ভিতর,' বলল স্বর্ণা। 'এজন্যেই ওরা আবার ফিরে এসে ধ্বংসাবশেষ ঘাঁটাঘাটি করেছে।'

'এ-ও হতে পারে লিবিয়ান সরকারই এসব করছে,' বলল সোহেল। 'তোমাদের কি ধারণা বিমানে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না?'

'আমরা যা প্রমাণ পেয়েছি, তাতে মনে হয় ওই বিমানকে

আগেই মরুভূমিতে নামানো হয়। এরপর আবার ওটাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলা হয় পাহাড়ের উপর।'

'তার আগেই প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নেয়া হয়?'

'তাই তো মনে হয়। যারা একাজ করেছে, তারা চাইছে মানুষ মনে করুক তিনি মারা গেছেন।'

'সবাই তাই ধারণা করলে কী ফায়দা পাবে ওরা?' জানতে চাইল সোহেল।

'জানি না, সোহেল ভাই,' বলল স্বর্ণা। 'তবে তিনি শান্তি মহাসম্মেলনের বিষয়ে খুব তৎপর ছিলেন। বারবার বলেছেন এই মহাসম্মেলন শতাব্দির সেরা সুযোগ। তিনি প্রধান বক্তাদের ভিতর অন্যতম ছিলেন। হয়তো তাঁকে সরিয়ে নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে টেরোরিস্টরা। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত না থাকলে অনেকেরই উৎসাহ দমে যাবে।'

নীরবতা নেমে এল। স্বর্ণার বক্তব্য নিয়ে ভাবছে ওরা। টেরোরিস্টরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে হাতে পেলে বিশ্ব নেতাদের উপর একহাত নিতে পারবে। এদিকে বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে জঙ্গিবাদ। আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের মত শুরু হবে বোমা হামলা। কে ঠেকাবে তখন জঙ্গি সন্ত্রাসীদের?

'প্রধানমন্ত্রী বেঁচে থাকলে তাঁকে যে করে হোক উদ্ধার করতে হবে,' নীরবতা ভাঙল সোহেল।

'আমাদের দেবার মত নতুন কোনও তথ্য আছে, সোহেল ভাই?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'হ্যাঁ, আছে। বিসিআই চিফ জানিয়েছেন তিউনিশিয়ায় বাংলাদেশি আর্কিওলজিকাল টিম কাজ করছে। জায়গাটা লিবিয়ান বর্ডারের পাশে। এদের সঙ্গে রয়েছে বিসিআই-এর এজেন্ট সবুর রহমান। ওই মিশনকে মিডিয়াম প্রায়োরিটি দেয়া হয়। ধারণা করা হয় তারা সফল না-ও হতে পারে।'

'ওরা ওখানে কী করছে?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

বুঝিয়ে বলল সোহেল।

কয়েক মাস আগে আহমেদ শরীফ নামের এক বাংলাদেশি গুরুত্বপুর্ণ কিছু চিঠি হাতে পান। তার ভিতর ছিল ঐতিহাসিক জলদস্যু ইউনুস আল-কবিরের বিষয়। বিখ্যাত এই দস্যু এক নদীর তীরে অবস্থিত গোপন গুহায় বসে কিছু প্রবন্ধ লেখেন। পরে শুকিয়ে যায় নদীটা, হারিয়ে যায় সেই গুহা। বাংলাদেশি আর্কিওলজিকাল টিম চাইছে ওই প্রবন্ধগুলো উদ্ধার করতে। প্রধানমন্ত্রী চেয়েছিলেন ওগুলো মহাসম্মেলনে পাঠ করবেন। এসব প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় কীভাবে পাশাপাশি টিকে থাকতে পারে খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম। মূল কথা: একে অপরের উপর হামলা না করে, সবাই মিলে শান্তিতে বাস করা সম্ভব।

'এসব প্রবন্ধ পেলে ভাল, কিন্তু আগে তো পেতে হবে ওই গুহা,' বলল স্বর্ণা। 'এসবের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ আছে প্লেন ক্র্যাশের?'

'কো-ইনসিডেন্টাল হতে পারে, একই এলাকায় দুটো ঘটনা ঘটেছে। জানি না দুটোর ভিতর কোনও সংযোগ আছে কি না। প্রধানমন্ত্রী খুশি হয়ে ওই এক্সপিডিশনের অনুমোদন দেন। আর্কিওলজিস্টদের ফাণ্ড দেয়া হয় সরকার থেকে। আশা করা হয় ওই ধর্মীয় নেতার লেখাগুলো মিলবে। এ ধরনের লেখার মূল্য অনেক। কোটি কোটি লোক এসব মানবে। যেমন মেনে নিয়েছে আয়াতোল্লাহ খোমেনির ফতোয়া। তিনি ঘোষণা করেন আত্মঘাতী হামলা জায়েজ। কিন্তু কোরানে...'

'পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয় আত্মহত্যা চলবে না,' কথা শেষ করল স্বর্ণা।

'যা হোক, চার আর্কিওলজিস্টকে পাঠানো হয় তিউনিশিয়ায়,' বলল সোহেল। 'কিন্তু এখন হারিয়ে গেছে তাদের তিনজন।

স্থানীয় সরকার থেকে এক লোককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সে আর্কিওলজিস্টদের অনুমতি দেয়, বাহাত্তর ঘণ্টার ভিতর একবার করে ক্যাম্পে ফিরলেই চলবে। কিন্তু সেই সময় পেরিয়ে গেছে।'

'এ ঘটনা এবং প্রধানমন্ত্রী হারিয়ে যাওয়ার ভিতর কোনও সংযোগ থাকতে পারে?' সন্দেহ নিয়ে বলল নবী।

'থাকতে পারে, বিসিআই চিফ তাই ধারণা করছেন,' বলল সোহেল। 'তিনি চান তোমরা বিষয়টা তদন্ত করে দেখবে।'

'তদন্ত করব?' একটু থমকে গিয়ে বলল স্বর্ণা। 'কিন্তু... মাসুদ ভাই গেছেন টেরোরিস্টদের সঙ্গে। তারা সন্ত্রাসী না লিবিয়ার স্পেশাল ফোর্স, আমরা জানি না। এরা যে প্লেন ক্র্যাশের সঙ্গে জড়িত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় যখন তখন আমাদেরকে লাগতে পারে মাসুদ ভাইয়ের। আর...'

'অথচ মরুভূমি পেরিয়ে ছুটতে হচ্ছে আর্কিওলজিস্টদের পিছনে?' বলল সোহেল। 'এখন তোমাদের কাজ...'

কী ভেবে যেন বাধা দিল নবী। 'এক সেকেণ্ড, সোহেল ভাই। ... রায়হান কোথায়, বলবেন?'

'নিজের কেবিনে। অফ ডিউটি।'

'ওই কেবিনে একটু লাইন দেবেন? খুব জরুরি।'

আধ মিনিট পেরুল, তারপর লাইনে এল রায়হান। 'কী বিষয়, কচি বালক?'

'রায়হান, আমরা যখন স্যাটালাইট ইমেজ দেখি, মনে পড়ে পরিত্যক্ত একটা ট্রাক দেখতে পাই মরুভূমিতে? ওটা আমাদের তৈরি ফ্লাইট পাথ থেকে বেশি দূরে ছিল না?'

'মনে আছে।'

'ওটার ক্লোজ-আপ ছবি আর জিপিএস কোঅর্ডিনেটস পাঠা।'

ওয়েবক্যামের সামনে থেকে সরে গেল রায়হান। কি-বোর্ডে টাইপ করছে। 'পাওয়া গেছে,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল। 'ই-মেইল

করে দিলাম জিপিএস নম্বর। এবার পাঠাব ট্রাকের জুম করা ছবি। ট্র্যাকিং তথ্য দেখছি। তোরা ওখান থেকে মাত্র এক শ' চার মাইল দূরে। বড়জোর আড়াই ঘণ্টা লাগবে পৌঁছতে।'

'অত সোজা নয়, আমরা কি কাক যে সোজা উড়ে যাব?' বলল নবী। 'এঁকেবেঁকে যেতে হবে। ছবিটা মেইন স্ক্রিনে তুলে সোহেল ভাইকে ফোন দে।'

পাঁচ সেকেণ্ড পর এল সোহেলের কণ্ঠ। 'এটাই ওই ট্রাক?'

'জী।'

'বস্ জানিয়েছেন ট্রাকের সঙ্গে ড্রিল রিগ থাকবে। এটা দেখে তো সেরকমই লাগছে। এত তাড়াতাড়ি ছবি পেলে কোথা থেকে?'

'আগেই রায়হানের কমপিউটারে ছিল।' ব্যাখ্যা দিল না নবী। ওটা থাকল রায়হানের জন্য।

'তা হলে খানিক অন্যদিকে যেতে হবে তোমাদেরকে,' বলল সোহেল। 'ওই ট্রাক তল্লাসী করবে। আরেকটা কথা, ইণ্টারভিউ নেবে আর্কিওলজিস্টদের চতুর্থ সদস্যের। লোকটার নাম ব্রাম ট্যাগার্ট। সে আছে রোমান খনন এলাকায়। সে এরইমধ্যে এক প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছে। তবে বিসিআই চিফ বলেছেন লোকটা কোনও কাজে গা নড়াতে চায় না। তবে মুখোমুখি কথা বললে নতুন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।'

'কিন্তু মাসুদ ভাইয়ের কী হবে?' আগের প্রসঙ্গে ফিরল স্বর্ণা। 'আমার মন বলছে তাঁকে পরিত্যাগ করছি আমরা।'

'রানার জন্য ভেবো না,' বলল সোহেল। 'ওর যা কপাল, ওই কপ্টার উড়িয়ে নিয়ে নামবে সাত-তারা হোটেলে। সঙ্গে সঙ্গে পাবে রাজকীয় ডিনার।' আর কিছু বলল না, তবে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে সোহেল।

আট ঘণ্টার বেশি মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছে সুন্দরী। আরও খানিক

সামনে সেই ড্রিল ট্রাক। জমি এখানে উঁচু-নিচু। মাঝে মাঝে টিলা। কোথাও কোথাও শুকিয়ে যাওয়া ঝর্নার খাত। নবী ও স্বর্ণার ধারণা হয়েছে হাজার ঝাঁকি খেয়ে মোরব্বা হয়ে গেছে শরীর, থলথল করছে মাংস, চুরচুর হয়ে গেছে হাড়। এবার ত্বক ফেটে গেলেই হালুয়া হয়ে যাবে ওরা।

ওরা দু'জন বারকয়েক জায়গা বদল করেছে। এখন নিশাতের পাশে শটগান হাতে স্বর্ণা। গম্ভীর চেহারায় ট্রাক নিয়ে চলেছে নিশাত, যেন কখনও ক্লান্ত হবে না। পশ্চিম দিগন্তে ডুবছে সূর্য। রায়হানের দেয়া জিপিএস কো-অর্ডিনেটস দেখে চলেছে তিনজনের দলটি। কোনও সমস্যা না করেই চলছে সুন্দরী। এখন পর্যন্ত যে পরিমাণ ফিউয়েল রয়েছে, অনায়াসে তিউনিশিয়া সীমান্ত পেরুতে পারবে। একবার ওখানে পৌঁছলে ডিজেল জোগাড় করতে হবে। নবীর ধারণা আর্কিওলজিকাল সাইটে টাকার বিনিময়ে সবই মিলবে। তা যদি না হয়, মার্ভেল থেকে ম্যাকডোনেল ডগলাস এমডি-৫২০এন কপ্টার নিয়ে রওনা হবেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ, পৌঁছে দেবেন ব্ল্যাডার ভরা ডিজেল। ওই কপ্টার সহজে এক টন ওজন নিতে সক্ষম।

আবারও সামনে পড়েছে ধূ-ধূ মরুভূমি। বহুদূরে দেখা যায় টিলাসারি। হঠাৎ বামে কী যেন চোখে পড়ল। জিনিসটা সিকি মাইল দূরে। আবছা আলোয় ভাল দেখা গেল না। আরও কিছু দূর যাওয়ার পর আঙুল তুলে ওদিক দেখাল নিশাত। মাত্র এক মাইল গেলে পড়বে পরিত্যক্ত ট্রাক। তবে বাঁ দিকের জিনিসটার দিকে সুন্দরীকে নিয়ে চলল সে। ওটা না দেখে যাবে না। একটা নিচু ঢিবির পিছনে রাখল ট্রাক, বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন।

'ক্যাপ্টেন নবী, আমার আরকেসিগটা দেবেন?' বলল নিশাত।

পাশেই স্বর্ণা, সিটের পাশের পকেট থেকে বের করল গ্লক ১৯ পিস্তল।

রিয়ার কমপার্টমেন্ট ডোর খুলল নবী, ওখান থেকে অস্ত্র নিয়ে বাড়িয়ে দিল নিশাতের দিকে। ওর নিজের হাতে গ্লক ১৯ পিস্তল।

ট্রাক থেকে নেমে এল ওরা। কুঁজো হয়ে এগোচ্ছে, দেখে নিচ্ছে চারপাশ। সামনের ওই জিনিসটা মরুভূমির মেঝে থেকে উঁচু হয়ে আছে। পঞ্চাশ গজ যেতেই শুনতে পেল বিশ্রী চিৎকার। কোনও মানুষ এ আওয়াজ ছাড়তে পারে না। তবে মিল আছে শিশুদের কান্নার সঙ্গে।

'ওটা কী?' চমকে গেল স্বর্ণা।

অন্য দু'জনের চেয়ে দু'ফুট সামনে হাঁটছে নিশাত। কাঁধে তুলে ফেলেছে রাইফেলের বাঁট। তীক্ষ্ণ চোখে ওদিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইল জিনিসটা কী। মনে হলো ওটা উল্টো করে পোঁতা একটা ক্রস। ক্রসের দু'পাশে কালো দুটো আকৃতি নড়ছে।

তারপর বিস্তারিত হলো কালো দুটো ডানা। এবার বুঝতে পারল নিশাত, এক লোককে ক্রুসিফাই করা হয়েছে। পা দুটো আকাশের দিকে তাক করা, জমিনের দিকে মাথা। মানুষটার দুই হাতের পাশে বসেছে-দুটো গলা ছেলা শকুন। বুকে ও ডানায় থকথকে রক্ত। লাশ থেকে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। একটা শকুনের ঠোঁট থেকে ঝুলছে এক খণ্ড মাংস। দ্রুত ক'বার মাথা নাড়ল, গলা দিয়ে নামিয়ে দিল সুস্বাদু খাবার।

আগেও আফ্রিকায় জাতিসংঘের কাজে এসেছে নিশাত। ওর জানা আছে, গুলি ছুঁড়লেও সরবে না এই বিশ্রী পাখিগুলো। এরা সরে না লাশ থেকে। দু'বার গুলি করল নিশাত। লাশের পাশ থেকে ধুপ করে পড়ল দুটো শকুন। হালকা হাওয়ায় অলস ভঙ্গিতে উড়ে গেল কয়েকটা পালক।

'হায় আল্লাহ্!' বিড়বিড় করল স্বর্ণা।

দ্রুত পায়ে ক্রসের সামনে পৌঁছল ওরা। শকুনগুলো ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে লাশটাকে। কয়েক দিন ধরে খুবলে খাচ্ছে।

এ লোক এশিয়ান ছিল। হতে পারে উপমহাদেশীয়। কপালে গুলি খেয়ে মারা যায়। ক্রসের পায়ের কাছে যে পরিমাণ রক্ত, এ থেকে বুঝবার উপায় নেই লোকটাকে গুলি করে ঝুলিয়ে দিয়েছে, না কি ঝুলিয়ে পরে গুলি করেছে।

ওরা নিশ্চিত হয়ে গেল, এ আর্কিওলজিকাল টিমেরই কেউ।

মানুষটাকে খুন করেছে টেরোরিস্টরা। হয়তো প্রয়োজন বোধ করেছে। কিন্তু তার দেহকে অমানবিক ভাবে বিকৃত করা সম্ভব শুধু পশুর পক্ষেই।

কোনও কথা বলল না ওরা। সুন্দরীর ক্যাবে ফিরল নবী, নিয়ে এল বেলচা।

পঁচিশ মিনিট লাগল নরম বালিতে লাশ কবর দিতে। ততক্ষণ ট্রাকের চাকার দাগ খুঁজতে এগিয়ে গেল স্বর্ণা ও নিশাত। চাকার চিহ্ন গেছে পশ্চিম দিকে। তবে ট্রাক একটা নয়, ছিল দুটো। শেষেরটা ড্রিল ট্রাকের চেয়ে অনেক হালকা। কিছুদূর যেতেই দুই ধরনের দাগের মাঝে পাওয়া গেল একটা গুলির খোসা। পাশের জমিতে লালচে রঙের দাগ। এক এক করে বালি কণা সরাচ্ছে পিঁপড়ার দল।

ফিরে এসে কী পেয়েছে নবীকে বলল ওরা। আলাপ ছাড়াই সবাই বুঝল, অজান্তে সীমান্ত পেরিয়েছে আর্কিওলজিকাল টিম। এখানে এসে ধরা পড়েছে লিবিয়ান প্যাট্রলের হাতে। যে কারণেই হোক, তাদের একজনকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়। বন্দি হিসাবে অন্যদেরকে নিয়েছে। মৃত মানুষটার লাশ ঝুলিয়ে দিয়েছে ক্রসে।

'হতে পারে প্রধানমন্ত্রীর বিমান দেখে ফেলেছিল,' বলল নবী। 'বিমানটা বিপদে পড়েছে বুঝেই দেখতে আসে।'

'এদিকে আসার পর বন্দি হয় প্যাট্রলের হাতে,' মন্তব্যের সুরে বলল স্বর্ণা।

'তবে ওরা সীমান্ত-রক্ষী ছিল না,' বলল নিশাত। 'চারপাশে নজর রাখতে দল পাঠায় টেরোরিস্টরা। যাতে পরিষ্কার থাকে ফ্লাইট পাথ। লোকগুলোকে নির্দেশ দেয়, কেউ বিমান দেখে ফেললে তাকে মেরে ফেলতে হবে।'

'খুবই সম্ভব,' বলল স্বর্ণা। 'তবে এ-ও হতে পারে বাকি দু'জনকে বন্দি করে নিয়ে গেছে।'

'আর্কিওলজিকাল টিম যেখানে অ্যাম্বুশে পড়েছে, তা থেকে অনুমান করা যায় ওরা বেস ক্যাম্প থেকে অনেক দক্ষিণে সরে এসেছিল,' বলল নবী। 'ভুল জায়গায় হাজির হয়, ভুল সময়ে।'

'এবার কী করতে বলেন, আপা?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

সবার ভিতর সিনিয়র নিশাত সুলতানা। তা ছাড়া, তাকে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন মাসুদ স্যর। এরপরও একবার ভাবল সোহেল আহমেদের সঙ্গে আলাপ করবে কি না। তবে ওই লাশের পচন দেখেননি তিনি। উনি বুঝবেন না ওই দৃশ্য কেমন লেগেছে ওদের তিনজনের। ট্যাকটিকাল বিষয়ে কখনও আবেগ থাকে না নিশাতের মনে। জানে, সত্যিকারের কোনও নেতা কখনও আবেগের বশে চলে না। কিন্তু সব জেনেও সঙ্গীদের মনের অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। ওই কসাইগুলোকে খুঁজে বের করবে। কপাল যদি ভাল থাকে, জীবিত পাবে দু'একজনকে। তাদের জানা থাকতে পারে কোথায় নেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। এ মুহূর্তে যে-কোনও তথ্য পাওয়াই গুরুত্বপূর্ণ।

'আমরা ওদের পিছু নিতে পারি,' বলল নিশাত। 'আপনাদের কী মনে হয়?'

'চেষ্টা করে দেখলে মন্দ হয় না,' বলল স্বর্ণা।

'শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা বাংলাদেশিদের সঙ্গে নিয়েছে ওরা,' বলল নবী। 'এখন তারা বন্দি।'

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল নিশাত। 'ট্রাকে উঠুন, আমরা পিছু

নেব।'

সুন্দরীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। ভারী ধরনের যান ড্রিল ট্রাক, গভীর দাগ ফেলে গেছে। মরুভূমিতে সর্বক্ষণ বইছে হাওয়া, তার পরেও বালির বুক থেকে মুছতে পারেনি গভীর চিহ্ন। সূর্যটা বহু দূরের পাহাড়ের ওপাশে ডুবে যেতেই এফএলআইআর সিস্টেম চালু করল নবী। জিনিসটা হেলিকপ্টারকে হামলা করবার জন্য। সামনের দিকে নজর রাখে ইনফ্রারেড সিস্টেম, কয়েক মাইল দূর থেকে পাওয়া যায় হিট সোর্স। সহজে ধরা পড়ে উত্তপ্ত ইঞ্জিন।

নাইট ভিশন গগল্স পরে নিল নিশাত। ধরা পড়বে প্যাসিভ ও অ্যাক্টিভ নিয়ার-ইনফ্রারেড আলো। ওদের পিছনে মুখ তুলেছে আধ-খাওয়া চাঁদ। ওটা ভৌতিক আলো ফেলছে মরুভূমির উপর। তবে চারপাশ দেখা যায়।

মরুভূমির উপর দিয়ে ছুটে চলেছে সুন্দরী। কেউ কথা বলছে না। তবে একই বিষয় নিয়ে ভাবছে—প্রতিশোধ নিতে হবে ওই মৃতের হয়ে। একের পর এক ঝাঁকি লাগছে। তবে সে নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই ওদের। শক অ্যাবযর্ভার যদি সামলাতে না পারে, কী আর করা, নীরবে সহ্য করবে ওরা।

'আমরা তিউনিশিয়া সীমান্ত থেকে কতটা দূরে?' কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল স্বর্ণা।

কমপিউটারে পজিশন দেখল নবী। 'আট মাইল।'

'মনে করি না লোকগুলো সীমান্ত পেরুবে,' বলল নিশাত।

ধূসর বালির উপর আধিভৌতিক আলো ফেলছে চাঁদ। মনে হয় ওটার সামনে উড়ছে বালির পর্দা। নিশাতের নাইট ভিশন গগলস পরিমিত আলো পেল না। কাজেই চালু করল অ্যাক্টিভ ইলিউমিনেটরগুলো। ওই আলো দেখবে না কেউ, তবে গগলস ওটা ধরবে।

আরও এক মাইল পেরুল সুন্দরী। নবী ভাল করেই জানে আপার গগলস সব দেখবে, নিজে এফএলআইআর থেকে চোখ সরাল না। এখন পর্যন্ত সামনের মরুভূমি ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্ক্যানে ধরা পড়ছে না কোনও থার্মাল ইমেজ।

তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল ছোট্ট ব্লিপ। এতই খুদে, কোনও মানুষ হতে পারে না। ব্লিপ নিয়ে ভাবল না নবী, ওটা খুব ছোট কোনও প্রাণী।

কিন্তু ক' সেকেণ্ড পর আলোর বিস্ফোরণ হলো প্রতিটি ওয়েভলেন্থ-এ। কমপিউটার স্ক্রিনে জ্বলজ্বল করে উঠল ধবধবে সাদা কিছু! পরক্ষণে নবী বুঝল, একযস্টের দীর্ঘ লেজ নিয়ে ছুটে আসছে আরপিজি!

রকেট মোটরের উজ্জ্বল প্রভা অন্ধ করে দিল নিশাতকে। চমকে গিয়ে খুলতে গেল গগলস। টের পেল, নিখুঁত অ্যাম্বুশের ভিতর পড়েছে! প্রতিপক্ষ এক সেকেণ্ড আগে গ্রেনেড লঞ্চ করলে হাজার টুকরো হয়ে যেত ওরা।

ষোলো

মাঝারি টিবির উপর দিয়ে চলেছে সুন্দরী, কিন্তু কাভার না পেলে এ সুবিধা কোনও কাজে আসবে না। গতির কারণে ব্যাক গিয়ার ফেলতে পারল না নিশাত। একমাত্র উপায় রইল এগিয়ে চলা। তীরের মত এল আনগাইডেড রকেট। নিশাত মেঝের সঙ্গে অ্যাক্সেলারেটার টিপে ধরল, দ্রুত গতিতে নেমে চলেছে ঢাল

বেয়ে। ড্যাশ বোর্ডের বাটন টিপে নামিয়ে দিল সাসপেনশন। প্রসারিত হলো চাকাগুলো, ফেণ্ডারের আড়াল থেকে অনেকটা বেরিয়ে গেল বাইরের দিকে।

বাম্পার নেমে গেল, .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান ব্যবহারের উপায় রইল না। অবশ্য দু' দিকে চাকা প্রসারিত হওয়ায় ভারসাম্য বেড়ে গেল ট্রাকের, ঝড়ের গতিতে নেমে যেতে লাগল টিবি থেকে। সহজে উল্টে পড়বে না। আরেকটা সুইচ টিপল নিশাত, পিছন বাম্পার থেকে নেমে গেল শেকলের পর্দা। ঝোড়ো গতিতে ছুটছে সুন্দরী, বালির ঘন মেঘ তৈরি করছে শেকলগুলো। তার ভিতর কিছুই দেখবে না গ্রেনেডিয়ারের নাইট ভিশন গগলস। কিন্তু সবই দেখবে এফএলআইআর।

ট্রাক তীরের মত ছুটছে। এক মুহূর্ত আগে যেখানে ছিল, সেখানে এসে বিস্ফোরিত হলো রকেট প্রপেল্ড গ্রেনেড। তৈরি হলো বালির ফোয়ারা। আঁধার চিরে ছুটে এল ট্রেসার বুলেট। একেকটা অতি দীর্ঘ আগুনের ছুরি। খটাখট লাগছে বডিতে।

'স্বর্ণা...' থেমে গেল নিশাত।

'কাজে নেমে পড়েছি, আপা।'

পিছনের কার্গো দরজা খুলে ফেলেছে স্বর্ণা, পা দুটো সামনে রেখে বেরুল। পাশের সুইচ টিপতে খুলতে লাগল উপরের হ্যাচ। কবাট সরে যেতেই উপরের দিকে ঠেলে দিল দ্বিতীয় মেশিনগান, বসিয়ে নিল ক্যাবের ছাতের মাউন্টে। হ্যাচ কাভার দুটো দু'দিক থেকে কাভার দেবে। সরাসরি সামনে থেকে এল ট্রেসার। লোকটার অবস্থান বুঝে নিল স্বর্ণা, ওর দু'হাতের ভিতর গর্জন ছাড়ল .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগান। বিদ্যুদ্বেগে ব্রিচ থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে ব্রাসের খোসা। দূরে এক জায়গায় আগুনের ফুলকি বেশি, ওদিকে বাড়তি মনোযোগ দিল স্বর্ণা। জানে না আঁধারে কী ঘটছে, তবে ক' সেকেণ্ড পর ওদিক থেকে গুলি আসা

বন্ধ হলো।

এঁকেবেঁকে ছুটছে নিশাত, বাধ্য হয়ে স্বর্ণার ঘোরাতে হচ্ছে মেশিনগান। সামনে পড়ল শত্রুদের আরেকটা লাইন। এদের সঙ্গে রয়েছে আরেক গ্রেনেডিয়ার। মেশিনগানের গুলি লাগল তার হাতের লঞ্চারে। বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড, ঝলসানির ভিতর দেখা গেল ছিটকে আকাশে উঠল কয়েকটা দেহ।

অন্ধকারে রওনা হয়েছে আরেকটা আরপিজি। তবে এত দূর দিয়ে, দ্বিতীয়বার ভাবল না নিশাত। দীর্ঘ এক টিবির দিকে চলেছে। ওখানে কাভার নিয়েছে আততায়ী দল। ত্যাড়চা ভাবে টিবির উপর উঠছে সুন্দরী। চূড়ায় উঠেই ফোর হুইল চালু করল নিশাত, কাত হয়ে আবার নেমে চলেছে। এক পাশে রইল লোকগুলো। সহজে তাদেরকে ক্রসহেয়ারে পেল স্বর্ণা। তারা যেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু করবার সময় পেল না, যেন কাস্তের সামনে পড়েছে গমের খেত। পিছনে ছিটকে পড়ল লাশগুলো।

'সামনে বিশাল থার্মাল ইমেজ,' কমপিউটার স্ক্রিন থেকে চোখ তুলল না নবী।

'রেঞ্জ?'

'পাঁচ শ' গজ। টপোগ্রাফির কারণে চোখে পড়ছে না। তবে বড় কিছু। ক্ষণে ক্ষণে গরম হয়ে উঠছে।'

'মিসাইল?' জানতে চাইল নিশাত।

এবড়োখেবড়ো জমির উপর দিয়ে ছুটছে সুন্দরী, কিন্তু একবারের জন্যও কি-বোর্ড টিপতে ভুল করছে না নবীর আঙুলগুলো। ট্রাকের দু' পাশ থেকে খুলল হাইড্রোলিকালি অপারেটেড প্যানেল, বেরিয়ে এল ভোঁতা মুখের চারটে এফজিএম-১৪৯ জ্যাভেলিন অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইল। কাঁধের উপর লঞ্চার রেখে ব্যবহার করতে হয়। জ্যাভেলিনের ওয়ারহেড সতেরো পাউণ্ডের। অনায়াসে ধ্বংস করে যে-কোনও আর্মার্ড

ভেহিকেল।

জ্যাভেলিন ইনফ্রারেড গাইডেড মিসাইল, একবার লক্ষ্য নির্ধারণ করলে ওটাকে নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয় না। না দেখা উত্তাপের উপর কমপিউটারের টার্গেটিং রেটিকল লক করল নবী, প্রস্তুত রইল মিসাইল।

'মিসাইল!' স্বর্ণার জন্য এক সেকেণ্ড দেরি করল নবী, তারপর লঞ্চ করল রকেট।

টিউব থেকে বেরিয়ে গেল মিসাইল, প্রচণ্ড উত্তপ্ত একযস্ট পিছনে ফেলে মরুভূমি পেরুতে লাগল। একদল লোক একপাশ থেকে গুলি ছুঁড়ছে সুন্দরীর দিকে। বনবন স্টিয়ারিং ঘোরাল নিশাত, সুযোগ করে দিল স্বর্ণাকে। বিশ্রী আওয়াজে আবার চালু হলো মেশিনগান। কারও কোনও আর্তচিৎকার নেই, তবে ক' সেকেণ্ড পর থেমে গেল গুলি।

চারপাশের গোলাগুলি যেন কিছুই নয়, সগর্জনে উড়ে চলেছে জ্যাভেলিন, জানে, কোনটা তার টার্গেট। প্রতিপক্ষের কয়েকজন গুলি করে থামাতে চাইল একগুঁয়ে মিসাইলটাকে, কোনও ফলাফল পেল না। টার্গেটের পঞ্চাশ ফুটের ভিতর পৌঁছে গেল জ্যাভেলিন, তারপর হঠাৎ হারিয়ে বসল সিগনাল। পরক্ষণে আরেকটা সিগনাল পেল, তবে ওটা অনেক কম উষ্ণ। জিনিসটাও কাছে, তবে ওদিকে মনোযোগ দিল না জ্যাভেলিন, ছুটতে লাগল নির্ধারিত কোর্সেই।

মিসাইলের ইলেকট্রনিক মগজ জানে না, সঠিক টার্গেট ও তার মাঝে হাজির হয়েছে একটি ফিউয়েল ট্রাক, ওটার চলন্ত ইঞ্জিনকে কম উষ্ণ ইমেজ ভাবছে জ্যাভেলিন। তবে গতিপথ পরিবর্তন হলো না, ক্যাবের পিছনে ট্যাঙ্কের উপর আছড়ে পড়ল মিসাইল। প্রচণ্ড তাপ ও আগুনে বিস্ফোরিত হলো ফিউয়েল, মুহূর্তে মরল ড্রাইভার। কমলা আগুনের প্রকাণ্ড গোলক উঠে গেল আকাশে।

খানিক দূরে ছিল ন'টা তাঁবু, বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হলো সব। ফিতার মত চ্যাপ্টা হয়ে গেল গাই রোপ। ভেঙে পড়ল খুঁটিগুলো। এ কম্পাউণ্ডকে স্যাটালাইটের হাত থেকে রক্ষা করতে কার্গো নেটিং দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। তার উপর ছিল খেজুর পাতার আচ্ছাদন—আগুনে ছাই হয়ে গেল এক পলকে। টুকরো টুকরো হলো ট্রাক, চারপাশে ছড়িয়ে গেল শ্র্যাপনেল। আশপাশে যত গ্রাউণ্ড ক্রু ছিল, কিমা হয়ে গেল। তবে তারা যে মেশিন সার্ভিসিং করছিল, ওটার কিছুই হলো না।

বিধ্বস্ত ট্রাকের বিশাল আগুনে একই সঙ্গে দুটো বিষয় দেখল নিশাত-নবী-স্বর্ণা। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ফলে কাত হয়ে পড়েছে আর্কিওলজিস্টদের ড্রিল ট্রাক, আগুন ধরে গেছে আণ্ডার ক্যারিজে। আর, দ্বিতীয় জিনিসটা ভয়ঙ্কর। প্রহরীরা ওটাকে আড়াল দিয়েছিল। বালির বস্তা দিয়ে তৈরি বাঙ্কারের ভিতর বসে আছে রাশান এমআই-২৪ হেলিকপ্টার গানশিপ। ওটা পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাটলফিল্ড কপ্টার, বলা হয় ফ্লাইং ট্যাঙ্ক। যে উষ্ণতা টের পেয়েছে নবীর এফএলআইআর, ওটা এসেছে ইসোতভ টারবাইন থেকে। দ্রুত ঘুরছে পাখা। শিকার ধরতে উড়াল দিতে চলেছে পাইলট!

'হায় আল্লাহ্!' বলে উঠল নবী। 'ওটা যদি ওড়ে, আমরা শেষ!'

ওটার মিলিটারি কোড নেম হিন্দ। নবী কথা শেষ করবার আগেই মাটি ছাড়ল গানশিপ, ঘুরল। ওটার এক পাশ এখনও বালির বস্তার আড়ালে। পরক্ষণে উপরে উঠল হিন্দ, নাকের নীচের গ্যাটলিং গানের চারটে ব্যারেল থেকে শুরু হলো গুলিবর্ষণ।

তার দু' সেকেণ্ড আগে হ্যাচ দিয়ে নেমে পড়েছে স্বর্ণা। সুন্দরীর চারপাশের মরুভূমি বলকে উঠল .৫০ ক্যালিবারের গুলিতে। বুলেটপ্রুফ উইণ্ডশিল্ডে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য খুদে নক্ষত্র।

এভাবে গুলি চললে আগামী কয়েক সেকেণ্ডেই চুরচুর হয়ে খসে পড়বে কাঁচ।

গিয়ার ফেলল নিশাত, চেপে ধরল অ্যাক্সেলারেটার। লাফ দিয়ে রওনা হলো সুন্দরী, পিছনে তৈরি হলো বালি-ঝড়। বামদিকের জমি বিস্ফোরিত হলো, ট্রাকের পিছু নিয়েছে বুলেট সারি। পরক্ষণে হিন্দের খাটো ডানার নীচের পড থেকে লঞ্চ করা হলো আধ ডজন রকেট। সুন্দরীর ভিতর ওদের মনে হলো যেন মরুঝড়ের ভিতর পড়েছে। ওসব মিসাইল গাইডেড নয়, চারপাশের টিবির উপর নেমে এল। প্রতিটি বিস্ফোরণের মাঝে এঁকেবেঁকে সরতে চাইল নিশাত, আশা করল খানিক বাড়তি সময় পাবে। একটা রকেট লাগল পিছনের বাম্পারে, ঝাঁকি খেল ট্রাক। তবে কঠিন স্টিলের বড় কোনও ক্ষতি হলো না।

নবীর দিকে চাইল নিশাত। 'আপনি তৈরি?'

'হ্যাঁ!'

স্টিয়ারিং হুইল বামদিকে ঘুরিয়ে দিল নিশাত, পরক্ষণে প্রচণ্ড চাপ দিল ব্রেক প্যাডেলে। বালির উপর পুরো ঘুরে গেল সুন্দরী, কাত হয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল। হিন্দের পিছন দিকে চলে এসেছে ট্রাকের নাক। দুটো জ্যাভেলিন ছুঁড়ল নবী। হাতে সময় কই যে লক্ষ্য-স্থির করবে, প্রার্থনা করল মিসাইলের হিট সিকার খুঁজে নেবে গানশিপকে।

বালি-ঝড়ের ভিতর টার্গেট হারিয়ে ফেলেছে পাইলট, আপাতত ছুঁড়ল না গুলি বা রকেট। নীচে চেয়ে খুঁজছে ট্রাক। জানা কথা, বালি-কণা সরলেই হাতের মুঠোর ভিতর পাবে শত্রুকে। কিন্তু নীচের ওই মরুঝড়ের ভিতর থেকে ছিটকে উঠল দুটো মিসাইল। মরুভূমির বালি এখনও যথেষ্ট তপ্ত, দুই মিসাইলের একটার ক্রায়োনিক কুলিং সিস্টেম পরিমিত তাপমাত্রা নির্ধারণে ব্যর্থ হলো—দিক হারাল ক্ষেপনাস্ত্র, খানিক দূরের টিবির

উপর বিস্ফোরিত হলো।

ইনকামিং রকেটের দিকে নাক তাক করল হিন্দ। ওটার দেহ আড়াল দেবে টারবাইনের একযস্টকে, ফলে থার্মাল ইমেজ কম হবে। পাইলট এটা ভাল করেই জানে, কিছুই করল না সে। আশা করছে, চুপচাপ অপেক্ষা করলে এমনিতেই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে জ্যাভেলিন। জানে না, টার্গেট লক-ইন করেছে মিসাইল। কমপিউটার মগজ দেখছে হেলিকপ্টারের থুতনির নীচে চারটে জ্বলজ্বলে টিউব। খুব উত্তপ্ত ওগুলো!

মিসাইলের ফিনগুলোকে সামান্য কারেকশান দিল হিট সিকার, হিন্দের গ্যাটলিং গানের তপ্ত ব্যারেলগুলোকে সরাসরি নিশানা করল। শেষ দু' সেকেণ্ডে সরে যেতে চাইল পাইলট, ফলে গ্যাটলিঙের ব্যারেল পেল না জ্যাভেলিন, বিস্ফোরিত হলো ঠিক ককপিটের নীচে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে দু' টুকরো হয়ে গেল হিন্দ। সামনের অংশ গুঁড়ো হলো। এদিকে হাল ও টেইল বুম ছিটকে পিছনে সরল। মেইন রোটর দ্রুত ঘুরছে, সব ভারসাম্য হারিয়ে বসল কপ্টার—চরকির মত ঘুরতে লাগল। যেটা ককপিট ছিল সেই গর্তের ভিতর থেকে বেরুতে লাগল ঘন কালো ধোঁয়া। নব্বুই ডিগ্রি কাত হয়ে উপরের দিকে উঠল হিন্দ। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস কাটার ক্ষমতা হারাল পাখাগুলো। মরুভূমির উপর জগদ্দল পাথরের মত নেমে এল দশ টনি কপ্টার। বালির ভিতর গাঁথল অ্যালুমিনিয়ামের পাখা। পরক্ষণে ছিঁড়েখুঁড়ে নানা দিকে ছুটল। শ্র্যাপনেলের গতি হলো প্রায় সুপারসনিক। একগাদা বালি ঢুকল ইসোতভ টারবাইনের ভিতর, সঙ্গে সঙ্গে অকেজো হলো ওটা।

কপ্টারের সেলফ-সিলিং ফিউয়েল ট্যাঙ্ক তার কাজ সঠিক ভাবেই করল, বিস্ফোরিত হলো না। ফিউয়েলের অভাবে দ্রুত নিভে গেল ইঞ্জিনের একযস্ট।

বড় করে শ্বাস ফেলল নবী।

'ভাল দেখিয়েছেন, ক্যাপ্টেন নবী,' বলল নিশাত। ঘাড় ফিরিয়ে জানতে চাইল, 'স্বর্ণা? তোমার কী অবস্থা?'

'ভয় কাটিয়ে উঠছি।'

'ভয় পাওয়ার মেয়ে তুমি নও।'

ক্যাবের ভিতর মাথা ঢোকাল স্বর্ণা। 'নিজ চোখে দেখলাম আপনারা একটা হিন্দ ফেলে দিলেন। এটা কী করে সম্ভব হলো? তার চেয়ে বড় কথা, এ এলাকা কোথায়? এটা কোনও সীমান্ত ফাঁড়ি?'

'হতে পারে,' বলল নিশাত।

'আপা, হিন্দের কাছে চলুন,' বলল নবী। এফএলআইআর-এর মাধ্যমে ভূ-পাতিত কপ্টার দেখছে সে।

'কাজটা ঠিক হবে না,' বলল নিশাত। 'এবার লেজ তুলে ভেগে যাওয়া উচিত।'

'মনে করি না এটা সীমান্ত ফাঁড়ি,' বলল নবী। 'কাছ থেকে হিন্দ দেখলে বুঝব এরা কারা। তা ছাড়া, নিশ্চিত হতে হবে চারপাশে কমিউনিকেশন গিয়ার আছে কি না। জীবিত কেউ থাকলে নিজেদের লোক ডেকে আনবে। সেক্ষেত্রে বিপদে পড়ব।'

গিয়ার ফেলে রওনা হয়ে গেল নিশাত। সিকি মাইল দূরে পড়েছে গানশিপ। তিন মিনিটে পৌঁছে গেল সুন্দরী। তখনও থামেনি, তার আগেই দরজা খুলে নেমে গেল নবী। নিজের অজান্তেই কুঁজো হয়ে গেছে। শিকারী যেমন হাজারো বছর আগে বিপজ্জনক শিকারের দিকে চাইত আর ভাবত ওটা এখনও বেঁচে থাকতে পারে, সেভাবে চাইল হিন্দের দিকে। সাবধানী পায়ে পৌঁছে গেল ওটার পাশে। এদিকে হ্যাচ দিয়ে বেরিয়ে গেছে স্বর্ণা, মেশিনগান হাতে চেয়ে রইল ধূমায়িত ধ্বংসাবশেষ ও ক্যাম্পের দিকে।

'কী খুঁজছেন?' জানতে চাইল।

'খুঁজছি না, দেখছি,' বলল নবী।

'সেটা কী তা-ই না হয় বলুন?'

'এয়ার ইনটেক সাধারণ নয়। ওগুলো আকারে বেশ বড়। তা ছাড়া, রোটর ব্লেডের স্টাব দেখবার মত।'

'তাতে?' ট্রাকের ক্যাব থেকে জানতে চাইল নিশাত।

ঘুরে চাইল নবী। 'আপা, এই কপ্টার মডিফাই করা হয়েছে অল্টিচ্যুড পেতে। বাজি ধরতে পারি, টারবাইনের লাইনগুলো চেক করলে দেখব স্বাভাবিকের চেয়ে বড়। আর এটার...' গানশিপের ডানায় হার্ড-পয়েন্ট মাউন্টে চাপড় দিল। 'এখানে রাখত এএ-৭ অ্যাপেক্স মিসাইল।'

'তাতে কী?'

'অ্যাপেক্স হিন্দের টিপিকাল লোড-আউট নয়। এসব গানশিপ আসলে গ্রাউণ্ড-অ্যাটাক কপ্টার। কিন্তু অ্যাপেক্স ডিজাইন করা হয় এয়ার-টু-এয়ার কমব্যাটের জন্য। বিশেষ করে এমআইজি-২৩ ফ্লগারের কারণে।'

'আপনি এত নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'আমি ওয়েপন্স ডিজাইনের উপর ট্রেইনিং নিয়েছি। আপনারা যেমন দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগ করতে পারেন, তেমনি করে বলতে পারি, এই গানশিপে অ্যাপেক্স ছিল।'

'এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল, হাই অল্টিচ্যুড গানশিপ...' যেন আনমনে বলছে নিশাত। কথাগুলোকে তুলা দণ্ডে তুলে ধরছে। 'খুব রহস্যজনক কিছু নয় যে শার্লক হোমসকে লাগবে। গানশিপের মিসাইল দিয়েই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিমানকে নামানো হয়েছে।'

জানতে চাইল স্বর্ণা, 'এ এলাকা কি লিবিয়ান আর্মির, না ভোগ-দখল করছে টেরোরিস্টরা?'

'লাখ টাকার প্রশ্ন করেছেন,' বলল নবী। ফিরল সুন্দরীর

ক্যাবে। 'চলুন দেখি এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় কি না।'

মরু-ক্যাম্পের দিকে ফিরছে সুন্দরী। প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে তাঁবুগুলো, পুড়ে ছাই হয়েছে খেজুর পাতা। এক পাশে খোলা মরুভূমি, আরেক দিকে লণ্ডভণ্ড ক্যাম্প। হিন্দের এক মেকানিকের লাশের পাশে থামল সুন্দরী। নেমে গেল নবী, চিত করল লাশটা। দূরের আগুন থেকে আসছে লালচে আভা। লোকটা গুলি খেয়ে মরেনি। ফিউয়েল ট্রাকের ট্যাঙ্ক থেকে এক টুকরো লোহা গেঁথেছে বুকে। ইউনিফর্মে কোনও ইনসিগনিয়া নেই, আইডেণ্টিফিকেশনও নেই। এমন কী ডগ ট্যাগও অনুপস্থিত।

আরও কয়েকটা লাশ পরীক্ষা করল নবী, তবে সুন্দরীর আড়াল থেকে বেশি দূরে গেল না। কারও র‍্যাঙ্ক বা আইডি নেই। বিধ্বস্ত তাঁবুর ভিতর খুঁজল। একটা স্যাটালাইট ফোন পাওয়া গেল। ওটা পকেটে রেখে দিল। পাশের তাঁবুর ভিতর মিলল বড়সড় ট্র্যান্সিভার, তবে ভয়ানক বিস্ফোরণে বিকল। এসব তাঁবুর ভিতর এমন কিছু নেই যা দেখে বুঝবে এরা কারা, বা কাদের হয়ে কাজ করত।

'কী বুঝলেন?' নবী ক্যাবে উঠতেই জানতে চাইল নিশাত।

'আমরা জানি এয়ারবাসকে কীভাবে নামানো হয়েছে, কিন্তু বোঝা গেল না এই গোপন ঘাঁটি কাদের,' হতাশ স্বরে বলল নবী।

'এ নিয়ে ভাবছি না,' বলল নিশাত। রওনা হয়ে গেল তিউনিশিয়া সীমান্ত লক্ষ্য করে। 'এসব প্রশ্ন নিয়ে কাজ করছেন মাসুদ স্যর। কপ্টার নামলে পাঁচ মিনিটের ভিতর জেনে যাবেন ওরা কারা।'

সতেরো

হেলিকপ্টারের শামুক দরজা খুলে যেতেই ধাঁধিয়ে গেল রানার চোখ। বাইরে অত্যুজ্জ্বল রোদ। খর দাবদাহের ভিতর বইছে লূ-হাওয়া। মনে মনে বলল, *পৌঁছে গেলাম। এবার চারপাশ দেখে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।*

লিবিয়ান এয়ার বেসে হারিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না। ক্যাম্পে বোধহয় থাকবে হাজারখানেক লোক। মিলিটারি পারসোনেল যে যার ডিউটি করবে। নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটিতে যাবে, আবার ফিরবে নিজ ব্যারাকে। বারো-চোদ্দটা দালান চোখে পড়ছে। সেগুলোর ভিতর লুকাতে পারবে। এত লোকের ভিতর উধাও হওয়া সোজা।

কিন্তু এমআই-৮ কোনও এয়ার ফোর্স ফ্যাসিলিটিতে নামেনি। এ জায়গা উঁচু মালভূমি। বহু নীচে একের পর এক সবুজ উপত্যকা। দেখতে অপূর্ব লাগছে। দুরমুজ করা শক্ত মাটিতে নেমেছে কপ্টার, নীচে ট্রেইনিং ক্যাম্প। সবার সঙ্গে কপ্টার থেকে নামতে হবে, একটু দ্বিধা নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। নীচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গোটা কয়েক তাঁবু। পাশেই প্যারেড ফিল্ড, অবস্ট্যাকল কোর্স ও শুটিং রেঞ্জ।

কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছল না রানা। মন বলছে, এটা লিবিয়ার জমিতে কোনও টেরোরিস্ট ক্যাম্প। অনুদান নেই সরকার থেকে।

কমপাউণ্ডের একদিকে লোহার কলাম ও বিম দিয়ে তৈরি তিনতলা দালান বোধহয় বড়সড় অফিস ব্লক। সামনে গোলাকার ড্রাইভওয়ে। দূর দিয়ে ঘেরা উঁচু দেয়াল। দালানের পিছন জমিতে

গাছ নেই, বদলে কারুকাজ করা তারকাঁটার বেড়া, হঠাৎ দেখলে মনে হয় হেজব্রাশের ঝোপঝাড়।

থামছে কপ্টারের টারবাইন। দূর থেকে এল জেনারেটারের কর্কশ আওয়াজ। আযান শুরু করেছেন মুয়াজ্জিন। দালানগুলো থেকে বেরিয়ে আসছে সবাই, হাতে জায়নামাজ। প্যারেড গ্রাউণ্ডে জড় হচ্ছে, মক্কা শহরের দিকে জায়নামাজ পেতে নেয়া হচ্ছে। আন্দাজ করল রানা, এখানে রয়েছে দু' শ'র মত লোক। কিন্তু এত কম মানুষের ভিতর অচেনা থাকা অসম্ভব। এখন হোক বা খানিক পর, সত্যিকারের সোবহানকে খুঁজবে কেউ। দল বেঁধে খুঁজতে বেরুবে সবাই।

যত দ্রুত সম্ভব এদের সম্পর্কে তথ্য দরকার। কিন্তু এখানে লুকাতে পারবে না। আগে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে, তারপর ফিরবে রিকনেসেন্স করতে।

'পা বাড়াও,' সামনে থেকে নির্দেশ এল।

সবার শেষে র‍্যাম্প বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। চোখ পড়ল নীচের উপত্যকার উপর। ওখানে কনস্ট্রাকশন বা মাইনিং চলছে। ভাল করে পেঁচিয়ে নিল কাফিয়ে, সরু মেটো পথ ধরে নামতে লাগল ক্যাম্পের দিকে। শেষ জনের পিছু নিয়েছে। আশা করছে, কেউ চট্ করে সন্দেহ করবে না।

ভূ-পাতিত বিমানকে যারা স্যাবোটাজ করল, তারা একই ব্যারাকের কি না, জানা নেই। নিজেদের ভিতর ওরা একটা কথা বলেনি। তবে আন্দাজ করা যায়, একই ব্যারাকের। একইসঙ্গে ট্রেইনিং নিয়েছে, শৃঙ্খলা শিখেছে। পরস্পরকে ভাল করেই চেনে, নিজ ব্যারাকে ফিরলে শুরু হবে আলাপ। তার মানে, সন্দেহ নেই, কিছুক্ষণের ভিতর ধরা পড়ছে ও। যেভাবে হোক, পালাতে হবে।

মনে মনে হিসাব কষছে রানা। গিরিখাদের পাশে মেটো পথ, বৃষ্টিতে ধসে পড়েছে একপাশ। এ-পথে নামলে ড্রেনের মত সরু

নালা, ফস্কা বালি, নুড়ি-পাথর ও বড়সড় বোল্ডার এড়িয়ে নামতে হবে। পা পিছলালে পড়বে গিয়ে অনেক নীচে পাথুরে জমিনের উপর। টিলার মাঝে কার্নিশ আছে তবে সেখানে নামা খুব কঠিন। নামতে যদি পারেও, তারপর বাকি তিরিশ ফুট দেয়ালের মত খাড়া। নীচের পাথরে আছড়ে পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু।

দলটি পিঁপড়ার মত নেমে চলেছে, সামনে তাদের নেতা। হঠাৎ থমকে গিয়ে নির্দেশ দিল সে। সবার কাফিয়ে জমা নেবে।

রানা ছাড়া সবাই জানে এটাই ক্যাম্পের নিয়ম। লোকগুলো আগেই মাথা থেকে কাফিয়ে খুলতে শুরু করেছে। একবার চট্ করে বামদিকে ক্যাম্পের দিকে চাইল রানা। ওদিকে কারও মাথায় কাফিয়ে নেই। ওর মনে পড়ল, এ জিনিস দেয়া হয় নিজেদের ভিতর আন্তরিকতা বাড়ানোর জন্য। আরেকটি কারণ, বাইরের কেউ চট্ করে চিনবে না। এখন ক্যাম্পের ভাইদের ভিতর তারা নিরাপদ। নিশ্চিন্তে নিজেদের মুখ দেখাবে!

মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ভাগ্যদেবী!

হাতের তালুর পাশ দিয়ে সামনের লোকটার পিঠে জোর ধাক্কা দিল রানা। চাপা স্বরে বলল, 'অ্যাই, সাবধানে চলবে!'

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, সরু হয়ে গেছে দুই চোখ। 'এটা করলে কেন?'

'আমার পেটে গুঁতো দিলে কেন!' ধমকে উঠল রানা। 'এই অপমানের জবাব তোমাকে খুন করা।'

'পিছনে কী হচ্ছে?' ধমক দিল নেতা।

'এই শুয়োরের বাচ্চা আমাকে অপমান করেছে!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

'তুমি কে বলছ?' জানতে চাইল নেতা। 'চেহারা দেখাও।'

'আগে এই শুয়োরের বাচ্চার মাফ চাইতে হবে।'

'কক্ষনো না। প্রথমে তুমি আমার পিঠে গুঁতো দিয়েছ।'

অলস ভঙ্গিতে আরবের মুখে হাত ঘুরিয়ে একটা বিরাশি সিক্কা বসানোর ভঙ্গি করল রানা। পুরো শক্তির দশ ভাগের এক ভাগ খরচ করেছে। লোকটা অনেক আগেই ঘুসিটা আসতে দেখেছে, উবু হয়ে এড়িয়ে গেল। জবাবে দুটো মাঝারি ঘুসি বসিয়ে দিল রানার পেটে। নিজের জন্য কৈফিয়ত দরকার ছিল রানার। হ্যাঁচকা টানে লোকটার কাফিয়ে খুলল, দুই হাতে তাকে ঘুরিয়ে দিল। এখন ওর নিজের পিঠ অন্যদের দিকে। কেউ দেখবে না মুখ।

'আমি তো তোমাকে চিনি না!' বিস্মিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'এই লোক নকল! গোপনে আমাদের দলে ঢুকেছে!'

'তুমি পাগল না কি! আমি এখানে আট মাস ধরে আছি!'

'মিথ্যুক!' গর্জে উঠল রানা।

ধাক্কা দিয়ে ওকে সরাতে চাইল আরব। বাধা দিল না রানা, তবে তাল সামলানোর ভান করে শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলল প্রতিপক্ষের একটা বাহু, পথ থেকে সরে গেল। টের পেয়েছে হড়কে গেছে দুই পা। জঙ্গিকে নিয়ে পড়ছে। মালভূমির প্রান্তে পৌঁছেই মাথার উপর দিয়ে লোকটাকে থ্রো করল। নিজেও দড়াবাজের মত ঘুরে গেছে। খাড়া নালার ভিতর পড়েছে আরব। তবে তার উপর আসীন হয়েছে রানা, চোখা পাথর এড়াতে শুয়ে পড়ল লোকটার বুকের উপর।

নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল দুজন, সঙ্গে চলেছে নুড়ি-পাথরের ঢল। ওই আওয়াজ ছাপিয়ে একটা মুটমুট শব্দ পেল রানা। হাড় ভাঙছে জঙ্গির। কানের কাছে বিকট চিৎকার জুড়েছে। নালা বেয়ে নেমে যাওয়ার গতি বাড়ল। ওরা যেন ববস্লেডে চড়েছে, তবে তফাৎ, স্লেড হয়েছে আরব টেরোরিস্ট। উপর থেকে ও দু'পাশ থেকে খসে পড়ছে অসংখ্য পাথর। দ্রুত গতিতে নামছে ওরা। উড়ছে প্রচুর ধুলো। উপর থেকে ওদেরকে দেখবে না কেউ। উঠে বসবার চেষ্টা করছে দু'জনই। তবে পড়বার গতি অস্বাভাবিক

বেশি। এ মুহূর্তে থামা অসম্ভব। লোকটার বুকে চেপে বসে একবার এপাশ একবার ওপাশ কাত হয়ে নালা বেয়ে বিদ্যুদ্বেগে নামছে রানা। দু'হাতে ভারসাম্য রাখতে চাইছে, যেন নালার মাঝখানে থাকতে পারে।

উপর থেকে ঝরঝর করে পড়ছে পাথর, আগেরগুলোর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। হঠাৎ রানা টের পেল, ওরা আছে অ্যাভালাঞ্চের ভিতর। ওর চোখের সামনে ক্ষত-বিক্ষত দেহ নিয়ে নুড়ির নীচে চাপা পড়ছে আরব। পতনের গতি আরও বাড়ল। চোখের পলকে বামে বাঁক নিল নালা, তারপর আর বাড়তি পাথর বইতে পারল না। পাড় ছাপিয়ে উঠল পাথরের ঢেউ। যেন বন্যা শুরু হয়েছে নদীতে। নীচে চেয়ে বুক শুকিয়ে গেল রানার। ওদের নীচে শুধু শূন্যতা!

আর কোনও আওয়াজ করছে না আরব টেররিস্ট। লোকটার সঙ্গে শূন্যে ভেসে উঠল রানাও, তারপর শুরু হলো পতন। পিছু নিল পাথরের অ্যাভালাঞ্চ। নতুন এক নালার ভিতর ধপ করে পড়ল ওরা। এই নর্দমা আগের চেয়ে চওড়া ও গভীর, তবে একটু পর পরই বাঁক। অ্যাভালাঞ্চ আবারও ধরে ফেলল ওদেরকে। মানুষ যেভাবে নদীতে গাছের গুঁড়ির উপর বসে, সেভাবে আরবের উপর চেপে বসেছে রানা। নীচের কার্নিশ পেরিয়ে পাথর ঝরছে জলপ্রপাতের মত। মালভূমির উপর থেকে ওই কার্নিশ দেখেছে রানা। একবার সাহস করে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। নুড়ি-পাথর, বালি ও বোল্ডার তেড়ে আসছে মাধ্যাকর্ষণের টানে। বোল্ডারগুলো পড়বার সময় পরস্পরের ভিতর ঠোকাঠুকিও করছে।

আবার নীচে চাইল রানা। কিনারা পেরিয়ে ছিটকে পড়ছে বোল্ডার, তারপর সোজা নীচে পাথুরে জমি। এই প্রস্তর-প্রপাত যদি জলপ্রপাত হতো, ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপ দিত রানা। সম্ভাবনা ছিল প্রাণ নিয়ে সাঁতরে বেরুতে পারবে। কিন্তু এখানে বাঁচবার কোনও সুযোগ নেই।

নুড়িপাথরের চলমান স্রোতের ভিতর হাত গাঁথতে চাইল রানা, পাঁচ সেকেণ্ড পর টের পেল, নীচে কঠিন জমিন। আর কয়েক মুহূর্ত পর কিনারা থেকে খসে পড়তে হবে। খাদের পনেরো ফুট বাকি থাকতে শেষ চেষ্টা করল রানা। টেরোরিস্টের লাশের উপর উঠে দাঁড়াল, বেকায়দা লাফ দিয়ে নামল অ্যাভালাঞ্চের উপরের দিকে। চার হাত-পা দিয়ে পড়ল, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠতে চাইছে। পায়ের নীচে সরসর করে সরছে পাথরের প্রবাহ। যতই চেষ্টা করুক, এক ইঞ্চি এগুতে পারল না রানা। অ্যাভালাঞ্চের গতি ঢের বেশি।

পাথরের সঙ্গে নীচে গিয়ে পড়লে?

বাঁচবার একমাত্র উপায় এখন নালার পাড়ে ওঠা। সেক্ষেত্রে সরতে পারবে পাথর-ধস্ থেকে।

পাথর ও বালির প্রবাহ ভাসিয়ে নিয়ে গেল বিক্ষত লাশকে।

কিনারা থেকে দশ ফুট বাকি থাকতে অ্যাভালাঞ্চের ভিতর দুই হাত ভরল রানা, সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত হলো আঙুলগুলো। প্রাণপণে পিছনে ছুঁড়ছে দুই পা। বেরুতে হবে পাথরের স্রোত থেকে। তবে দেহে এত শক্তি নেই যে জিতবে। হুড়মুড় করে নেমে আসছে পাথর, তার ওপাশে যেতে পারছে না শত চেষ্টা করেও।

হাল না ছেড়ে চেষ্টা চালিয়ে গেল রানা, দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে চাইল জমিন। তারপর নুড়ি পাথরগুলোর ভিতর দিয়ে জমিনের ছোঁয়া পেল। শক্ত কী যেন ঠেকল হাতে। ডান হাতে খপ করে ধরল ওটা, বাম হাতে সরতে চাইল অ্যাভালাঞ্চ থেকে।

হাতে ওটা কিশোর বট গাছ। নীচে পড়বার সময় ওটাকে দেখেনি রানা। আবারও পিছলে যাওয়ার আগেই দুই হাতে শক্ত করে ধরল। ডানে সরতে চাইছে। কিন্তু দু'ফুট যেতেই মটকে গেল কাণ্ড। বাধ্য হয়ে মোটা একটা শিকড় ধরল রানা। ওটা অনেক জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

রক ক্লাইম্বিঙের প্রথম শর্ত: কোনও গাছকে বিশ্বাস করবে না।

ওটা যে কোনও সময় উপড়ে আসবে।

তবে এ মুহূর্তে রানার সামনে দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

প্রাণপণে ধরল শিকড়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাথুরে জমি থেকে উঠে আসতে চাইল ওটা। এদিকে অ্যাভালাঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওর ঊর্ধ্বাঙ্গ, বাকি রইল দুই পা। ভরসা রাখতে পারছে না শিকড়ের উপর। মূল শিকড়ের চারপাশের শিরাগুলো চড় চড় করে উঠে আসছে, দীর্ঘ হচ্ছে শিকড়। বারবার ঝাঁকি খেয়ে নীচের দিকে নামছে রানা।

কার্নিশটাকে পেরিয়ে গেল দুই পা। তারপর কোমর। শক্ত করে ধরে রইল শিকড়। মাত্র এক ফুট পাশ দিয়ে ছিটকে পড়ছে নুড়ি-পাথর, বালি ও বোল্ডার। ক' সেকেণ্ডের জন্য পতন থামল। আঙুলের সমান মোটা শিকড়, বেয়ে উঠতে চাইল রানা, কিন্তু তাতে পড়পড় করে উপড়ে আসতে চাইল। একবার নীচের দিকে চাইল। পরক্ষণে কিনারা পেরিয়ে সড়াৎ করে নেমে এল। আগেই দেখেছে, এবার বালি-নুড়ি-বোল্ডার এদিকে পড়বে।

টিলার দেয়াল থেকে আধ ইঞ্চি দূরে ওর নাক। স্থির হওয়ার সময় নিল না রানা, এক সেকেণ্ড পর দোলা দিয়ে ডানদিকে সরুতে চাইল। মাথা ও কাঁধে পড়ছে ছোট নুড়ি-পাথর ও বালি। তিন সেকেণ্ড পর পাশে নামল বড় পাথরের ধস। মাঝারি এক পাথর কাঁধে পড়ে পিছলে বেরিয়ে গেল। শিকড় থেকে পেণ্ডুলামের মত ঝুলছে রানা। কোনও ফাটল বা ফুলে থাকা পাথর খুঁজছে। খাড়া টিলার গা থেকে বেরিয়েছে মুঠো সমান এক পাথর। বার তিনেক দুলে ওখানে পৌঁছল রানা, ডান হাতে খপ করে ধরল পাথর।

বেশি দুলতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছে। উপরের ক্ষুরধার কিনারা লেগে ছিঁড়ছে শিকড়। বোল্ডার-পাথরটা ঠিক ভাবেই ধরেছে, কিন্তু পট করে ছিঁড়ে গেল শিকড়। টিলার বুকে আছড়ে পড়ল রানা। বালি ও পাথরের সঙ্গে দ্রুত নেমে গেল শিকড়ের টুকরো।

ডান হাতে পাথর ধরে ঝুলছে মরিয়া রানা। অসহায় ভাবে নীচের দিকে চাইল। প্রথমে ভাবল টিলার দেয়াল কাঁচের মত মসৃণ, একদম দেয়ালের মত খাড়া—কিন্তু না, পায়ের দু' ইঞ্চি নীচেই সরু তাক। হয়তো ওখানে দাঁড়াতে পারবে।

এদিকে হাত থেকে ফস্কে যেতে চলেছে পাথরটা!

বারকয়েক শ্বাস নিল রানা, তারপর আস্তে করে নেমে গেল তাকে। জুতোর হিল দুটো বেরিয়ে রইল। এই দীর্ঘ পতনে প্যান্টের পকেট থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছে স্যাটালাইট ফোন, এবার ওটা খসে পড়ল। রানা সবই টের পেল, তবে খপ করে ধরবার উপায় নেই। সব জঞ্জালের সঙ্গে পাথুরে জমিতে গিয়ে পড়ল জিনিসটা। বুঝতে দেরি হলো না ওর, ওটার আয়ু শেষ। দেয়ালে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। উষ্ণ পাথরের স্পর্শ লাগছে কপালে।

পাশেই ধুলোর চাদর উড়ছে। পাথর ও বালি পড়ছে উপর থেকে। তবে ধস কমে এসেছে। বইছে জোরালো হাওয়া, কিছুক্ষণের ভিতর সরে যাবে ধুলো। জঙ্গিরা উপর থেকে দেখতে পাবে রানাকে। পাথরের দেয়াল নেমে গেছে তিরিশ ফুট নীচে, সেখানে এবড়োখেবড়ো জমিন। ওখান থেকে এক শ' ফুট নামলে উপত্যকার জমিন।

ডানদিকে চাইল রানা, প্রায় থেমে এসেছে অ্যাভালাঞ্চ। বড় বোল্ডারগুলো পড়েছে নীচের জমিতে। এখন টিলার উপর থেকে পড়ছে বালির সরু রেখা।

ক্লাইম্বিঙের দ্বিতীয় নিয়ম: নেমে যাওয়ার পথ না জানলে খাড়া দেয়াল থেকে সরতে যেয়ো না।

রানার জানা নেই নীচে কী থাকতে পারে। হয়তো কোনও পাথর ধরতে পারবে, গর্তে রাখতে পারবে পা—কিন্তু উপর থেকে চেয়ে রয়েছে বিশজন সশস্ত্র লোক! নিশ্চয়ই জানতে চাইছে কোথায় গেছে তাদের সঙ্গীরা!

খুব ধীরে ভারসাম্য রেখে বসতে শুরু করল রানা, দু'হাত রেখেছে টিলার বুকে। অর্ধেক বসা অবস্থায় তাক থেকে নামিয়ে দিল ডান পা। গর্ত খুঁজতে শুরু করেছে। পাথরের দেয়ালে সামান্য একটা খোঁড়ল পেল। ওখানে রাখা যাবে শুধু বুটের তিন ভাগের একভাগ। গর্তটা ওর ওজন নেবে? ঝুঁকি নিল রানা, জুতোর ডগা ভরে দিল খোঁড়লে, এবার ধীরে নামাল অন্য পা। দু' মিনিট পর ভাঁজ করা দুই কনুই রাখল তাকের উপর। ডান পা গর্তের ভিতর থাকল, কিন্তু বাম পা সরিয়ে নিল, অন্ধের মত খুঁজছে বেড়ে থাকা পাথর বা গর্ত। এক মিনিট পেরুল, পায়ে কিছুই ঠেকল না। টিলার বুক দেয়ালের মত খাড়া।

ঠিক তখনই ওর মুখের পাশে নামল কুণ্ডলি পাকানো দড়ি। উপরে চাইল রানা। কেউ উপর থেকে দেখতে পাচ্ছে না ওকে। টিলা আড়াল দিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ, ওকে বাঁচানোর জন্য দড়ি ফেলেনি টেরোরিস্টরা। নীচে কী ঘটেছে জানার জন্য লোক নামবে এখন। সৌভাগ্যক্রমে এখান দিয়েই ফেলা হয়েছে দড়ি।

আবার হাঁচড়েপাঁচড়ে তাকের উপর উঠে এল রানা, দ্রুত হাতে শার্টের কয়েকটা বোতাম খুলল। খুব সাবধানে খুলে নিল বাম পায়ের বুট, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকের সঙ্গে ঠেসে ধরল ওটা। বুটের সঙ্গে বার তিনেক জড়িয়ে নিল দড়িটা। চলনসই পুলি হলো। উপর থেকে দড়িতে ঝাঁকি শুরু হয়েছে। নামছে কেউ। জুতোর দুই পাশ দু'হাতে শক্ত করে ধরল রানা, তারপর টিলার বুকে পা রেখে নামতে লাগল। প্রতি বারে পাঁচ ইঞ্চির বেশি নামতে পারছে না। তবে উপরের লোকটা সহজে বুঝবে না নীচে কেউ আছে। সবার অজান্তে নেমে যাবে রানা, কোথাও লুকিয়ে থাকবে, রাতের আঁধারে চলে যাবে খনি এলাকায়। দেখতে হবে ওখানেই প্রধানমন্ত্রীকে বন্দি করে রাখা হয়েছে কি না।

তিন মিনিট পেরুনোর আগেই টিলার গোড়ায় নেমে এল রানা।

উপর থেকে ভেসে এল চিৎকার, 'কাইয়ুম, একটু অপেক্ষা করো, আমরাও আসছি!' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝপাৎ করে রশি নামল আরও কয়েকটা।

দ্রুত হাতে বুট পরে নিল রানা, নামছে ঢাল বেয়ে। যে-কোনও সময়ে কার্নিশে পৌঁছে যাবে উপরের লোকগুলো। সামনে একটা ঢিবি পেয়ে তার পিছনে লুকিয়ে পড়ল রানা। হাঁপাচ্ছে। ঢিবির গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চাইল। টের পেল, শরীর চলতে চাইছে না, বসে পড়তে ইচ্ছে করছে। বুঝতে পারছে, শরীরের একটা হাড়ও ভাঙেনি, কিন্তু সারা শরীরের সবখানে টনটনে ব্যথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা শরীরে ফুটে উঠবে বেগুনি ও নীল দাগ।

মাত্র দশ সেকেণ্ড বিশ্রাম নিল রানা, তারপর কিছুদূর হামাগুড়ি দিয়ে সরে বড়সড় একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে সাবধানে উঠে দাঁড়াল আবার।

এদিকে চাতালে নেমে এসেছে লোকগুলো। গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। নেমে এসে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ওরা। পালাও, পালাও, রানা!

কাছেই পরিচিত জিনিসটা দেখতে পেল রানা। বালির নীচ থেকে বেরিয়ে রয়েছে ওর কাফিয়ের একাংশ। কাপড়টা তুলে নিল ও, আবার পরে নিল মাথায়, ভাবছে, দৌড় শুরু করবে।

ওই যে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, কার্নিশে পৌঁছে গেছে ওরা! নৈঃশব্দ্যের ভিতর জোরালো একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'গেল কোথায়? নীচে তো খালি পাথরের স্তূপ। মনে হয় চাপা পড়েই মরেছে।'

'দাঁড়াও,' মোটা গলা ভেসে এল উপর থেকে, 'চারপাশ ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে।'

অন্তরের গভীরে টের পেল রানা, এবার আর রক্ষা নেই, ধরা পড়ে যাচ্ছে ও। ভাগ্যের সহায়তা বারবার পাওয়া যায় না!

(দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্য)

মাসুদ রানা

সূর্য-সৈনিক

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

মরুভূমি এখনও আঁধার। তবে ধীরে ধীরে ধূসর হয়ে আসছে পুবের আকাশ। নীড়ে ফিরছে নিশাচর পাখি। নিশাত ও নবী এক ঘণ্টা আগে বেরিয়েছে, হেঁটে পৌঁছে গেছে আর্কিওলজিকাল ক্যাম্পের কাছে। ঘুমের অভাবে শুষ্ক ওদের চোখ, রক্তে দৌড়াচ্ছে অতিরিক্ত অ্যাড্রেনালিন। সুন্দরীকে নিয়ে মরুভূমির গভীরে গেছে স্বর্ণা, ওখানে নামার কথা ক্যাপ্টেন আলম সিরাজের কপ্টার। ভদ্রলোক পৌঁছে দেবেন ব্ল্যাডার ভরা ডিজেল। যথেষ্ট ফিউয়েল পেলে অনায়াসে মিশন শেষ করতে পারবে ওরা।

আর্কিওলজিকাল টিমের মাত্র একজনকে পাওয়া গেছে, কাজেই ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে, শত্রুপক্ষ অন্যদেরকে বন্দি করে নিয়ে গেছে নিজেদের আস্তানায়। কোথায়, ওরা জানে না। হতে পারে কার্গো কপ্টার মাসুদ ভাইকে যেখানে নিয়েছে, সেখানেই। সেক্ষেত্রে তাদেরকে ইন্টারোগেট করা হবে। সেই জিজ্ঞাসাবাদ হবে যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি ভয়ঙ্কর। কথা বের করার জন্য অকথ্য নির্যাতন চালানো হবে। কিন্তু কোনও ফলাফল পাবে না তারা। হয়তো এ মুহূর্তে আর্কিওলজিকাল ক্যাম্পের উদ্দেশে আসছে ওদের এমআই-৮ কপ্টার।

এদিকে অতি মূল্যবান সময় শেষ হয়ে এল। ঘনিয়ে আসছে শীর্ষ মহাসম্মেলন। এখনও জানা গেল না প্রধানমন্ত্রী কোথায়। হয়তো নির্যাতন করা হচ্ছে তাঁকেও।

পুব-দিগন্তে লাফ দিয়ে উঠল সূর্য, এর পর নড়াচড়া শুরু হলো ক্যাম্পে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছে সবাই। বেশিরভাগই তরুণ ও তরুণী, কিছু দিন পর আর্কিওলজিস্ট হয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুবে। তবে বয়স্ক এক শ্বেতাঙ্গকেও দেখা গেল। উনি প্রফেসর। ক্যাম্পে গোটা দশেক তিউনিশিয়ান লোক, মনে হলো স্টাফ। কুচকুচে কালো মানুষের ভিড়ে একজনের পরনে বেমানান রংচঙে সুট। চেহারায় মহাবিরক্তি। সে বোধহয় সরকারী লোক।

আরও এক ঘণ্টা পেরুল, তারপর নিজ তাঁবু থেকে বেরুলেন প্রফেসর ব্রাম ট্যাগার্ট। মনে হলো না দলের চার ভাগের তিন ভাগকে হারিয়ে চিন্তিত। মস্ত হাই তুলে এসে দাঁড়ালেন রোদের ভিতর, বোধহয় ঘুম ভাল হয়নি। পরনে কোঁচকানো সাফারি সুট, মাথা ঢেকে রেখেছেন তোবড়ানো পানামা হ্যাট দিয়ে। টলতে টলতে গিয়ে ঢুকলেন মেস টেন্টে। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রাঁধুনি। নিশাত ও নবী কোনও সুবাস পেল না। আন্দাজ করল, ওখানে ডিম ও আলু ভাজা দেয়া হচ্ছে। এখন ওটাই বা কে দিচ্ছে ওদেরকে, পরস্পরের দিকে চাইল ওরা। পেটে ছুঁচোর কেত্তন চলছে। অবশ্য মার্ভেল থেকে আনা টাটকা স্যাণ্ডউইচ পাবে ট্রাকে ফিরলে। মেস তাঁবুতে দীর্ঘ সময় নিয়ে খাওয়া চলল। তারপর বোধহয় শুরু হলো স্টাফ মিটিং। ছাত্র-ছাত্রীরা মেস-তাঁবু থেকে বেরুল, চলে গেল যে যার তাঁবুতে। পাঁচ মিনিট পর ব্যাগ ও টুলস হাতে চলে গেল রোমান ধ্বংসাবশেষের দিকে। আর্কিওলজিকাল সাইট ও এই ক্যাম্পের মাঝে মাথা তুলেছে ছোট একটা টিলা। কিছুক্ষণ পর অলস ভঙ্গিতে ছাত্রদের পিছনে গেলেন প্রশিক্ষক।

সবাই চলে যাওয়ার পর নিজ কোয়ার্টারে ফিরলেন ট্যাগার্ট। দু'মিনিট তাঁবুর ভিতর থাকলেন, তারপর বেরুলেন বই হাতে। তাঁবুর দরজার পাশেই ছায়ার ভিতর চেয়ার, সেখানে বসে খুললেন বইটা। আকার দেখে মনে হলো, এনসাইক্লোপিডিয়ার ভলিউম।

নিশাত ও নবী চাইছে ক্যাম্পে ঢুকে ধরবে প্রফেসরকে, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। স্থানীয় কর্মীরা ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক গুছিয়ে রাখছে, পরিষ্কার করছে তাঁবু।

'আমি একবার ভর্তি হতে চেয়েছিলাম আর্কিওলজিতে,' নিচু স্বরে বলল নিশাত। 'কদিন ওদের সঙ্গে ঘুরে দেখি এক সপ্তাহ পেরিয়ে যায়, শুধু মাটিই ঘাঁটছে। এদের তো চাকর আছে, ওদের কিছুই ছিল না। শেষে ভেগে গেলাম ওই ডিপার্টমেন্ট থেকে।'

'সরকার অনুদান দেয়নি বোধহয়,' বলল নবী।

'খামোকা দেবে কেন? ...ভাল করেই তো দেখলেন প্রফেসর ট্যাগার্টকে। কী মনে হয়?'

'মনে হচ্ছে এখানে চুপচাপ বসে টাকা রোজগার চলছে, কাজেই কোনও বিষয়ে তাড়াহুড়ো নেই। অন্যরা হারিয়ে গেলেও তার কোনও ক্ষতি নেই।'

'আমারও ঠিক তা-ই মনে হচ্ছে।'

আরও এক ঘণ্টা পেরুল, আরাম করে বসে রইলেন ট্যাগার্ট। আরও কিছুক্ষণ পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল তিউনিশিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভ। মাত্র দু' মিনিট কথা হলো, দুই হাত নাড়িয়ে কী যেন বললেন প্রফেসর, তারপর কথা শেষ করলেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

নিচু স্বরে বলে উঠল নিশাত, "প্রফেসর ট্যাগার্ট, আপনার লোকের কাছ থেকে কোনও খবর পেলেন?" এবার মোটা হয়ে উঠল নিশাতের কণ্ঠ, "না, কোনও খবর পাইনি।" এবার নাকি কণ্ঠে বলল, "নিশ্চয়ই বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন? তাদেরকে জানিয়েছেন তারা হারিয়ে গেছে?" মাথা নাড়ল নিশাত। "ওদের কী হয়েছে আমি কী জানি? এটা আমার কোনও বিষয় নয়। আমি কেন যোগাযোগ করতে যাব! আমি এসেছি কনসালট্যান্ট হিসাবে।" ..."আপনি তাদের জন্য চিন্তিত নন? কয়েক দিন পেরুল তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

...“তাতে আমার কী?” এবার স্বাভাবিক স্বরে বলল নিশাত, ‘এরপর স্টেজ থেকে স্থানীয় লোকটির প্রস্থান।’

বোধহয় ঠিকই ধরেছে নিশাত সুলতানা। কথা শেষ হতেই আর দেরি করেননি, আবার বইয়ে ডুব দিয়েছেন প্রফেসর।

আরও বিশ মিনিট অপেক্ষা করল নিশাত ও নবী। ততক্ষণে নীরব হয়ে গেছে ক্যাম্প। নতুন করে আর দেখা গেল না স্থানীয় কর্মচারীদেরকে। যে যার কাজ শেষে ক্যাম্প ছেড়েছে, হয়তো গেছে রোমান সাইটে। এবার গোপন স্থান থেকে বেরুল নিশাত, স্বাভাবিক পায়ে চলে গেল প্রফেসরের তাঁবুর পিছনে। পকেট থেকে ছোরা বের করে পোঁচ দিল পুরু নাইলনের কাপড়ে। ইমারসন সিকিউসি-৭এ ছোরা, মসৃণ ভাবে কাটছে। গরম ছুরি যেভাবে নরম মাখন কাটে।

নিঃশব্দে তাঁবুর ভিতর ঢুকল নিশাত, চলে গেল প্রবেশ দ্বারের কাছে। ট্যাগার্টের পিঠ এখন ওর দিকে। দূরত্ব মাত্র এক ফুট, কিন্তু কিছুই বুঝল না লোকটা। একবার চট্ করে পিছনে চাইল নিশাত। খানিক দূরে কয়েকটা ব্যারেলের পিছনে লুকিয়েছে নবী। ওই ব্যারেলগুলোর ভিতর রাখা হয়েছে ক্যাম্পের জেনারেটারের ডিজেল। হঠাৎ হাত উঁচু করল নবী। কম্পাউণ্ড পেরুতে শুরু করেছে রাঁধুনিদের একজন। তারপর চলে গেল সে ল্যাট্রিনে। এবার হাত মুঠো করে ঝাঁকাল নবী।

তাঁবু থেকে আধ পা বেরুল নিশাত, ট্যাগার্টের দুই বগলের নীচে দুই হাত ভরে এক হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল তাকে তাঁবুর ভিতর। তাল সামলাতে পারল না অটোম্যান স্পেশালিস্ট, হুমড়ি খেয়ে পড়ল ধুলো ভরা মেঝের উপর। পরক্ষণে তাকে চিত করে বুকের উপর চেপে বসল নিশাত। বাম হাতে চেপে ধরেছে মুখ। ডান হাত উঁচু করে ছোরা দেখাল—একটু তেড়িবেড়ি করলে ফাঁক করে দেবে গলা!

এক মুহূর্ত পর নতুন তৈরি পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকল নবী। 'আপা, ভাল দেখিয়েছেন। মনে হলো পঁচিশ কেজি ওজনের বাচ্চাকে সরিয়ে নিলেন।'

'ওজনটা কমপক্ষে এক শ' পঁচিশ কেজি। বসে বসে অনেক খেয়েছে ব্যাটা।'

ট্যাগার্টের মাথার পাশে দুই হাঁটু গেড়ে বসল নবী। লোকটার দুই চোখ পিরিচের মত গোল হয়ে উঠেছে। কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ইংরেজিতে সাবধান করল নবী, 'এবার মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নেওয়া হবে। নড়বেন না, বা চিৎকার দেবেন না, তা হলে স্রেফ খুন হয়ে যাবেন।'

চুপ রইল প্রফেসর।

'যদি বুঝে থাকেন, তা হলে মাথা দোলান।'

মোটেই নড়ল না ট্যাগার্ট। বিরক্ত হয়ে তার থুতনি ধরল নিশাত, মাথাটা বার কয়েক উঁচু-নিচু করিয়ে দিল। ভয় কমে এসেছে লোকটার, এবার দ্রুত কয়েকবার মাথা দোলাল।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল নিশাত। ককিয়ে উঠল প্রফেসর, 'আপনারা কারা? এভাবে আমাকে মারছেন...'

'গলা নিচু করুন,' চাপা স্বরে বলল নবী। 'আমরা স্মৃতি মাহমুদ, সবুর রহমান আর আসাদ চৌধুরির খোঁজে এসেছি।'

'আপনারা কারা?' দ্বিতীয়বারের মত বলল ট্যাগার্ট। 'আমি আপনাদেরকে চিনি না। আপনারা তো আমার গ্রুপের কেউ নন!'

তার একটা হাত খপ করে ধরল নবী। ভয় পেয়ে মাটির ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চাইল প্রফেসর। তার বাঁকা হয়ে যাওয়া চশমা সোজা করে দিল নবী, নিচু স্বরে বলল, 'আমরা আপনাদের বন্ধু। এখানে এসেছি আপনার সঙ্গীদের বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য।'

'তারা তো এখানে নেই।'

'এ দেখি আস্ত গাধা,' বিরক্ত হয়ে বলল নিশাত।

'প্রফেসর ট্যাগার্ট,' নরম করে বলল নবী। 'আমরা এসেছি কয়েকটা প্রশ্ন করতে। আমরা বাংলাদেশি সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিমের সদস্য।'

'বলুন?'

'বাংলাদেশ সরকার থেকে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। আপনাদের মিশনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।'

'এখানে সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই হবে না,' বলল ট্যাগার্ট। ভয় দূর হয়েছে, এখন রেগে উঠছে।

'কিছুই পাওয়া যাবে না, কেন মনে হলো আপনার?' জানতে চাইল নিশাত।

'নিশ্চয়ই জানেন আমি কে?'

লোকটা আসলে হারিয়ে যাওয়া সম্মান ফিরে পেতে চাইছে।

শান্ত স্বরে বলল নিশাত, 'আপনি প্রফেসর ব্রাম ট্যাগার্ট, অটোম্যান এমপায়ারের উপর দুনিয়ার সেরা এক্সপার্টদের ভিতর অন্যতম।'

'কাজেই ধরে নিতে পারি, আপনারা আমার কথা মেনে নেবেন। বাংলাদেশ সরকার থেকে অনুদান দেয়া এই এক্সপিডিশন আর কিছুই না, অর্থহীন সময় নষ্ট করা। কিছুই পাওয়া যায়নি, পাওয়া যাবেও না।'

'আপনার যদি তা-ই মনে হয়, তা হলে এলেন কেন?' জানতে চাইল নিশাত।

দ্বিধা নিয়ে চুপ রইল প্রফেসর, চোখদুটো চলে গেল বহু দূরে।

'মিথ্যা বলবেন না,' সাবধান করল নবী।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করল ট্যাগার্ট, 'চাকরি হারাই এক ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে। এদিকে আমার স্ত্রী আমাকে ডিভোর্স দিতে চলেছে। তার উকিল চুষে নিচ্ছে আমার সমস্ত টাকা।

আগেও ভাল বেতন ছিল না, পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেল। এদিকে ক' বছর হলো একটা বইও বের হয়নি। অবস্থা তো বুঝতে পারছেন?'

'শুধু টাকার জন্য কাজটা নিয়েছেন, অর্থহীন কালক্ষেপণ জেনেও?'

'বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে প্রতি দিন সাত শ' ডলার করে পাই। টাকাটা আমার দরকার।'

'কাজেই এখানে চলে এসেছেন, শুয়ে-বসে আরাম করে বই পড়ছেন। এদিকে আপনার দলের সদস্যরা যে হারিয়ে গেছে, সেদিকে খেয়াল নেই। আগে ধারণা ছিল না, কোনও প্রফেসর এতটা পচে যেতে পারে।'

নিশাতের কথায় আপত্তি তুলল না ট্যাগার্ট, সামান্য লজ্জার ছাপও পড়ল না চেহারায়।

নিশাতের মন চাইল কষে একটা চড় দেয় লোকটার গালে, তবে তা না করে থমথমে কণ্ঠে বলল, 'এখন থেকে কাজ দেখিয়ে পয়সা রোজগার করুন। আমাদেরকে বলতে হবে: কেন আপনার মনে হলো এই এক্সপিডিশন সময়ের অপচয়।'

'আপনারা ইউনুস আল-কবিরের গোটা কাহিনি জানেন?' নিশাতকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, 'আমাদেরকেও জানানো হয়েছে আদ্যোপান্ত। সে-ডাকাত বা খুনি, যা-ই বলুন, বন্ধুত্ব করে এক আমেরিকানের সঙ্গে। এরপর মনোভাব বদলাতে থাকে তার। শেষে ঠিক করে পশ্চিমা খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ না করলেও চলে।'

'এসব আমরা শুনেছি,' বলল নবী।

'ওই গল্প আমি বিশ্বাস করি না। এক পলকের জন্যেও না। আল-কবিরের সমস্ত লেখা পড়েছি। বলা যায় তার বুকের ভিতর ঢুকে গেছি। ওই লোক বদলাবার নয়। অসম্ভব! বারবারির কোনও

জলদস্যু নিজের মনোভাব পাল্টে নিতে পারে না। ইউরোপিয়ান জাহাজ লুটপাট করে অনেক বেশি মুনাফা হতো। কেন বদলাতে যাবে তারা?'

'ইউনুস লড়াই করতেন ধর্মের জন্য, টাকার জন্য নয়,' বলল নবী।

'ইউনুস আল-কবির আর সব মানুষের মতই। আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই, সে-ও টাকার পিছনে ছুটেছে। প্রথমে হয়তো ভেবেছে অধার্মিকদের খুন করলে পুণ্য হবে, তবে পরে তার লেখায় এসেছে আর্থিক লাভের কথা। ওগুলো কিন্তু তারই লেখা, আমার নিজের বানানো গল্প নয়।'

'আর্থিক মুনাফা মানেই অন্যায় ভাবে সম্পদ বৃদ্ধি নয়,' বলল নবী। বুঝেছে, ট্যাগার্ট নিজের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়েছে ইউনুস আল-কবিরকে। যেন তারই মত লোভী ছিল সেই দস্যু।

'আমাকে এখানে আনা হয় কারণ আমিই এক্সপার্ট,' বলল ট্যাগার্ট। 'যদি আমার কথা শুনতে ইচ্ছে না হয়, বিদায় নিয়ে চলে যেতে পারেন।'

'না, বলুন, আমরা কৌতূহলী,' বলল নিশাত। 'বারবারি জলদস্যুরা কত রোজগার করত?'

'তাদের ব্যাপারে কতটুকু জানেন?'

'শুনেছি আমেরিকান মেরিনরা তাদেরকে ধ্বংস করে।'

'এক এক্স আমেরিকান কনসালের অধীনে পাঁচ শ' মার্সেনারি এবং অল্প সংখ্যক মেরিনকে নিয়ে ধ্বংস করা হয় ডেমা শহর। ওটা ছিল ত্রিপোলির বাশাওয়ের পিছন-উঠান। ওই লড়াইয়ের ফলে দ্রুত শান্তি চুক্তি হয়।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল ট্যাগার্ট। 'ফিফটিন্থ থেকে নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির ভিতর বারবারি জলদস্যুরা লুটপাট করেছে। সে সময় যেসব দেশ চাঁদা দিতে পারেনি, তাদের জাহাজ দখল

করে নিয়েছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স থেকে শুরু করে স্পেন পর্যন্ত সাগরতীরের প্রতিটি ইউরোপীয় দেশ জলদস্যুদের চাঁদা দিতে বাধ্য হয়। প্রথম কিছুদিন জলদস্যুদের চাঁদা দিয়েছে এমন কী আমেরিকাও। ইউরোপ উপকূল থেকে ধরে আনা হয়েছে অগণিত মানুষকে। ধারণা করা হয় প্রায় দশ লাখ লোককে কিডন্যাপ করে জলদস্যুরা। এদের অর্ধেককে ধরা হয় তাদের নিজ বাড়ি থেকে। বিক্রি করে দেয়া হয় ক্রীতদাস হিসাবে।'

'এসব আমরা জানি,' বলল নবী।

নিজ সাবজেক্ট পেয়ে বলে চলেছে প্রফেসর, 'আমরা দেখছি সে আমলের সবচেয়ে শক্তিশালী নেভাল শক্তিকে। এই জাহাজগুলোর ভিতর সবচেয়ে মজবুত ছিল ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ। সবচেয়ে সফল জলদস্যুদের ভিতর অন্যতম ছিল ইউনুস আল-কবির। প্রথমে লেখাপড়া করেছে ইমাম হওয়ার জন্য, তবে তার পরিবারে ছিল জলদস্যুতা। কয়েক পুরুষ ধরে তারা ছিল লুটেরা। কাজেই বলতে পারি, সে মোটেই সাধু ছিল না। যখন ধরে নিল জলদস্যুতা করে ডাকাতি করা যায়, সেটার নাম দিল পবিত্র ধর্মযুদ্ধ। আসলে আজকের টেরোরিস্টদের সঙ্গে কোনও তফাত ছিল না তার।'

নিশাত কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। বুঝতে পারছে এ লোক নিজের সঙ্গে জলদস্যু-নেতার তুলনা করছে না, ইসলামী রাষ্ট্রের অতীত এবং বর্তমানের টেরোরিজমের ভিতর তুলনা করছে। এ এমন এক লোক যে জীবনে করুণ ভাবে হেরে গেছে। কখনও কোনওদিন গুলি ছোঁড়েনি, ধারণা নেই জঙ্গিরা কেমন হয়। লেখাপড়া করে প্রফেসর হয়েছে, তবে কখনও মানুষের অন্তর বুঝতে পারেনি।

'যদি ধরি ইউনুস আল-কবিরের মনোভাব পাল্টে যায়, তাতেই বা কী?' বলল প্রফেসর। 'আসল কথা কোথায় তার সেই

জাহাজ? মরুভূমির ভিতর দুই শ' বছর ধরে একটা জাহাজ আটকে থাকতে পারে না। টিকবে ওটা? এত দিনে ধ্বংস হয়ে গেছে। বা লুট করে নিয়েছে যাযাবররা। মূল বিষয়: আমার কথার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন, ওই জাহাজ আর নেই।'

'তর্কের খাতিরে বলছি, ওটা যদি থাকে?' বলল নবী। 'কোনও কারণে টিকে গেল? সেক্ষেত্রে ওটা কোথায় থাকবে? আপনার ধারণা শুনি।'

'ওয়াশিংটনে যে চিঠি পড়ি, তাতে ছিল ওই জাহাজ আছে শুকনো এক নদীর ভিতর। জায়গাটা আমাদের চেয়ে আরও দক্ষিণে। তবে পুরো এলাকা ঘুরে দেখেছে স্মৃতি, সবুর আর আসাদ। এক জায়গায় থামে তারা। ওখানে ছিল উঁচু জলপ্রপাত। নদী যখন ছিল, তখন ওই জায়গা পেরুনো ছিল অসম্ভব। কাজেই বারবারি জলদস্যু জাহাজ ওখানে থাকতে পারে না।'

'চিঠির ভিতর আর কোনও সূত্র?' বলল নিশাত, 'এমন কিছু, যা গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও আসলে জরুরি?'

'জেফ মার্টেল বলেছে ওই জাহাজ আছে বিশাল এক গুহার ভিতর। সেখানে যেতে হলে ব্যবহার করতে হয় অদ্ভুত এক যন্ত্র। এই যন্ত্র বলতে কী বোঝাতে চেয়েছে, আমি জানি না। স্মৃতি মাহমুদ কয়েক সপ্তাহ আমার পিছে লেগে ছিল, কিছুই বলতে পারিনি। আর কোনও সূত্র বলতে আরেকটা বিষয়: স্থানীয়রা বলে ওই জাহাজ আছে কালো জিনিসের নীচে, তা আবার জ্বলে।'

'আরেকবার বলুন,' বলল নিশাত।

'কালো জিনিস যা জ্বলে। এই কথা এসেছে ইউনুস আল-কবিরের সাক্ষাৎ স্যাঙাতের দিনলিপি থেকে। লোকটার নাম ছিল রমিজ হারুনালি। ওই ডায়েরি টিকে থাকে, কারণ ওই লোক ছিল ত্রিপোলির বাশাওয়ের ভাতিজা। এসব লেখা ছিল রাজকীয় লাইব্রেরিতে। তবে ওসব দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে, তা আমি

জানি না। ব্যস, এ-ই। আর কিছু জানা নেই আমার।'

'ও,' বিড়বিড় করে বলল নিশাত।

যদি স্মৃতির মত ট্রেইণ্ড আর্কিওলজিস্ট সফিসটিকেটেড ইকুইপমেন্ট থাকা সত্ত্বেও সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ খুঁজে বের করতে না পারে, তা হলে মার্ভেল জাহাজ থেকে আসা ওরা ক'জন কী করবে? এদিকে বড় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে শান্তি মহাসম্মেলন!

চট্ করে ঘড়ি দেখল নিশাত। হাতে মাত্র এক ঘণ্টা, তার ভিতর পৌঁছতে হবে সুন্দরীর কাছে। নইলে রওনা হবে স্বর্ণা। মনের ভিতর সব গুছিয়ে নিল নিশাত, ওর প্রথম কাজ সোহেল ভাইকে বলা: কথা হয়েছে ট্যাগার্টের সঙ্গে। এরপর ফিরতে শুরু করবে ওরা পাহাড়-সারির দিকে। ততক্ষণে মার্ভেল থেকে তথ্য মিলবে, জানা যাবে মাসুদ ভাই কোথায়। তাঁকে তুলে নেবার জন্য রওনা হবে ওরা।

'নবী ভাই, চলুন,' বলল নিশাত। 'ডক্টর ট্যাগার্ট, সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দিতে হবে না, আমরা এখানে আসিইনি। আমাদেরকে চেনেন না আপনি।'

'ঠিক আছে, কোনও সমস্যা নেই,' তাড়াতাড়ি করে বলল ট্যাগার্ট। 'আরেকটা কথা, আমার টিমের বিষয়ে কিছু জানেন?'

তিক্ত অনুভূতি হলো নিশাতের। তবে বলল, 'আপনাদের টিমের একজন মারা গেছেন। তিনি সবুর রেহমান বা আসাদ চৌধুরি হতে পারেন। একবার গুলি করা হয়েছে কপালে। শকুনগুলো লাশের যে অবস্থা করেছে, তাতে তাঁকে চেনার উপায় রাখেনি। অন্য দু'জন সম্পর্কে কিছু জানি না।'

'হায় ঈশ্বর! আমার এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে? মনে হচ্ছে, এখুনি আমেরিকায় ফেরা উচিত!'

নবী কিছু বলবার আগেই ট্যাগার্টকে হ্যাঁচকা টানে আধ-শোয়া

করল নিশাত, পরক্ষণে লোকটার হাত মুচড়ে ঠেলে দিল পিঠের উপর অংশে।

'বাপরে, মরেছি!' করুণ বিলাপ ছাড়ল স্কলার।

'আপা, ছুঁচো মেরে হাত নোংরা করবেন না,' ইংরেজিতে বলল নবী।

চড়াৎ করে চড় পড়ল ডক্টরের গালে। উঠে দাঁড়াল নিশাত, লোকটার দিকে দ্বিতীয়বার না চেয়ে রওনা হয়ে গেল। ওর পর তাঁবু থেকে বেরুল নবী। থমথম করছে ক্যাম্প। কিন্তু ওরা দেখেনি তাঁবুর গায়ে কান লাগিয়ে বসে ছিল এক ছোকরা। সবই শুনেছে সে। নিশাত-নবী বালির ঢিবি পেরুতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল তিউনিশিয়ান রিপ্রেজেণ্টেটিভের খোঁজে। বিশ মিনিট পর বিপুল টাকার বিনিময়ে তথ্য পৌঁছে গেল ত্রিপোলিতে। তার পঁয়ত্রিশ মিনিট পর লিবিয়ার ভিতর এক পাহাড়ের উপর ঘুরতে লাগল এমআই-৮ কপ্টারের টারবাইন। দেখতে না দেখতে আকাশে উঠল যান্ত্রিক ফড়িং, রওনা হলো তিউনিশিয়ার সীমান্ত লক্ষ্য করে।

দুই

দিগন্তে ঝুলছে সূর্য, কিন্তু রোদের তেজ কমেনি। এগযিকিউটিভ কপ্টারের কেবিন থেকে বহু নীচে চেয়ে রয়েছেন অ্যাম্বাসেডার নাহিদ কামাল। কুঁচকে গেছে ভুরু। বমি আসছে। অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছেন, তবে নীচে যা দেখছেন তাতে যে-কোনও

সময়ে পাশে বসা লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ ফতে আলীর গায়ে বমি করে দেবেন। পাহাড়ে বিছিয়ে রয়েছে বিধ্বস্ত বাংলাদেশি এয়ারবাস। পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে ওটা। এক মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। কেবিনের পঞ্চাশ ফুট লম্বা এক অংশ এবং একটা ইঞ্জিন ছাড়া সবই ছোট ছোট ভাঙা টুকরো।

'আল্লাহ্ সবাইকে মাফ করুন,' বললেন ফতে আলী। এই প্রথম এসেছেন সাইট দেখতে।

গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে লিবিয়ান সেনাবাহিনী, ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করছে এভিয়েশন এক্সপার্ট দল। এরা অ্যাম্বাসেডারের খানিক আগে পৌঁচেছে। এক মাইল দূরে রেখে এসেছে কপ্টার।

সাউণ্ডপ্রুফ কেবিনে ইন্টারকমে বলল পাইলট, 'মিস্টার মিনিস্টার, আমরা এভিয়েশন এক্সপার্টদের কপ্টারের পাশে নামছি, নইলে দমকা বাতাসে এলোমেলো হবে সাইট।'

জবাব দিলেন মন্ত্রী, 'হাঁটতে ভালই লাগবে আমাদের।'

'ওকে, স্যর।'

নাহিদ কামালের দিকে চাইলেন ফতে আলী, এক হাত রাখলেন ভদ্রলোকের কাঁধে। 'আমার সরকার এবং আমার নিজের তরফ থেকে বলব, আমরা সত্যিই দুঃখিত, মিস্টার কামাল।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার আলী। আপনি যখন খবর দিলেন, তখনও মনে আশা ছিল...' কপ্টারের প্লেক্সিগ্লাস জানালা দেখিয়ে দিলেন কামাল। 'কিন্তু এখন...' মিলিয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ। আর কিছু বলবার নেই।

সবুজ রঙের আর্মি কপ্টারের পাশে নামল ফ্রেঞ্চদের তৈরি এগযিকিউটিভ ইসি১৫৫ চপার। নেমে গেল মন্ত্রীর বডিগার্ড, মোষের ঘাড়ের মত মোটা গর্দান তার, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে। পাহাড়ের মত বিশাল লোক। পাত্তাই দিল না মাথার

উপর ঘুরছে রোটরগুলো। বালি ও পাথর ছিটকে উঠছে বাতাসের তোড়ে। ওই লোকের পর কপ্টার থেকে নেমে গেলেন মোহাম্মদ ফতে আলী, একটু সরে দাঁড়ালেন। শেষে নামলেন বাংলাদেশি অ্যাম্বাসেডার। থমথম করছে মুখ।

কেউ কোনও কথা বললেন না, নীরবে ধ্বংসাবশেষের দিকে চললেন। কয়েক পা যেতে না যেতেই ঘেমে উঠলেন কামাল। মনে হলো লিবিয়ান মন্ত্রী ও তাঁর গার্ড পণ করেছে, এক বিন্দু ঘামবে না। নির্বিকার চেহারা, প্রচণ্ড গরম এবং রোদে অভ্যস্ত। মাঝে মাঝে দমকা লূ হাওয়া আসছে পাহাড়ের দিক থেকে, সঙ্গে নিয়ে আসছে এভিয়েশন ফিউয়েল ও পোড়া প্লাস্টিকের দুর্গন্ধ।

আকাশ থেকে কামাল যা দেখেছেন, তার তুলনায় মাটিতে অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছে জঞ্জাল। পুড়ে কালো হয়ে গেছে প্রতিটা জিনিস। দাউদাউ আগুনে জ্বলেছে গোটা বিমান। এলাকা কর্ডন করে রাখা সৈনিকদের কাছে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। এখানে অপেক্ষা করবার কথা ছিল বাংলাদেশি এভিয়েশন এক্সপার্টদের লিডারের। সামনে জঞ্জালের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে তদন্ত দল, প্রতিটি জিনিসের ছবি তুলছে। তাদের সঙ্গে এক লোক ক্যামকর্ডার দিয়ে সব রেকর্ড করছে। ডিগনিটারিরা পৌঁছে যেতেই তাঁদের দিকে এলেন তদন্তকারী দলের চিফ। ঘোড়ার মত লম্বা মুখ তাঁর, ঠোঁটের কোণ একটু বাঁকা।

'অ্যাম্বাসেডার কামাল?' দূর থেকে বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ। আর ইনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলী।'

'আমি দাউদ তালুকদার।' দ্রুত এলেন তিনি, হাত মেলালেন তাঁদের সঙ্গে।

বাংলাদেশি এই এভিয়েশন এক্সপার্ট আমেরিকা থেকে মস্ত সব ডিগ্রি নিয়েছেন। সম্ভবত তাঁর নাম জানেন মন্ত্রী আলী। একটু কাত হয়ে চাইলেন ভদ্রলোকের দিকে।

'বলতে পারেন এখানে কী ঘটেছে?' জানতে চাইলেন অ্যাম্বাসেডার।

কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিক দেখলেন দাউদ। 'এখানে আমরা প্রথম লোক নই। আগেও অনেকে এসেছে।'

'কী বলছেন!' একটু তীক্ষ্ণ শোনাল মন্ত্রীর কণ্ঠ।

নাহিদ কামাল তাঁর দিকে চাইলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী কীভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন, তার উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কেমন হবে। শান্তি মহাসম্মেলনের সবাই খেয়াল রাখবে লিবিয়ান সরকার ব্যাপারটাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে। এভিয়েশন এক্সপার্ট মিস্টার দাউদ যা বললেন, তাতে মন্ত্রী আলী এবং তাঁর সরকার বিপদে পড়তে পারে। সত্যি যদি কোনও প্রমাণ নষ্ট হয়, হয়তো দোষ দেয়া হবে লিবিয়ান সরকারকে—তোমরাই বাংলদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিমান ফেলে দিয়েছ। সেক্ষেত্রে বহু দেশ মুখ ফিরিয়ে নেবে লিবিয়ার দিক থেকে।

কাঁধ ঝাঁকালেন দাউদ। 'যতটুকু বুঝেছি, এখানে হাজির হয় একদল যাযাবর। অজস্র পায়ের ছাপ ফেলেছে। ক্যাম্প করে রান্না-বান্না সেরেছে। গুলি করে মেরে রেখে গেছে নিজেদের একটা অসুস্থ উট। ওই উটের শেষ বয়স ছিল। খয়ে গেছে দাঁতগুলো। ওটার কোনও মূল্য ছিল না বলেই মেরে ফেলা হয়।

'রেকেজের সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে মূল্যবান কী আছে খুঁজেছে। যাত্রীদের কয়েকটা লাশ ছিল, সেগুলো সরিয়ে ফেলেছে। শুনলাম, যাযাবররা মুসলিম নিয়ম অনুযায়ী মৃতদের চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর কবর দেয়। ওরা বোধহয় লাশগুলোর তাই করেছে। আসলে কী ঘটেছে বুঝতে হলে কেডাভার ডগ আনিতে হবে।'

'কিছু বোঝা গেল? অ্যাক্সিডেন্টটা কী কারণে হয়?'

'যা বুঝলাম তা খুব সামান্য, তবে আন্দাজ করছি, চলার পথে বিমানের লেজের কোনও অংশ খসে পড়ে। ওটা এখনও পাওয়া

যায়নি। চারপাশ দেখবার জন্য কপ্টার পাঠানো হবে। ওরা ফ্লাইট পাথ ধরে খুঁজে দেখবে। রাডার এবং এলিভেটর বিকল হলে, তখন বিমানের হাইড্রলিক ফ্লুইডের অভাব দেখা দেবে। হাইড্রলিক সিস্টেম ফেইল করলে একই সঙ্গে বিকল হবে ফ্ল্যাপ, স্লেট ও মূল ডানার স্পয়লারগুলো। তাই যদি হয়, বিমান নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে ওঠে।'

মোহাম্মদ ফতে আলী জানতে চাইলেন, 'আপনি জানেন বিমানের লেজের কোন্ অংশ নেই?'

'এখনও নয়। ওটা পাওয়া গেলে বোধহয় জানা যাবে আসলে কী ঘটেছে।'

'আর যদি পাওয়া না যায়?' জানতে চাইলেন কামাল। পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে সন্দেহ করছেন তা নয়, তবে খেয়াল করেছেন তাঁর প্রতিক্রিয়া। ভদ্রলোক অবশ্যই পছন্দনীয় মানুষ, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তিনি নিরপেক্ষ কেউ।

'অন্যসব প্রমাণ হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা অনুচিত।'

অ্যাম্বাসেডারের দিকে চাইলেন আলী। 'মিস্টার কামাল, আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, বিমানের টেইলের ওই অংশ খুঁজে বের করা হবে। ঠিকই বেরুবে কীভাবে এই ক্র্যাশ হলো।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা রাখা সম্ভব না-ও হতে পারে,' বললেন দাউদ। 'আজ বহু বছর ধরে আমি ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশনের কাজ করছি। এমনও দেখেছি মাঝ আকাশে বিস্ফোরিত হয়েছে প্লেন, ধ্বংসাবশেষ তুলে আনতে হয়েছে সাগর থেকে; তার পরেও ওসব ক্র্যাশের কারণ খুঁজে বের করা সোজা ছিল। কিন্তু এখানে যা ঘটেছে তা বোঝা ঢের কঠিন। আপনাদের লোক সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছে।' প্রতিবাদ করতে হাঁ করলেন আলী, তবে হাত তুলে তাঁকে বাধা দিলেন দাউদ। 'বলছি আপনাদের যাযাবরদের কথা। এরা তো আপনাদেরই জনগণ,

তাই না?'

'যাযাবররা কোনও দেশের নাগরিক হয় না, তারা মরুভূমির সন্তান।'

'যাই হোক, এরা সব ছিটিয়ে দিয়েছে, টেইল পাওয়া গেলেও পরিষ্কার ভাবে কিছু বলা সম্ভব হবে না।'

এভিয়েশন এক্সপার্টের চোখ দুটোকে বিদ্ধ করলেন আলী। 'অ্যাম্বাসেডার কামাল এবং আপনাদের সরকারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আপনি দুনিয়ার সেরা এভিয়েশন এক্সপার্টদের একজন। কাজেই বলব, যা করবার তা করুন, মিস্টার দাউদ। বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে আপনি মূল সমস্যা খুঁজে বের করবেন। ধারণা করি আপনি প্রতিটি এয়ারলাইন ডেযাস্টার বিষয়ে পুরো মনোযোগ দিয়ে থাকেন। এবং এখন যে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ধরে নিন, কী প্রমাণ পাবেন তার উপর নির্ভর করছে দুই সরকারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কেমন থাকবে।'

একবার অ্যাম্বাসেডার আরেকবার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দিকে চাইলেন দাউদ, তিক্ত হয়ে গেল চেহারা। বুঝেছেন এই ক্র্যাশ শুধু ফরেনসিক সায়েন্সের বিষয় নয়, এ থেকে শুরু হতে পারে মস্ত কোনও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যা।

'আপনাদের কনফারেন্স কবে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'আটচল্লিশ ঘণ্টা পর,' বললেন কামাল।

হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন দাউদ। 'যদি বিমানের টেইল পেতাম, আর যাযাবররা এভাবে সব নষ্ট না করত, হয়তো ওই সময়ের আগেই প্রাথমিক রিপোর্ট দিতে পারতাম। যাই হোক, আমার সাধ্যমত চেষ্টা আমি করব।'

ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মিস্টার দাউদ ওটা ধরতেই বললেন, 'আপনার কাছে এর বেশি কিছু দাবি করছি না।'

নিঝুম আঁধারে ভাসছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস জাহাজটা। সবাই সতর্ক। আশপাশ দিয়ে কোনও জাহাজ গেলে আগেই টের পাবে। নেটিং দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে সুপারস্ট্রাকচারকে। চলছে সোনার ও রেইডার। খুব কাছে না এলে কোনও জাহাজ বুঝবে না খোলা সাগরে ভাসছে বড়সড় কোনও জাহাজ।

কেবিনের দরজায় টোকা পড়তেই মুখ তুলে চাইল বিসিআইয়ের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার, সোহেল আহমেদ। যে এসেছে সে কমপিউটার বিশেষজ্ঞ রায়হান না হয়েই পারে না। সে হ্যাকার বলেই বোধহয় অতি সতর্ক।

'এসো, রায়হান।'

নীরবে খুলে গেল দরজা, ল্যাপটপ হাতে পিছলে ভিতরে ঢুকল রায়হান, পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা। আরেক হাতে পাতলা এক পোর্টফোলিও। ওকে দেখে মনে হলো কয়েক সপ্তাহ ঘুমায়নি। তবে প্রসারিত ঠোঁট দুটো নীরবে হাসছে। মাসুদ ভাইকে যমের মত ভয় পায় সে, তবে সোহেল ভাইয়ের সঙ্গে খাতির করে নিয়েছে বিসিআইয়ে যোগ দেয়ার পর।

'কী, রায়হান?' বামহাতে ধরা সিগারেটে সুখটান দিয়ে শেষাংশ অ্যাশট্রের ভিতর গুঁজে দিল সোহেল। রায়হান জানে, সোহেল ভাইয়ের ওই হাতটা নকল। বহু বছর আগে কাটা পড়েছিল ওটা কনুইয়ের কাছে। কিছুদিন আগে প্লাস্টিক, স্প্রিং ও রাবার দিয়ে অবিকল আরেকটা হাত তৈরি করে দিয়েছেন ড. শামশের আলী। সোহেল ভাই এখন ডানহাতের মতই ব্যবহার করতে পারে বামহাতের আঙুলও। ওই হাতের ভিতর ফাঁপা অংশে কিছু অস্ত্র ও গোলা-বারুদ রাখারও ব্যবস্থা আছে।

পোর্টফোলিও দেখিয়ে দিল রায়হান। 'মাসুদ ভাই যেখানে গেছেন, তার লোকেশন। সঙ্গে ওই এলাকার ইতিহাস।'

'জানতাম তুমি পারবে,' ডেস্কের উপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার ও অ্যাশট্রে সরিয়ে নিল সোহেল। 'বিছিয়ে দাও ম্যাপ।' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, রায়হান ডেস্কের উপর মানচিত্র রাখতেই ওটার দিকে চাইল। 'এবার খুলে বলো।'

ছোট ট্রেইনিং ফ্যাসিলিটি দেখছে সোহেল। ওটা পাহাড়ের অনেক উপরে। উপকূল থেকে বিশ মাইল ভিতরে। পাহাড়ের চূড়াগুলো লুকিয়ে রেখেছে ক্যাম্পটাকে। এক পাশে বিশাল গভীর এক গহ্বর। কোনও ধরনের খনি হতে পারে। এসবই ধরা পড়েছে রানার জিপিএস ট্র্যান্সপণ্ডারের ফলে। উপকূল থেকে শুরু করে গহ্বর পর্যন্ত গেছে সরু এক কালো লাইন। বোধহয় রেল লাইন। ক্যাম্প থেকে উপকূলে যাওয়ার পর এক পাশে পুরনো কয়েকটা দালানের সামনে দিয়ে গেছে। ওখানে রয়েছে দীর্ঘ জেটি। একদিকে কিছু দালানের পাশে খনন কাজ হয়েছে।

বন্দরের দিকে আগে আঙুল তুলল রায়হান। 'ব্রিটিশদের কোলিং স্টেশন, তৈরি হয় আঠারো শ' চল্লিশ সালে। উনিশ শ' চোদ্দ সালে নতুন করে বড় পিয়ার তৈরি করে। ধারণা করা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কাজে লাগবে। তবে তার অনেক পরে রোমেলের নর্থ আফ্রিকা ক্যাম্পেইনে প্রায় বিধ্বস্ত হয় পিয়ার। নতুন করে ওটা তৈরি করে জার্মানরা। ওটা ছিল তখন স্টেজিং এরিয়া, মিশর দখল করতে রওনা হয় হিটলারের বাহিনী। কালো লাইনটা রেলরোড, সোজা গেছে প্রকাণ্ড গহ্বরের পাশে। ওখানে কয়লা সরাতে বড় খাল ছিল, কিন্তু পরে শুকিয়ে যায়। তখন ওটার বদলে বসানো হয় রেলরোড।'

'দেখে মনে হচ্ছে কেউ নতুন করে চালু করেছে ওই খনিটা,' মন্তব্য করল সোহেল।

'ঠিক তাই, সোহেল ভাই। আন্দাজ পাঁচ মাস আগে। নতুন করে রেল লাইন ঠিক করেছে। এখন বড় ওর বগিগুলো চলতে

পারে। পুরনো খনিতে কাজ শুরু হয়েছে।'

'কিন্তু কেন? যে দেশ বসে আছে চল্লিশ বিলিয়ন ব্যারেল তেলের উপর, তাদের কয়লা লাগবে কেন?'

'জায়গাটা পাওয়ার পর থেকে আমিও জানতে চেয়েছি,' বলল রায়হান। 'এবং কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। লিবিয়ান সরকার টাইডাল জেনারেটিং স্টেশন বসিয়েছে যাতে প্রকৃতি ঠিক থাকে। তা হলে?'

'ওখানে আসলে কী ঘটছে?'

'সিআইএর কমপিউটার হ্যাক করে জেনেছি, ওরা ভাবছে ওখানে গড়ে তোলা হচ্ছে সাবটেরেনিয়ান নিউক্লিয়ার-রিসার্চ প্রোগ্রাম।'

'শুনেছি মুয়াম্মার গাদ্দাফি নিউক্লিয়ার অ্যামবিশন ছেড়ে দিয়েছে,' প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল সোহেল, ধরিয়ে নিল লাইটার দিয়ে। 'সিআইএ তো সব কিছুকে সন্দেহ করে। যে কোনও দিন শুনব আমার নানীবাড়ির সিঁড়িঘরের নীচে শুরু হয়েছে নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম।'

ফিক করে হেসে ফেলল রায়হান। 'তবে আমেরিকার ফরেন ইণ্টেলিজেন্স সার্ভিসেস বাতিল করে দিয়েছে সিআইএর ধারণা। তারা বলছে খনি চালু করা হয়েছে নিয়ম মেনে। এখন আমাদের সমস্যা: ওই খনির সঙ্গে কোনও করপোরেট এনটিটির নাম নেই। তাতে অবাক হইনি। পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে লিবিয়ানদের সুনাম নেই। ট্রেড পাবলিকেশনের একটা আর্টিকেলে পড়লাম, লিবিয়া তেলের বদলে কয়লার গ্যাসিফিকেশনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠছে। বলা হয়েছে তারা এমন এক সিস্টেম পেয়েছে, ন্যাচারাল গ্যাসের বদলে কয়লা দিয়ে ঢের পরিচ্ছন্ন ভাবে কাজ করতে পারবে।'

'শুনে মনে হচ্ছে বিশ্বাস করছ না,' বলল সোহেল।

'কাজেই কাদা খুঁড়তে শুরু করলাম। বহু আগে যখন জাহাজ কয়লা ব্যবহার করত, সেদিকে চোখ ফিরালাম। সে সময়ের দৃশ্য তৈরি করলাম মনে মনে, দেখতে পেলাম জাহাজগুলোকে নিয়মিত রিফিউয়েল করা হচ্ছে, আর তাতে পঞ্চাশ পার্সেন্ট মেইনটেন্যান্স বাড়ছে। শুধু তাই নয়, বিশ পার্সেন্ট কমে আসছে এফিশিয়েন্সি।'

'কয়লা মানেই নোংরা পরিবেশ,' মাথা দোলাল সোহেল।

'শিপিং আর্কাইভে হায়দ্রাবাদ নামের এক উপকূলীয় ফ্রেইটারের ক্যাপ্টেনের লগ পেলাম। লিখেছে ওই স্টেশন থেকে কয়লা নেয়ার বদলে জাহাজে তুলবে কাঠের গুঁড়ো।'

'বর্তমানে কোনও গ্যাসিফিকেশন টেকনোলজি নেই যা ভাল। মূল কথায় এসো, আসলে জায়গাটা কী?'

'খনির উত্তরে একটা ফ্যাসিলিটি আছে, আগে ওখানে লিবিয়ান আর্মির ট্রেইনিং বেস ছিল।'

'তা হলে সরকার ওখানে স্যাংশান দিচ্ছে?'

'তা না-ও হতে পারে, সোহেল ভাই। কয়েক বছর আগে ট্রেইনিং বেস গুটিয়ে নেয়া হয়।'

'তা হলে কী পাওয়া গেল?' একটু বিরক্ত হলো সোহেল।

'তেমন কিছুই না। আমেরিকান ছবি যা দেখছেন সব দুই মাস আগে তোলা। বর্তমানে কী ঘটছে জানি না।'

'আমরা যদি টাকা দিয়ে কমার্শিয়াল স্যাটালাইট কোম্পানির সাহায্য নিই?'

'চেষ্টা করেছি। সাধারণ ফি'র দ্বিগুণ দিতে চেয়েছি। ওরা রাজি, কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, আগামী এক সপ্তাহের আগে কোনও ছবি দিতে পারবে না।'

'কাজেই সে চেষ্টা বাদ। তার আগেই যে করে হোক রানা ও প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধার করতে হবে।'

'জী।'

'তার মানে যে কোম্পানি রেল লাইন ব্যবহার করছে, তার করপোরেট পর্দা সরাতে পারোনি?'

'সে চেষ্টা পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত, সোহেল ভাই। আগেও এসব চেষ্টা করেছি। এক এক করে পর্দা সরিয়েছি, কিন্তু বেরোয়নি মালিক কে। তবে লিবিয়ার ভিতর যেসব কোম্পানি কাজ করে, এদের বিষয়ে জেনেছি, এরা সাধারণত সরকারের সঙ্গে কাজ করে। ব্যাপারটা প্রায় জাতীয়করণের মত।'

'অর্থাৎ পুরো একটা বৃত্ত ঘুরলাম আমরা। কিন্তু এ থেকে কী বুঝব? সব কিছুর পিছনে লিবিয়ান সরকার?'

'হতে পারে। এসবের সঙ্গে থাকতে পারে আর্মি। আপনি তো জেএসও, বা জামাহিরিয়া সিকিউরিটি অর্গানাইজেশনের নাম জানেন। তারা দেশের প্রধান স্পাই এজেন্সি। তারা এসবের সঙ্গে থাকতে পারে। গাদ্দাফি দুনিয়ার প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়ার পর জেএসওর ক্ষমতা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। হয়তো তারাই চাইছে ক্ষমতা ফিরে পেতে।'

'এখুনি বলা যাচ্ছে না, তবে হতে পারে, প্রধানমন্ত্রীর বিমান এরাই ফেলে দিয়েছে।' একবার ছোট হয়ে আসা সিগারেট দেখল সোহেল, তারপর ওটাকে অ্যাশট্রের ভিতর গুঁজে দিল। কিছুই বলছে না রায়হান, একদম চুপ। আবার শুরু করল সোহেল, 'হতে পারে টেরোরিস্টরা জেএসওর কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়েছে, যাতে তারা চোখ বন্ধ রাখে। সুদানে একই কাজ করেছিল ওসামা বিন লাদেন। আফগানিস্তানেও।'

'এবার অন্যদিকে মনোযোগ দিই,' খেই ধরল রায়হান। 'আমরা জানি আগেও সন্ত্রাসীদের স্থান দিয়েছে লিবিয়ান সরকার। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা আশ্রয় পেয়েছিল ওদের কাছেই। এমনও হতে পারে ওই খনি বা রেল লাইন সন্ত্রাসীদের নতুন কোনও ফ্রন্ট। আসলে ওখানে ট্রেইনিং ক্যাম্প তৈরি করেছে। প্রচুর টাকা

খরচ করে ট্রেইনিং দিচ্ছে সন্ত্রাসী জঙ্গিদের। আফ্রিকার হীরা ট্রাফিকিঙে একই কাজ করেছিল আল-কায়েদা।'

'আমরা খামোকা মগজ খরচ করছি,' বলল সোহেল। 'যা ঘটবে তা বুঝে নিয়ে চলতে হবে। ভেবে কোনও লাভ নেই। মনের ভিতর কোনও জবাব পাব না। এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে রানাকে ওখান থেকে বের করে আনা। ও হয়তো বলতে পারবে ওখানে আসলে কী ঘটছে।'

'ঠিক তাই, সোহেল ভাই।'

'আর কিছু বলবে?'

'তেমন কিছু না। আমাদের আসলে অপেক্ষা করতে হবে। মাসুদ ভাই যোগাযোগ করলে তখন দ্রুত মুভ করতে হবে।' একটু চুপ থাকল রায়হান, তারপর বলল, 'খুব খারাপ লাগছে।'

'বুঝতে পারছি কী বলতে চাও।'

'আসলে মাসুদ ভাই না গেলেও পারতেন। এত বড় ঝুঁকি...'

'ওটা ট্যাকটিকাল নেসেসিটি ছিল। নইলে জানতাম না ওখান থেকে কলকাঠি নাড়ছে সন্ত্রাসীরা।'

'আর কোনও উপায় থাকলে ভাল হতো। যদি রেইডারে অনুসরণ করা যেত কপ্টারটাকে...'

'কপ্টার ওই সাইটে নামবে তাই তো জানি না আমরা, পরেও ট্র্যাক করা অসম্ভব হতো। পুরো পথ মাটি ছুঁয়ে গেছে। স্যাটালাইট কাভারেজও পেতাম না। একমাত্র উপায়টাই বেছে নিয়েছে রানা।'

'সরকার এসব করছে, না কোনও সন্ত্রাসী দল, তা-ও জানি না আমরা। হতে পারে তারা ইউনুস আল-কবিরের দল। এ-ও জানি না তারা কী করতে চলেছে। জানা নেই প্রধানমন্ত্রী বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন। আসলে কিছুই জানি না আমরা।'

'তা বলতে পারো। নিশাত, স্বর্ণা আর নবী একটা কপ্টার দেখেছে। হয়তো ওটা দিয়েই এয়ারবাস ফেলে দেয়া হয়েছে।

আমাদেরকে জানতে হবে এসবের পিছনে কে বা কাদের হাত রয়েছে। এদিকে হারিয়ে গেছে আর্কিওলজিস্টরা। তারা কোনও ভাবে জড়িত হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। নষ্ট বুদ্ধির এক অ্যাকাডেমিক ওখানে রয়েছে; কাজ না করে বসে বসে পয়সা নিচ্ছে লোভী বউয়ের পার্স ভরাতে। সব মিলে বিশ্রী পরিস্থিতি। এদিকে শান্তি মহাসম্মেলন চলে এল। ক্যাম্প ডেভিডের পর ওটা সবচেয়ে বড় কনফারেন্স।'

'আর একটু ভাবুন, মাসুদ ভাই মোটেই যোগাযোগ করছেন না। আমরা জানি না জিগস'র কোন্ টুকরো কোথায় বসবে।'

'এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে নিশাত, স্বর্ণা ও নবীকে খনি ক্যাম্পের কাছাকাছি থাকতে বলা,' বলল সোহেল। 'রানা সাহায্য চাইলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারে।'

'আর্কিওলজিস্ট আর ফতোয়ার কী হবে, সোহেল ভাই?'

'আপাতত ভুলে যাব। মূল কাজ রানা ও প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধার করা।'

ডেস্কের উপর বেজে উঠল ফোন। ডিসপ্লের দিকে চাইল সোহেল, কমিউনিকেশন্স ডিউটি অফিসার। বাটন টিপল ও। 'সোহেল বলছি।'

'এই মাত্র সিকিউর অ্যালার্ট পেলাম বিসিআই থেকে।'

'বলো?'

'মাসুদ ভাইকে যে কপ্টার নিয়ে গেছে, ঠিক তেমনি একটা গেছে তিউনিশিয়ার রোমান আর্কিওলজিক্যাল সাইটে। ওটা থেকে নামে সশস্ত্র লোকজন, কিডন্যাপ করে প্রফেসর ব্রাম ট্যাগার্ট, তিউনিশিয়ান সরকারী ওভারসিয়ার আর ক্যাম্পের এক স্টাফকে। বোধহয় এসবের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় এক ছোকরা।'

তিক্ত চেহারা করল সোহেল। কমিউনিকেশন স্পেশালিস্টকে বলল, 'ঠিক আছে। বিসিআইকে অ্যাক্নলেজমেণ্ট দিয়ে বলো

আমরা বুঝতে পেরেছি।' রিসিভার নামিয়ে রায়হানের দিকে চাইল সোহেল। 'পাওয়া গেল তোমার আরেকটা জিগস'র টুকরো।'

এ টুকরো অন্য কোনও জিগস'র অংশ হতে পারে, তবে কিছু বলল না রায়হান।

তিন

বেশ কিছুক্ষণ হলো দম আটকে গেছে স্মৃতি মাহমুদের। দুঃস্বপ্নের ভিতর থেকে জেগে উঠছে সে।

আবছা চেতনা ফিরতেই টের পেল, কোথায় আছে। মাথার তালুর উপর টিসটিসে ব্যথা। ওখানে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছে গার্ড। বাবুর্চির সামনে আধপেটা মানুষের যে লাইন, সেখান থেকে ওকে টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে আনা হয়েছে। টনটন করছে দুই হাত, যেন ছিঁড়েই গেছে। সবাই টিনের বাসনে করে মোটা বাবুর্চির কাছ থেকে সুরুয়ার মত পাতলা হলুদ তরল নিতে ব্যস্ত। ওই একই জিনিস দেয়া হয় সব বন্দিকে। রুক্ষ পাথুরে মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় পিঠ ছিলে গেছে স্মৃতির। যে শুঁটকি তরুণ গার্ড ওকে টেনে সরিয়ে নিয়েছে, মনে হয় তার অন্তরে দয়া-মায়া বলতে কিছু নেই।

হঠাৎ পুরো সচেতন হয়ে উঠল স্মৃতি। আস্তে করে চোখ খুলল। খিঁকখিঁক করে হাসছে গার্ড। কিন্তু আরেক গার্ড রেগে উঠে কী যেন বলছে তাকে।

ওকে টেনে কিছুদূর নিয়েই দুই হাত ছেড়ে দেয়। ঠাস্ করে

পাথরের উপর পড়ে স্মৃতির মাথা। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য জ্ঞান হারায় ও। একটু আগে আরবিতে কী যেন বলছিল লোকগুলো।

শুঁটকি গার্ডের সঙ্গে এখনও তর্ক করছে তৃতীয় গার্ড। তারপর চতুর্থ এক লোক এসে যোগ দিল তর্কে। তাকে চেনে স্মৃতি, সে ওঅর্ক ক্যাম্পের সিনিয়র কোনও কর্মকর্তা। তার দুই ধমকে চুপ হয়ে গেল সবাই। যে গার্ড স্মৃতির মাথার উপর ডাণ্ডা মেরেছে, সে বুট দিয়ে খোঁচা দিল ওর পেটে। হাতের ইশারা করছে, স্মৃতিকে আবার লাইনে দাঁড়াতে হবে। এই ক্যাম্পের বন্দিরা দুর্বল ও দুস্থ, পরনে ছেঁড়াখোঁড়া শার্ট-প্যান্ট। অল্প কয়েকজন মেয়ে আছে এই দলে। তাদের পোশাক আরও খারাপ। ছিঁড়ে গেছে ব্লাউজ। খেতে না পেয়ে শীর্ণ সবাই। চোয়ালের গর্তে বসে গেছে দুই গাল।

এক সপ্তাহ হয়নি স্মৃতি এই ক্যাম্পে এসেছে। প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছে অন্যরা রয়েছে এখানে মাসের পর মাস। নাযি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দিদের যে অবস্থা ছিল, এখানে ঠিক সেই পরিস্থিতি।

লম্বা টেবিলের পাশে আবার দাঁড়াল স্মৃতি। ওর পিছনের মহিলা বিড়বিড় করে কী যেন বলল আরবিতে।

'দুঃখিত? আমি আপনার ভাষা জানি না,' কাতর হয়ে বলল স্মৃতি।

যে মহিলা কথা বলেছে, সে এক সময়ে ভারী গড়নের মানুষ ছিল, গলা থেকে এখনও ঝুলছে পুরু চামড়া। সরাসরি স্মৃতির চোখে চাইল সে, তারপর নীরবে টেবিল দেখিয়ে দিল। বোধহয় বোঝাতে চাইছে, গার্ডদের দিকে চাইতে যেয়ো না, নিজের কাজে ব্যস্ত থাকো। স্মৃতির পাশ দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরছে এক বন্দি, হাতে টিনের বাসন ও স্টিলের মগ।

পাঁচ মিনিট পর বাসনে সুরুয়া ও মগে পানি পেল স্মৃতি। সরে

এল ওখান থেকে। দু' মিনিট পর ওর পাশে এসে থামল মোটামত মহিলা। বন্দিদের খাবার খেতে হবে মাটিতে বসে। ক' জনের কপাল ভাল, তারা একটা দালানের পাশে পিঠ ঠেকিয়ে বসতে পেয়েছে। এই দালানগুলো বেশ পুরনো, দুইতলা বা তিনতলা। ছাত হিসাবে জং ধরা লোহার পাত। দেয়াল বলতে ক্ল্যাপবোর্ড, সূর্যের তাপে ফেটে বাঁকা হয়ে গেছে। দালানের আরেক পাশে রেল সাইডিং। ওখানে রয়েছে কয়েকটা রেলকার ও ছোটবড় দুটো লোকোমোটিভ। ছোটটার আকৃতি বড়জোর একটা ট্রাকের সমান। দালান বা রেলকারের চেয়ে অনেক নতুন মনে হলো লোকোমোটিভ দুটোকে। তবে তা-ও এখন ধুলোয় ধূসরিত। খানিক দূরে প্রধান লাইন, আধ মাইল গিয়ে পাহাড়ি বাঁকের ওপাশে হারিয়ে গেছে। ওখানে রয়েছে জং ধরা লোহার বিশাল এক আকৃতি, সঙ্গে পুরনো কনভেয়ার বেল্ট ও ধাতব শ্যুট, যত্ন না নেয়ায় সব এখন ধসে পড়ছে।

এখানে আসবার পর স্মৃতির বুঝতে দেরি হয়নি, এটা অনেক আগের এক পুরনো খনি। বন্দিদেরকে দিয়ে নতুন করে চালু করা হচ্ছে এটা। যাদের গায়ে এখনও যথেষ্ট শক্তি, প্রতি ভোরে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তর দিকে লাইন মেরামত করতে। অন্যদেরকে কাজ দেয়া হয় উপত্যকায়, দিঘির মত গভীর ওই গর্তে। ইকুইপমেন্ট হিসাবে ভারী যন্ত্র দেয়া হয় না। ওখানে রেল ফ্ল্যাটবেডে রয়েছে এক ক্রেন, ওটা রেল লাইন বসানোর কাজ করে। এ ছাড়া রয়েছে দুটো বুলডোজার। বন্দিদের খালি হাতে কাজ করতে হয়। সর্বক্ষণ তাদের উপর নজর রাখে গার্ডরা। একটু এদিক ওদিক হলে নেমে আসে লাঠির বাড়ি বা ঘুসির বৃষ্টি। গত পরশু এক লোককে চোখের সামনে পিটিয়ে মেরে ফেলতে দেখেছে ও। লাশটা ফেলে রাখা হয় শকুনের জন্য। মানুষটার দোষ ছিল, সে কাজ থামিয়ে গার্ডদের কাছে পানি চেয়েছিল।

চুপচাপ সুরুয়া গিলছে বন্দিরা, হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। দূর থেকে ফিসফিসে আওয়াজ আসছে। সবার চোখ চলে গেল উপত্যকার পুবে। প্রচুর ধুলো তুলে এগিয়ে আসছে ট্রাক, চাকাগুলো পুরু ও প্রকাণ্ড।

ওরকম আরেকটা ট্রাক স্মৃতি ও সবুরকে এখানে ধরে এনেছে। ছাতের উপর মেশিনগান, দ্রুত আসছে ট্রাক। হুডের উপর বস্তার মত কী যেন। যন্ত্রদানব কাছে আসতেই বোঝা গেল ওটা বস্তা নয়, একটা লোক। পরনে পোশাক নেই, দেহের কালচে ত্বক এখন পুড়ে লালচে। যেন ছিলে নেয়া হয়েছে চামড়া। বুক-পেট খুবলে খেয়েছে কোনও জন্তু। হাত-বুক-পেট রক্তাক্ত। ক্ষত-বিক্ষত মুখ ফুলে আছে লাল বেলুনের মত।

আজ ভোরে পলাতক বন্দিকে ধরতে পাঠানো হয় গার্ডদের।

লম্বা টেবিলের পাশে এসে থামল ট্রাক, সঙ্গে সঙ্গে ঝটাং করে খুলে গেল প্যাসেঞ্জার দরজা, লাফ দিয়ে নামল এক গার্ড। কথা বলছে গার্ডদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। তার কথা শেষ হতেই গলা উঁচু করে ঘোষণা দিল ক্যাপ্টেন। বন্দিদের জড় করা হবে। লোকটার ভাষা না বুঝলেও সবই বুঝল স্মৃতি, জানে সে কী বলতে পারে। *এই কুকুরটাকে দেখে নাও, তোমাদের ভিতর কেউ পালাতে চাইলে এই একই পরিণতি হবে।* কোমরের খাপ থেকে ছোরা বের করল ক্যাপ্টেন, যে দড়ি দিয়ে দেহটাকে জড়িয়ে রাখা হয়েছে, সেটা কাটতে লাগল। আধ মিনিট পর লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল। ভেজা 'থপ্' ধরনের আওয়াজ তুলে মাটিতে পড়ল লাশ। চারপাশের হাজারো মাছি পলকের জন্য সরে গেল, পরক্ষণে লাশটা পালিয়ে যাচ্ছে না দেখে খুশি হয়ে আবার এসে বসল লোভনীয় খাবারের উপর।

স্মৃতির পেটে খাবার নেই যে বমি করবে, তবে উবু হয়ে গেল কোমরের কাছ থেকে, দু'হাত রেখেছে দুই হাঁটুর উপর, বার

কয়েক ঝাঁকি খেল—যেন পেটের ভিতর কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে মস্ত কোনও সাপ। কিছুক্ষণ পর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল স্মৃতি। হাত থেকে পড়ে গেছে বাসন ও মগ। কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে চাইল এক গার্ড। বুঝতে চাইছে এ মেয়ের সমস্যা কী।

আধ ঘণ্টা পর খাওয়া শেষ হলো। পুরো সময় চুপ করে বসে রইল স্মৃতি। পুরুষ বন্দিরা বাসন-মগ রেখে চলে গেল। ওসব ধোয়ার কাজ দেয়া হয়েছে মেয়েদেরকে, সে কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা। মুঠো ভরা বালি ফেলল বাসন-মগের উপর, তারপর মাজতে শুরু করল। বন্দিরা খাবারটুকু চেটে খেয়ে গেছে, না মাজলেও চলে। দিনে এই একবার ভাল খেতে পায় বন্দিরা। তাও যদি না দেয়া হতো, উঠে দাঁড়াতে পারত না কেউ।

হাঁটু মুড়ে বসে গামলা পরিষ্কার করছে স্মৃতি, এমন সময় ওর উপর এসে পড়ল কালো এক ছায়া। মুখ তুলে চাইল ও। অন্য মহিলারা চুপচাপ কাজ করছে, ভুলেও কোনওদিকে চাইছে না। হঠাৎ ডানহাত ধরে হ্যাঁচকা টানে স্মৃতিকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। এ সেই তরুণ গার্ড। এ-ই ওকে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ঝুঁকে এসেছে মুখের উপর। শ্বাসে তামাকের কটু গন্ধ পেল স্মৃতি। তরুণের বয়স হবে বড়জোর বিশ, তবে চোখ দুটো মরা মাছের মত। মনে হলো না স্মৃতিকে মানুষ ভাবছে। ও যেন চাবি ঘুরিয়ে চালু করা কোনও পুতুল।

মহিলাদের উপর চোখ রাখা গার্ডদের দায়িত্ব, তবে তারা এ মুহূর্তে চোখ সরিয়ে রেখেছে অন্য দিকে। কাজটা করা হচ্ছে যুক্তি করে। নিশ্চয়ই একটা চুক্তি হয়েছে তাদের ভিতর। যতক্ষণ ইচ্ছে স্মৃতিকে আটকে রাখবে তরুণ। এর বেশি কিছুও করতে পারে।

এক হাঁটু তুলে তরুণের তলপেটে গুঁতো দিতে চাইল স্মৃতি। তবে ঢের সতর্ক সে, কাত হয়ে ধাক্কাটা নিল উরুর উপর। তরুণের ঠোঁটে টিটকারির হাসি, পরক্ষণে চড়াৎ করে চড় পড়ল

স্মৃতির গালে। টলে উঠল স্মৃতি, ওর মনে হলো মুহূর্তে ফুলে গেছে গাল।

চেঁচিয়ে উঠল না, পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিল। মাতালের মত টলছে, বন বন করে ঘুরছে মাথা। কয়েক মুহূর্ত পর পরিষ্কার হলো দৃষ্টি। হাড্ডিসার গার্ড খপ করে ওর কাঁধ ধরল, ঘুরিয়ে দিল। এত জোরে ধরেছে, কাঁধের মাংসে বসে গেল আঙুলগুলো। অন্য গার্ডদের কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

গজ পঞ্চাশেক দূরে পুরনো এক ছাউনি, অর্ধেক চাল নেই, সেদিকে নিয়ে চলেছে ওকে গার্ড। দেয়ালগুলো ফুলে বাঁকা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। মাত্র একটা কবজা থেকে ঝুলছে দরজাটা। স্মৃতিকে ধাক্কা দিয়ে দরজা পার করে দিল তরুণ। এত জোরে ঠেলেছে, সামলাতে পারল না স্মৃতি, মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বুঝতে পারছে এবার কী ঘটতে চলেছে। একবার কলেজে ওর উপর হামলে পড়েছিল এক সহপাঠী। সেবার ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে পালাতে পারে। কিন্তু এবার কী পারবে? উপুড় হয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, ধড়মড় করে চিত হলো স্মৃতি, মেঝে থেকে এক মুঠো বালি তুলে নিল।

ঝড়ের মত এল গার্ড, লাথি দিল স্মৃতির ডান মুঠো লক্ষ্য করে। ঝটকা খেয়ে খুলে গেল মুঠো। অবশ হয়ে গেল বাহু। একমাত্র অস্ত্র হারিয়ে বসেছে স্মৃতি। আরবিতে কী যেন বলল তরুণ, তারপর শেয়ালের ডাকের মত করে হাসতে শুরু করল।

হাঁ করল স্মৃতি, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। কিন্তু সে সুযোগও পেল না, ওর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে নেমে এল তরুণ। নোংরা হাতে চেপে ধরেছে নাক-মুখ, অন্য হাতে খামচে ধরেছে বাম স্তন। ধড়মড় করে উঠে বসতে চাইল স্মৃতি, কিন্তু বুকের উপর ওজন ওকে উঠতে দিল না। ঘ্যাচ করে লোকটার আঙুলে কামড় দিতে চাইল। পাগল হয়ে উঠেছে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

কিন্তু তরুণ গার্ড ঠেসে ধরেছে ওকে মেঝের সঙ্গে। শ্বাস নিতে পারছে না স্মৃতি, লোকটা ওর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় ফুসফুসে ব্যথা পেয়েছে। তা ছাড়া, লোকটা এক হাতে ওর নাক-মুখ চেপে ধরেছে! চরকির মত ঘুরছে মাথা। আর কয়েক সেকেণ্ড মুক্তি পেতে চাইল স্মৃতি, তারপর সমস্ত শক্তি হারিয়ে বসল। জ্ঞান হারাতে শুরু করেছে। টের পেল এক হাতে ওর কাপড় টেনে খুলছে লোকটা। চোখের সামনে কালো হয়ে এল ছায়াটা।

তারপর কটাস্ করে জোর আওয়াজ শুনল। মনে হলো ফেটে গেল কোনও গাছের শুকনো ডাল। এখন আবার শ্বাস নিতে পারছে। দৃষ্টি পরিষ্কার হতেই দেখতে পেল এক লোকের হাত সরে গেল গার্ডের ঘাড় থেকে। স্মৃতির উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হলো তরুণ গার্ডের দেহ। ফিরে এল দীর্ঘ লোকটা, স্মৃতিকে উঠিয়ে বসিয়ে দিল। হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে বেচারি। ধর্ষক গার্ড একটু দূরে পড়ে আছে, মোটেই নড়ছে না। চোখদুটো খোলা, তবে আর মরা মাছের মত চেয়ে নেই। মৃত্যু যেন তাকে এক ধরনের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে!

বাবুর্চির কাছ থেকে খাবার নেয়ার সময় যে গার্ড ওর হয়ে তর্ক করেছিল, সে হাঁটু গেড়ে বসে আছে পাশে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল স্মৃতি। মানুষটা কীভাবে খালি হাতে ঘাড় ভাঙল তরুণ গার্ডের!

নরম স্বরে কথা বলল লোকটা। স্মৃতির বুঝতে এক সেকেণ্ড লাগল মানুষটা পরিষ্কার বাংলা বলছে। 'আপনি এখন নিরাপদ। আর কখনও আপনাকে এ জ্বালাবে না।'

'কে? কে আপনি?' জানতে চাইল স্মৃতি।

মুখ থেকে কাফিয়ে সরিয়ে নিল লোকটা। মুখের ত্বক শ্যামলা। খাড়া নাক। ঠোঁটে মৃদু হাসি। চোখের মণি দুটো দুই রঙের। একটা কুচকুচে কালো, অপরটা সবুজ। দু'চোখে আশ্চর্য

এক মায়া।

'আমার নাম মাসুদ রানা। বাংলাদেশ থেকে এসেছি। জলদি সামলে নিন। বাঁচতে চাইলে এখান থেকে পালাতে হবে এখুনি।'

কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল স্মৃতি। ভাবছে, এই অদ্ভুত সুপুরুষের সঙ্গে পালাতে পারলে খুশি হবে যে-কোনও মেয়ে!

'আপনি কেন আমাকে... ঠিক বুঝতে পারছি না...' থমকে গিয়ে চেয়ে রইল স্মৃতি।

দু'হাত ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল যুবক, 'এখন কিচ্ছু বোঝার দরকার নেই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।'

চাঁদের আলোয় মস্ত উপত্যকা পেরুনো কঠিন নয়। গার্ডদের উপর নির্দেশ রয়েছে, বন্দিদেরকে আটকে রাখতে হবে এই কারাগারে। কিন্তু যাদের পরনে গার্ডদের পোশাক, তাদের ব্যাপারে কড়া কোনও বিধি-নিষেধ নেই।

গত ভোরে নামাজের পর গার্ডদের নাস্তার টেবিলে রানাকে জিজ্ঞাসবাদ করা হয়েছে। উত্তরে ও বলেছে, অবস্ট্যাকল কোর্সে ফেল করেছে বলে ওকে শাস্তি হিসাবে অন্য ক্যাম্প থেকে পাঠানো হয়েছে। যে অফিসার জেরা করেছে, রানার জবাব তার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়েছে। এরপর আর কিছু বলেনি।

পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে রানা, আর সব আরবের মতই পরনে ডেজার্ট ফেটিগ। মুখের অর্ধেক ঢাকা কাফিয়ে দিয়ে। খুব সাবধানে চলাফেরা করেছে। পাহাড় থেকে নেমে আসবার পর শরীরে টনটনে ব্যথা ছিল, সেটাকে পাত্তা দেয়নি।

পুরো সকাল চারপাশ ঘুরে দেখেছে। তবে গার্ডদের কাছ থেকে বেশি দূরে যায়নি। কারও মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। বুঝতে দেরি হয়নি, এটা সত্যিই বন্দিশালা। এখানে গায়ের জোরে মানুষগুলোকে খাটানো হচ্ছে। তাদের শারীরিক অবস্থা

থেকে মনে হয় বহুদিন ধরে বন্দি, অথবা যখন এসেছে তার আগে থেকেই দুর্বল ছিল। শেষটা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। প্রচুর কাজ চলছে খনিতে, এখন যে-কোনও দিন শুরু হবে উৎপাদন।

তবে এখানে কয়েক ঘণ্টা থাকবার পর রানা বুঝেছে, এরা কয়লা উৎপাদনের জন্য কাজ করছে না। উপত্যকার নীচের দিকে যেসব গর্ত খোঁড়া হয়েছে, সেগুলো খননের ভিতর দক্ষতা নেই। এটা করবে না কোনও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। রানা ধারণা করেছে, খনন শুরু করবার মূল কারণ লোকগুলোকে খাটিয়ে ক্লান্ত করা। প্রচণ্ড পরিশ্রম শেষে সামান্য খাবার পেলেই ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেবে তারা। এদেরকে যে পাঠিয়েছে, সে চাইছে এরা এখনই মারা না পড়ুক।

রানা জানে না এ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী কেমন থাকতে পারেন। তবে ওর বিশ্বাস, তিনি মারা যাননি। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। উপর থেকে নির্দেশ এলেই তাঁকে মরতে হবে।

গার্ডদের কথা শুনে এবং চারপাশের আবহ থেকে রানা বুঝে নিয়েছে, এখানে কেউ টুঁ শব্দ করে না ক্যাম্পের প্রধান সম্পর্কে। ক্যাম্পের স্টাফরা এসেছে আরব দুনিয়ার নানান জায়গা থেকে। মরোক্কোর বস্তিতে বড় হওয়া লোক থেকে শুরু করে সৌদি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা লোকও রয়েছে। টেরোরিস্টদের উচ্চারণ থেকে বোঝা যায় এরা এসেছে মধ্য-প্রাচ্যের প্রতি কোণ থেকে।

দুপুরের আগে একবার কমাণ্ড তাঁবুর পাশে গিয়েছিল রানা। তখন কোনও গার্ডের সঙ্গে কথা বলছিল কমাণ্ডার, অথবা রেডিওতে আলাপ চলছিল। এ-ও হতে পারে কথা হচ্ছিল স্যাটালাইট ফোনে। সঙ্গে সঙ্গে বুটের ফিতা বাঁধবার ভঙ্গি নিয়ে বসে পড়েছিল রানা। তাঁবুর সামনে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে ছিল গার্ড। বন্ধ ছিল তাঁবুর ফ্ল্যাপ, তবে ওখানেই শোনা গেল ইউনুস আল-

কবিরের নাম। আর দেরি করেনি রানা, গার্ড কিছু সন্দেহ করবার আগেই রওনা হয়ে গেছে।

দুপুরের খাবার দেয়ার সময় রানা বুঝে নিয়েছে, সব বন্দি আরব নয়, তাদের ভিতর দেখতে পেয়েছে বিসিআই-এর সবুর রহমানকে! প্রচণ্ড কড়া রোদে আরও কালো হয়ে গেছে সে। তারপর গার্ডদের একজন হঠাৎ আঘাত হানল এক মেয়ের মাথার উপর। সে মেয়ে আরব হতে পারে না। আরব বা অন্য কোনও দেশের মেয়ে ওই মমতাময় মায়াবী চোখ কোথায় পাবে? সন্দেহ নেই ওই মেয়ে বাঙালি। তবে চুলগুলো ছেঁটে ফেলেছে, মাথা ঢেকেছে স্কার্ফ দিয়ে।

এরপর থেকে মেয়েটার উপর চোখ রেখেছে ও। একবারও সুযোগ মেলেনি সবুর রহমান বা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবার। তারপর মেয়েটির উপর প্রতিশোধ নিতে এল সেই তরুণ গার্ড। তার আগে মেয়েটিকে আঘাত করায় গার্ডদের ক্যাপ্টেন কড়া রোদের ভিতর তাকে পনেরো মিনিট পিটি করায়।

মেয়েটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার পর রওনা হয় রানা, দু' মিনিট পর পৌঁছে যায় ছাউনির ভিতর। ততক্ষণে কোমরে গোঁজা ওয়ালথার বের করেছে, তবে ওটা ব্যবহার করেনি। ওর সঙ্গে সাইলেন্সার নেই। ধরা পড়বার ঝুঁকি না নিয়ে আবারও রেখে দিয়েছে পিস্তল। খপ্ করে একহাতে চুল আর অপর হাতে চিবুক ধরেছে ছোকরার, প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে মটকে দিয়েছে ঘাড়।

'আসলে আপনার সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই আমার,' বলল স্মৃতি।

'বেশ, চলুন তা হলে।'

'কিন্তু... আপনার দুই চোখের রঙ দু'রকম কেন?' প্রশ্নটা না করে পারল না স্মৃতি।

'তাই নাকি?' হাসল। বুঝতে পেরেছে একটা কণ্ট্যাক্ট লেন্স

খসে চলে গেছে পাহাড়ি পাথর ঢলের সঙ্গে। বাকিটাও খুলে ফেলে দিল। 'এইবার এক রকম হয়েছে? চলুন এবার।'

কমপাউণ্ড থেকে বেশ দূরে ছাউনি। সরাসরি এদিকে চাইবে না গার্ডরা। বিশেষ করে এখন, তারা জানে কী ঘটছে ছাউনির ভিতর। স্মৃতিকে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা, দেয়ালের পাশ দিয়ে পৌঁছে গেল ছোট এক টিলার গোড়ায়। পাঁচ মিনিট পর চূড়া টপকে গেল ওরা, এক ফুট নেমে শুয়ে পড়ল তপ্ত পাথরের উপর। অপেক্ষা করছে। সাবধানে ক্যাম্পের দিকে চাইল রানা। মনে হলো না কেউ দেখতে পেয়েছে ওদেরকে।

নিয়ম মেনে কাজ চলছে ওখানে।

কিছুক্ষণ পেরুল, তারপর রানার মনে হলো এবার রওনা হওয়া যায়। স্মৃতিকে নিয়ে নামতে শুরু করল, চলেছে ওরা খোলা মরুভূমির দিকে। যত দ্রুত সম্ভব জঙ্গিদের ট্রেইনিং ক্যাম্প পিছনে ফেলতে চাইছে। হারিয়ে যেতে হবে রুক্ষ মরুভূমির ভিতর।

রানা আঁচ করছে এক ঘণ্টার ভিতর কেউ খুঁজবে না তরুণ গার্ডকে। পরে যখন লাশ পাবে, তারা বন্দিদের মাথা গুণবে। খুঁজবে এমন কোনও বন্দিকে যে খালি হাতে তরুণ গার্ডের ঘাড় মটকাতে পারে। মাথা গোনার পর দেখবে বন্দি কম নেই। জঙ্গিরা দ্বিধার ভিতর পড়বে, কিন্তু তখনই প্যাট্রল পাঠাবে না।

একবার ক্যাম্প থেকে সরতে পারলে আর ধাওয়া খাওয়া নিয়ে ভাববে না রানা। দুপুরে দেখেছে পলাতক বন্দির কপালে কী ঘটেছে। গার্ডরা প্রথমেই তাকে খুঁজতে যায়নি। মরুভূমিতে বন্দিকে হারিয়ে যেতে দিয়েছে। বাকি কাজ করেছে নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর মরুভূমি। লোকগুলো যখন আকাশে শকুনের দেখা পেয়েছে, ধীরে সুস্থে গেছে লাশ আনতে।

একদিন বা দু'দিন পর একটা গাড়ি পাঠাবে গার্ডদের ক্যাপ্টেন। তারা আকাশে চোখ রেখে খুঁজবে শকুন।

রানার ধারণা, ততক্ষণে মার্ভেলে পৌঁছে যাবে ও স্মৃতিকে নিয়ে। বাথটাবে শুয়ে থাকার সময় ঠোঁটে থাকবে সিগারেট, হাতে জরুরি রিপোর্ট। স্যাটালাইট ফোন খুইয়েছে, তাই ওর উরুতে থাকবে রক্তে ভেজা ব্যাণ্ডেজ।

চার

অচেনা অ্যালার্ম ডক্টর ফারার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ওর কেবিনটা অফিস সংলগ্ন, খোলাই থাকে মাঝের দরজা। কমপিউটারের অ্যালার্মে ঘুম ভেঙেছে ওর। চট্‌ করে ওদিকে চাইল ফারা। মনিটরের স্ক্রিন জ্বলজ্বল করছে, ক্ষীররঙা আলো পড়েছে গোছানো ডেস্কের উপর, চকচক করছে চেয়ারের স্টিলের হাতল।

গায়ের উপর থেকে চাদর সরাল ফারা, চুলগুলোকে দু'হাতে গুছিয়ে খোঁপা করল। খুব একটা শখ নেই ওর জীবনে, তবে ঘুমানোর আগে সবসময় পরে সাদা স্যাটিনের নাইটগাউন। এখন ওটা দ্বিতীয় ত্বকের মত সেঁটে রয়েছে দেহে, কেউ চাইলে পরিষ্কার দেখবে প্রতিটি রমণীয় ভাঁজ ও বাঁক। ফারা আগেই জানত আজ রাতে হঠাৎ ইমার্জেন্সি কল আসতে পারে। সাধারণত এসব সময়ে ঘুমাতে যায় বড় টি-শার্ট পরে। দেরি না করে গাউনের উপর টি-শার্ট পরে নিল ফারা, দুধ সাদা নরম পা দুটো গলিয়ে দিল স্যাটিন চটির ভিতর। যে-কোনও সময় অপারেশন থিয়েটারে ডাক পড়তে পারে, তা-ই ওটা সবসময় পরিষ্কার থাকে।

কেবিন পেরিয়ে কমপিউটারের সামনে থামল ফারা, দ্রুত

হাতে জ্বেলে দিল ডেস্কের সঙ্গে লাগানো বাতি। তার আগেই জানা হয়ে গেছে ওই অ্যালার্ম কী হতে পারে। মার্ভেলের সবার উরুতে যে বায়োমেট্রিক ট্র্যাকিং চিপস রাখা হয়েছে, সেগুলোর একটা থেমে গেছে। এসব ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের অ্যালার্ম বাজায় কমপিউটার। ওটা থেকে বোঝা যায় কী কারণে চিপস থেমেছে। বেশিরভাগ সময় দেখা যায় থামতে শুরু করেছে ইলেকট্রিক চার্জের অভাবে। তবে এখন যে শব্দ কমপিউটার করছে, তা শুনে মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত নামল ওর। তীক্ষ্ণ এই অ্যালার্মের অর্থ, যেভাবেই হোক থামিয়ে দেয়া হয়েছে চিপস, অথবা মারা গেছে মালিক।

কমপিউটার স্ক্রিনে পরিষ্কার ভাবে লেখা ফুটেছে।

মাসুদ রানার ট্র্যাকিং চিপস আর ট্র্যান্সমিট করছে না!

জিপিএস স্যাটালাইট চুপ হয়ে গেছে। মাউস দিয়ে স্ক্রল করল ফারা, দেখতে চাইছে গত কয়েক ঘণ্টায় কোথায় ছিল রানা। টেরোরিস্ট ক্যাম্প ও পুরনো খনি থেকে অনেক সরেছে সে, চলে গেছে দক্ষিণে মরুভূমির দিকে। প্রতি ঘণ্টায় চার মাইল করে হেঁটেছে। প্রায় পঁচিশ মাইল গেছে, তারপর দশ মিনিট আগে থেমেছে। এবং তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেছে চিপস।

ফোনের দিকে হাত বাড়াল ফারা, সোহেলকে জানাতে হবে। কিন্তু আবার থেমে গেল অ্যালার্ম। আরেকবার ট্র্যান্সমিট করল চিপস। রানা নড়ছে না দেখে দ্রুত হাতে কি বোর্ড টিপল ফারা, সিস্টেম ডায়াগনস্টিক চাইছে। ট্র্যাকিং চিপস এখনও নতুন টেকনোলজি, খুব একটা ভুল করে না, তবে যে-কোনও সময় কাজ করতে ব্যর্থ হতে পারে। সিস্টেম অনুযায়ী রানা উনচল্লিশ সেকেণ্ড আগে মারা গেছে, অথবা চিপস সরিয়ে নেয়া হয়েছে দেহ থেকে। তারপর আবারও দেহে বসানো হয়েছে চিপস, পাম্প করছে, ফলে অক্সিজেনেটেড রক্ত নতুন করে সার্কিট শেষ করে

ট্র্যান্সমিট করছে।

হঠাৎ করে যেভাবে অ্যালার্ম বন্ধ হয়েছে, ঠিক সেভাবেই আবারও বাজতে শুরু করল। ত্রিশ সেকেণ্ড এভাবেই চলল, তারপর আবারও থেমে গেল অ্যালার্ম। বার কয়েক একই ঘটনা ঘটল। মনে হলো নষ্ট হয়ে গেছে চিপস।

ব্লিপ, *ব্লিপ ব্লিপ*। ব্লিপ, ব্লিপ ব্লিপ। ব্লিপ, *ব্লিপ ব্লিপ*।

বেতালা সুরে একই রকম চলছে চিপস। হঠাৎ শব্দগুলোর ভিতর একটা প্যাটার্ন খেয়াল করল ফারা। নিশ্চিত হয়ে নিল ওর কমপিউটার রানার চিপস থেকে টেলিমেট্রি রেকর্ড করছে, তারপর দ্রুত হাতে চালু করল ইন্টারনেট কানেকশন। বুঝতে চাইছে ওর সন্দেহ ঠিক কি না। প্রায় এক মিনিট পর প্রথম শব্দগুলোর সঙ্কেত ডিসাইফার করতে পারল।

ঘুম... থেকে... ওঠো...

ফারা... ঘুম... থেকে...

চিপসের মাঝের সময়টাকে ব্যবহার করছে রানা, যেভাবেই হোক, বার্তা পাঠাচ্ছে পুরনো আমলের মোর্স কোডে!

'মাসুদ রানা, ব্যাটা!' আদর ভরা কণ্ঠে বলে উঠল ফারা। মনে মনে প্রশংসা করছে।

তারপর তারস্বরে বাজতে লাগল অ্যালার্ম। আর থামছে না।

দ্রুত ফোনের রিসিভার তুলতে গিয়ে কলমদানি ফেলে দিল ফারা, সেদিকে না চেয়ে কল দিল সোহেলকে।

জঙ্গিদের ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে প্রথম চার মাইল হেঁটেছে রানা ও স্মৃতি, তারপর পেয়েছে পছন্দমত আশ্রয়। ওখানে সূর্যের কড়া রোদ থেকে আড়ালে থাকতে পারবে। রানা ঠিক করেছে স্মৃতিকে নিয়ে ওখানেই দিনটা পার করবে, তারপর সন্ধ্যা নেমে এলে বেরুবে খোলা মরুভূমিতে। মেয়েটিকে বলেছে, চাইলে সে ঘুমাতে

পারে। নিজে ফিরবে ক্যাম্পের দিকে। তবে এক মাইল যাওয়ার পর নিশ্চিত হয়েছে, বাতাসের চাপড়ে হারিয়ে গেছে ওদের পায়ের ছাপ। তখন মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছে। মুসলিমরা সাধারণত কুকুর রাখে না সঙ্গে। এক্ষেত্রে তা ঘটলে কারও সাধ্য নেই অনুসরণ করে। আপাতত ওরা নিরাপদ।

সন্ধ্যার পর রওনা হয়েছে ওরা। রানার একমাত্র উদ্দেশ্য ক্যাম্প পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া। ওর জানা আছে একবার থামলে পরের বার দ্রুত হাঁটতে পারবে না। আড়ষ্ট হয়ে আসছে মাংসপেশি। তার চেয়ে বড় সমস্যা অন্যখানে। ভোরের পর ওদেরকে খুঁজে বের করবে শকুনগুলো, খাবারের চরম সঙ্কটে বাজপড়া পাখিগুলো দিনের পর দিন অনুসরণ করবে, মাথার উপর ঘুরবে। ওটাই গার্ডদেরকে বুঝিয়ে দেবে, এই দেখো, কোথায় পলাতকরা। টেরোরিস্টরা যদি প্যাট্রল পাঠায়, বা আকাশে তোলে কপ্টার, সেক্ষেত্রে খুব দ্রুত ধরা পড়বে ওরা।

আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। মনে হয়েছে অন্য বন্দিদের তুলনায় স্মৃতি যথেষ্ট সুস্থ; তবে রানার জানা নেই কতক্ষণ টিকবে সে। ক্যাম্পে আগেই দুটো ক্যান্টিন জোগাড় করে পানি ভরে রেখেছিল রানা, ও-দুটো থেকে যথেষ্ট পানি দিয়েছে স্মৃতিকে। কিন্তু তাতে মেয়েটির ডিহাইড্রেশন কমেনি।

রাত তিনটের দিকে রানা টের পেল অতি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে স্মৃতি। হয়তো আরও এক মাইল যেতে পারবে, তবে তার কোনও প্রয়োজন নেই। যথেষ্ট দূরে সরে এসেছে ওরা। বেচারিকে আর কষ্ট না দিলেও চলে। এবার যোগাযোগ করতে হবে মার্ভেল টিমের সঙ্গে।

এখানে পাথুরে এক টিবির উপর উঠেছে ওরা। উপর থেকে বহু দূর চোখ চলে। নীচ থেকে দেখা যায় না, চূড়ার কাছে রয়েছে গামলার মত একটা জায়গা। বড় একটা পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে

বসল রানা। স্মৃতির মনোযোগ সরিয়ে রাখতে চাইছে, 'খুলে বলুন তো কী ধরনের খনন করেছেন?'

ক্যাম্প পিছনে ফেলতে হনহন করে হেঁটেছে ওরা। স্মৃতির সঙ্গে আলাপের সময় হয়নি। দু'জন শুধু জানে পরস্পরের নাম।

'ব্যাপারটা ছিল খুব হতাশাজনক,' ক্যান্টিনের মুখ খুলে চুমুক দিল স্মৃতি। খুব তৃষ্ণা পেয়েছে, তবে একটু একটু করে পান করছে। ক্যান্টিনের পানি ফুরিয়ে গেলে বিপদে পড়তে পারে। 'একটা চিঠিতে লেখা ছিল, সত্যিকারের ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ আছে এক গুহার ভিতর। অনেক খুঁজেছি আমরা, কিন্তু কপাল মন্দ, কিছুই পাইনি। ওদিকের জিওগ্রাফি অন্যরকম। ওখানে কোনও গুহা থাকার কথা নয়।'

'কাজেই ধারণা করছেন ভুল হিসাব কষেছে জেফ মার্টেল। অর্থাৎ আপনারা খুঁজেছেন ভিন্ন নদী খাতে।' স্মৃতির ভাবনাকে এগিয়ে দিয়েছে রানা, নিজে খুলতে শুরু করেছে প্যান্ট।

কৌতূহল নিয়ে চাইল স্মৃতি। লোকটা করছে কী? তারপর ওর মনে পড়ল কথা জুগিয়ে দিয়েছে রানা। কাজেই বলল, 'সম্ভবত ইউনুস আল-কবির মারা যাওয়ার পর চলে যায় জেফ মার্টেল। আর তারপর আবারও ওই গুহার ভিতর ঢোকে জলদস্যুরা। লুটপাট করে, যা নিতে পারেনি, ধ্বংস করে দেয়।'

'এর সম্ভাবনা খুবই কম,' দ্বিমত প্রকাশ করল রানা। বুটের খাপ থেকে থ্রোয়িং নাইফ বের করেছে। দেখলে মনে হয় সার্জিকাল স্টিল, তবে ক্ষুরের মত ধারালো এবং খুব ব্যালেন্সড। ওটা দিয়ে তিরিশ ফুট দূর থেকেও লক্ষ্যভেদ করতে পারে রানা। নিজের কথার খেই ধরল রানা, 'আপনি আগে বলেছেন জলদস্যুরা অন্ধের মত ভালবাসত ইউনুস আল-কবিরকে, শ্রদ্ধা করত। এসব ক্ষেত্রে প্রিয় নেতা মারা গেলে ভালবাসা আরও বাড়ে। সাধারণত কোনও লোকের কবর নতুন করে খুঁড়তে যায় না মুসলিমরা।'

'তা ঠিক।'

'ভক্তরা যদি জাহাজের কথা এক জেনারেশন গোপন রেখে থাকে, তা হলে ধরে নিতে পারেন ওটা এখনও আগের মতই আছে।'

'কিন্তু আমরা যেখানে খুঁজেছি সেখানে কিছু নেই।' চাঁদের আলোয় আস্তে করে মাথা নাড়ল স্মৃতি। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল, 'আমরা কি সবুর রহমানকে উদ্ধার করতে পারি?'

মেয়েটার দিকে চাইল রানা। 'আপনাকে হতাশ বা উৎসাহিত করছি না। আমাদের হাতে অন্য কাজ রয়েছে। তবে সে কাজ শেষ হলে ফিরব।' বলল না, সবুর রহমান বিসিআইয়ের ট্রেইনিং পাওয়া এজেন্ট, নিজের দেখভাল ভালই পারবে।

'আপনারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিমান খুঁজছেন, তাই না?' বলল স্মৃতি। 'আমরা ওটাকে নামতে দেখেছি। আর সে কারণেই সবুর রহমান, আসাদ চৌধুরি আর আমি সীমান্ত পার হই। আমরা ওটাকে খুঁজছিলাম।'

'সেই সময় ধরা পড়ে বন্দি হয়েছেন।'

'একটা প্যাট্রল আমাদের ধরে ফেলে। ওরা... ওরা আসাদ চৌধুরিকে মেরে ফেলে। বেচারা আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল।'

চাঁদের আলোয় রানা দেখল, মেয়েটার গাল বেয়ে নামছে অশ্রু। কিছু মেয়ে আশা করে এরকম অবস্থায় তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়া হবে, তবে স্মৃতি সে ধারার মেয়ে নয়। চিবুক উঁচু করে দূরে চেয়ে আছে। সান্ত্বনা চাই না ওর, প্রয়োজনে সাহায্য নেবে, এবং বদলে নিজের সাধ্য মত উপকার করবে। স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা খানিক বাড়ল রানার।

'সামনে জরুরি শান্তি মহাসম্মেলন,' নরম স্বরে বলল রানা। 'ধরে নেয়া যায় সেখানে প্রধানমন্ত্রী থাকলে কনফারেন্স সফল

হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বাড়বে।'

'আমিও তা-ই ধারণা করেছি। আর সেজন্য যখন দূতাবাস থেকে ডাক পেলাম, ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ খুঁজে বের করতে রাজি হয়ে গেলাম। ধারণা করা হয় ওই গুহার ভিতর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া। সেসব পাওয়া গেলে সম্মেলন সফল হতে পারে।'

'তার মানে বিষয়টা আর্কিওলজি নয়?'

মাথা নাড়ল স্মৃতি।

'প্রথম থেকে বলুন, আমি হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

মনের ভিতর সব গুছিয়ে নিতে এক মিনিট লাগল স্মৃতির। সেই ওয়াশিংটনে মিটিং থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সীমান্তের কাছে বন্দি হওয়া, সবই খুলে বলল।

ওর কথা শেষ হতে রানা বলল, 'আগেও নাম শুনেছি আহমেদ শরীফের। আমার এক ইতিহাসবিদ বন্ধু ওর প্রশংসা করেছিল। এ ছেলে নাকি কিছুদিনের ভিতর পৃথিবীর বিখ্যাত মেরিটাইম রিসার্চার হবে। আহমেদ যদি বলে থাকে ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ মরুভূমিতে, খুব সম্ভব ওখানেই আছে ওটা।'

'হতে পারে। আগে কখনও শরীফ সাহেবের নাম শুনিনি। তবে উনি চেয়েছেন বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে আগ্রহী হোক।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা, 'বলতে পারেন অন্য বন্দিরা কোথা থেকে এসেছে?'

'জানি না,' বলল স্মৃতি। 'সবুর হয়তো বলতে পারতেন। উনি আরবি বলতে পারেন। খাওয়ার সময় ছাড়া অন্য সময়ে পুরুষদের ধারেকাছে যাইনি। কোনও মেয়ের সঙ্গেও কথা হয়নি। ওরা কেউ ইংরেজি বা স্প্যানিশ বলে না।'

'এ আরেক রহস্য,' বিড়বিড় করে বলল রানা। বাকল খুলে প্যান্ট নামিয়ে দিয়েছে। বেরিয়ে এসেছে উরুর উপর অংশ। 'ঠিক

আছে, এবার আমার দলকে ডাকতে হবে।'

'কী করছেন?' অবাক হয়ে বলল স্মৃতি। দেখছে রানার উরুর উপর এক ইঞ্চি দীর্ঘ একটা কাটা চিহ্ন।

জবাব দিল না রানা, শান্ত ভাবে ছুরি বসাল পুরনো ক্ষতের উপর, চিরচির করে কেটে ফেলল মাংস। ক্ষত থেকে ছিটকে বেরুল তাজা রক্ত।

'এ কী করছেন?' চমকে গেছে স্মৃতি।

'আমার পায়ে একটা ট্র্যাকিং ডিভাইস আছে,' বলল রানা। 'ওটা দিয়ে সিগনাল দেব। আমার সেল ফোন পড়ে গেছে পকেট থেকে। খুব বেশি দেরি হবে না আমার লোকদের চলে আসতে।'

কাটা মাংসের ভিতর দুই আঙুল ভরল রানা, কী যেন খুঁজছে। চোখ নির্বিকার, তবে চোয়াল শক্ত। যেন ভুলে গেছে ব্যথা বলে কিছু আছে। তিন সেকেণ্ড পর হাত সরিয়ে নিল। কালো প্লাস্টিকের ডিভাইস পেয়ে গেছে। জিনিসটা দেখতে কম পয়সার ডিজিটাল ঘড়ির মত। শার্টে মুছে নিল চিপসের নীচের অংশ। আন্দাজ তিরিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল, তারপর চিপসটা বসিয়ে দিল কাটা অংশে। তিরতির করে বেরুচ্ছে রক্ত। একই কাজ দ্বিতীয়বার করল রানা। তারপর আবারও। এবার আগের চেয়ে দ্রুত কাজটা সারছে। রক্তে ভিজছে চিপস, আবার সরিয়ে নিচ্ছে। দু'হাত নড়ছে ওর।

'ওঠো ফারা,' ট্র্যান্সমিট করবার সময় মুখে প্রতিটা শব্দ বলছে রানা।

এদিকে মরুভূমি সমতল থেকে উঠে এসেছে কোনও বদ জিন, উঠে গেছে চূড়ার কাছে। রানা ও স্মৃতি গামলার ভিতর, কিন্তু এক পাশের পাথর থেকে ঝাঁপ দিল সে। পিছন থেকে পাখির মত নেমে এল রানার বুকে। ধাক্কা খেয়ে চমকে গেল রানা, অন্ধকারে হাত থেকে পড়ে গেল পিচ্ছিল ট্র্যান্সমিটার। হাড়ের মত

শুকনো দুটো হাত চেপে ধরল রানার কণ্ঠ। গেঁথে বসছে তীক্ষ্ণ নখগুলো!

রক্তাক্ত উরু থেকে প্যান্ট নামিয়ে দিয়েছে রানা হাঁটুর কাছে, বেকায়দা অবস্থায় পড়ল। নোংরা জিন কিঁচকিঁচ করে কী যেন বলল, দুই হাঁটু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইল রানার পাঁজর। বিড়াল যেভাবে শিকার ধরে, ঠিক সেভাবে পা দুটো খামচি দিচ্ছে রানার দেহে। পাথরের মত শক্ত নখগুলো চিরে দিতে চাইছে কণ্ঠ।

রানার প্যাণ্টের সঙ্গে নেমে গেছে ওয়ালথার, ওটা আছে এখন ওর কোমরের নীচে। ছোরাটাও হাতের বাইরে। ঝট্ করে মাথা পিছনে নিল রানা, পরক্ষণে সামনে বাড়াল। ওর কপাল ঠাস করে নামল লোকটার নাকের উপর। আঘাতে জোর নেই, হাড় ভাঙল না, তবে ছিটকে বেরুল রক্ত। চমকে গেছে আক্রমণকারী, কাতরে উঠল ব্যথায়।

বুকের উপর চড়ে বসেছে লোকটা, সোজা হয়ে বসে তাকে নামাতে চাইল রানা। ঝটকা খেয়ে বুক থেকে পিছলে পড়ল শত্রু। একই সঙ্গে আধবসা হলো ওরা। দু'জনের ভিতর রানা দ্রুত, ওর ডান হাতি ঘুসি পড়ল লোকটার বুকের উপর। ছিটকে পড়ল সে। গামলার দেয়ালে প্রচণ্ড বাড়ি খেল মাথা। ততক্ষণে উবু হয়ে দাঁড়িয়ে ছোরা তুলে নিয়েছে রানা। দুটো বিষয় খেয়াল করেছে। প্রথম কথা, আক্রমণকারী অস্বাভাবিক হালকা। দ্বিতীয়ত, এর যে ধরনের ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক, এমনই দেখেছে টেরোরিস্ট ক্যাম্পে বন্দিদের পরনে। মেঝের উপর নিথর শত্রু, তবে রানার হাত থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে থ্রোয়িং নাইফ। শেষ মুহূর্তে সামান্য অ্যাঙ্গেল বদলে দিল রানা। লোকটার মাথার পাশে নরম স্যাণ্ডস্টোনে গাঁথল ছোরা।

সাত সেকেণ্ড হলো আক্রান্ত হয়েছে রানা। এ সময়ে ওকে সাবধান করতে দু'হাত উপরে তুলেছে স্মৃতি, তবে কিছু বলতে

পারেনি। এবার ফোঁস করে শ্বাস ফেলল।

'হায় খোদা, সবুর বলেন, ক' দিন আগে ওখান থেকে দুই বন্দি পালিয়েছিল। তাদের একজনের লাশ ফেরত নিয়ে গেছে গার্ডরা।'

রানা আঁচ করল, বিশ মাইলের ভিতর ওরা ছাড়া একমাত্র মানুষ এ। ক্যাম্প পিছনে ফেলে সরাসরি এগিয়েছে ওরা, বেছে নিয়েছে সবচেয়ে সহজ জমিন। ঠিক একই কাজ করেছে এই লোকও। ওদের মত দ্রুত চলতে পারেনি দুর্বলতার কারণে। এ পর্যন্ত যে আসতে পেরেছে, তা-ই আশ্চর্য। এই টিবি বেছে নিয়েছে অবজার্ভেশন পোস্ট হিসাবে। দেখেছে ওরা এদিকে আসছে। তখনই লুকিয়ে পড়েছে। তারপর হামলা করেছে রানার দুর্বল মুহূর্তে।

বন্দির পাশে থামল রানা, হাত বাড়িয়ে দিল স্মৃতির দিকে। 'ক্যান্টিন দিন।'

গুঙিয়ে কী যেন বলল লোকটা।

স্মৃতির কাছ থেকে ক্যান্টিন নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। আরবিতে বলল, 'পান করুন। আমরা আপনার কোনও ক্ষতি করব না।'

ধুলো-ময়লায় লোকটার চেহারা চেনা কঠিন, তবে রানা আন্দাজ করল বয়স হবে ওর কাছাকাছিই। বড়সড় নাক, চওড়া কপাল। দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত থেকেছে। গাল দুটো চোয়ালের গর্তের ভিতর বসে গেছে। চোখে ভোঁতা দৃষ্টি। মরুভূমিতে একা এত দূরে এসেছে, বিপদ হতে পারে ভেবেও হামলা করেছে। আশা করা যায় সুস্থ হয়ে উঠবে।

'বন্ধু, আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন,' বলল রানা। 'আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব।'

'আপনি সৌদি,' ক্যান্টিনের অর্ধেক পানি শেষ করল সে.

'উচ্চারণ তা-ই বলে।'

'ঠিক তা নয়, তবে সত্যিকথা আরবি শিখেছি রিয়াদে। আমি আসলে বাংলাদেশি।'

'আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন। এবার হয়তো উদ্ধার পাব আমরা।'

'আমরা! মানে?'

পাঁচ

ট্র্যান্সমিট করবার পর আর যোগাযোগ করেনি রানা। তাই ওই কোঅর্ডিনেটস অনুযায়ী নিশাত, স্বর্ণা, নবীকে পাঠিয়েছে সোহেল। দু' ঘণ্টা কঠিন পথ পাড়ি দেয়ার পর ওরা পৌঁছে গেছে ওই এলাকায়।

অপারেশন্স সেন্টারে অপেক্ষা করছে সোহেল। [illegible] কমপিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সব। এ মুহূর্তে অল্প কয়েকজন ডিউটিতে আছে। তবে অপারেশন্স সেন্টারে সারাক্ষণ হাজির বারোজন পুরুষ ও নারী কমাণ্ডো। ভেন্টের হিসহিস বাদ দিলে চারপাশে কোনও আওয়াজ নেই। হেলম-এ অপেক্ষা করছে ভিনসেন্ট গগল। একটু পিছনে রায়হান। ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ নিজ চেয়ারে বসে গোঁফ মুচড়ে চলেছেন। ওটা থেকে বোঝা যায় তিনি বিচলিত। যে ভঙ্গিতে গোঁফ পাকানো চলছে, আর দুই ঘণ্টা পর ঠোঁটের উপর একটা রোম থাকবে না।

কিছুক্ষণ পরেই মেইন মনিটরে ধূসর হতে শুরু করবে রাতের

অন্ধকার, ভোর হতে খুব বেশি দেরি নেই। ছোট একটা স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে সুন্দরীকে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে জ্বলজ্বলে একটা বিন্দু। রানার শেষ অবস্থান আর মাত্র এক মিলিমিটার দূরে।

ফোন বাজতেই হঠাৎ চমকে গেল সবাই। কমিউনিকেশন্স সেন্টার থেকে সোহেলের দিকে চাইল টেকনিশিয়ান।

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহেল। হেডসেট পরে নিল, মুখের সামনে মাইক্রোফোন। চেপে রেখেছে উদ্বেগ। কোনও ভাবেই রানাকে ঠাট্টা করতে দেবে না।

'সোহেল বলছি।'

'হ্যাঁ, সোহেল। আমি।'

ভারী কণ্ঠ শুনে চমকে গেল সোহেল। 'জী, স্যর!'

প্রায় ধমকে উঠলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান, 'রানা কোথায়? এখনও ওকে পাওয়া গেল না?'

'গেছে, স্যর। ওরই জন্যে অপেক্ষা করছি, এখনই যোগাযোগ করবে।' চট্ করে ঘড়ি দেখল সোহেল।

'কেমন আছে ও?' গলার উত্তাপ নেমে গেছে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। 'নতুন কোনও খবর আছে?'

'নেই, স্যর। কিছু জানতে পারলেই জানাব।'

'বিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছ না কেন!' আরও একটু নরম হলো কণ্ঠ, 'ও কতক্ষণ পর যোগাযোগ করবে?'

বুড়ো একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে, রানার প্রসঙ্গ ছাড়তে চাইছে না, খানিক হিংসা নিয়ে ভাবল সোহেল। 'আধ ঘণ্টার ভিতর ওর কল পাব আশা করছি, স্যর।'

'ওকে বোলো, লিবিয়ান সরকার জানিয়েছে, নাইট টাইম ট্রেইনিঙে তাদের এক ফাইটার জকি বিশেষ এক এলাকা দেখে। জায়গাটা লিবিয়া আর তিউনিশিয়ার বর্ডারে। লিবিয়ানরা প্যাট্রল পাঠায়। ওখানে টেরোরিস্টদের গোপন বেস ছিল। রাখা ছিল হিন্দ

হেলিকপ্টার। তবে সব ধ্বংস হয়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে কেউ বাঁচেনি।'

'জী, স্যর। আমিই বলতাম আপনাকে। আমাদের টিমই হামলা করে ওখানে। ওটা মডিফায়েড হিন্দ ছিল। এয়ার টু এয়ার মিসাইল ব্যবহার করত। দক্ষ ছিল এপেক্স মিসাইলে।' সাহস করে জানতে চাইল সোহেল, 'স্যর, কপ্টার বা ক্যাম্প বিষয়ে কী বলছে লিবিয়ান সরকার?'

'বলছে প্রধান তাঁবুর নীচে চাপা পড়ে একটা কমপিউটার। জিনিসটা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়।'

চুপ থাকল সোহেল। ওর মনে পড়ে গেছে নিশাত-স্বর্ণা এবং নবী বেশি খুঁজতে যায়নি। 'স্যর, কমপিউটারের ভিতর কী আছে?'

'ওই কপ্টার ছিল ইউনুস আল-কবিরের। ওরা লিবিয়ানদের নাকের ডগায় বসে চালু রেখেছে জঙ্গি ক্যাম্প। ডামি কোম্পানি গড়ে পুরনো এক কয়লার খনিও চালু করেছে।'

পরস্পরের দিকে চাইল সোহেল ও রায়হান। গত রাতে এই নিয়ে আলাপ করেছে ওরা।

ধমক খাওয়ার ভয় নিয়ে বলল সোহেল, 'স্যর, খবরটা আমরা কোথা থেকে পেলাম?'

'ত্রিপোলি থেকে। সরকারী এক এজেন্ট টাকার বিনিময়ে বিসিআইয়ের শাখা প্রধান শাকির হোসেনকে জানায়।'

'তার মানে জামাহিরিয়া সিকিউরিটি অর্গানাইযেশনের?'

'হ্যাঁ। সোর্স ঠিক আছে। জানিয়েছে লিবিয়া সরকার সত্যিই প্রধানমন্ত্রীকে খুঁজছে। তাদের ভিতর ফাঁকিঝুঁকি নেই।' চুপ হয়ে গেলেন রাহাত খান। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'তবে পুরো বিষয়টা চালাকি হতে পারে। আসলে হয়তো ষড়যন্ত্রে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে লিবিয়ান সরকার।'

তাঁর কথা শেষে নীরবতা নেমে এল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে

কথা বলে উঠল কমিউনিকেশন্স অফিসার, 'সুন্দরী থেকে ফোন এসেছে, সোহেল ভাই।'

ওভারহেড স্ক্রিনের দিকে চাইল সোহেল। ওই ট্রাকের বিন্দু এবং রানার অবস্থান মিশে গেছে। 'স্যর, এক সেকেণ্ড, বোধহয় যোগাযোগ করছে সুন্দরী।'

'অ্যাঁ? ...ও, আচ্ছা। কী বলে শোনো।'

হাতের ইশারা করল সোহেল। 'লাইন দাও।'

বোধহয় পিঠ-উঁচু চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন চিফ।

'কী রে!' ভেসে এল রানার কণ্ঠ। 'সব ঠিক তো?'

'স্যর লাইনে আছেন,' চাপা স্বরে জানিয়ে দিল সোহেল।

'রানা,' গুড়গুড় করে উঠল রাহাত খানের কণ্ঠ। 'ওই ক্যাম্পে ওরা কি জেএসও (জামহিরিয়া সিকিউরিটি অর্গানাইযেশন), না অন্য কোনও দল?'

'এখনও জানি না, স্যর।'

'মুশকিল হয়ে গেল।'

কৌতূহলী সবাই, তবে কোনও কথা বলল না।

দশ সেকেণ্ড পর বললেন রাহাত খান, 'লিবিয়ান সরকার ধারণা করছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি বেঁচে থাকেন, ওই ক্যাম্পে বন্দি হয়ে আছেন। দুই ঘণ্টা পর ওখানে হামলা করতে যাচ্ছে লিবিয়ান সেনাবাহিনী। ওদের এয়ার ফোর্স বেসে অপেক্ষা করছে শাকির। ওরা কপ্টারে করে যাবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। আরেকটা বিষয়, জঙ্গি ক্যাম্পের কমপিউটার থেকে তথ্য পাওয়া গেছে, হয়তো ধরা পড়বে ইউনুস আল-কবির। জানা গেছে হিন্দ এবং সব ইকুইপমেন্ট লিবিয়ার ভিতর ঢুকেছে এক হার্বার পাইলটের মাধ্যমে। লোকটার নাম হাবিস জামান। লিবিয়ান সরকারের রেকর্ড অনুযায়ী ওই লোক পাঁচ বছর ধরে বন্দর কর্তৃপক্ষের হয়ে কাজ করছে। এর আগের কোনও তথ্য নেই। স্কুল রেকর্ড বা

এমপ্লয়মেন্ট রেকর্ড বলতে কিচ্ছু নেই। যেন আকাশ থেকে পড়েছে। লিবিয়ান সিক্রেট সার্ভিস ধারণা করছে, হারিস জামানই ইউনুস আল-কবির। এখন যে-কোনও সময়ে তাকে গ্রেফতার করা হবে।'

চট্ করে সোহেলের দিকে চাইল ভিনসেন্ট গগল। চোখে দুশ্চিন্তা। অপারেশন্স সেন্টারের সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ক্যাম্পে থাকতে পারেন, আবার না-ও থাকতে পারেন। কিন্তু রানারা আছে ক্যাম্প থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে। ওদের হাতে যথেষ্ট সময় নেই যে লিবিয়ান অ্যাসল্ট শুরুর আগেই সরে যাবে। এদিকে মার্ভেল বন্দরে ভিড়বার পর থেকেই হারিস জামানকে অনুসরণ করছে কমাণ্ডো কাশেম বক্স এবং চায়নিজ সিক্রেট সার্ভিসের গ্যাং ফেং। ওরা লিবিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের হাতে ধরা পড়তে পারে। রানা রওনা হওয়ার আগেই নির্দেশ দেয়, হারিসের পিছু নিতে হবে, লোকটা যে-কোনও সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

এখন পর্যন্ত খবর যা মিলেছে, তাতে সে ত্রিপোলিতে চার উপ-পত্নী রেখেছে, তবে এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু করেনি। প্রথম রাতে পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলির পর ধারণা করা হয়, ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় হারিস। তবে এখন সোহেল নিশ্চিত, প্রথম থেকেই লোকটা ওদেরকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছে।

ত্রিপোলির জামহারিয়া যদি হারিস জামানকে ধরতে চেষ্টা করে, জানা কথা, মস্ত বড় বিপদে পড়বে মার্ভেলের গ্যাং ফেং ও কাশেম।

'তোমাদের ট্যাকটিকাল সিনারিয়ো বদলে গেল,' মন্তব্য করলেন রাহাত খান।

'জী, স্যর,' সায় দিল রানা।

'ঠিক আছে, নতুন কিছু ঘটলে জানাবে।'

কেন যেন সোহেলের মনে হলো রাহাত খান সন্তুষ্ট। বোধহয় রানা সুস্থ আছে বলেই। খুট করে কেটে গেল লাইন।

সোহেল বলল, 'রানা, শোন...'

'না, শুনব না,' চট্ করে বলল রানা, 'তোর সঙ্গে আড়ি।'

'মস্ত ঝামেলার ভিতর পড়লাম আমরা।'

ী ধরনের?' সিরিয়াস হয়ে গেল রানা।

নলি তো লিবিয়ানরা দুই ঘণ্টার ভিতর ট্রেইনিং ক্যাম্পে হামলা করবে। ওদের ধারণা প্রধানমন্ত্রী ওখানে থাকতে পারেন। সার্চ, ডেস্ট্রয় অ্যাণ্ড রেসকিউ মিশন নিয়ে যাচ্ছে ওরা। এদিকে হারিস জামানকে গ্রেফতার করতে চাইছে। ধারণা করছে সে-ই ইউনুস আল-কবির।'

'খনির ব্যাপারে কিছু বলেছেন স্যর?' জানতে চাইল রানা।

'তেমন কিছু না। কেন?'

কোনও জবাব দিল না রানা। ওর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল সোহেল। আঁচ করল প্রিয় বন্ধু কঠিন কোনও সিদ্ধান্ত নিল।

বিড়বিড় করে কী যেন বলল রানা। পরক্ষণে বলল, 'কাশেম আর গ্যাংকে সতর্ক করে দে।'

'এখন ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে রায়হান।'

'জঙ্গিদের ট্রেইনিং ক্যাম্পে দুই শ'র বেশি মানুষ বন্দি। তাদের সঙ্গে থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে মারা পড়ছেন। ক্যাম্প সিকিউর করতে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট নেবে লিবিয়ান ফো তার অনেক আগেই একটা গুলি খতম করতে পারে প্রধানম । কিছু করতে হবে আমাদের।'

'কী করবি?'

'জানি না। ভাবা দের সুযোগ সরিয়ে নেব। ...তোরা কোথায়?'

'উপকূল থেকে আশি াইল দূরে।'

'হাতে মাত্র দুই ঘণ্টা?'

'কম-বেশি তা-ই।'

'ঠিক আছে। গগলকে বল ইঞ্জিনিয়ারদের যেন পাত্তা না দেয়। ফুলস্পিডে চলুক মার্ভেলের ইঞ্জিন। সরাসরি তীরে চলে আয়। ক্যাপ্টেন আলম সিরাজকে জানিয়ে দে পনেরো মিনিটের নোটিশে আকাশে তুলতে হবে কপ্টার।'

'কোলিং স্টেশনের ডকে ভিড়ব,' বলল সোহেল। বেসুরো শোনাল কণ্ঠ, 'অপেক্ষা কর, রানা, দুই ঘণ্টার আগেই পৌঁছব।'

'হেলম থেকে বলছি: ইমার্জেন্সি পাওয়ার দিন,' গগলের চাঁছাছোলা কণ্ঠ শুনতে পেল রানা। 'অল অ্যাহেড ফ্ল্যাঙ্ক।'

সুন্দরীর পিছনের বেঞ্চ-সিটে পা ছড়িয়ে বসেছে রানা। ক্ষতটার পাশে লোকাল অ্যানেসথেটিক দিয়েছে স্বর্ণা। এখন সেলাই করছে। সামনের সিটের দিকে চাইল রানা। গাদাগাদি করে বসেছে লিবিয়ান বন্দি ও স্মৃতি। বন্দির নাম ফুয়াদ আহমেদ, এরইমধ্যে লবণের ট্যাবলেট ও পর্যাপ্ত পানি পেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ, সোহেল, তোরা আয়,' বিড়বিড় করল রানা। 'আমরা সবাই তৈরি থাকব।'

ছয়

মাসুদ রানা হার্বার পাইলট হারিস জামানকে অনুসরণের নির্দেশ দেয়ায় ভড়কে যায়নি গ্যাং ফেং। পাত্তা দেয়নি লিবিয়ার

বেশিরভাগ লোক আরব, সহজেই ওর চিনা চেহারা চিনে রাখবে। ওকে ভরসা দিয়েছে মোফিজ বিল্লাহ্। কাশেম বক্স ও গ্যাং ফেং দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, টুরিস্ট হিসাবে লিবিয়া দেশটা ঘুরতে এসেছে। ওদেরকে দেয়া পাসপোর্টে তা-ই লেখা।

কাশেম ও গ্যাং পরস্পরের কাছে স্বীকার করবে না, তবে দু'জনই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। খুবই সন্দেহজনক চরিত্র হারিস জামান। কখন কোন্ দিক থেকে বিপদে ফেলবে কেউ জানে না।

অবশ্য কাউকে সন্দেহ করা আর তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

কাশেমকে বলেছে গ্যাং, পৃথিবীতে এমন কোনও শহর নেই যেখানে চায়নিজ বসতি নেই, কাজেই ভাবতে হবে না। সহজে খুঁজে নেবে অপরাধী চক্রকে। ওদের হয়ে কাজ করবে তারাই।

প্রথম রাতে কাশেম যখন হারিস জামানকে অনুসরণ করছে, সেই অবসরে শহর ঘুরতে বেরিয়েছে গ্যাং, খুঁজে বের করেছে চায়নিজ বসতি। এতে সুবিধা হয়েছে। জানা গেছে লিবিয়া, বিশেষ করে ত্রিপোলিতে দ্রুত গড়ে উঠছে আবাসন শিল্প। হংকং ও শাংহাই থেকে আনা হয়েছে হাজার হাজার চায়নিজ মজুর। এদের জন্য গড়ে উঠেছে রেস্টুরেন্ট, বার, দোকান ও পতিতালয়। বড় শহরের মতই ত্রিপোলিতেও রয়েছে আইন-মানা ব্যবসায়ী ও বেআইনী চোরাকারবারীরা। শেষের এদেরকে দরকার গ্যাং ফেঙের। চায়না টাউনে এক ব্লক যাওয়ার আগেই নির্দিষ্ট গ্যাঙের সিম্বল দেখতে পেয়েছে। এবং ওই দলকে খুঁজে নিতে লেগেছে পাঁচ মিনিট। একটা ওয়্যারহাউসের হেভি ডিউটি দরজার উপর আঁকা ছিল চিহ্ন। ওয়্যারহাউসের নীচ তলায় কোনও জানালা নেই, দোতলায় এক সারি জানালা।

শাংহাইয়ের নির্দিষ্ট এক দলের কোড ব্যবহার করেছে ফেং। একবার টোকা ও তিনবার থাবা দিয়েছে দরজার উপর। ভোঁতা

আওয়াজ হয়েছে। বুঝেছে দরজাটা নিরেট লোহার তৈরি।

আধ মিনিট পর সামান্য খুলে গেছে দরজা, মাথা বের করেছে কিশোর এক ছেলে। ফেং জানে, দরজার ওপাশে অবস্থান নিয়েছে কমপক্ষে চারজন সশস্ত্র লোক।

ছেলেটা একটা কথাও বলেনি।

গ্যাং ফেং নিজেও চুপ থেকেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে শার্টের পিঠ উঁচু করে দেখিয়ে দিয়েছে শোল্ডার ব্লেডে আঁকা উল্কি।

বড় করে শ্বাস ফেলেছে ছেলেটা, ফেং টের পেয়েছে ওর পিঠের উপর বিদ্ধ হয়েছে কয়েকটা চোখ। ধীরে ধীরে শার্ট ঠিক করে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখেছে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওই দলের সদস্যদের দু'জন। হাতের পিস্তল নামিয়ে নিয়েছে তারা।

'কে আপনি?' ডানদিকের লোকটা জানতে চেয়েছে।

'বন্ধু,' জবাবে বলেছে ফেং।

'উল্কি কে দিয়েছে?' দ্বিতীয়জন প্রশ্ন করেছে।

যথেষ্ট বিরক্তি নিয়ে বলেছে ফেং, 'কেউ দেয়নি। ওটা অর্জন করেছি।'

পিঠে কালি দিয়ে আঁকা বিস্তারিত ঝাপসা উল্কি। ওখানে ড্রাগন লড়াই করছে এক গ্রিফিনের সঙ্গে। এটা পুরনো ব্লু শীল ড্রাগন টং-এর সিম্বল। উনিশ শ' পঁচিশ সালে শাংহাইয়ের ডক দখল করবার জন্য বিরোধী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে দলটা। এই উল্কি পায় শুধু সিনিয়র সদস্য বা দুঃসাহসী ফুট সোলজাররা। অন্য কেউ ব্যবহার করলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাদের শরীরে এই উল্কি থাকে তারা চায়নিজ আণ্ডারওয়ার্ল্ডের সম্মানিত মানুষ।

গ্যাং ফেং মনে মনে প্রার্থনা করেছে, এরা যেন ভাল করে উল্কি পরীক্ষা না করে। এই উল্কি মিলেছে চিনা কারাগারের বন্দিদের কাছ থেকে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ক্যাটালগ দেখে স্টেনসিল করে ছাপ ফেলেছে মোফিজ বিল্লাহ। ক্যাটালগে ছিল বেশির ভাগ

দলের উল্কি। সেরা দলের ছাপ বেছে নিয়েছে ফেং।

'এখানে কী কাজে এসেছেন?' প্রথম জন জানতে চাইল।

'এ বন্দরে এক লোক কাজ করে, তার কাছে টাকা পায় টং। আপনাদের কয়েকজনের সাহায্য চাই। চোখ রাখতে হবে তার উপর। আদায় করতে হবে টাকাগুলো।'

'আপনার সঙ্গে টাকা আছে?'

মোটেও জবাব দিল না ফেং। পৃথিবীতে এমন কোনও লোক নেই যে টাকা ছাড়া এ কাজ নেবে। 'চার থেকে পাঁচ দিনের কাজ। আট থেকে দশজন লাগবে। পাবে দশ হাজার ডলার।'

'ওটা এখানে ভাঙানো কঠিন। ইউরো দেবেন। দশ হাজার।'

তার মানে ডলারের শতকরা পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়তি চাইছে। আস্তে করে মাথা দোলাল ফেং, 'ঠিক আছে।'

এরপর কোনও সমস্যা হয়নি। চব্বিশ ঘণ্টা হারিস জামানের পিছু নিয়েছে চায়নিজরা। টঙের ভাঙা হোটেলের এক ছারপোকা ভরা কামরায় উঠেছে ফেং ও কাশেম। প্রতি ছয় ঘণ্টা পর পর ডিসপোযেবল ফোনে যোগাযোগ রাখছে অনুসরণকারীরা। দু' দিন পেরুনোর আগেই হারিস জামানের গতিবিধির ছক জানা গেছে।

রাতের শিফটে কাজ করে সে। তবে কোনও জাহাজ ডকে না ভিড়লে ডিউটি ফাঁকি দেয়। এসব রাতে বন্দর থেকে খানিক দূরে এক অ্যাপার্টমেন্টে যায়। ওখানে রয়েছে তার এক উপপত্নী। সে মহিলা হারিসের অন্যান্য প্রেমিকার চেয়ে দেখতে অনেক খারাপ, তবে সবচেয়ে সহজে তাকে কাছে পাওয়া যায়।

কাজ শেষে ভোরে স্ত্রীর কাছে বাড়ি ফেরে হারিস। ছয় ঘণ্টা ঘুমায়, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সহকর্মীদের বাড়িতে যায়। ওখান থেকে চা-নাস্তার পর রওনা হয় উপপত্নীদের সঙ্গে দেখা করতে। যাদের কাজে নিয়েছে তাদের বলেছে ফেং, ওই মেয়েমানুষগুলোর নাম ও ঠিকানা জোগাড় করতে হবে। করেছে

তারা। ওই তালিকা রায়হানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে ফেং। কমপিউটার হ্যাকার জানিয়েছে, হারিস সরকারী অফিসারদের স্ত্রীদের সঙ্গে লটর-পটর করছে। বন্দরের কাছে যে মহিলা ওর প্রেমে পাগল হয়েছে, তার বোনের স্বামী এনার্জি মিনিস্ট্রির ডেপুটি ডিরেক্টর।

দেখতে মোটেই আকর্ষণীয় নয় হারিস জামান, তবে যেভাবেই হোক, পটিয়ে ফেলে মাঝবয়সী মেয়েলোকদের।

এ নিয়ে আলাপ করেছে গ্যাং ফেং ও কাশেম। ওদের ধারণা হয়েছে হার্বার পাইলট লোকটা একটু দুর্নীতি পরায়ণ, এবং এমন এক লোক যার লিবিডো বেশি সক্রিয়।

তবে একটু আগে চমকে গেছে ওরা। রায়হানকে দিয়ে নতুন তথ্য পাঠিয়েছেন সোহেল ভাই। ওটা পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা।

মার্ভেল থেকে রানাকে ব্রিফ করছে রায়হান। স্যাটালাইট ছবি পাওয়া যায়নি, তবে রানা যখন জঙ্গি ক্যাম্পে কপ্টার থেকে নেমেছিল, সেসময় রায়হান দেখেছে পাহাড়ি ওই এলাকা সাগর সমতল থেকে এক হাজার ফুট উপরে। ওর কথা মন দিয়ে শুনছে রানা। জঙ্গি ক্যাম্প থেকে উপকূল পর্যন্ত পুরো রেলপথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিচ্ছে কমপিউটার বিশেষজ্ঞ। উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ। মোটমাট বিশ মাইল।

রায়হানের কথা শুনবার ফাঁকে পরিকল্পনা করতে চাইছে রানা। ওর মন বলছে, উপকূল পর্যন্ত যাওয়া খুব কঠিন হবে।

হাতে সময় নেই। দুই ঘণ্টার আগেই হামলা হবে ক্যাম্পে। লিবিয়ানদের এমন কোনও কারণ দেখাতে পারবেন না রাহাত খান, যেটা শুনে সময় কিছুটা পিছাবে তারা।

এদিকে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়েছে রানার মাথায়। আটচল্লিশ

ঘণ্টার ভিতর তিনটে ঘণ্টাও ঘুমাতে পারেনি। নিশাত, স্বর্ণা ও নবী ওর চেয়ে ঢের সুস্থ।

'কী হলো, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল স্বর্ণা। এই মাত্র তিন স্তরের ক্যাটগাট সেলাই শেষ করেছে। রক্তে মাখামাখি সার্জিকাল গ্লাভস। এখন আর সহজে কাটবে না সেলাই। লোকাল অ্যানেসথেটিক দেয়ায় এ মুহূর্তে উরুতে ভোঁতা একটা ব্যথা। তবে রানা জানে, দরকার পড়লে ঠিকই লড়তে পারবে।

'কী বিষয়ে, স্বর্ণা?'

'এইমাত্র হাসলেন আপনি।' গ্লাভস খুলল স্বর্ণা। ওগুলো চলে গেল লাল বায়োহ্যাযার্ড কণ্টেইনমেণ্ট বক্সে।

'হেসেছি, না? ভাবছি জটিল সমস্যার ভিতর পড়েছি।'

'আর তাই দাঁড় করিয়েছেন জটিল পরিকল্পনা,' বলল স্বর্ণা। 'নিশ্চয়ই আপনার কোনও সি প্ল্যান, মাসুদ ভাই?' নিশাতের চওড়া কাঁধের উপর দিয়ে সামনে চাইল সে।

'এবার সি প্ল্যানে চলবে না, আমাদের ডি, ই এমন কী এফ প্ল্যানও লাগবে।'

এখন মাত্র দুটো কাজ করতে পারে ওরা। এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। বিষয়টা সবাইকে শ্যুটিং গ্যালারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়ার মত। আর সুন্দরী হবে সিটিং ডাক।

ডাক-টেপ ও গজ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে রানার উরুর ক্ষত বুজিয়ে দিল স্বর্ণা। 'ডক্টর ফারা আপত্তি তুললে বলব, এর বেশি পারি না।'

'ভালভাবেই সেলাই করেছ।' গম্ভীর চেহারা করে উঠে দাঁড়াল রানা, পরে নিল প্যাণ্ট। ওটা এখানে ওখানে ফেঁসে গেছে। বালির বস্তার মত শক্ত। কোমরে তুলতেই কুড়কুড় আওয়াজ তুলল। ট্রাকে বাড়তি প্যাণ্ট নেই। নীচে নেমে গেল রানা, বার কয়েক বসল-উঠল। ক্ষতের উপর টান পড়ছে, তবে টিকবে সেলাই।

নিজ কাজ করছে অ্যানেসথেসিয়া।

পুব পাহাড়ের ওপাশ থেকে সূর্য উঠতে দেরি আছে। মাথার উপর জ্বলজ্বল করছে অজস্র নক্ষত্র। ওগুলোর দিকে চাইল রানা, ভাবছে আগামী সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচবে? কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'সবাই ট্রাকে ওঠো। মার্ভেল আসার আগেই নাটক শেষ হবে।'

'সামনে অনেক কাজ,' বিড়বিড় করে বলল নবী।

'একটা কথা, মাসুদ ভাই,' বলল স্বর্ণা। 'আমরা যাদের উদ্ধার করব, এরা কারা? রাজনৈতিক বন্দি, না সাধারণ অপরাধী?'

'জানি না। তবে সরিয়ে না নিলে মরবে সবাই।'

'মনের ভিতর বিশ্রী অনুভূতি হচ্ছে,' বলল নিশাত।

তিলতিল করে পেরুল পঞ্চাশ মিনিট, রানা ধারণা করল সময় হয়েছে। বন্দিদের পাহারা যারা দেয়, তাদের ট্রেইনিং কেমন আঁচ করেছে ও। লোক কম হলে সমস্যা হতো না, তবে সংখ্যায় তারা চল্লিশজন। আশা করছে এদেরকে সামলাতে পারবে। সঠিক সময় বুঝে কাজে নামতে হবে। ভাবছে, দুই শ' লোককে সরানো কঠিন, ক্যাম্প থেকে তাদেরকে নিয়ে যেতে হবে খনির দিকে। সবাইকে নিয়ে পালানো চাট্টিখানি কথা নয়।

খনির দিকে যাওয়ার আগে নিশাতকে ট্রাক থেকে নামিয়ে দিল রানা। নিশাত যাবে পাহাড়ের উপর। ওখান থেকে স্টকইয়ার্ড আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দালান কাভার করবে। ওর সঙ্গে রয়েছে .৫০ ক্যালিবারের ব্যারেট স্নাইপার রাইফেল। ওটা দিয়ে এক মাইল দূরের টার্গেটে লক্ষ্যভেদ করা যায়। সাত শ' গজের ভিতর লক্ষ্যভেদ করবার জন্য রেখেছে আরইএম৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। রানার ধারণা, নিশাত আরও কম রেঞ্জেই পাবে টার্গেট। সুন্দরী এখন আছে ক্যাম্প থেকে খানিক দূরে, সরু উঁচু ট্রেইলের উপর। গতকাল দুপুরে গার্ডরা এই পথে নিয়ে গেছে ট্রাক। তখন বনেটের উপর ছিল বন্দির লাশ।

পুবাকাশে আবছা আলো ফুটতে শুরু করেছে। সামনে চাইল রানা, চোখে পড়ছে ঘুটঘুটে কালো গিরিখাত। বহু দূর সাগর থেকে ভেসে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া। খচখচ করছে রানার মন। স্মৃতি মাহমুদ ও ফুয়াদ আহমেদকে লড়াই থেকে সরিয়ে দিতে পারলে ভাল হতো। তবে তা সম্ভব নয়। মরুভূমির ভিতর ছেড়ে যাওয়া অমানবিক হবে। এমন হতে পারে ক্যাম্পের দিকে আর ফিরতেই পারল না ওরা সুন্দরীকে নিয়ে। স্মৃতি ও ফুয়াদকে নিজের পরিকল্পনা খুলে জানিয়েছে রানা। বুঝিয়ে দিয়েছে ওরা মস্ত ঝুঁকি নিতে চলেছে। তারা জবাবে জানিয়ে দিয়েছে, ওরা থাকছে। কোনও দায়িত্ব দেয়া হলে তা পালনের চেষ্টা করবে।

'এবারের আর্কিওলজিকাল কাজের শেষে আপনাকে একটা ফেদোরা উপহার দেব,' স্মৃতিকে বলেছে রানা।

'আর আমি ফক্কা?' মৃদু হেসেছে ফুয়াদ আহমেদ।

'আপনাকে দু' প্যাকেট টেস্টি স্যালাইন দেয়া হবে,' গম্ভীর চেহারায় বলেছে স্বর্ণা।

রেডিও কড়কড় করে উঠতে সচেতন হলো রানা।

'কম চেক,' ট্যাকটিকাল নেটে বলে উঠেছে নিশাত।

'সব ঠিক,' বলল নবী। 'ফাইভ বাই ফাইভ, আপা।'

'আমি *ওর লোডিং স্ট্রাকচারের* উপর,' জানিয়ে দিল নিশাত। 'গার্ডরা ঘুম থেকে তুলছে বন্দিদেরকে। একটু পর নাস্তা দেবে। যা করার এখনই করতে হবে।'

'ঠিক আছে,' জবাবে বলল রানা। টের পেল মরুভূমির বালির মত শুকিয়ে গেছে গলা। নবীর দিকে চাইল। নিজে বসেছে ড্রাইভিং সিটে। ওর পরিকল্পনা সফল বা ব্যর্থও হতে পারে। সুন্দরীর ওয়েপন্স সিস্টেমের উপর নির্ভর করছে সব। 'রেডি, নবী?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন।

'তা হলে রওনা হব।'

কি বোর্ড ব্যবহার করে রুফ মাউন্টেড মর্টার চালু করল নবী। নিশাতের সাহায্য নিয়ে সাইট ঠিক করেছে। ব্যবহার করা হচ্ছে লেজার রেঞ্জ ফাইণ্ডার। শুরু হলো গোলাবর্ষণ। প্রথম রাউণ্ড এক শ' গজ যাওয়ার আগেই টিউবের ভিতর চারটে রাউণ্ড ঢুকিয়ে দিল অটোলোডার। পরক্ষণে হাস্যকর 'পুম' আওয়াজ তুলে খালি হলো টিউব। বাঁকা পথে উঠছে গোলা, ছুটে চলেছে টার্গেট লক্ষ্য করে।

দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু হয়েছে। নবী চেঁচিয়ে উঠল, 'গো-গো!'

ট্রাকের ইঞ্জিনের পিকআপ তুলেছে রানা, গিয়ার ফেলেই রওনা হয়ে গেল। চরকির মত বনবন করে ঘুরল চাকাগুলো। টিলা পেরিয়ে ক্যাম্পের দিকে ছুটল সুন্দরী। রানার পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত সফল। ওরা ছাড়া কেউ জানে না কোথা থেকে আসবে মর্টারের গোলা। গমের খুদের তৈরি খাবার দেয়া হবে, কাজেই লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে বন্দিদেরকে। দূরে দেখা গেল এক লোককে পিটাতে শুরু করেছে গার্ড। কিডনির উপর গুঁতো খেয়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে মাটিতে পড়ল বন্দি।

গতিপথের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেল মর্টারের গোলা, এবার জমিনের দিকে নেমে আসতে লাগল। প্রতিটার ভিতর এক কিলো হাই এক্সপ্লোসিভ। তবে বেশিরভাগ শ্র্যাপনেল সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ফলে বন্দিদের আহত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

যে গার্ড এই মাত্র মাটিতে ফেলে দিয়েছে বন্দিকে, তার উপর ক্রস-হেয়ার স্থির করল নিশাত। অর্ধেক শ্বাস আটকে রেখেছে। তারপর আস্তে করে স্পর্শ করল ট্রিগার। লোকটার মাথা বিস্ফোরিত হতেই বলল, 'আমরা পেলাম লালচে কুয়াশা।'

আরও দুই গার্ড পড়ে যাওয়ায় সচেতন হলো তাদের সঙ্গীরা। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল গার্ডদের ক্যাপ্টেন। পরনে শার্ট নেই,

ইউনিফর্ম প্যান্টের পায়া গুঁজে দিয়েছে কমব্যাট বুটের ভিতর। নিশাত লক্ষ করল ওই তাঁবুর ছাত ফুঁড়ে বেরিয়েছে রেডিও অ্যান্টেনা। ওদিকে মন না দিয়ে আরেকটা টার্গেট খুঁজে নিল।

ঠিক তখন একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো চারটে মর্টার। দিঘির মত উন্মুক্ত খনির উপর ছিটকে উঠল বালি ও আগুন। ক' মুহূর্ত পর ক্যাম্পের কাছে বিস্ফোরিত হলো আরও চার রাউণ্ড।

চমকে গেছে গার্ড ও বন্দিরা, পিছাতে শুরু করেছে কাঠের দালানের দিকে। নিশাত নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, একের পর এক খতম করছে জঙ্গি গার্ডদের। প্রতিটি গুলিতে কমছে একজন করে। যাদের সঙ্গে অস্ত্র রয়েছে, তাদেরকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

ক্যাম্প লক্ষ্য করে র‍্যালির ড্রাইভারের মত ছুটছে রানা, যেন একমাত্র উদ্দেশ্য ফিনিশ লাইনে পৌঁছুনো। ওর পাশে এইমিং রেটিকল ঠিক রাখতে চাইছে নবী। তারপর সুন্দরীর অনবোর্ড মিসাইলের একটা লক করে দিল টেরোরিস্ট ট্রাকের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই ফায়ার করল।

সুন্দরীর রেইল থেকে আকাশে বক্র পথ তৈরি করে রওনা হলো রকেট, ট্রাকের ক্যাবে লেগে বিস্ফোরিত হলো। মট করে মাঝখান থেকে ভেঙে গেল চেসিস, মনে হলো টর্পেডোর আঘাতে টলমল করছে জাহাজ।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে ভীষণ ভয় পেয়েছে বন্দিরা, ছুটল দালানের দিকে। এদিকে গার্ডদের অনেকে ছুটছে নিজ নিজ তাঁবু লক্ষ্য করে। ওখানে রয়েছে তাদের রাইফেল।

ক্যাম্প থেকে মাত্র এক শ' গজ দূরে সুন্দরী, এমন সময় তাঁবুগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল সশস্ত্র জঙ্গিরা। সবার চোখ পড়েছে ট্রাকের উপর, একে-৪৭ থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হলো। কাপোলা থেকে এম৬০ মেশিনগান চালু করল স্বর্ণা। হাতের ভিতর লাফিয়ে উঠছে অস্ত্র। কাঁধে লাগছে ঝাঁকির পর

ঝাঁকি। যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। তবে একবারের জন্যও লক্ষ্য ব্যর্থ হলো না।

গার্ডদের মাঝে বিশৃঙ্খলা তৈরি করল রাউণ্ডগুলো। ধুপ-ধাপ পড়ছে লোকগুলো, দু'হাতে চেপে ধরছে আহত স্থান। নিজেদের দলের গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল ক'জন। সবার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে সুন্দরী। ওটা লক্ষ্য করে নতুন উদ্যমে গুলি শুরু হলো।

'যথেষ্ট সময় পেয়েছে ক্যাপ্টেন,' ইঞ্জিনের গর্জনের উপর দিয়ে বলল রানা। 'এবার উড়িয়ে দাও কমাণ্ড টেন্ট।'

ওর পরিকল্পনার দুটো উদ্দেশ্য আছে। প্রথম কথা, যত বেশি সম্ভব মানুষকে উদ্ধার করতে হবে। এমন হতেই পারে লিবিয়ান সেনাবাহিনী শত্রু-বন্ধু বাছবে না, গুলি করে পরে কথা বলবে। দ্বিতীয় কথা, খেয়াল রাখতে হবে যত বেশি পারা যায় জঙ্গিদের শেষ করতে হবে। নইলে এরা যাবে ট্রেইনিং ক্যাম্পে। তাতে মূল হামলার সময় শত্রু সংখ্যা বাড়বে। বোধহয় ওখানে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, উদ্ধার করবার আগেই এরা তাঁকে মেরে ফেলতে পারে। কাজেই তাঁর আততায়ীর সংখ্যা কমিয়ে দিতে হবে।

এবং এই কারণেই নিশাতকে জানিয়ে দিয়েছে রানা, খনি ক্যাম্পের কমাণ্ডারকে খতম করা চলবে না। লোকটা রেডিও করুক ট্রেইনিং ক্যাম্পে, এতে ওখান থেকে হাজির হবে জঙ্গিরা। এতক্ষণে লোকটা তার কাজ শেষ করেছে।

কমাণ্ড টেন্টের ফ্ল্যাপের ভিতর ঢুকল একটা মিসাইল, সোজা মাটি ছেঁচড়ে পিছনের দেয়াল ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে গেল। ক্যানভাস থেকে মস্ত অগ্নিকুণ্ড লাফিয়ে বেরুল। মিলিটারি মালপত্রের উঁচু স্তূপ ছিল বাইরে, প্রচণ্ড কংকাশনে উড়ে গেল সব। তাঁবুটা টয়লেট পেপারের মত ফস্ করে জ্বলে উঠল। নোংরা বাদামি তুষারের মত চারপাশে উড়ছে ছাই।

ক্যাম্পের ভিতর ঢুকে পড়েছে সুন্দরী। রানা ও নবীর মাথার

উপর গর্জন করছে স্বর্ণার এম৬০ মেশিনগান। ধান কাটার মত কাটা পড়ছে জঙ্গি গার্ডরা। একটু পর পর ট্রেসার রাউণ্ড ব্যবহার করছে লেফটেন্যাণ্ট, ওগুলো দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বন্দিদেরকে স্টকইয়ার্ডে যেতে হবে। ওখানে রয়েছে জঙ্গিদের রেলকার ও ট্রেন ইঞ্জিনগুলো।

রানা দেখল আকস্মিক এ হামলায় মন ভেঙে গেছে গার্ডদের, তাদের বড় এক অংশ ছুটে ঢুকে গেল খনি এলাকায়, অথবা টিলা পেরিয়ে চলে গেল মরুভূমিতে। আন্দাজ পঞ্চাশজন বন্দি জড় হয়েছে পুরনো খনির দালানের পাশে। হঠাৎ একটা বুলডোজারের আড়াল থেকে বেরুল এক গার্ড, নিরস্ত্র মানুষগুলোকে বাগে পেয়েছে। কাঁধে তুলে নিল আরপিজি-৭।

সুন্দরীর কণ্ট্রোল প্যানেলে মিসাইলের বদলে মেশিনগান ব্যবহার করল নবী। ট্রাকের নীচ থেকে বিশ্রী আওয়াজ তুলল .৩০ ক্যালিবারের অস্ত্র। জঙ্গি পড়ে গেল, তবে তার আগেই ফায়ার করেছে রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড। পাঁচ পাউণ্ডের মিসাইল মাত্র দশ ফুট গেল, তারপর বিস্ফোরিত হলো আকাশে।

'সর্বনাশ, আপা,' অবিশ্বাস নিয়ে বলল রানা। 'ওটা কী আপনার কাজ?'

নিশাত বলল, 'লোকটার দিকে গুলি করলাম, কিন্তু বুলেটের স্রোতের ভিতর পড়ল গ্রেনেড। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল।'

মনে মনে প্রশংসা করল রানা, মহিলা মিথ্যা বলবার মানুষ নয়। সুন্দরীকে নিয়ে দালানের কোণ ঘুরল রানা, কষে ব্রেক চাপল। রেল লাইনের উপর থামল বিরাট ট্রাক। পিছনদিক থাকল এক বক্সকারের দু' ফুট সামনে। ওই অ্যান্টিক রোলিং স্টককারের ছাতে ব্রেকম্যানের জন্য মেকানিক্যাল ব্রেক। সুন্দরীর চাকার চেয়ে পুরো এক ফুট সরু রেল লাইন। তিন সেকেণ্ড ধরে ড্যাশ বোর্ড হাতড়াল রানা, তারপর পেয়ে গেল কণ্ট্রোল সুইচ। ওটা দিয়ে

ট্রাকের আর্টিকুলার সাসপেনশন বদলে গ্রাউণ্ড ক্লিয়ারেন্স ঠিক করে নেয়া হয়।

ট্রাক সামনে-পিছনে নিল রানা, সুইচ টিপে দেয়ায় হুইলগুলো ভিতর দিকে ফিরছে। পরের আধ মিনিটে চাকাগুলো বসে গেল সরাসরি রেল লাইনের উপর। চেসিস উঠে এসেছে, ভাঙা পাথর থেকে দুই ফুট উপরে থাকল মেঝে।

একটা আরইসি৭ অ্যাসল্ট রাইফেল নিল রানা, বাম হাতে ওয়ালথার নিয়ে লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। গুলি করে ডানদিকের চাকাগুলো ফুটো করে দিল। প্রচণ্ড ওজনে ভুস করে বেরিয়ে গেল বাতাস। সুন্দরীর স্টিলের রিম বসল রেলের উপর। রাবারের চাকা বাড়তি গ্রিপ হিসাবে কাজ করবে। সন্তুষ্ট হলো রানা। এটাই ছিল ওর প্ল্যানের বড় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুন্দরীকে এখন রেলরোডে ট্রেইনের মত ব্যবহার করতে চাইছে।

দালানের কোনা ঘুরল রানা, ট্রাক থেকে নেমে পিছু নিয়েছে ফুয়াদ আহমেদ। তার পরনে এখনও বন্দিদের ছেঁড়া পোশাক। দালান থেকে খানিক দূরে ক'জন গার্ডকে দেখা গেল, শত্রুপক্ষকে খুঁজছে। আপাতত বন্দিদের দিকে কোনও খেয়াল নেই।

দালানের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকে। তাদের কেউ কেউ রানার পরনে গার্ডের পোশাক ও অস্ত্র দেখে ভয় পেল। তারপর দেখল গার্ডের পাশে হাজির হয়েছে ফুয়াদ আহমেদ।

'আমাদের সঙ্গে চলুন,' নির্দেশের সুরে বলল সে। 'এঁরা এসেছেন আমাদেরকে সাহায্য করতে।'

কেউ কেউ অনিশ্চিত দৃষ্টিতে দেখল তাকে।

'চলুন। আমাদেরকে পালাতে হবে। এটা নির্দেশ।'

খসে পড়া শুকনো পাতার মত করে নড়ে উঠল কয়েকজন। তারপর অন্যরা অনুসরণ করল। ততক্ষণে রেলকারের দরজা খুলে ফেলেছে স্বর্ণা। বন্যার পানির মত বগিতে উঠছে বন্দিরা। এক

কোনায় অবস্থান নিল রানা, গার্ডরা হামলা করলে ঠেকাবে। দু'একজন দূর থেকে গুলি করল। রানা ও নিশাতের পাল্টা গুলি খেয়ে পড়ে গেল তারা, অথবা গা ঢাকা দিল। হাত ইশারা করে তাড়াতাড়ি রেলকারে বন্দিদেরকে উঠতে বলছে ফুয়াদ। গার্ডদের উল্টে পড়া টেবিলের আড়াল থেকে বেরুল কয়েকজন মহিলা, ছুটে আসছে সুন্দরীর দিকে। পিছন থেকে গুলি করল এক গার্ড। রানা কাউন্টার ফায়ার করার আগেই পড়ে গেল এক মহিলা। এরপর দূরের ওই ক্রেটের পিরামিডে কয়েক পশলা গুলিবর্ষণ করল রানা।

আহত মেয়েটিকে তুলে নিয়ে রেলকারের দিকে আসতে লাগল মহিলারা। রানাকে পাশ কাটানোর সময় বলল এক মহিলা, 'আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন।'

পাশেই থেমেছে এক বন্দি। তার দিকে না চেয়ে কম্পাউণ্ডে চোখ বোলাল রানা। লোকটা ওর আস্তিন ধরতেই সতর্ক দৃষ্টিতে তাকে দেখল। এ আর সব আরবের মত নয়। একমাথা কালো চুল, কুচকুচে কালো মুখ। রোদে পুড়ে গেছে ত্বক।

'সবুর?' এক সেকেণ্ড পর বলল রানা। নিজ হাতে তাকে ট্রেইনিং করিয়েছে।

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই।' হাত তুলে কপাল দেখিয়ে দিল। 'এবার সত্যিই কপাল পুড়েছে আমার।'

ট্রাকে উঠে পড়ো।'

'স্মৃতি মাহমুদ, মাসুদ ভাই?'

'ভাল আছে।'

'তা হলে সত্যি কপাল ভাল। গতরাতে গার্ডরা বলল মেয়েটা পালানোর সময় গুলি খেয়ে মরেছে।' হাত বাড়িয়ে দিল সবুর। 'একটা অস্ত্র দিন।'

'সুস্থ তুমি?'

'জী।'

নবীর দিকে দেখিয়ে দিল রানা। বক্সকারের টো হুক আটকে দিচ্ছে সুন্দরীর পিছনে—ব্যাক গিয়ার দিয়ে ওটাকে ঠেলে নড়াবার ইচ্ছে। কাছ থেকে প্রকাণ্ড লাগছে বগি। শেকলটা যেন রুপার কোনও চেইন। 'নবী ওখানে, ওর কাছ থেকে অস্ত্র বুঝে নাও।'

'চললাম তা হলে, মাসুদ ভাই।'

চট্ করে ঘড়ি দেখল রানা। প্রথম মর্টার ফেলার পর মাত্র নয় মিনিট পেরিয়েছে। হাতে বড়জোর দশ মিনিট, তারপর ট্রেইনিং ক্যাম্প থেকে হাজির হবে জঙ্গিরা। এদিকে লিবিয়ান সেনাবাহিনীর হামলা হতে এক ঘণ্টাও বাকি নেই। তারা যে-কোনও চলন্ত টার্গেটে বোমা ফেলবে।

এখনও রেলকারের দিকে আসছে বন্দিরা। যতই তাড়া দেয়া হোক, দ্রুত হাঁটতে পারছে না। সামনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা, তারপরেও ছোটা সম্ভব হচ্ছে না। রানার মনে হলো ওর কানের কাছে টিকটিক করছে হাতঘড়িটা। একবার কাঁধের উপর দিয়ে বগির দিকে চাইল। বন্দিরা এক এক করে উঠছে, পরের জনকে উঠতে সাহায্য করছে।

ক' মুহূর্ত পর রানা ভাবল: কই, ঘড়ির টিকটিক নয়, অন্য আওয়াজ! টের পেল, হুম্প-হুম্প-হুম্প শব্দটা আসছে অগ্রসরমান কপ্টার থেকে! ক্যাপ্টেন আলম সিরাজের আসতে কমপক্ষে বিশ মিনিট বাকি। সুতরাং এ কপ্টার জঙ্গিদের এমআই-৮।

বগি প্রায় ভরে গেছে। তবে এক বয়স্কা মহিলা টলতে টলতে আসছে বগির দিকে। পিছনে জ্বলছে তাঁবু ও ইকুইপমেন্ট। গোলাপি আকাশে উঠছে ঘন কালো ধোঁয়ার কলাম।

একবার মহিলার দিকে চাইল রানা, কিন্তু হাতে মোটেই সময় নেই!

সাত

বয়স্কা মহিলার পিছনের বালিতে বিঁধল এক পশলা বুলেট। যন্ত্রের মত চলছে রানার হাত। অ্যাসল্ট রাইফেলের ব্রিচ থেকে ব্যবহৃত ম্যাগাজিন ফেলে ভরে নিল নতুন একটা। শেষ গুলি খরচ করেনি বলে নতুন করে কক করতে হলো না।

দুই শ' মানুষ বক্সকারে উঠেছে, তবে এখন তা বড় বিষয় নয়। উদ্ধার করতে হবে ওই বয়স্কা মহিলাকে। হয়তো যৌক্তিক কাজ করছে না রানা। এত মানুষকে উদ্ধার করা কম নয়, কিন্তু যারা রয়ে গেল তাদেরকেও রক্ষা করতে চাইছে। ওই মহিলার প্রাণ অন্যদের চেয়ে কম মূল্যবান নয়।

কাভার থেকে বেরিয়ে গেল রানা, কোমরের পাশ থেকে গুলি শুরু করল। চমকে গেছে টেরোরিস্ট, থেমে গেল তার রাইফেল। মহিলা ভীষণ ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর আচরণ দেখে রানার মনে হলো, অন্ধকারে উনি হরিণী, চোখের উপর পড়েছে হেডলাইটের বাতি।

দীর্ঘ বারো পদক্ষেপে তাঁর পাশে পৌঁছল রানা, নিচু হয়েই বাম কাঁধের উপর তুলে নিল মহিলাকে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেল কাঁধের উপর উনি আসলে পাহাড়। মহিলার ওজন কমপক্ষে এক শ' নব্বুই পাউণ্ড। দীর্ঘ দিন অনাহারে আড়াই শ' পাউণ্ড থেকে নেমে এসেছেন বেচারি। টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ফিরতি পথ ধরল। হাঁটুর কাছ থেকে

ভেঙে আসতে চাইছে পা। ভয় পেয়ে চাপা স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন মহিলা, তবে বাধা দিলেন না। দালানের দিকে কোনাকুনিভাবে রওনা হলো রানা। ঘাড় কাত করে পিছনে চোখ রাখল, ডান হাতে রাইফেল।

হঠাৎ বিকট আর্তচিৎকার ছাড়লেন মহিলা। কী হলো বুঝবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে রানা। দেখল, হঠাৎ কোথা থেকে হাজির হয়েছে এক গার্ড। লোকটার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নেই, হাতে গদার মত লাঠি। ক্ষেপা কুকুরের মত ছুটে আসছে সে। রানার রাইফেলের নল অন্য দিকে তাক করা। ঘুরে দাঁড়ানোর সময় বুড়ি মহিলার পা দুটো গার্ডের নাক থেকে আধ ইঞ্চি দূর দিয়ে গেল। অ্যাসল্ট রাইফেল তাক করতে চাইল রানা, কিন্তু অবাক চোখে দেখল, ঘুরবার সময় গার্ডের চোয়ালে ভয়ঙ্কর এক ঘুসি বসিয়ে দিলেন মহিলা। যদি ওটা না করতেন, রানার খোলা গর্দানের উপর নামত গদা।

দাঁড়িয়ে পড়ে টলমল করছে গার্ড, তারপর আবারও সামনে বাড়তে চাইল। কিন্তু লোডিং টাওয়ারের উপর থেকে গুলি করল নিশাত। বুকে গুলি লাগতেই ধুপ করে পড়ল লাশ।

'ম্যাডাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে আরবিতে বলল রানা, 'আপনার ডান-হাতি ক্রস হুবহু মাইক টাইসনের ঘুসির মত।'

'কক্ষনো না,' আপত্তি তুললেন মহিলা। 'মোহাম্মদ আলীর পাঞ্চ ওর চেয়ে অনেক বেশি জোরালো। সেজন্যই আমি তাঁর ভক্ত।'

হেসে ফেলল রানা। আরেকটু হলে হাসতে হাসতে ফেলে দিত মহিলাকে, কয়েক পা গিয়ে তুলে দিল বক্সকারে। হাতের ইশারা করল স্বর্ণার উদ্দেশে। রোলিং ডোর বন্ধ করে দিল স্বর্ণা।

'নবী, তৈরি?' রেডিওতে জানতে চাইল রানা। প্রতি সেকেণ্ডে বাড়ছে কপ্টারের আওয়াজ।

'জী, মাসুদ ভাই।'

'আপা?'

'জী, স্যর।'

'টাওয়ার থেকে নেমে আসুন। আমরা আধ মিনিটের মধ্যে রওনা হব।'

প্যাসেঞ্জার সিটের দিকে যাওয়ার সময় সুন্দরীর বামদিকের চাকাগুলো দুই গুলিতে ফুটো করল নবী। এরইমধ্যে ফুয়াদ আহমেদকে রিয়ার কার্গো কমপার্টমেন্টে তুলে দিয়েছে স্বর্ণা। খোলা টপ হ্যাচে দাঁড়িয়েছে সবুর রহমান।

ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ল রানা। এক পাশে বিশাল ডিজেল-ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ, ওটা দিয়ে পাহাড়ি পথে টেনে নেয়া হয় ওর কার। রানার মনে হয়েছে, ওই লোকোমোটিভ ওদের অনুসরণ করতে পারে। তবে, ওসব ইঞ্জিন গরম হতেই কমপক্ষে আধঘণ্টা লাগে।

ডক্টর শামশের আলী সুন্দরীর জন্য ডিজাইন করেছেন চব্বিশ গিয়ারের ট্র্যান্সমিশন। রিভার্সের লো রেঞ্জের সবচেয়ে নীচের চারটে গিয়ার ফেলল রানা। অ্যাক্সেলারেটার দাবিয়ে ধরতেই শুনতে পেল ইঞ্জিনের রেভ বাড়ছে। গর্জন শুরু করল টুইন টার্বো। সুন্দরীর পিছনে রয়েছে রেলকার, এক পাশে আবছা স্টেনসিলে লেখা: আঠারো হাজার পাউণ্ড। এ ছাড়া মানুষ তোলবার পর আরও অন্তত পাঁচ টন বেড়েছে ওজন। রানা জানে না দাঁড়ানো কারটাকে সুন্দরী নড়াতে পারবে কি না।

থরথর করে কাঁপছে ট্রাক। চেপ্টে যাওয়া চাকাগুলো পিছলে গেল স্টিলের রেলের উপর।

সুন্দরীর ফ্লোর শিফটারে রয়েছে একটা সেফটি ডিভাইস, ওটার লাল বাটন টিপে দিল রানা। ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারগুলোর ভিতর ঢুকল ইনটিগ্রেটেড এনওএস থেকে নাইট্রাস অক্সাইড।

প্রচণ্ড তাপে ভাঙতে শুরু করল, কমবাস্চনের জন্য তৈরি হলো বাড়তি অক্সিজেন।

'সুন্দরীর এত জোর নেই যে মার্ভেলকে নায়াগ্রা জল-প্রপাতে ঠেলে তুলবে,' হাসতে হাসতে বলেছেন শামশের আলী।

তবে দেখা গেল নাইট্রাস অক্সাইডের বাড়তি দুই শ' হর্সপাওয়ার নড়াতে শুরু করেছে বক্সকারকে।

প্রথমে মনে হলো শামুকের গতিতে নড়ছে ওটা, তারপর ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতে লাগল। একটু একটু করে গতি বাড়ছে। ড্যাশবোর্ডের ডিজিটাল স্পিডোমিটার দেখাল: ঘণ্টায় এক মাইল। ওদের বিদঘুটে ট্রেন পুরনো কোল লোডিং স্টেশনের ভিতর ঢুকে গেছে, গতি উঠল তিন মাইলে। পাশেই কঙ্কালের মত লোডিং প্লাটফর্ম। ওটার উপর থেকে স্নাইপিং করেছে নিশাত।

রানা রেডিও করতেই জং ধরা কনভেয়ার বেল্টের উপর নেমে এসেছে নিশাত। পাশেই মুখ খোলা কয়লার শ্যূট, ওখান দিয়ে নামিয়ে দেয়া হয় কয়লা। সামনে বক্সকার দেখেই তৈরি হয়ে নিয়েছে নিশাত, নেমে পড়েছে শ্যূটের ভিতর। সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে নামল বক্সকারের ছাতের উপর। এক গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোলিং স্টেশন তৈরি হয়েছে খোলা, নিচু মালগাড়ির জন্য; বক্স ফ্রেইট কার সে তুলনায় অনেক উঁচু। হঠাৎ সামনেই নিশাত দেখল এগিয়ে আসছে আরেকটা কোল শ্যূট। ওটার নীচের অংশ ক্ষুরের মত ধারাল! কচ্ করে কাটা পড়বে মাথা!

ঝুপ করে বসেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল নিশাত, ওর নাকের এক ইঞ্চি উপর দিয়ে গেল শ্যূট। পাথরের মত পড়ে থাকল। পরের এক মিনিটে একের পর এক শ্যূট পেরুল বগি। জং ধরা লোডিং স্টেশন পিছনে পড়তে শ্বাস ফেলল নিশাত, রেডিও করল, 'আমি বক্সকারের ছাতে।'

'গুড,' জবাব দিল রানা। 'আপা, আপনি সুন্দরীর ড্রাইভিঙে

চলে আসুন।'

খনি থেকে সামনের এক মাইল একদম সমতল, মসৃণভাবে গতি তুলছে সুন্দরী। ক্রুজ কন্ট্রোল বাটন টিপল রানা, সরে গেল ড্রাইভিং সিট থেকে। কার্গো বেড থেকে আরইসি৭-এর বাড়তি ম্যাগাজিন নিয়ে পকেটে ঢোকাল। কোমরে পরে নিয়েছে দুটো হোলস্টার। খাপের ভিতর এফএন ফাইভ-সেভেনএন পিস্তল। ফুয়াদ ও স্মৃতির উদ্দেশে বলল, 'আপনাদের কী অবস্থা?'

'গত ছয় মাসে এই প্রথম মনে কিছুটা আশা জাগছে,' বলল লিবিয়ান। 'মন বলছে, আগে কখনও এত ভাল ছিলাম না।'

'আপনি?' স্মৃতির উদ্দেশে চোখ নাচাল রানা।

'আমি এমন কোনও কাজ করিনি যে ফেদোরা হ্যাট দেবেন।'

'যথেষ্ট করেছেন।'

'আরেহ্, ট্রেন চালাচ্ছে কে?' জানতে চাইল নিশাত। এইমাত্র সবুরকে পাশ কাটিয়ে ক্যাবে ঢুকেছে। দেখতে পেল রানা সোজা হয়ে বসছে।

'প্রথম বাঁক আসতে আধ মাইল,' বলল রানা। 'আমাদের ভিতর যে কথা হয়েছে, সেই অনুযায়ী সব চলবে। কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।' হঠাৎ ওর মনে পড়েছে অন্য কিছু। সুন্দরীর ক্যাব থেকে মাথা বের করল রানা। 'নবী, ওই বক্সকারের ওজন নয় টন। মানুষগুলোর জন্য আরও পাঁচ টন। জলদি অঙ্ক শেষ করো।'

'আগে তো ডিমেনশন জানতে হবে, মাসুদ ভাই।'

'আন্দাজ করে নাও।'

রসগোল্লার মত চোখ করল নবী। 'এ কেমন কথা হলো, মাসুদ ভাই? আপনি কি ঠাট্টা করছেন?'

'না।'

চুপচাপ চেয়ে রইল নবী। ক্যাব থেকে বেরিয়ে গেছে রানা।

প্রতি ঘণ্টায় পনেরো মাইল গতি তুলে ছুটছে ট্রেন। ধীরে ধীরে আরও বাড়ছে স্পিড। এখন পর্যন্ত কোনও বিপদ হয়নি। একবার আকাশ দেখে নিল রানা। কোনও কপ্টার পিছু নেয়নি।

ট্রাকের পিছনের ড্রামগুলো ফেলে আসা হয়েছে মরুভূমিতে। রানা জানে, নীচে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েই উঠতে হবে বক্সকারের ছাতে। হঠাৎ এম৬০ দিয়ে গুলিবর্ষণ করল সবুর রহমান। ঘুরে চাইল রানা। একটা ক্যামোফ্লেজড় ট্রাক বাঁক নিয়েছে স্টকইয়ার্ডে। ট্রেইনিং ক্যাম্প থেকে হাজির হয়েছে টেরোরিস্টরা। ট্রাকের পিছনের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে বারো জঙ্গি। গুলি করছে সুন্দরীকে লক্ষ্য করে।

ওই ট্রাক যে পথে আসছে সেটা পাহাড়ের কাঁধে উঠেছে। পাশেই রেললাইন। সবুর দেরি করেনি মেশিনগান চালু করতে। ট্রাকের সামনের চাকাগুলো ওর লক্ষ্য। ড্রাইভার বুঝবার আগেই গুলি লাগল সামনের দুই চাকায়, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো রাবার। স্টিলের রিম বেরুতেই ছিটকে উঠল অজস্র লাল-সাদা-হলুদ-নীল ফুলকি।

তীক্ষ্ণ বাঁক নিল ট্রাক, চেপে বসতে চাইল রেললাইনের বাঁধের উপর। পিছনের লোকগুলো চিৎকার শুরু করেছে। আরও কাত হলো ট্রাক, বিপজ্জনক ভাবে ছুটছে। লাফিয়ে নেমে গেল কয়েক জঙ্গি। অন্যরা রয়ে গেল ভিতরে। তারপর হঠাৎ করেই উল্টে গেল ট্রাক। পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছে। একবার ডিগবাজি দিয়ে নরম মাটিতে গভীর দাগ তৈরি করে নামতে লাগল। ধুলোর মেঘ থেকে ছিটকে উঠছে ভাঙা ইস্পাত ও মানুষের বিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গ।

ওই ট্রাক নীচে গিয়ে পড়তেই দেখা গেল আরেকটা ট্রাক। ওটা ডেযার্ট প্যাট্রল। ড্রাইভার অনেক সতর্ক, কড়া ব্রেক কষে থামতে চাইল। অ্যামিউনিশন বেল্টের শেষ বুলেট ওটার উপর খরচ করল সবুর, তারপর অসহায় চোখে চারপাশে চাইল। জানে

না এই নতুন মেশিনগান কীভাবে রিলোড করতে হবে। স্বর্ণা দেখিয়ে দিল। পাহাড় থেকে নেমে একটা লোকোমোটিভের আড়াল নিল ট্রাক। রেঞ্জ অনেক বেশি, তারপরও ওখান থেকে গুলি চলছে। দু'চারটে কাছ দিয়ে যাওয়ায় লুকিয়ে পড়ল সবুর ও স্বর্ণা।

এ দৃশ্য দেখতে গিয়ে সময় অপব্যয় করেছে রানা, নিজের উপরেই রেগে গেল। ওর মাথা থেকে চার ফুট উপরে বক্সকারের ছাত। তবে দূর থেকে দৌড়ে গিয়ে উঠতে পারবে। কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রাইফেল, খানিক পিছিয়ে দৌড় শুরু করল রানা, শেষ মুহূর্তে উড়াল দিল, দু'হাতে ধরতে চাইল ছাতটা। মসৃণ ইস্পাতে ধাক্কা দিল বুক। তবে দু'হাতে খপ্ করে ধরেছে ছাতের কিনারা। কয়েক সেকেণ্ড ঝুলে শরীর দুলিয়ে উঠে গেল উপরে। দেখতে পেল, সিকি মাইল দূরেই প্রথম বাঁক। বক্সকার এখন কমপক্ষে বিশ মাইল গতি তুলে ছুটছে।

ই-মেইল করে মানচিত্র পাঠিয়েছে রায়হান। চোখের সামনে দীর্ঘ বাঁক। উঁচু পাহাড়ের কিনারা ঘিরে পাক খেয়ে উপত্যকায় নেমেছে রেললাইন। সেখানে পৌঁছলে গতি অনেক বাড়বে। ফলাফল হতে পারে ভয়ঙ্কর। শেষে হয়তো বক্সকারের নিয়ন্ত্রণই হারাবে ওরা।

বগির পিছনের এই অংশে রয়েছে জং ধরা ধাতব হুইল। ওটা আটকে দেবে মেকানিকাল ব্রেক। বহু বছর আগে নিউম্যাটিক ব্রেকিং সিস্টেম আবিষ্কার করেন জর্জ ওয়েস্টিংহাউস। তখন বগিগুলোর উপর উঠত ব্রেকমেন, তারাই হুইল ঘুরিয়ে ব্রেক কষত। চাকাগুলোকে আটকে দিত ব্রেক-শু'র লোহার প্যাড। কখনও কখনও সামঞ্জস্য থাকত না ব্রেককারীদের ভিতর, ঘটত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। দু'হাতে শক্ত করে হুইল ধরল রানা, মনে মনে প্রার্থনা করল যেন জঙে জমে না থাকে প্যাড। আরেকটা ঘটনা

ঘটতে পারে, হয়তো বছরের পর বছর এই লাইনে চলতে চলতে খয়ে গেছে ব্রেকের প্যাড।

রানা ভেবেছে হুইল ঘোরাতে পুরো জোর লাগবে, কিন্তু ওটা ঘুরতে লাগল মসৃণ ভাবে। মনে হলো না কোনও কিছু স্পর্শ করছে। তারপর শুনল শুরু হয়েছে বিশ্রী ধাতব আওয়াজ। লোহার সঙ্গে লোহার ঘর্ষণ চলছে। চাকাগুলোর উপর অংশকে চেপে ধরেছে ব্রেক-শু। সব ঠিক ভাবেই চলছে। গত কিছু দিনের ভিতর যন্ত্রাংশে গ্রিজ দেয়া হয়েছে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে আরও আধ পাক হুইল ঘোরাল রানা। পরক্ষণে হতাশ হলো। হুইল ঘুরলে যে বাড়তি চাপ তৈরি হবে, তা নেই। কাজ করছে না ব্রেক। ঘর্ষণের আওয়াজ আর বাড়েনি।

ব্রেক কাজ করছে। তবে তা পর্যাপ্ত নয়।

সুন্দরী বাঁক ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে বক্সকারটাকে। পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল ওর লোডিং সুপারস্ট্রাকচার। ডানদিকে আরেকটা উপত্যকা দেখল রানা। ওদিকে রেললাইন আছে। পড়ে আছে এক সারি ওর কার। হয়তো এক শ' বছর আগে পরিত্যক্ত হয়েছে। এত দূর থেকে খেলনা গাড়ি মনে হচ্ছে। ওখানে যে স্টিম ইঞ্জিন দেখা গেল, ওটার শক্তি সুন্দরীর হর্সপাওয়ারের কমপক্ষে পাঁচগুণ।

'আপা?' রেডিও করল রানা।

'বলুন, স্যর।'

'আমাদের গতি কত?'

'আটাশ মাইল।'

'ঠিক আছে, তবে তিরিশ যেন পার না হয়। বক্সকারের ব্রেক ঠিক ভাবে কাজ করছে না।'

'অবস্থা খুব খারাপ?' জানতে চাইল নিশাত।

'ভাল বলা যায় না।'

বগির পিছনে ঝালাই করা লোহার মইয়ের ধাপ। ওটা বেয়ে নামতে লাগল রানা, নেমে এল সরু প্ল্যাটফর্মে। পাশেই একটা শাফট, ওটার সঙ্গে যুক্ত উপরের হুইল। ওই দুটো দিয়ে ব্রেক আটকানো হয়। ঠিক ভাবেই কাজ করছে, কিন্তু ব্রেক ধরছে না। একবার সুন্দরীকে দেখে নিয়ে সাবধানে কাপলিঙে বাম পা রাখল রানা, শক্ত করে স্টানশন ধরে উঁকি দিল বগির নীচে। রেললাইনের টাইগুলো কয়লার কারণে কুচকুচে কালো। ওর নাক থেকে খানিক নীচে সাঁই-সাঁই করে পিছিয়ে চলেছে টাইগুলো। খয়ে যাওয়া গিয়ার ও টার্নিং রডের মাঝখানে আটকা পড়েছে একটা পাথর। রানা যখন হুইল ঘুরিয়েছে, ওই পাথর আটকে দিয়েছে গিয়ারের দাঁত, অ্যালাইনমেণ্ট নষ্ট হওয়ায় ব্রেক কাজ করছে না। বামহাতে আরও জোরে স্টানশন ধরল রানা, সাবধানে সামনে বাড়ল। ওর বুক ঢুকে গেল বগির নীচে। পুরনো রেললাইনের মাঝে জন্মেছে ঝোপঝাড় ও ঘাস, চাবুকের মত লাগছে মুখে।

গিয়ারের গ্রিজে মাখামাখি হয়ে গেল হাত। বিস্কুটের মত পাথরটা ধরল বটে, কিন্তু ওটা খুব শক্ত হয়ে আটকেছে।

ডানহাত ফিরিয়ে কোমর হাতড়াল রানা, পিস্তল বের করবে। প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় একটু একটু দুলছে ও। সামনের রেললাইনের মাঝে চোখ যেতেই চমকে গেল। আগে যাওয়া কোনও ট্রেন থেকে পড়েছে ধাতব জেরি ক্যান। অথবা ফেলেছে অসতর্ক কোনও ওঅর্ক ক্রু। দুই লাইনের মাঝখানে বসে আছে। তিরিশ মাইল গতি তুলে ওটার দিকে ছুটছে রানা। হাতে সময় নেই যে বগির নীচ থেকে বেরুবে। কাত হয়ে ঝুলছে, ঝটকা দিয়ে পিস্তল বের করেই গুলি শুরু করল জেরি ক্যান লক্ষ্য করে। এফএন ফাইভ-সেভেনএন-এর হাই ভেলোসিটি বুলেটগুলো ফুটো করে দিল ক্যানের পাতলা টিন। একটুও নড়ল না ক্যান। আর দশ ফুট

গেলে ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাবে রানার মুখ। এমন সময় কপালগুণে কণ্টেইনারের কোণে লাগল একটা বুলেট। জোড়ার উপর আঘাত পড়তেই লাফ দিয়ে সরল ক্যান। দুই ইঞ্চির জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যু এড়ানো গেল। এক সেকেণ্ড ঝুলে থাকল, তারপর শেষ গুলিটা খরচ করল রানা গিয়ারের উপর। ছিটকে বেরিয়ে গেল পাথরটা।

'আপনি গুলি করছেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

'বোধহয় ব্রেক ঠিক করা গেল,' বলল রানা। বগির নীচ থেকে বেরিয়ে এল, বেয়ে উঠতে লাগল মই। 'আমাদের গতি কত?'

'বত্রিশ মাইল। সুন্দরীর ব্রেক কাজে লাগিয়েছি। তবে দ্রুত প্যাডের উপর থেকে খসে পড়ছে কার্বন ফাইবার।'

'ওটা বড় সমস্যা করবে না।'

'এরই জন্য সুন্দরী পিছনে চলছে?'

'হ্যাঁ। আপনি গিয়ার ডাউন করুন, ইঞ্জিনের শক্তি দিয়েই অনেকটা কমিয়ে আনা যাবে গতি। আমি বক্সকারের ছাতে উঠে দেখি ব্রেক কাজে লাগে কি না। দু' দিক থেকে বাধা পড়লে গতি কমবে।'

বক্সকার নিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে এক শ' ফুট নেমে এসেছে সুন্দরী। ঘুরে ঘুরে নামছে মালগাড়ি। ক্যাম্পের দিকে মুখ করে পিছিয়ে চলেছে সুন্দরী, পিছনে বক্সকার। উপরের পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মেছে ঝোপঝাড়। ছাতে উঠল রানা। রেললাইন থেকে খানিক উপর দিয়ে গেছে একটা সড়ক। ওটা চোখেই পড়ত না, কিন্তু বাঁক ঘুরে হাজির হয়েছে বাদামি একটা ট্রাক।

মাথায় কাফিয়ে পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে ট্রাকের পিছনে। চট্ করে পিছনে চাইল রানা। ব্রেক মেরামত করতে যাওয়ার আগে বক্সকারের ছাতে রেখেছে রাইফেল। ঝুঁকে পড়ে ওটা তুলে নিতে চাইল, কিন্তু বগির পাশে চলে এসেছে দ্রুতগামী ট্রাক। ওটার ছাত থেকে ঝাঁপ দিল জঙ্গি।

বাতাসের তোড়ে হারিয়ে গেল লোকটার হুঙ্কার। ঠিক একই সময়ে খপ করে রাইফেলের ব্যারেল হাতে পেল রানা। কিন্তু লোকটা নেমে এসেছে বক্সকারের ছাতে। তার পা লাগল আরইসি৭-এর বাঁটে। ছিটকে গিয়ে ছাতের কিনারায় থামল রাইফেল। ভয়ঙ্কর রণহুঙ্কার ছাড়ল জঙ্গি, পরক্ষণে কারাতে কিক্ চালাল রানার মুখ লক্ষ্য করে।

চেষ্টা করেও আঘাতটা এড়াতে পারল না রানা। ঘাড়ে লাথি খেয়ে ব্যথায় অন্ধ হয়ে গেল ও, উপুড় হয়ে ধুপ করে পড়ল। তবে আবছা ভাবে বুঝল, কী ঘটতে চলেছে। পিঠ থেকে একে-৪৭ নামিয়ে তাক করতে শুরু করেছে লোকটা। সচেতনতা ফিরছে রানার, পিঠের নীচে রোদে তপ্ত ইস্পাতের অনুভূতি। গা মুচড়ে চিত হয়েই লোকটার দুই পা লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়ল রানা। ওর কপাল ভাল, জঙ্গির ডান শিন বোনে লাগল বাম পায়ের লাথিটা। রানার মাথার পাশে চারটে গর্ত তৈরি করল একে-৪৭। বগির ভিতর কে যেন কাতরে উঠল গুলি খেয়ে।

খপ্ করে রাইফেলের সামনের গ্রিপ ধরল রানা, গায়ের জোরে টান দিল। পায়ের ব্যথায় টলমল করছে জঙ্গি, তারই ভিতর দ্রুত পিছাতে চাইল। শক্ত করে গ্রিপ ধরেছে রানা, সহজেই উঠে দাঁড়িয়ে গেল। অস্ত্র ছেড়ে দিয়েই শত্রুর মুখে দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল। কিছুতে অস্ত্র ছাড়বে না জঙ্গি, কাজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। আরও দুটো জোরালো পাঞ্চ পড়ল নাকের উপর। লোকটার কাঁধের উপর দিয়ে রানা দেখল, আরও দুই জঙ্গি এখনই উঠে আসবে বক্সকারের ছাতে।

প্রথম জঙ্গির পেটে কনুইয়ের গুঁতো পড়তেই উবু হয়ে গেল সে। তাকে চরকির মত ঘুরিয়ে দিল রানা। পাশ থেকে থাবা দিল ডানহাতের তর্জনীর উপর। একে-৪৭-এর মাযল ট্রাকের দিকে তাক হতেই বেরিয়ে গেছে এক পশলা বুলেট। এক লোক লাফ

দিতে গিয়ে ছিটকে পড়ল ট্রাক থেকে। ট্রেসার বুলেট খুবলে নিয়েছে বুক। ট্রাকের পিছন চাকার তলে পিষে গেল লোকটা। সামান্য লাফিয়ে উঠল সাসপেনশন।

তৃতীয় জঙ্গি ট্রাক থেকে উড়ে এল পাখির মত। সহজে বিড়ালের মত নামল বক্সকারের ছাতে।

দু' কাঁধ ধরে প্রথম জঙ্গিকে ঘুরিয়ে নিল রানা, পরক্ষণে বুকের পাঁজরে জোর ধাক্কা দিল। দুই পা পিছিয়ে গেল লোকটা, তবে সামলে নেয়ার আগেই পিছলে গেল। ট্রেনের ছাতের কিনারা থেকে ডিগবাজি দিয়ে নীচের দিকে রওনা হলো সে। মাথা থেকে খুলে গেল কাফিয়ে, ওটা বিরক্ত প্রজাপতির মত ডানা মেলে রওনা হলো আরেক দিকে।

হোলস্টারে থাবা দিল রানা, পিস্তল তুলেই ট্রিগার টিপল। পিস্তল খালি। দেরি না করে ছুঁড়ে মারল ওটা তৃতীয় জঙ্গির মুখ লক্ষ্য করে। এক সেকেণ্ড পর নিজেও ছুটল লোকটার উদ্দেশে। কাঁধ থেকে ক্যানভাসের স্লিং খুলছে জঙ্গি, তবে রাইফেল তুলবার আগেই পৌঁছে গেল রানা। লোকটার পেটে দুটো ঘুসি মেরেই কোমর জড়িয়ে ধরল, তুলে ফেলল উপরে, ছুঁড়ে দিতে চাইল ছাত থেকে। তিন ফুট উড়ে ছাতের উপরই ধুপ্ করে পড়ল জঙ্গি। চিত হয়ে পড়ে বুক থেকে ভুস্ করে বেরিয়ে গেল বাতাস। মেরুদণ্ড না ভেঙে থাকলেও আপাতত নড়তে পারবে না।

বোধহয় সুন্দরী থেকে কেউ দেখেনি বক্সকারের ছাতে কী ঘটছে। রানার কান থেকে খসে পড়েছে রেডিওর ইয়ার বাড, কোনও সময় পায়নি দলের সবাইকে সতর্ক করতে। গতি কমিয়ে আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সুন্দরী। তবে বক্সকারের ব্রেক কাজ না করলে কিছুই করতে পারবে না। রানা আন্দাজ করল, ওরা চলেছে ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল গতিবেগে। সামনে ধীরে ধীরে বাঁক নিয়েছে রেললাইন, ক্রমশ নেমে গেছে। তবে সামনে যখন

চুলের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ বাঁক পড়বে, উল্টে যাবে বক্স্রকার।

বগির উপর লাফিয়ে উঠতে চাইল আরও তিন জঙ্গি। তাদের দু'জন নেমে এল ছাতের উপর। তৃতীয়জন বাড়ি খেল বগির পাশে, পড়ে যাওয়ার আগেই খপ্ করে ধরতে চাইল ছাতের কিনারা।

রানার কাঁধে বাড়ি খেল সশস্ত্র জঙ্গিদের একজন। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড ঘুসি এসে লাগল ওর কিডনির উপর। তীব্র ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলল রানা। খুশি হয়ে উঠল জঙ্গি, পর পর কয়েকটা ঘুসি মারল পেটে। রানা টের পেল ওর দ্বিতীয় পিস্তলটা বের করে আনা হচ্ছে হোলস্টার থেকে। ঝটকা দিয়ে সরে যেতে চাইল ও, কিন্তু ওর মেরুদণ্ড লক্ষ্য করে গুলি করেছে লোকটা। পিঠের উপর ছ্যাঁকা খেল রানা, আড়াআড়ি ভাবে পুড়ে গেল শার্ট। ও সরে যাওয়ায় দ্বিতীয় টেরোরিস্টের কণ্ঠনালীতে লেগেছে বুলেট, তপ্ত গুলি বেরিয়ে গেল সেভেন্থ ভার্টেব্রা ছিঁড়েখুঁড়ে। দু' দিকের ক্ষত থেকেই ছিটকে বেরুল রক্ত। কাত হয়ে পড়তে শুরু করেছে লোকটা।

তাকে এভাবে মরতে দেখেই বোধহয় হতবাক হয়েছে প্রথম জঙ্গি। সুযোগটা নিল রানা, তার ডানহাত খপ্ করে ধরেই খোঁচড় দিয়ে কেড়ে নিল পিস্তল। এক পা পিছিয়ে গুলি করল হৃৎপিণ্ড বরাবর।

প্রায় একই সঙ্গে ছাতের উপর পড়ল দুই লাশ।

'স্যর, শুনছেন?'

কানে ইয়ারপিস পরে নিল রানা, চোয়ালের পাশে থাকল মাইক। যোগাযোগ করল, 'হ্যাঁ, আপা। কী ব্যাপার?'

'আমাদের ব্রেক দরকার, স্যর,' জানাল নিশাত। 'এবং এখনই।'

মুখ তুলে চাইল রানা। ওরা দীর্ঘ বাঁক শেষ করছে। সামনে

নীচের দিকে গেছে রেললাইন, তারপর এক শ' গজ গিয়ে ডানদিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে। চরকির মত ঘুরেই হুইলের দিকে পা বাড়াল ও। তবে যে জঙ্গির মেরুদণ্ড ভাঙার কথা, সে পা বাড়িয়ে ল্যাং মারল। হুড়মুড় করে পড়ল রানা। উঠে বসল জঙ্গি, রানা কিছু করবার আগেই একলাফে চেপে বসল বুকের উপর। একের পর এক ঘুসি মারছে বুকে-মুখে। তবে তার ঘুসিতে জোর নেই। ধড়মড় করে উঠে বসতে চাইল রানা। বড় বেশি দ্রুত বাঁকের দিকে চলেছে বক্সকার।

পিঠের নীচে রানা টের পেল, ঢালু হয়ে গেছে রেললাইন। ঝটকা দেয়ার ফাঁকে গুটিয়ে নিল পা দুটো, ঠেকাল জঙ্গির বুকে, পরক্ষণে জুডোর মুভে থ্রো করল ওকে মাথার উপর দিয়ে। ছিটকে গিয়ে চিত হয়ে পড়ল জঙ্গি। শুয়েই চরকির মত ঘুরল রানা, ডানহাতের জোরে উঁচু হয়েই বাম কনুই নামিয়ে আনল লোকটার কণ্ঠার উপর। ছেঁচে গেল কার্টিলেজ, সিনিউ ও টিশ্যু।

উঠে দাঁড়িয়েই ধাতব হুইল খপ করে ধরল রানা, বন বন করে ঘোরাতে লাগল। বাঁক ঘুরতে শুরু করেছে বক্সকার। গতিবেগ কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল। এই বাঁকে চলবার কথা তিরিশ মাইল বেগে। কর্কশ আওয়াজ শুরু করেছে ব্রেকগুলো। চারপাশে ছিটকে পড়ছে রঙিন ফুলকি। তবে রানা জানে, বড্ড দেরি হয়ে গেছে ওদের।

দ্রুত গতি তুলে বাঁক নিচ্ছে বক্সকার। সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্সের কারণে বামদিকের চাকাগুলো উঠে আসতে চাইছে লাইন থেকে। যে-কোনও সময় উপড়ে আসবে ইস্পাতের রেল, বক্সকার ও সুন্দরীকে নিয়ে ছিটকে পড়বে। ব্রেকের হুইল ঘুরিয়ে চলেছে রানা, দশ সেকেণ্ড পর আটকে গেল ওটা। ব্রেকের শুগুলো থামিয়ে দিয়েছে চাকাগুলোকে। পিছন থেকে সুন্দরীর ইঞ্জিনের গর্জন শুনল রানা। সিলিণ্ডারগুলোর ভিতর নাইট্রাস অক্সাইড দিয়েছে নিশাত।

চেপ্টে যাওয়া চাকা থেকে ছিঁড়ে পড়ছে রাবার। পিছানোর বদলে উল্টো সামনে ঘুরছে রিমগুলো, কর্কশ আওয়াজ তুলছে ইস্পাতের ট্র্যাকের সঙ্গে। ফ্রেইট কারের বামদিকের চাকাগুলো প্রতিটি ঝাঁকির সঙ্গে উঠে আসছে। বিড়বিড় করে বলল রানা, যদি মানুষগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতাম! এখন বক্সকার বাঁচাতে হলে তাদের ওজনটা দরকার!

অসহায় বোধ করছে রানা, তারপর হঠাৎ মনে বুদ্ধি এল। টেরোরিস্টদের একটা একে-৪৭ তুলে নিয়ে দাঁড়াল ছাতের ডানদিকে। সামনে শুধু আ-দিগন্ত উপত্যকা নেমে গেছে। বক্সকারের পাশে গুলি করল রানা, এমন একটা অ্যাঙ্গেল বেছে নিয়েছে, ইস্পাতের দেয়ালে লেগে ছিটকে বেরুবে বুলেট। দেখতে না দেখতে ফুরিয়ে গেল ম্যাগাজিন। বগির ভিতর হুলুস্থূল শুরু হয়েছে। ডানদিক থেকে সরে বামদিকে চেপে গেছে মানুষগুলো। বাড়তি ওজনের কারণে বামদিকের চাকাগুলো আবারও বসে পড়ল রেলের উপর, ভারসাম্য ফিরে পেল বক্সকার।

বিদ্যুদ্বেগে বাঁক ঘুরল ওরা। সামনে আবারও দীর্ঘ রেললাইন। বিপদ কেটে যেতেই রানা টের পেল, এতক্ষণ আটকে রেখেছে শ্বাস। ফোঁস করে দম ফেলল, ঠিক করল এবার একটু বসে বিশ্রাম নেবে। কিন্তু ঠিক তখনই নিশাতের আতঙ্কিত কণ্ঠ শুনতে পেল: 'স্যর, ব্রেক খুলে দিন! জলদি!'

হুইল ঘোরাতে শুরু করেছে রানা, তারই ফাঁকে পিছনে ফেলে আসা পথের দিকে চাইল। অন্য দিকে গেছে সড়ক, দেখা গেল না ডেযার্ট ট্রাক বা জঙ্গিদেরকে। কিন্তু পিছন থেকে তেড়ে আসছে আরেকটা ট্রাক। ওটা মডিফায়েড, ট্র্যাক ধরে ছুটে আসছে রেলগাড়ির মত! বক্সকার, দুইশ' মানুষ বা সুন্দরীর ওজন বহন করতে হচ্ছে না ওটাকে, ছুটে আসছে তীব্র গতি তুলে। ক্যাবের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছে কয়েক জঙ্গি, হাতে অস্ত্র। শুধু রাইফেল নয়,

তাদের সঙ্গে রয়েছে রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড লঞ্চারও!

সুন্দরীর উইণ্ডশিল্ডে আগেই অসংখ্য বুলেট লেগেছে, এখন একে-৪৭ থেকে কয়েক পশলা বুলেট এলে চুরচুর হয়ে ভাঙবে কাঁচ। তার চেয়ে বড় বিপদ, ক্যাবের ভিতর আরপিজি ঢুকলে ছিন্নভিন্ন হবে সবাই!

নিশাত আবারও গিয়ার বদল করে পিছাতে চাইছে। লো রেঞ্জের গিয়ারের কথা ভুলে গেছে, আশা করছে উপরেরগুলো ওদেরকে যথেষ্ট গতি দেবে। এখন হাতে সময় পাওয়া খুব জরুরি হয়ে উঠেছে। ভাবছে, ওরা যদি রেললাইন ধরে দ্রুত পিছাতে পারে, টেররিস্টরা গুলি বা গ্রেনেড ছুঁড়তে পারবে না।

'আমাদের পরের কঠিন বাঁক কোথায়?' জানতে চাইল রানা। ওর জানা আছে, এখন ল্যাপটপে সুন্দরীর জিপিএস ট্র্যাকার থেকে মানচিত্র দেখছে নবী।

'দুই মাইল, মাসুদ ভাই।'

'মিসাইল?'

'অবশিষ্ট মাত্র একটা।'

'ওটা রেখে দাও। অন্য কিছু করতে হবে।'

একবার সুন্দরীর পিছন দিক দেখে নিল রানা, তারপর পাখির মত নেমে এল ট্র্যাকের বেডে। স্বর্ণা এম৬০ থেকে সরিয়ে দিয়েছে সবুর রহমানকে। বিসিআই এজেন্ট এখন কার্গো এরিয়ায় ফুয়াদ ও স্মৃতির সঙ্গে বসে আছে। ক্লান্ত লাগছে তাকে।

ওদের দিকে চাইল না রানা, ঢুকে পড়ল সুন্দরীর ক্যাবে। পিছন-দেয়ালের কেবিনেটের হিঞ্জ পিন খুলে ফেলল। দরজাটা তিন ফুট বর্গাকারের, ওজন কমপক্ষে ষাট পাউণ্ড। স্বর্ণার সাহায্য নিয়ে দরজাটা হ্যাচ দিয়ে গলিয়ে দিল, নিজে আবারও ফিরল ক্যাবের ভিতর। ওর সঠিক সময় বেছে নিতেই হবে এমন নয়, আসলে কপালের জোর থাকতে হবে পরিকল্পনা সফল করতে।

সিকি মাইল দূর থেকে ছুটে আসছে ট্রেন-ট্রাক, গতি আরও বাড়ছে। ওখান থেকে কে যেন খেয়াল করেছে ক্যাবের ভিতর রানা। ওকে লক্ষ্য করে একে-৪৭এর গুলি এল। তার আগেই বুকের সামনে বর্মের মত করে দরজার কবাট তুলে নিয়েছে রানা, মুষল বৃষ্টির মত এল বুলেটগুলো, ছিটকে চলে গেল আরেক দিকে। রানার মনে হলো স্লেজহ্যামারের আঘাত পড়ছে হাতের উপর।

সামান্য প্যাঁচানো একটা বাঁক পেরুতে শুরু করেছে সুন্দরী। কিছুক্ষণের জন্য ওদেরকে দেখতে পাবে না পিছনের ওরা। এই সুযোগের জন্য অপেক্ষা করেছে রানা, ক্যাবের জানালা খুলে সাবধানে বের করল কবাট, ফেলে দিল রেললাইনের উপর।

ঠন-ঠনাৎ আওয়াজ তুলে ডানদিকের রেলের উপর পড়ল কবাট। কয়েক সেকেণ্ড পিছলে থেমে গেল একটা টাই-এর সঙ্গে। আর নড়ছে না।

আধ মিনিট পর বাঁক ঘুরল ট্রেন-ট্রাক। গতি কমপক্ষে ঘণ্টায় ষাট মাইল। সুন্দরীকে সামনে দেখল জঙ্গিরা, লোভনীয় টার্গেট। আরপিজি নিয়ে তৈরি হলো কয়েকজন।

আট

দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাল হাইব্রিড ট্রেন-ট্রাকের ড্রাইভার। নিজের জান তো রক্ষা করলই, বাঁচিয়ে দিল রানা ও অন্যদের প্রাণও। ট্র্যাকের উপর স্টিলের পাত চোখে পড়তেই বুঝে ফেলেছে কী

ঘটতে চলেছে। ইস্পাতের উপর ট্রাক চড়ে বসলে ছিঁড়ে বেরুবে রেললাইন। ফলাফল হবে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। কষে ব্রেক করল সে। মেঝের উপর রয়েছে একটা লিভার, বাম হাতে ওটা টান দিল। হাইড্রলিকস তুলে নিল ট্রেনের লোহার চাকাগুলোকে, ট্রাকের চেসিসের সঙ্গে সব সেঁটে গেল। রেললাইনের বাইরে দ্রুত ঘুরছে রেগুলার চাকা, ট্র্যাকের টাইয়ের উপর দিয়ে ছুটল।

দ্রুত খটা-খট শব্দ তুলে কমল ট্রাকের গতি, ক্যাবের উপর দাঁড়ানো জঙ্গিরা কোনও সুযোগই পেল না। নিজেদের স্থির রাখাই কঠিন, লক্ষ্যভেদ দূরের কথা। ট্রাক থেকে নানাদিকে ছুটল তাদের রকেট। কোনওটা গেল আকাশের দিকে, স্ক্রুর মত প্যাঁচ মারতে মারতে বিশাল আতসবাজির মত ফেটে পড়ল। কিছু গেল নীচের উপত্যকার মরুভূমিকে খুন করতে।

ধাতব পাত পেরিয়ে গেল ট্রাক, এবং সঙ্গে সঙ্গে গতি আরও কমিয়ে আনল বুদ্ধিমান ড্রাইভার। নতুন করে ট্র্যাকের উপর বসিয়ে নিল ট্রেনের লোহার চাকাগুলোকে।

তেমন কাজে আসেনি রানার বুদ্ধি। তবে ওদেরকে দিয়েছে আধ মাইল দূরত্ব। সামনে পড়বে তীক্ষ্ণ বাঁক। আবারও বক্সকারের উপর উঠে ঘোরাতে হবে ব্রেকের হুইল। সুন্দরীর পিছনে চলে গেল রানা, পোড়া রাবারের দুর্গন্ধে কুঁচকে গেল নাক। ছিঁড়ে পড়ছে চাকাগুলো। আবার চল্লিশ মাইল গতি তুলে ছুটছে ওরা। রানাকে উড়িয়ে নিতে চাইছে হু-হু বাতাস। ওটার জন্য বক্সকারের ছাতে ওঠা কঠিন হবে। বক্সকার ও সুন্দরীর মাঝের সংকীর্ণ অংশ দেখে নিল। নীচে চোখ পড়তেই দেখল, সাঁই-সাঁই করে পিছিয়ে চলেছে কয়লা মাখা কালো টাইগুলো।

আপাতত উপরের দিকে উঠছে রেললাইন, একটু সামনে পড়বে বাঁক। কমে এল ট্রেনের গতি। তবে এটা চলবে কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর আবারও নীচের দিকে রওনা হবে ট্র্যাক।

সুন্দরী বা বক্সকারের গতি এখনও ঢের বেশি। বাঁক ঘুরতে শুরু করলে রেললাইন উপড়ে ছিটকে পড়বে ওরা। দু'দিকের দুই রেল অসমতল হয়ে গেল, লাফাতে লাফাতে ঢাল বেয়ে উঠছে বক্সকার। ছাত থেকে রেললাইনের পাশে খসে পড়ল দুই টেরোরিস্টের লাশ। ছাতের উপর থাকল কেবল এক জঙ্গির দেহ। তার কণ্ঠার হাড় চুরমার করে দিয়েছে রানা।

পাহাড়ি ঢালের চূড়ায় উঠে এল বক্সকার, সুন্দরীর প্রচণ্ড শক্তি কোনও কাজেই এল না, আবার নীচের দিকে ট্র্যাক নামতে শুরু হওয়ায় বাড়ল গতি।

কয়েক সেকেণ্ড ঝুলে থেকে বক্সকারের ছাতে উঠে এল রানা, একবার চেয়ে দেখে নিল জঙ্গির লাশটা, তারপর দুই হাতে ধরতে চাইল ব্রেকের হুইল। আর ঠিক তখনই ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লাশটা! বড় দেরি করে ফেলেছে রানা। ওর মনে পড়ল, যাকে খুন করেছে, তার মাথায় ছিল নীল কাফিয়ে। এর মাথারটা লাল। খানিক আগে ছাতে নামতে গিয়ে লাফ দিয়েছিল তিন জঙ্গি। তাদের একজন ছাতে উঠতে পারেনি। এ-ই সেই লোক, ছাতের কিনারা ধরে ঝুলছিল! ও সুন্দরীতে ফিরতেই উঠে এসেছে। লাশ ফেলে ভঙ্গি নিয়েছে সে নিজেই সেই মৃত।

পলকের মধ্যে এসব ভাবল রানা, দুই পা দিয়ে জড়িয়ে ধরল লোকটার হাঁটু—পড়তে শুরু করেছে তাকে নিয়ে। লোহার ছাতে আছড়ে পড়ল। ওর দুই ঊরুর উপর পড়ল লোকটা। নতুন করে চমকে গেল রানা। আক্রমণকারী বিশালদেহী লোক, ওজন ওর চেয়ে অন্তত আশি পাউণ্ড বেশি!

কোমরের পিছনে খোঁচা দিচ্ছে ওয়ালথার। ওটা বের করতে পারবে না। রানা বের করতে চাইল হোলস্টারের পিস্তলটা। তবে সবই বুঝতে পেরেছে জঙ্গি, তার প্রকাণ্ড থাবা পড়ল রানার হাতের উপর। ঝট্‌কা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল রানা, শরীর মুচড়ে সরে

যেতে চাইল। তারই ফাঁকে সামনের দিকে চলে গেল চোখ। দ্রুত কাছিয়ে আসছে বিপজ্জনক বাঁক!

লোকটা যেন মস্ত পাহাড়! নড়ছে না!

মরিয়া হয়ে বলল রানা, 'যদি না ছাড়ো, দু'জনই মরব।'

'তা হলে একইসঙ্গে মরছি,' হিসহিস করে বলল জঙ্গি। আনমনে একই কথা বলল উর্দু ভাষায়। তার ডান কনুই আচমকা নামল রানার ঊরুর উপর। পাকিস্তানি সবই বুঝেছে। শত্রুকে উঠতে দেবে না। গেঁথে রেখেছে ছাতের সঙ্গে। ঠিক করেছে, ওপারে যাবে শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে।

বাইন মাছের মত মুচড়ে কাত হতে চাইল রানা। ছিঁড়ে পড়তে চাইল পিঠের পেশি। বামে কাত হতে পেরেই গায়ের সমস্ত জোর ব্যবহার করে ডানহাতি ঘুসি মারল লোকটার চোয়াল লক্ষ্য করে। করোটি ও চোয়াল যেখানে যুক্ত, সেখানে লাগল ঘুসি। বিশ্রী খট্টাস্ আওয়াজে খুলে গেল চোয়ালের জয়েন্ট। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বিহ্বল হলো লোকটা। ঝটকা-ঝটকি শুরু করেছে রানা, সে সঙ্গে লাথি দেয়ার চেষ্টা করছে। ডান হাঁটুর গুঁতো পড়ল লোকটার পিঠে। অজান্তেই গড়িয়ে নেমে গেল পাকিস্তানি। লাফ দিয়ে উঠে বসল রানা, পরক্ষণে ওর ঘুসি নামল আগের সেই খোলা জয়েন্টের উপর। তীব্র ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ব্রেকের হুইল ধরেই বনবন করে ঘোরাতে শুরু করেছে। মাত্র কয়েক পাক ঘুরিয়েছে, তখনই চোক হোল্ডে আটকা পড়ল। গলা পেঁচিয়ে ধরেছে পাকিস্তানিটার রোমশ হাত। হাঁটু ভাঁজ করে ফেলেছে রানা, ছাতে ঠুকে উপরের দিকে তুলতে চাইল দুই পা। পরক্ষণে এক পা রাখল হুইলের উপর, আবারও ঝটকা দিল। খুলে গেল হোল্ড। উল্টো ডিগবাজি দিয়ে পাকিস্তানির পিঠ ডিঙিয়ে চলে এল পিছনে। সামনের লোকটার উচ্চতা কমপক্ষে এক মাথা বেশি। জঙ্গি পাক খেয়ে ঘুরে

দাঁড়াতেই রানার তৃতীয় ঘুসি পড়ল আবার ওর আহত চোয়ালের উপর। এবার মড়াৎ আওয়াজে ভেঙে গেল হাড়।

প্রচণ্ড ব্যথায় পাগল হয়ে উঠেছে জঙ্গি, দু' হাতে ভালুকের মত জড়িয়ে ধরতে চাইল শত্রুকে। প্রায় বসে পড়ে এড়িয়ে গেল রানা, দু' হাতে ঘুসি মারল লোকটার পেটে, পরক্ষণে আবারও ফিরল হুইলের দিকে। বুঝতে পারছে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আরও দুই পাক ঘুরিয়ে দিল হুইল, চাকাগুলোকে চেপে ধরছে উত্তপ্ত ব্রেক।

কোনও শব্দ পেল না রানা, তবে ওর মন জানিয়ে দিল, আবার হামলা আসছে। এবার ঘুরবার আগেই শিরদাঁড়ার কাছে গোঁজা ওয়ালথারটা তুলে নিল, পরক্ষণে ঘুরে দাঁড়াল। ওর ওয়ালথার সহ হাতটা খপ্ করে ধরেই বগলের নীচে নিয়ে গেল জঙ্গি, অপর হাতে কনুইটা ধরে ঠেলা দিল উপর দিকে। রানা টের পেল দুই পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরমুহূর্তে রানার কনুই ছেড়ে নিজের কনুইটা চালাল ওর কাঁধের উপর—ভাঙতে চাইছে কলার বোন। আঘাতটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে এড়াতে চাইল রানা। তবু ব্যথা লাগল, তবে নাজুক ক্ল্যাভিকলে না লেগে আঘাত পড়েছে সকেট জয়েন্টের উপর। হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল বগির ছাতে।

শত্রুকে ব্যথায় মুখ কোঁচকাতে দেখে খুশি হয়ে উঠেছে জঙ্গি, পুরু ঠোঁটের আড়াল থেকে বেরুল হলদেটে দাঁতের কোদাল। লোকটার গ্রিপের ভিতর শিথিল হয়ে গেল রানা, পরমুহূর্তে হাঁটু তুলেই গুঁতো মারল ওর কুঁচকির উপর। সেইসঙ্গে হোলস্টার থেকে ঝটকা দিয়ে তুলে নিল এফএন ফাইভ-সেভেনএন পিস্তল। ওটা আগে থেকেই কক্ করা, ট্রিগার টিপে দিতেই ভারী বুলেট ছোবল দিল লোকটার বুকে। ছিটকে দুই পা পিছাল পাকিস্তানি জঙ্গি, তারপর দড়াম করে পড়ল ছাতের উপর চিত হয়ে।

পুরো ব্রেক আটকে দিতে না দিতেই বাঁক ঘুরতে লাগল

বক্সকার। গতবারের সেই বিপদ আবারও হলো। ডানদিকের চাকা উঠে আসছে ট্র্যাক থেকে। বগি একবার কাত হলে রেললাইন ছিঁড়ে ছিটকে পড়বে, সঙ্গে নেবে সুন্দরীকে। তবে বক্সকারের ভিতর কেউ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে পরিস্থিতি। হঠাৎ ট্র্যাকের উপর নেমে এল চাকাগুলো। বিপুল কাউন্টারওয়েটকে কাজে লাগিয়ে ভারসাম্য রাখছে লিবিয়ানরা।

ব্রেকের হুইল থেকে চোখ তুলে চাইল রানা। একটু আগে যে টিবি পেরিয়ে এসেছে, এইমাত্র তার চূড়া পেরুল টেরোরিস্টদের ট্রেন-ট্রাক। সুন্দরীর ক্যাবের নীচ থেকে বেরুল ধূসর ধোঁয়া। মুহূর্ত পর অটোফায়ারের আওয়াজ শুনল রানা। সুন্দরীর টার্গেটিং কমপিউটারটা টিবির উপর লক করেছে নবী। এতক্ষণ অপেক্ষা করেছে কখন দেখা দেবে মানুষ-শিকারীরা।

ধেয়ে আসা আনআর্মড ভেহিকলের সামনের দিক ছিঁড়তে শুরু করেছে ৭.৬২ এমএম রাউণ্ড। মুহূর্তে উধাও হলো উইণ্ডশিল্ড, হাজার টুকরো কাঁচ ঢুকল ক্যাবের ভিতর। কয়েকটা বুলেট ফুটো করে দিল রেডিয়েটারকে। গ্রিল দিয়ে বেরুনো বাষ্পের তপ্ত মেঘ ঘিরে ফেলল পুরো ট্রাককে। ইঞ্জিন কমপার্টমেন্টে ঢুকল অজস্র বুলেট। ছিঁড়েখুঁড়ে গেল ভঙ্গুর ডিসট্রিবিউটার, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ইঞ্জিন। একটা রাউণ্ড কেটে দিল হাইড্রলিক লাইন, ফলে আর বিস্তৃত রইল না ট্রাক-ট্রেনের লোহার চাকা। ওগুলো এত দ্রুত কাত হলো যে ড্রাইভার কিছুই করতে পারল না। হঠাৎ রেলরোডের টাইয়ের উপর নেমে এল টায়ারগুলো, ঝাঁকি খেয়ে আকাশে উঠল ট্রাকের পিছন দিক। দুই জঙ্গি কার্গোবেড থেকে গিয়ে পড়ল ক্যাবের ছাতে, সেখান থেকে ছিটকে গেল সামনের রেললাইনের উপর। মুহূর্তে ট্রাকের নীচে পিষে গেল তারা।

সামনের সাসপেনশন মড়াৎ করে ভাঙল, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে বাবারে বলে বসে পড়তে চাইল ট্রাক। চারদিকে ছিটকে পড়ল

ব্যালাস্ট পাথর। হঠাৎ গতি থামল গাড়িটার, ওটাকে ঘিরে ফেলল বাষ্প ও ধুলো।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে চেয়ে আছে রানা, ঠিক তখন কানে এল উপত্যকার দূর থেকে ভেসে আসা গম্ভীর গর্জন।

ওটা বোধহয় এয়ার হর্নের হুঙ্কার, ডিজেল-ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের না হয়েই যায় না। রানার ধারণা ছিল এত কম সময়ে ওটা চালুই হবে না। কিন্তু নিজ চোখে দেখল, উঠে এসেছে ওটা ঢিবির উপর, দ্রুত ছুটে আসছে! রেলবেড থেকে পনেরো ফুট উঁচু এক-চোখওয়ালা ভয়ঙ্কর দানব। ইঞ্জিনটার ওজন হবে এক শ' টনের অনেক বেশি। এগযস্ট থেকে বেরুনো তেলতেলে কালো ধোঁয়া বলছে, মোটেই মেইনটেন্যান্সের জন্য সময় দেয়া হয় না। তবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ওই দানবীয় রেলইঞ্জিন বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে সুন্দরী বা বক্সকারের।

ট্রেন-ট্রাকের কার্গোবেডে যারা ছিল, তাদের ভিতর কয়েকজন ভাগ্যবান, লোকোমোটিভ ছুটে আসবার আগেই লাফিয়ে নেমে পালাতে লাগল তারা। ধসে পড়া ট্রাকে প্রচণ্ড গুঁতো দিল রেলইঞ্জিন, যেন বিস্ফোরিত হলো ট্রাকে রাখা বোমা, সব চুরমার হতে লাগল। ধাতব পাত, ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ এবং চেসিস্ ছিটকে সরে গেল। কিছুই হলো না রেলইঞ্জিনের, যেন পাখির পালক সরিয়ে দিল। ট্রাকের চেপ্টে যাওয়া গ্যাস ট্যাঙ্ক থেকে ভলকে বেরুল কমলা আগুন, তার ভিতর দিয়ে ছুটে এল লোকোমোটিভ।

আগুন পিছনে ফেলে আসছে। ভাঙারির মাল মনে হলো ভাঙাচোরা ট্রাক-ট্রেইনকে। এক ধাক্কায় সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

দানবটাকে এক পলক দেখে নিয়ে ব্রেকের হুইল খুলতে শুরু করল রানা। সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক থাকুক বা না থাকুক, মূল কথা: ওদেরকে লেজ তুলে পালাতে হবে, নইলে বাঁচবে না একজনও!

সুন্দরীর পাশ থেকে ছিটকে বেরুল সাদা আলোর বর্শা, দেখা

গেল আগুনের মস্ত লেজ নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে মিসাইল। শেষ রকেট ফায়ার করেছে নবী। শ্বাস আটকে ফেলল রানা। লোকোমোটিভের দিকে ছুটছে ক্ষেপণাস্ত্র। কয়েক সেকেণ্ডে গন্তব্যে পৌঁছে গেল রকেট। ট্রাক ও রেলইঞ্জিনের সংঘর্ষের সময় যে বিস্ফোরণ হয়েছে, তার শতগুণ আলো চারদিকে ছিটকাল। রেলইঞ্জিনকে গিলে ফেলল প্রকাণ্ড আগুনের কুণ্ডুলি। চারপাশ কেঁপে উঠল বিস্ফোরণের আওয়াজে। দূর থেকে মনে হলো একটা উল্কা ওটা, রেললাইন ধরে ছুটে আসছে। গনগনে আগুন ও পাক খাওয়া ধোঁয়া চাটছে ওটার শরীর।

নিজ কাজ করেছে মিসাইল, কিন্তু মোটেই পাত্তা দিল না দুই লাখ পাউণ্ডের দৈত্যটা। রেলইঞ্জিন যেন ছুটন্ত যুদ্ধরত সামরিক ট্যাঙ্ক, এবং ওটার দিকে ছোঁড়া হচ্ছে গুলতির মার্বেল! সুন্দরীর দিকে হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসছে লোকোমোটিভ, যেন এক গ্রাসে গিলে নেবে!

রানাদের ছোট্ট কারাভাঁ আবারও গতি ফিরে পাচ্ছে। তবে ডিজেল-ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের চেয়ে ওদের স্পিড ঢের কম। দ্বিগুণ গতি তুলে আসছে লোকোমোটিভ। সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক মুহূর্তে রানার মন চাইল, লাফিয়ে নেমে যায়। কিন্তু চিন্তাটাকে মনের ভিতর ডানা মেলতে দিল না। সঙ্গীদের ফেলে কখনও পালাবে না ও।

সুন্দরীর ষাট গজ পিছনে তেড়ে আসছে রেলইঞ্জিন, এখন আর গা চাটছে না লেলিহান আগুন। ইঞ্জিন কাভারের নীচের দিকে পুড়ে যাওয়া একটা গর্ত, জ্বলে গেছে রং। ওই অংশ না দেখলে কেউ বুঝবে না ওখানে আঘাত হেনেছে চার পাউণ্ডের সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল।

তবে রানার দেখবার কথা নয়, লোকোমোটিভের নীচে কী ঘটছে। ওখানে স্টিলের ফ্রেমের সঙ্গে আটকানো হুইল ট্রাক।

সেখানে সরাসরি মিসাইলের ওয়ারহেডের প্লাজমা লেগেছে মাউণ্টিং পিনগুলোর উপর। পুরনো রেললাইনের উপর আরেকবার ঝাঁকি খেল লোকোমোটিভ, আর তারপরই খসে পড়ল পিনগুলো। সামনের চারটে হুইল একইসঙ্গে ডিরেইল হলো। লোহার চাকা ছিন্নভিন্ন করল পুরু গুঁড়ির টাইগুলোকে। চড়চড় করে উপড়ে এল ট্র্যাকের তিরিশ ফুট লাইন।

সামনে রেললাইন নেই যে ইঞ্জিনটাকে আটকে রাখবে, পুরো পাগল হয়ে উঠল লোকোমোটিভ। কয়েক ফুট গিয়েই স্লো মোশনে কাত হতে লাগল। দড়াম করে পড়ল ডানদিকে, ছেঁচড়ে চলেছে। চারদিকে ছিটকে উঠল ব্যালাস্ট পাথর, উপড়ে গেল কয়েক ডজন টাই। মাটি-পাথরের সাধ্য নেই ভারী জিনিসকে থামিয়ে দেবে। লোকোমোটিভের মৃত্যু ঘনিয়ে এলেও গতি এখনও প্রচণ্ড, সুন্দরীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানো যাবে না।

সুন্দরীর নাকের সামনে মাত্র বিশ ফুট দূরে রেলইঞ্জিন, মোটেই কমেনি গতি। রানার মনে হলো, নিশাত মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে অ্যাক্সেলারেটার, মনে আশা, যদি সবাইকে রক্ষা করা যায়! এখনও বাঁক ঘুরছে সুন্দরী ও বক্সকার। ট্র্যাক স্পর্শ করে ছুটছে, তবে যে-কোনও সময়ে পাহাড়ি বাঁক থেকে ছিটকে পড়বে।

সামনে নির্ধারিত ট্র্যাক নেই, তারপরেও সরাসরি ওদের দিকে ছুটে আসছে লোকোমোটিভ। বিপুল ওজন ও গতি তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তারপর সুন্দরীর মাত্র এক ফুট সামনে দিয়ে ট্র্যাক পেরিয়ে ছেঁচড়ে চলে গেল রেলইঞ্জিন খাড়া উপত্যকার কিনারায়। ওখানে কোনও গার্ডরেইল নেই, থাকলেও উড়ে যেত ধাক্কা খেয়ে। লোকোমোটিভের নাক নীচের দিকে তাক হলো, তারপর শুরু হলো গভীর খাড়াইয়ে পতন। সঙ্গে চলল বৃষ্টির ফোঁটার মত অজস্র পাথর। খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে ডিগবাজি খেতে শুরু

করল লোকোমোটিভ।

সুন্দরীর ক্যাব থেকে নীচের দিক দেখতে পেল না নিশাত ও নবী, তবে বক্সকারের ছাত থেকে সবই দেখছে রানা। কাজেই ব্রেকের হুইল আটকাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। পাহাড়ি ঢালে গড়িয়ে নামছে লোকোমোটিভ, পতনের গতি আরও বাড়ছে। হঠাৎ ফেটে গেল ওটার প্রকাণ্ড পেটটা, জ্বলে উঠল ফিউয়েল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। চারপাশে উড়ছে প্রচুর ধুলো, দেখা গেল না ইঞ্জিনের শেষ পরিণতি। তবে পাথুরে উপত্যকার উপর আছড়ে পড়ার বিকট আওয়াজ শোনা গেল পরিষ্কার।

ডানদিকের চাকাগুলোর উপর ভরসা করে বাঁক নিল বক্সকার। রানার মনে হলো, বগি আর কোনওদিন সোজা হবে না। তবে অ্যান্টিক বক্সকার নিরাপদে বাঁক শেষ করল, বামদিকের চাকাগুলো আবারও বসে গেল ট্র্যাকের উপর। ব্রেক হুইলে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল রানা, হতক্লান্ত।

ওর মনে পড়ল, মাত্র মাইল দশেক গেলেই পৌঁছবে কোলিং স্টেশন ও ডকে। ওখানে ওদের জন্য মার্ভেলকে নিয়ে অপেক্ষা করছে সোহেল।

আরেকটা কথা ভাবতেই ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। কোথায় গেল এমআই-৮ কপ্টার? বয়স্কা মহিলাকে উদ্ধার করবার আগে শুনেছে রোটরের আওয়াজ। তা হলে? ওটা নিয়ে এল না কেন জঙ্গিরা? অ্যাসল্টের জন্য স্থির প্ল্যাটফর্ম নয় কোনও কপ্টার, তবে ওদেরকে ধরতে যে চেষ্টা করেছে জঙ্গিরা, তাতে এমআই-৮ নিয়ে হামলা করাই স্বাভাবিক ছিল।

পরের পাঁচ মিনিট একের পর এক মসৃণ বাঁক পেরুল ওরা। মাত্র একবার ব্রেক করতে হলো। বিশ্রামের ফাঁকে কমিউনিকেশন নেটে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল রানা। বড় একটা বাঁক ঘুরছে সুন্দরী ও বক্সকার, ওপাশ দেখা গেল না।

কিন্তু মোড় ঘুরতেই চমকে গেল রানা। হৃৎপিণ্ডের ভিতর হিমশীতল হয়ে এল রক্ত।

এতক্ষণ পাহাড়ি পথে চলেছে রেললাইন, কিন্তু সামনে বুনো-পশ্চিমের রেল-সেতুর মত একটা। যেন প্রাচীন আমলের কাঠের রোলার কোস্টার। অসংখ্য বিম দিয়ে তৈরি জটিল আকৃতি। এতই পুরনো, রোদে ও বাতাসে সাদাটে হয়ে গেছে কাঠ। উপত্যকার বহু নীচে মেঝে, কমপক্ষে এক শ' ফুট উপরে সেতু। তার মুখের কাছেই একপাশে নেমে বসে আছে এমআই-৮, এখনও সামান্য ঘুরছে রোটর।

রানা দেখল, সেতুর ফ্রেমওঅর্কে উঠেছে কয়েক জঙ্গি। বুঝতে দেরি হলো না, এরা বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে সেতু।

নয়

জঙ্গি ক্যাম্পের কমাণ্ডার রহমত শরীফুল্লাহ্ অনেকক্ষণ ধরে ডায়াল করছে। এইমাত্র ওই প্রান্তে পাওয়া গেল সেল ফোনের সংযোগ। শরীফুল্লাহ্ জানে না ভয় পেতে হবে, না খুশি হওয়া উচিত।

'শুনছি,' রাগী অশুভ কণ্ঠ বলল। যেন গভীর কোনও কূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে শব্দটা। গলার আওয়াজ এমনই, যে-কোনও মানুষের বুক কেঁপে উঠবে।

নিজের নাম বলবার প্রয়োজন নেই রহমত শরীফুল্লাহ্‌র। মাত্র কয়েকজন লোক যোগাযোগ করতে পারে ওই স্যাটালাইট ফোনে। কলটা যে ধরেছে সে জানে ও কে, আর ও-ও ভাল করেই জানে

ওই ভয়ঙ্কর গলার আওয়াজটা কার। ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'উনি ব্যস্ত। আমাকে বলো।'

শরীফুল্লাহ্‌র ভাবতেই খারাপ লাগে এই যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছে ঘৃণিত ইজরায়েলিরা। তবে এটা ঠিক, এর উপকারিতার কোনও শেষ নেই। মুহূর্তে পৌঁছে যাওয়া যায় কাছে-দূরে যে-কোনও জায়গায়। তা ছাড়া এক শ' ভাগ সিকিউর। ও-প্রান্তে আবছা আওয়াজ শুনছে। জাহাজের ভেঁপু বেজে উঠল, সঙ্গে বয়ার ঘণ্টির ধাতব ঠনাঠন আওয়াজ। ভুরু কুঁচকে ভাবল, কোথায় লোকটা? নীরবে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল শরীফুল্লাহ্‌, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। ইমামকে বলবেন বন্দিরা পালিয়ে যাচ্ছে।'

'কীভাবে?'

'মনে হচ্ছে প্রহরীদেরকে কোনভাবে কাবু করে উঠে পড়েছে একটা বক্সকারে। চুরি করা ছোট একটা ট্রাক ওটাকে রেললাইনের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।' ওদিক থেকে কোনও কথা নেই। শরীফুল্লাহ্‌ আবার শুরু করল, 'কয়লার খনিতে ওদেরকে ঠেকানো যায়নি। আমাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে কয়েকজন ভাই যায়। কিন্তু তারাও ঠেকাতে পারেনি ওদেরকে। শেষে হেলিকপ্টারে করে কয়েকজনকে পাঠিয়েছি। তারা কাঠের সেতু উড়িয়ে দেবে। আর পালাতে পারবে না বন্দিরা।'

শরীফুল্লাহ সশব্দে ঢোক গিলল। একটু থেমে আবার শুরু করল, 'আমি... ভাবছি... এখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে কোনও লাভ নেই। আমেরিকান আর্কিওলজিস্ট জানিয়েছে আদি ইউনুস আল-কবিরের গোপন আস্তানা এই উপত্যকায় ছিল না, দক্ষিণে থাকবার কথা 'কালো কিন্তু জ্বলে' এমন পাহাড়। আল-কবিরের রণতরী ছিল তিউনিশিয়ার একটা নদীতে। ওখানে লোক পাঠানো হয়েছে, যে-কোনও সময়ে পেয়ে যাবে জাহাজটাকে।'

ওপাশ থেকে নীরবতা। ঠং-ঠং করছে বয়া, মাঝে মাঝে আসছে এয়ার হর্নের আওয়াজ।

'আপনি এখন কোথায়?' অধৈর্য হয়ে বলল শরীফুল্লাহ্।

'এ নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। বলতে থাকো।'

'এখন তো আমাদেরকে নতুন করে খনি চালু করতে হচ্ছে না। জানাই হয়ে গেছে এই খনির ভিতর নেই জাহাজটা। তাই মনে হয়েছে সেতু উড়িয়ে দিলেও ক্ষতি নেই। তাতে সব দিক থেকে ভাল হবে। আমরা বন্দিদেরকেও শেষ করতে পারব, আবার এখানকার ক্যাম্পও গুটিয়ে নিতে পারব।'

'আমাদের এলিট ফোর্সের কতজন আছে ক্যাম্পে?'

জবাব দিতে দেরি করল না শরীফুল্লাহ্, 'পঞ্চাশজনের মত।'

'বন্দিদেরকে খতম করার মত সামান্য কাজে এলিট ফোর্সকে কাজে লাগাবে না। ওই কাজ করতে সাধারণ ভাইদের পাঠাও। ওদেরকে জানিয়ে দাও: যদি শহীদ হয়, তাদেরকে ভাবতে হবে না, আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহ করবেন জান্নাতে। স্বয়ং ইমাম এ কথা বলেছেন।'

কথা শুনে দমে গেল শরীফুল্লাহ্। আগেই ক্র্যাক ট্রুপ পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন সময় নেই যে তাদেরকে সরিয়ে আনবে। বদলে জানতে চাইল সে, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কী ব্যবস্থা?'

'আধ ঘণ্টার ভিতর তোমার ওখানে পৌঁছে যাবে কপ্টারগুলো। তার একটা সরিয়ে নেবে মহিলাকে। এখন মূল কাজ বন্দিদেরকে শেষ করা। তোমার নিশ্চিত হতে হবে আমাদের এলিট ফোর্স যেন ঠিকঠাক মত পৌঁছে ত্রিপোলিতে। মিটিঙে অনেক সিকিউরিটি পারসোনেল থাকবে, তাদেরকে শেষ করে ঢুকতে হবে মেইন হলে। একবার ভিতরে ঢুকতে পারলে সমস্যা হবে না, সরকারী অফিসারদের কাছে অস্ত্র থাকবে না। ওখানে বিধর্মীদের নাপাকী রক্ত ঝরবে, শেষ হবে শান্তি মহাসম্মেলনের নামে কাফেরদের

সঙ্গে মাখামাখি। শেষ হয়ে আসছে মুয়াম্মার গাদ্দাফির সময়। কিছু দিনের ভিতর দেশের ক্ষমতা নিয়ে নেব আমরা।'

আগে কখনও এই লোককে এত কথা বলতে শোনেনি রহমত শরীফুল্লাহ্। তার মনে হলো, মানুষটা হয়তো সত্যিই আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা, ইমাম ইউনুস আল-কবিরের সত্যিকারের অনুসারী। শরীফুল্লাহ্ কখনও স্বীকার করবে না, তবে বারবার তার মনে হয়েছে ইমামের ভিতর রয়েছে চরম ফ্যানাটিসিজম।

যেসব ছেলেদের সে রিক্রুট করে, তারা অনেক কথাই বলে। ওদের বেশিরভাগ এসেছে বস্তি থেকে। তবে রিক্রুটদের ভিতর ধনী লোকের ছেলে যে নেই, তা-ও নয়। এরা সবাই ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে ইসলামের শত্রুদেরকে, এসবের মাধ্যমে বাড়িয়ে নিতে চায় নিজ মনোবল। একে অপরকে সাহস দেয়। অনেক বছর আগে নিজেও লেবানিজ সিভিল ওয়ারে শরীফুল্লাহ্ তা-ই করত। তবে স্বীকার না করলেও নিজের অন্তরে প্রত্যেকে জানে বিধর্মীদের অত্যাচার করা একটা বাহানা, তাদের ঘৃণা করার মাধ্যমে আরও অনুগত হতে চায় ইসলাম ধর্মের প্রতি। কিন্তু শেষে, বেশিরভাগই হয়ে যায় পাথরের মত। পরে আর ভালুভাবে পিস্তলও ধরতে পারে না। বাধ্য হয়ে ওদেরকে নকল ভেস্ট পরিয়ে পাঠাতে হয় সুইসাইডাল মিশনে। তখন এসব গাধা নিশ্চিন্ত থাকে, আর সবার যা হয় হোক, আমার কিচ্ছু হবে না।

তবে ফোন লাইনের ওই প্রান্তে যে লোক, সে অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি। শরীফুল্লাহ্ জানে, ওই লোক দিনের পর দিন তলোয়ার দিয়ে কতল করেছে বিধর্মীদেরকে। চেচনিয়ার দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ে রাশান সৈনিকদের জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। বাগদাদে আমেরিকান সৈনিদের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে তার দিয়ে গেঁথে দিয়েছে। আপন ভাতিজাকে পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছে। ষোলো বছরের ছেলেটা ছিল অটিস্টিক। দুই বছরের বাচ্চার মত

মগজ ছিল, দশটা ভুট্টার দানার সঙ্গে একটা পাথর দিলে তফাৎ ধরতে পারত না। ছেলেটাকে পাঠানো হয় বসরা শহরের সুন্নী লণ্ড্রোম্যাটে। বুকে-পেটে বেঁধে দেয়া হয় চল্লিশ পাউণ্ড বিস্ফোরক ও থলি ভরা পেরেক। উদ্দেশ্য ছিল শিয়া ও সুন্নীদের ভিতর বিরোধ তৈরি করা। ওই বিস্ফোরণে মারা যায় পঁয়তাল্লিশজন মহিলা ও তরুণী। এর ফলে যে রায়ট হয় তাতে মারা পড়ে শ' দুয়েক লোক।

রহমত শরীফুল্লাহ্ জানে নিজ দায়িত্ব পালন করবে ও, এবং তা নিজের জন্য নয়, শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্র জন্য। ইমামের কাছের মানুষের কাছেই শুনেছে, ইমাম ইউনুস আল-কবিরের দেহরক্ষী শুধু আনন্দের জন্য মানুষ খুন করে। এটা ইমামের সংগঠনে গোপন তথ্য নয় যে ওই লোক নিজে কখনও ধর্মের বিধান মেনে চলে না। মুসলিম পরিবারে জন্ম বটে, তবে কখনও প্রার্থনা করে না। কোনও ধর্ম বিশ্বাস করে না সে। কেউ শোনেনি যে কোনদিন রোজা রেখেছে। নিষিদ্ধ সব কিছুই খায়।

কেউ জানে না কেন ইমাম এই অধার্মিককে কাছে রেখেছেন। শরীফুল্লাহ্র মত সিনিয়র কমাণ্ডাররা নিজেদের ভিতর এ নিয়ে আলাপ করে। তবে সেসব কথা কখনও ইমামের কানে পৌঁছে না। কিছুদিন আগে চার কমাণ্ডার ইমামের দেহরক্ষীর বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। তাদের জিভ ও নাক কেটে নেয়া হয়। উপড়ে নেয়া হয় চোখ ও নখ। পেরেক দিয়ে ফুটো করা হয় কানের পর্দা।

এরপর সবাই বোঝে কী করা যায়, এবং কী করা যায় না। কারও সাহস নেই ইমামের পিছনে কথা বলবে। আর বলেই বা কী হবে?

শরীফুল্লাহ্ টের পেল কথার জবাব দিতে হবে, সুতরাং দ্রুত বক্তব্য শেষ করল, 'ইমামের ইচ্ছা-পূরণ হবে, আল্লাহ্ তাঁর ভাল করুন।'

ততক্ষণে কেটে গেছে লাইন।

'স্বর্ণা, উঠে এসো বক্সকারের ছাতে,' রেডিওতে নির্দেশ দিল রানা। 'সঙ্গে আনবে এম৬০। যেন গুলির অভাব না হয়। নবী, বক্সকার থেকে সুন্দরীকে আলাদা করতে হবে।'

'জী?' বলল নবী। 'কেন, মাসুদ ভাই?'

'কারণ, পিছন ফিরে দ্রুত দৌড়ানো যায় না।'

ট্যাকটিকাল নেটে এল নিশাত। 'স্যর, আমরা তো ভেবেছি গতি কমানোই মূল সমস্যা।'

'সে যুগ শেষ। এবার সত্যিকারের গতি লাগবে।'

আধ মিনিট পর ছাতে উঠে এল স্বর্ণা, সঙ্গে এনেছে সুন্দরীর ক্যাবের উপর রাখা মেশিনগান। ধপ্ করে ছাতের উপর রাখল। লেফটেন্যান্টকে সাহায্য করতে এগুলো রানা। অ্যামিউনিশনের বেল্ট নিয়ে স্বর্ণার পিছনে এল স্মৃতি। মালার মত গলা থেকে ঝুলছে বুলেটের ফিতা। দুই হাতে আরও দুই বাক্স গুলি।

বুলেটের বেল্ট ও বাক্স নিল রানা, মৃদু হাসল। 'ফেদোরা হ্যাট আদায় করতে ব্যস্ত?'

শুকনো হাসি দিল স্মৃতি। ভাবছে, সবুর রহমান সাহায্য না করলে বক্সকারে উঠতেই পারত না ওরা। মানুষটা আবারও ফিরে গেছে ট্রাকে। আগে কখনও এত সাহসী মানুষ দেখেনি স্মৃতি। আনমনে মাথা নাড়ল। না, দেখেছে। ক্যাম্পে এবং মরুভূমিতে। তার নাম মাসুদ রানা।

প্রথমবারের মত কাঠের সেতুর উপর চোখ পড়ল স্বর্ণার, সঙ্গে সঙ্গে বুঝল কেন মাসুদ ভাই ভারী ফায়ারপাওয়ার চেয়েছেন। বক্সকারের সামনের দিকে চলে গেল স্বর্ণা। ছাতের শেষ মাথায় নামিয়ে রাখল এম৬০-র গোদা পায়ের বাইপড, শুয়ে পড়ল তার পিছনে। পাশ থেকে মেশিনগানে প্রথম বেল্ট পরিয়ে দেবে রানা।

কাছেই দাঁড়িয়ে পড়েছে স্মৃতি, দ্বিতীয় এক শ' রাউণ্ডের বেল্ট নিয়ে তৈরি। হাতের কাছে রাখা হয়েছে বুলেটের বাক্স। এম৬০ লোড করল রানা, খটাং করে আটকে দিল রিসিভার। বোল্টে জোর টান দিল স্বর্ণা, তৈরি হয়ে গেল মেশিনগান।

অস্ত্রের আওতার প্রায় বাইরে কাঠের সেতু। তবে দু' চারটে বুলেট আঘাত হানলে টেরোরিস্টরা ভয় পাবে। নেমেও পড়তে পারে ট্রেস্‌ল্‌ থেকে। তারা যদি কাভার নেয়, মার্ভেল টিমের ওরা বাড়তি সময় পাবে।

গুলিবর্ষণ শুরু করল স্বর্ণা। থরথর করে কাঁপছে দেহ। মনে হলো বিদ্যুৎ-বাহী তার ধরে ফেলেছে। মাযল থেকে এক ফুট দূর পর্যন্ত ছিটকে বেরুচ্ছে লাল আগুন। বহু দূরে চলে যাওয়া ট্রেসার বুলেটের দিকে চাইল স্বর্ণা, উঁচু করে নিল ব্যারেল, তারপর দেখল ফসফরাস টিপ্‌ড্‌ রাউণ্ড গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে। এত দূর থেকে রানা দেখল সাদাটে কাঠের উপর বুলেটগুলো ধুলোর বিস্ফোরণ তুলছে। প্রথম বেল্টের চার ভাগের তিন ভাগ শেষ হওয়া পর্যন্ত জঙ্গিরা টেরই পেল না কী ঘটছে। রেলবেডের কাজে ব্যস্ত ছিল, কারও গায়ে গুলি লাগেনি। কিন্তু কাছ দিয়ে গুলি যেতে ভয় পেল সবাই, ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটল চারদিকে, আড়াল নিল ক্রস্‌ বিমের জঙ্গলের ভিতর।

নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে গুলি করছে স্বর্ণা। চাইছে না অতি উত্তপ্ত হোক ব্যারেল। জঙ্গিদেরকে নিজ নিজ আড়ালে আটকে রাখছে। কপালের জোরে একটা বুলেট লাগল এক জঙ্গির গায়ে, জটিল ট্রেস্‌ল্‌ থেকে টুপ করে খসে নীরবে নীচের দিকে রওনা হলো সে। কোনও আওয়াজ নেই, পড়ছে যেন সিনেমার দৃশ্যের মত। নীচের এক বিমের উপর পড়ল, তারপর ডিগবাজি খেয়ে রওনা হলো মাটির দিকে। নিঃশব্দে লাশ স্থির হলো মাটিতে, ভুস্‌ করে ছিটকে উঠল ধুলো, অলস হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কণাগুলো।

.৩০ ক্যালিবারের গুলির আওয়াজ শুনেছে নবী, তবে জানে না কী উপলক্ষে চলছে গুলি। সেফটি স্ট্র্যাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সুন্দরীর পিছনে চলে এল সে। ঝুঁকে পড়ল রিয়ার বাম্পারের উপর, নীচের দিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখল। কয়লা মাখা টাইগুলো পিছিয়ে চলেছে বিদ্যুদ্বেগে।

রওনা হওয়ার আগে বাম্পারে কয়েকবার পেঁচিয়ে দিয়েছে টো লাইন। ওটা গেছে রেলকারের কাপলিঙে। নিশাত এখন বক্সকারের চেয়ে খানিক গতি তুলে সুন্দরীকে পিছিয়ে নিতে চাইছে। ফলে ঢিলা হয়ে গেছে লাইন। বড়সড় বোল্ট কাটার দিয়ে পাকানো ইস্পাতের কেবল কাটতে শুরু করল নবী। কাজটা শেষ হতে না হতেই ছিটকে সরতে হবে। হঠাৎ বক্সকারের গতি বেড়ে গেলে অর্ধেক কাটা তার পটাং করে ছিঁড়বে। কাটা পড়তে পারে দুই হাঁটু।

একটা বাঁক ঘুরছে ওরা। নবী খেয়াল করল, থেমে গেছে এম৬০ মেশিনগান। একটা টিলার কারণে আড়াল হয়েছে লক্ষ্য। গতি বাড়ছে বক্সকারের। টানটান হয়ে উঠল চিকন কেবল। পটাপট ছিঁড়ছে ব্রেইডগুলো।

'আপা, গতি খানিক বাড়ান,' তাড়াহুড়ো করে বলল নবী।

সুন্দরীর ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে দিল নিশাত।

কেবলের টানটান ভাব চলে যেতেই আবার কাজে নামল নবী। দুই কবজির সমস্ত জোর ব্যবহার করল।

'নবী, কেবল কাটা হলে সুন্দরীর বেড়ে উঠবে না,' রেডিওতে বলল রানা। 'হাতে সময় নেই। নেমে পড়বে কাপলিঙে।'

আস্তে করে ঢোক গিলল নবী। জানে না জং-ধরা কাপলিং ধরে ঝুলে থাকা ভাল, না মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক করা। বড় করে শ্বাস ফেলে ভাবল, কাপলিংই সই।

'আপা?' বলল রানা। 'নবীর কাজ শেষ হলেই ঘুরিয়ে নেবেন

সুন্দরীকে, তারপর ঠেলতে শুরু করবেন বক্সকারকে।'

নিশাত কিছু বলবার আগেই বলল নবী, 'আমার কাজ শেষ।'

সুন্দরীর ক্যাবের ভিতর ব্রেক প্যাডেলে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল নিশাত। ফুরিয়ে আসা ব্রেক প্যাডের উপর ধুলোর ঝড় তৈরি করল কার্বন। গতি কমতেই স্টিয়ারিং হুইল বনবন করে ঘোরাতে লাগল নিশাত। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েই আবার উঠে এল রেললাইনের উপর। ফাটা চাকা নিয়ে রিমগুলো টাইয়ের উপর উঠতে গিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল গোটা ট্রাক। একদিকে কাত হয়ে গেল সুন্দরী। প্রথম গিয়ার ফেলে লাইনের উপর উঠতে চাইল নিশাত। পিছনে ছিটকাল ব্যালাস্ট গ্র্যাভেলের স্রোত। জোরালো ঠং আওয়াজ তুলে রিমগুলো বসল রেললাইনের উপর। ফ্রেইটকারের দিকে লাফ দিল সুন্দরী। বক্সকারকে ধাওয়া শুরু করল নিশাত।

তীব্র গতি তুলছে সুন্দরী। দু' মিনিট পেরুনোর আগেই রিনফোর্সড বাম্পার ঠেকল বক্সকারের কাপলিঙে। অবাক হলো নিশাত, কাপলিঙের উপর এক পা রেখেছে নবী, অন্য পা রাখল বাম্পারের উপর। ঝুঁকে পড়ে সুন্দরীর সামনের উইঞ্চ থেকে খুলে নিল টো লাইন। সোজা হয়ে কাপলিঙের সঙ্গে ভাল ভাবে পেঁচিয়ে দিল কেবল। দুটো দানব এখন যেন আটকা পড়েছে ওই সরু কেবলের বাঁধনে। নিশাত আগে ভাবেনি ক্যাপ্টেন নবী এতটা দুঃসাহসী মানুষ। নিজে হয়তো এ ধরনের সাহস দেখাতে হলে দুইবার ভাবত ও।

'স্যর,' ডাকল নিশাত। 'আমরা ঘুরে এসে ধাক্কা দিতে শুরু করেছি। নবী ট্রেনের বগির সঙ্গে উইঞ্চ আটকে দিচ্ছে।'

'নবী, তোমার অঙ্ক করা শেষ?' জানতে চাইল রানা। এসে দাঁড়িয়েছে ওয়েপন্স এক্সপার্টের স্বাথার কাছে, ছাতের কিনারায়।

কেবলে দুটো লূপ তৈরি করে উইঞ্চের হুকে আটকে দিল নবী, হেঁটে উঠে পড়ল সুন্দরীর বনেটের উপর। ঘুরে দাঁড়ানোর

আগেই রানার উদ্দেশে বলল, 'জী। আপনার কথা মত অঙ্ক শেষ। বক্সকার কিছুক্ষণ ভাসবে। তবে জানি না পানি কত দ্রুত ডুবিয়ে দেবে ওটাকে।'

'মার্ভেলের ডেরিক ক্রেনটা কাজে লাগাতে হবে সোহেলকে।'

'মাসুদ ভাই, খুব ভাল হয় সাধারণ হুকের বদলে ম্যাগনেটিক গ্র্যাপল ব্যবহার করলে।'

ঠিক বলেছে নবী, ভাবল রানা। ইলেকট্রোম্যাগনেট ব্যবহার করলে ক্রেনের সঙ্গে ফ্রেইটকারকে ঝোলাতে হবে না ক্রুদের। এতে সময় বাঁচবে।

বোধহয় রানার পিছনে সরে গেছে টিলাসারি, আবার গুলি শুরু করল স্বর্ণা। এম৬০-র করডাইটের গন্ধ পেল রানা। তীব্র গতি তুলে ছুটছে বক্সকার। ঘুরে দাঁড়িয়ে চাইল রানা। সেতু এখনও অনেক দূরে, মনে হচ্ছে শখ করে কেউ একটা মডেল তৈরি করেছে। ট্রেস্‌লে বিস্ফোরক বসাতে ব্যস্ত ছিল জঙ্গিরা, সেতুর দিকে ট্রেসার বুলেট শুরু হতেই আবারও লুকিয়ে পড়ল। বক্সকারকে যে গতিতে ঠেলে নিয়ে চলেছে সুন্দরী, কয়েক মুহূর্ত পর সামনে পড়বে আরেকটা বাঁক। আবারও বোমা বসাতে পারবে জঙ্গিরা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। সরাসরি লাইন অভ ফায়ার পাবে না ওরা। ঠেকাতে পারবে না জঙ্গিদেরকে। তবে কিছু করবার নেই। না পারবে ট্রেন থামাতে, না পারবে সেতু পেরুতে। উড়ে যাবে সেতু, মানুষগুলোকে নিয়ে এক শ' ফুট উপর থেকে ছিটকে পড়বে নীচে।

নিশাতকে নির্দেশ দিতে মুখ খুলল রানা। ব্রেক চেপে থামার চেষ্টা করুক। তবে মনের ভিতর জানে, এসবে কোনও কাজই হবে না। এমন সময় হঠাৎ সেতুর ওদিকে নড়াচড়া চোখে পড়ল।

কাঠের বিম ও কলামের ওপাশে ওটা কী?

মার্ভেলের কুচকুচে কালো ম্যাকডোনেল এমডি-৫২০এন কপ্টার সেতুর উপর দিয়ে এল সগর্জনে। পিছনে কোনও রোটর নেই, সে-কাজ করে ডাক্টেড একযস্ট। ট্রেসলের আড়াল নিয়ে আচমকা এসেছেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ, চমকে দিয়েছেন জঙ্গিদেরকে।

রোটর ও ক্যাপ্টেনের হুঙ্কার একই সঙ্গে ইয়ারপিসে শুনতে পেল রানা। তারপর ভারী মেশিনগানের শব্দে চাপা পড়ে গেল আওয়াজটা। কপ্টারের পিছন-দরজা খোলা, সেখান থেকে গুলি হলো প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। পুরু কাঠের সাঁপোর্টগুলো শত বছর টিকে আছে, মরুভূমির তাপ ওগুলোকে লোহার মত কঠিন করে দিয়েছে। তবে মেশিনগানের অজস্র গুলি খুবলে নিতে চাইল কাঠ। মনে হলো ওখানে সাদা ক্ষত তৈরি হচ্ছে। ছিটকে উঠছে ধুলো এবং বালি। মানবদেহে অবশ্য আরও অনেক বেশি ক্ষতি করল বুলেট।

'ঠিক সময়ে এসেছি, কী বলেন?' শোনা গেল সিরাজের কণ্ঠ। 'নাটকীয় ভাবে আসার জন্য দুঃখিত। গোটা পথে হাওয়ার সহায়তা পেয়েছি।'

'ওদেরকে আটকে রাখুন, আমরা আসছি,' বলল রানা। 'সেতু পেরুলে পিছু নেবেন। কাভার দেবেন ডক পর্যন্ত।' ফ্রিকোয়েন্সি বদলে নিল রানা। 'সোহেল?'

'কী খবর তোদের?' ভঙ্গি থেকে মনে হলো কিছুতে কিছু যায় আসে না সোহেলের। যেন জানেই না দুশ্চিন্তা কাকে বলে।

'তোর ইটিএ কখন?' জানতে চাইল রানা।

'তোরা ডকে পৌঁছবার দু' মিনিট আগে পৌঁছুব। সামনে পাবি ভাসমান পিয়ার। এখন যে গতি তুলে আসছিস, রেল বাম্পার পেরুলে বক্সকারের সবাই মারা পড়বে।'

'তো কী করতে বলিস? তোর প্ল্যান কী?'

'সব সামলে নেব, ভাবিস না।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। বন্ধুর উপর পূর্ণ আস্থা আছে। এখন সময় নেই যে বিস্তারিত কিছু জিজ্ঞেস করবে। যে-কোনও সময়ে শুরু হবে গোলাগুলি।

তীব্র গতি তুলে বাঁক ঘুরছে ওরা। যেসব ইঞ্জিনিয়ার এই পথ তৈরি করেছে, তারা টিলার পাশে সরু খাদ খুঁড়ে নিয়ে গেছে রেললাইনটা। ফ্রেইটকার ছুটবার সময় দু' দিকে বাড়তি জায়গা থাকছে না বললেই চলে। রানার ধারণা এই বাঁকে মস্ত লোকোমোটিভ নেবার সময় শামুকের গতি তুলত ড্রাইভার। দু' পাশে থাকছে মাত্র এক বিঘত জায়গা। দু' দিক থেকে ছিটকে পিছিয়ে চলেছে এবড়োখেবড়ো পাথরের দেয়াল।

সংকীর্ণতা রক্ষা করল সবাইকে।

বক্সকারের বামদিকের চাকাগুলো উঠে গেল ট্র্যাক থেকে। পাথরের দেয়ালকে ঘষে নিয়ে চলেছে বগির ডানদিকের উপরের অংশ, তৈরি করছে গভীর খাঁজ। ছাতে বৃষ্টির মত তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরো পড়ছে, একেকটা কাঁচের মত ধারালো। ওদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে আবার লাইনে বসল বামদিকের চাকা। তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর প্রচণ্ড সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স আবারও তুলে নিল চাকা। বগির ডানদিকের উপর অংশটা চেঁছে তুলছে পাথরের দেয়ালকে। আগেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রানা। ওর পিঠ রইল দেয়ালের দিকে। ছিটকে এসে পড়ছে পাথরের টুকরো।

'স্যর?' বলল নিশাত।

ওই কণ্ঠে আগে কখনও এই সুর শোনেনি রানা। ভয় পেয়েছে ক্যাপ্টেন নিশাত!

'ভুলেও গতি কমাবেন না!' সাবধান করল রানা। নীচ থেকে ভেসে আসছে যাত্রীদের ভীত চিৎকার। খোলা ছাতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে, মানুষগুলোর কেমন লাগতে পারে। ঘুটঘুটে

অন্ধকারে জানে না কী ঘটতে চলেছে!

আরও দু'বার পাথরের দেয়ালে ঘষা দিল বক্সকার, তারপর বেরিয়ে এল খোলা আকাশের নীচে। চাকাগুলো ঠিক ভাবে বসে গেছে ট্র্যাকের উপর। শেষ বাঁক পেরিয়ে এসেছে ওরা, এখুনি সামনে পড়বে সেতু। সোজা একটা অগভীর সরু খালের ভিতর দিয়ে গেছে পথ, তারপর শুরু হবে ট্রেস্‌ল্‌। সেতুর ওপাশে কেউ আছে, রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে বিনকিউলারের কাঁচ। দূরের ওই লোকের ভাবনা আঁচ করছে রানা: কয়েক সেকেণ্ড পর নির্দেশ দিতে হবে। যারা সেতুর উপর বোমা বসিয়েছে, এখন ট্রেস্‌ল্‌ ধরে ছুটতে শুরু করেছে। কেউ এমডি-৫৪০-র গুলি পাত্তা দিচ্ছে না।

বক্সকারের সামনে চলে গেল রানা। এম৬০-র পিছনে শুয়ে আছে স্বর্ণা ও স্মৃতি।

এমন কোনও অ্যাঙ্গেল নেই যে জঙ্গিদের দিকে গুলি করবে। তবে লোকগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন ক্যাপ্টেন সিরাজ।

'আমাদের আর কিছু করার নেই,' বলল স্মৃতি।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। কানের পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ বইছে বাতাস, মনে হচ্ছে ছাত থেকে উড়িয়ে নেবে। ওদের গতিবেগ কমপক্ষে ষাট মাইল। 'সবাই সুন্দরীর ক্যাবে চলো,' বলল রানা। তুলে নিল মেশিনগান, রিসিভার থেকে ঝিকিয়ে উঠছে ব্রাসের শেল।

হামাগুড়ি দিয়ে রানার পিছু নিল স্বর্ণা ও স্মৃতি। দুই মিনিট পেরুনোর আগেই নেমে এল সুন্দরীর ক্যাবের ছাতে। খোলা হ্যাচ দিয়ে ঢুকে পড়ল ক্যাবের ভিতর। সবাই নেমে যাওয়ার পর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল রানা, তীব্র হাওয়ায় সরু হয়ে গেছে চোখ। চেয়ে থাকল ট্র্যাকের দিকে। কপ্টার নাচিয়ে চলেছেন সিরাজ। এড়াতে চাইছেন শত্রুর গুলি। পিছনের দরজার গানারকে চিনতে পারল রানা। জলিল। কপ্টার স্থির হলেই গুলি করছে।

হঠাৎ রেলকারের চাকার আওয়াজ বদলে গেল। সেতুর প্রথম সেকশনে উঠে পড়েছে। ফাঁপা আওয়াজ শুরু হয়েছে। বক্সকারের পাশে চাইল রানা। জমি হারিয়ে গেছে।

আচমকা সেতুর দৈর্ঘ্য ধরে বিস্ফোরণ শুরু হলো। উপত্যকার মেঝের কাছে একটা ট্রেস্‌ল্‌ সাপোর্টে ছিটিয়ে উঠল ধোঁয়া। লাফ দিল কমলা আগুন। যেন ঝটকা দিয়ে রংচঙে ছাতি খুলেছে কেউ। ক্যারের ছাতে শুয়ে পড়ল রানা। আগুন ও ধোঁয়ার ভিতর ঢুকে পড়ল বক্সকার। পরক্ষণে সুন্দরী। বিদ্যুদ্বেগে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। কোনও ক্ষতি হয়নি। শুধু জায়গায় জায়গায় পুড়ে গেছে সুন্দরীর রং।

পিছনে বিস্ফোরণ হওয়ায় সেতুর ফ্রেমওঅর্কের ল্যাটিস দুর্বল হয়েছে। তবে স্বর্ণা ও সিরাজের গুলিবর্ষণে ভাল ভাবে স্ট্রাকচারে রিগিং করতে পারেনি জঙ্গিরা। রানারা মাটিতে বসানো ট্র্যাক ছাড়বার পর দশ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, কিন্তু ধসে পড়ল না সেতু। দীর্ঘ স্প্যান ফুরিয়ে এল। পিছনে চাইল রানা, এইমাত্র খসে পড়তে শুরু করেছে প্রকাণ্ড সেতু। মস্ত সব বিম ও কলাম রওনা হলো দশতলা নীচের মাটির দিকে। উপত্যকা ভরে উঠল ধুলোয়। তারই ভিতর দেখা গেল অপেক্ষমাণ এম-৮ কপ্টার। ওটার দিকে ছুটছে জঙ্গিরা।

ডমিনোর মত খসে পড়ছে সেতু। খোলা পিয়ানোর তারের মত ঝুলে পড়ল স্টিলের রেললাইন। বোধহয় উইং মিররে পিছনে দেখেছে নিশাত। বদলে গেল ট্রাকের ইঞ্জিনের গর্জন। নিশ্চয়ই নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করছে।

অ্যাভালাঞ্চের মত হুড়মুড় করে পড়ছে কাঠ ও লোহা, যেন ধেয়ে আসছে বক্সকারের দিকে। বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল রানা। পিছন থেকে উধাও হয়েছে সেতু। ওর ভয় পাওয়ার কথা, কিন্তু পেল না। কারও হাত নেই ভাগ্যের উপর। মনোযোগ দিয়েই

দেখছে রানা। গতি বেড়ে গেছে সুন্দরীর, আর পিছন থেকে ধেয়ে আসছে ধ্বংস। এক শ' ফুট পিছনে কেঁপে উঠল রেললাইন, তারপর মুহূর্তে হারিয়ে গেল ভলকে ওঠা ধুলোর ঝড়ের ভিতর।

সামনে চাইল রানা। সেতুর কত দূর পর্যন্ত এসেছে ওরা? জানে না। তবে টের পেল, নীচে বসে গেল রেললাইন। দু' পাশ থেকে হু-হু বাতাস পিছিয়ে চলেছে। ফাঁপা আওয়াজ থেমে গেল। আবারও কাঠের টাই শুরু হয়েছে! সেতুর শেষ অংশ পেরিয়ে এসেছে ওরা! এখন আর পিছনে সেতু নেই। সব ভেঙে পড়ছে উপত্যকার উপর। চারপাশে শুধু ধুলো।

'একে বলে দুনিয়ার সেরা ড্রাইভিং, আপা!' খুশি মনে বলল রানা। 'তোমরা ঠিক আছ তো?'

'কারও কোনও সমস্যা নেই, স্যর,' জবাবে বলল নিশাত।

কিন্তু নিশাতের কণ্ঠে কী যেন, খেয়াল করেছে রানা। 'কী হয়েছে, আপা?'

'শেষবার নাইট্রো ব্যবহার করতে গিয়ে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি ট্র্যান্সমিশনের। উইং মিররে দেখলাম রেললাইনের উপর গলগল করে পড়ছে তেল।'

খেয়াল করল রানা, মোটরের গর্জন নেই। গিয়ার নেই, কাজেই ইঞ্জিন চলবে কী করে?

'রায়হান বলেছে সামনের পথ সোজা, কিন্তু' থেমে গেল নিশাত।

'বাকিটা আঁচ করতে দিন, আপা,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই আমাদের ব্রেকও নেই?'

'একটু আছে। মেঝের সঙ্গে টিপে রেখেছি প্যাডেল। এ দিয়ে চলবে, বলুন?'

চুপ থাকল রানা, সামনে চেয়ে দেখল দূরে কম্পমান ফিতার মত সুনীল সাগর। জমির বুক চিরে গেছে রেললাইন। আর

বড়জোর মাইল খানেক যেতে হবে। রায়হানের কথাগুলো মনে পড়ল রানার। ধীরে ধীরে সাগরের দিকে নেমেছে রেললাইন। ওরা যে গতি তুলে চলছে, গন্তব্যে পৌঁছবে। কিন্তু ওদের জন্য কী ব্যবস্থা রেখেছে সোহেল? ওরা থামবে কী করে? আবারও বক্সকারের ছাতে উঠতে হবে। ব্রেক হুইল ব্যবহার করে কমিয়ে আনতে হবে গতি। তবে বক্সকারের ব্রেক প্রায় শেষের পথে।

'সোহেল?' রেডিও করল রানা।

'শুনছি।'

'তোরা কোথায়?'

'পজিশনে। তোদের তুলে নেব।'

'লিবিয়ান কপ্টার স্ট্রাইক টিমের বিষয়ে কিছু জানিস?'

'না। বোধহয় দক্ষিণ থেকে আসবে। আমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। তার চেয়ে বড় কথা, আমাদেরকে দেখবে না।'

'আমাদেরকে ম্যাগনেটে ধরেই গগলকে জানিয়ে দিবি রওনা হতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব আন্তর্জাতিক জলসীমায় ফিরতে চাই।'

'ভাবিস না। আমরা সবকিছুর জন্য তৈরি। সামনের হোল্ডে হাসপাতাল খুলেছে ফারা। ওখানে রয়েছে কট্, ব্ল্যাঙ্কেট ও আইভি ড্রিপ। স্যাঙাতদের নিয়ে ব্যস্ত বাবুর্চি। এদিকে জাহাজের ওয়েপন্স সিস্টেম লক্‌ড ও লোডেড। কেউ চাইলেই মানুষগুলোকে ফেরত নিতে পারবে না।'

'ঠিক আছে। আন্দাজ তিন মিনিট পর আসছি আমরা।'

পাহাড়ি একটা উপত্যকার ভিতর দিয়ে গেছে রেললাইনের শেষ অংশ, মিশেছে গিয়ে সাগর-তীরের ডকে। সুন্দরীর ক্যাবে সিটবেল্ট বেঁধে নিল স্মৃতি, সবুর ও লিবিয়ান ফুয়াদ। বক্সকারের ভিতর মানুষগুলোকে চিৎকার করে সতর্ক করল রানা।

আর কিছু করবার নেই।

পুরনো কোলিং স্টেশনের দালানগুলো জীর্ণ। রয়েছে ধাতব

ফ্রেমওঅর্ক ও কিছু পচা কাঠ। যেসব ক্রেন আগে ফ্রেইটারগুলোতে মাল ভরত, সব বহু আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একটা কয়লার টিলা ছিল, এখন ঢাকা পড়েছে মরুভূমির বালিতে।

মার্ভেল থেমেছে ভাসমান ডকের পাশে। নিজ পজিশনে থেমেছে মেইন কার্গো ডেরিক। পিয়ারের বিশ ফুট উপর ঝুলছে প্রকাণ্ড ইলেকট্রোম্যাগনেট।

জিনিসটা ওরই অনুরোধে আবিষ্কার করেছে ড. শামশের। তবে ওটার দিকে ঘুরেও চাইল না এখন। ওর মন পড়ে আছে অন্যখানে। বক্সকারের গতি এখন কত? জোর করে চোখ সরিয়ে রেখেছে স্পিডোমিটার থেকে। ষাট মাইল তো হবেই। ধারণা করেছিল রেললাইনে কোনও ধরনের ব্যারিয়ার তৈরি করবে সোহেল। কিন্তু, কোথায়, সামনে তেমন কিছু চোখে পড়ছে না।

হঠাৎ রানা বুঝল, পানি থেকে যতটা উপরে থাকার কথা ডকের, ওটা তার চেয়ে নীচে। শেষমাথায় উঠে এসেছে পানি।

হেসে ফেলল রানা।

দ্রুত ছুটছে বক্সকার ও সুন্দরী। রেলবেডের শেষে শুরু হলো পিয়ার। মার্ভেলের গ্যাটলিং গান দিয়ে ইন্টারলক প্লাস্টিকের পডগুলোকে ফুটো করেছে সোহেল। নিজের ওজনে ডুবতে শুরু করেছে পিয়ার। ওটার উপর বক্সকার উঠতেই আরও ডেবে গেল।

বগিকে বাধা দিতে শুরু করেছে পানি। দেখতে না দেখতে মসৃণ ভাবে গতি কমিয়ে দিল সাগরের পানি। একবারের জন্য সুন্দরীর আরোহীদের সিটবেল্ট টানটান হলো না। পিয়ারের তিন ভাগের দুই ভাগ পেরুল সুন্দরী। গতি নেমে এসেছে ষোলো মাইলে। পানি ডুবিয়ে দিয়েছে নষ্ট চাকাগুলোকে।

পিয়ারের শেষ মাথায় পানিতে নামল বক্সকার, শেষ গতিটুকুও হারাল। তবে টান পড়ছে সুন্দরীর কেবলের উপর। কয়েক সেকেণ্ড পানির ভিতর হাবুডুবু খেল বক্সকার, তারপর ওটার উপর

স্থির হলো চুম্বক। ইলেকট্রিসিটি চালু হতেই আটকে গেল বক্সকারের ছাতে। কিছুক্ষণ পর বগির কাপলিং থেকে ঝুলতে লাগল সুন্দরী। আগেই ট্রাক থেকে নেমে পড়েছে সবাই।

রানা জানে ক্রেনের কণ্ট্রোলে আছে কোন্ অপারেটর। হিসাব কষে ট্রেনের সেণ্টার অভ গ্র্যাভিটি খুঁজে বের করেছে সোহেল।

বক্সকার ও সুন্দরীকে তুলে নেয়া হলো মার্ভেলের ডেকে। তখনও ঝরঝর করে ঝরছে পানি। বোট গ্যারাজে উঠেছে সুন্দরীর সবাই। এলিভেটরে চেপে উঠে এল মেইন ডেকে। একজন ক্রু দাঁড়িয়ে আছে অক্সিঅ্যাসেটিলিন টর্চ নিয়ে। সুন্দরী ও বক্সকারের মাঝের কেবল কাটতে শুরু করেছে। দ্রুত পায়ে ডক্টর ফারাকে পাশ কাটাল রানা, টান দিয়ে খুলল বক্সকারের স্লাইডিং দরজা। স্ট্রেচার নিয়ে এসেছে কয়েকজন আর্দালি, অপেক্ষা করছে অসুস্থদের নিতে।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'রোগী পেলে খুশি হয় ডাক্তার। তোমাকে দিয়েছি শত শত। নিশ্চয়ই খুশি হয়েছ, ফারা?'

'সব বিনা পয়সার কাস্টমার।' রানাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ফারা। উঠে পড়ল বক্সকারে, কঙ্কালসার মানুষগুলোকে দেখে চমকে গেল। তাদের সবার চোখ বিস্ফারিত। ভিজে চুপচুপে ন্যাকড়ার মত পোশাক। 'একে একে বেরিয়ে আসুন আপনারা। কেউ অসুস্থ থাকলে শুয়ে থাকুন। আমরা নামিয়ে নেব।'

'আপনারা এখন নিরাপদ,' আরবিতে বলল রানা। 'বেরিয়ে আসুন।'

ওর পাশে থেমেছে ফুয়াদ। একই কথা ক'বার বলতেই মানুষগুলো নামতে লাগল। কয়েকজন সামান্য আহত। পা ভেঙেছে দু'জনের। একজনের কব্জির ভিতর ঢুকেছে বুলেট। এদের নামিয়ে স্ট্রেচারে করে সরিয়ে নেয়া হলো।

ওয়েপন্স এক্সপার্ট নবীকে দেখতে পেল রানা। কাঁধে ঝুলছে

ওয়াটারপ্রুফ ল্যাপটপ কেস। হ্যাচওয়ের দিকে রওনা হয়েছে, ফিরছে নিজ কেবিনে। ওকে এবং রায়হানকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছে ও। দেখা যাক ওরা কী আবিষ্কার করে।

কয়েক ডেক নীচে চালু হয়েছে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন।

'রানা, তোমার কী মনে হয়, এরা কারা?' বগির দরজার কাছ থেকে জানতে চাইল ফারা।

'সবাই লিবিয়ান ফরেন মিনিস্ট্রির অফিসার,' বলল রানা। 'এদের ভিতর রয়েছেন সাবেক মিনিস্টারও।'

'কথাটা বুঝলাম না। কেন এরা বন্দি ছিল?'

'আমার আন্দাজ ঠিক হলে, নতুন ফরেন মিনিস্টার মোহাম্মদ ফতে আলী নিজেই জঙ্গি-নেতা ইউনুস আল-কবির।'

দশ

দক্ষিণে শুধু বিস্তৃত ফাঁকা মরুভূমি। পাথর ও বালির ভিতর কোনও গাছপালা নেই, নেই কোনও শহর বা লোকালয়। মাটি ছুঁয়ে রাগী ভোমরার মত ছুটে চলেছে সবজেটে লিবিয়ান মিলিটারি কপ্টারগুলো। সামনের চারটে রাশার তৈরি যান্ত্রিক ফড়িং, কাদা রঙের ছোপ দিয়ে ক্যামোফ্লেজ্‌ড, অন্যগুলো লিবিয়ান নেভির, ধূসর রঙের।

তিনবছর হলো বিসিআই-এ চাকরি নিয়েছে শাকির হোসেন, কখনও ভাবেনি জঙ্গিদের বেস ক্যাম্পে হামলা করবে লিবিয়ান

হেলিকপ্টার, আর সেই অ্যাসল্ট টিমে যোগ দেবে সে অবজার্ভার হিসেবে। ফরেন মিনিস্টার মোহাম্মদ ফতে আলীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ শেষে সব ব্যবস্থা করেছেন অ্যাম্বাসেডার নাহিদ কামাল। অবাক ব্যাপার, তবে লিবিয়ান সরকার থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। বদলে বাংলাদেশি অ্যাম্বাসেডার জানিয়েছেন, তাঁরা কৃতজ্ঞ রইলেন। এখন দুই সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সবাই জানেন, বাংলাদেশের বিমান আগেই নামানো হয়েছিল মরুভূমিতে। সরিয়ে নেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। আবার আকাশে উঠেছে বিমান। তারপর ক্র্যাশ করানো হয়েছে পাহাড়ের উপর।

এরপর একদল লোক কপ্টার নিয়ে নেমেছে ওই পাহাড়ে। নষ্ট করেছে সব প্রমাণ। বিমান বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে বলা হয়েছে: এরা ঝড়ের মত এসেছে, ধ্বংসস্তূপ তছনছ করেছে। তেমন কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

ত্রিপোলির বাইরে গোপন এক এয়ার বেসে পৌঁছে দেয়া হয়েছে শাকির হোসেনকে। ওখান থেকে রওনা হয়েছে অ্যাসল্ট টিম। স্পেশাল ফোর্সের অপারেশন্স লিডার, কর্নেলের নাম আবু হোসেন। তিনি শাকিরকে জানিয়েছেন, লিবিয়ার মরুভূমিতে রয়েছে শ' খানেক পুরনো ট্রেইনিং বেস। আগে জঙ্গিদেরকে নানা ভাবে সহায়তা দিত লিবিয়ান সরকার। তবে গত কয়েক বছর হলো টেরোরিজমকে দমন করতে চাইছে তারা। নিজেরাই ধ্বংস করে দিয়েছে বেশির ভাগ ক্যাম্প। অবশ্য স্বীকার করেছেন তিনি, এখনও মরুভূমি ও পাহাড়ে রয়েছে কমপক্ষে ডজন খানেক জঙ্গি ক্যাম্প। সেগুলোর ঠিকানা জানে না সরকার।

পাইলটের পাশে ডানদিকের সিটে বসেছেন কর্নেল আবু হোসেন। শাকির ঝাড়া ছ' ফুটি যুবক, বসেছে ককপিটের পিছনে ফোল্ডিং জাম্প সিটে। ইউটিলিটি চপারের পিছন সেকশনে হাতে গোনা কয়েকজন। অ্যাসল্ট ফোর্সের বেশিরভাগ সৈনিক অন্য সব

কপ্টারে।

হেলমেটের বুম মাইকের উপর হাত রাখলেন কর্নেল, হেলান দিয়ে বসলেন সিটে। রোটরের পাখার আওয়াজে চাপা পড়বে কণ্ঠ, কাজেই গলা উঁচিয়ে বললেন, 'আমরা এক মিনিটের ভিতর নামছি।'

একটু থমকে গেল শাকির। 'কী বললেন, কর্নেল? আমার ধারণা ছিল অ্যাসল্ট দেখতে চলেছি!'

'আপনার কথা জানি না, মিস্টার শাকির, তবে এসব জঙ্গিদেরকে দেখে নিতে চাই আমি,' হাসলেন কর্নেল।

'আমিও তাই চাই, কর্নেল, তবে ইউনিফর্মের সঙ্গে আমাকে কোনও অস্ত্র দেয়া হয়নি।'

কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করলের কর্নেল, ওটার নল ধরে বাঁট এগিয়ে দিলেন শাকিরের দিকে। 'মনে রাখবেন, রিপোর্টে আবার লিখবেন না আমি পিস্তল সরবরাহ করেছি।'

ষড়যন্ত্রের হাসি হাসল শাকির, বাটন টিপে বের করে নিল ম্যাগাজিন। নিশ্চিত হতে চাইল ওটা পুরো লোডেড। ম্যাগাজিনের পাশে সরু ফাটল দিয়ে দেখা গেল, বসে আছে পুরো তেরোটা চকচকে ব্রাসের বুলেট। রিসিভারে আবার ম্যাগাজিন ভরে নিল শাকির। ঠিক করেছে, মাটিতে নামবার পর কক করবে পিস্তল।

ককপিটের পিছনে নিচু সিটে বসেছে, উইণ্ডশিল্ড দিয়ে আকাশ দেখতে পেল না। তবে আঁচ করল কপ্টার নেমে এসেছে মাটির কাছে। শক্তিশালী রোটরের দমকা হাওয়া তৈরি করছে ধুলোর ঝড়। আড়াল হয়েছে সব। শাকিরের মনে পড়ল, ইউএনও-র মিশনে আফগানিস্তানে কমব্যাট সিচুয়েশনে পড়েছে। তখন মনের ভিতর ছিল ভয় আর তীব্র উত্তেজনা। কখনও ভুলবে না ওই অনুভূতি।

কপ্টার নেমে পড়েছে মাটিতে। সেফটি বেল্ট খুলে ফেলল

শাকির হোসেন। কর্নেল আবু হোসেনের কাঁধের পিছন থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে চাইল। টেরোরিস্ট ক্যাম্প শ' খানেক গজ দূরে। লোকগুলো কাফিয়ে পেঁচিয়ে নিয়েছে মাথায়, হাতে একে-৪৭, দৌড়ে ছুটে আসছে। অন্যান্য কপ্টার থেকে এখনও কোনও সৈনিককে নামতে দেখল না শাকির।

হারিয়ে গেল ওর উত্তেজনা, বদলে উদ্বেগে শুকিয়ে এল গলা।

কপ্টারের দরজা খুলে ফেলল কর্নেল আবু হোসেন, ঘুরেই নেমে গেল। তাকে আর দেখা গেল না। তারপর কপ্টারের সাইড ডোর ধপ্ করে বাড়ি খেল রোলার স্টপে।

হোল্ডের ভিতর এসে পড়েছে উজ্জ্বল সোনালী রোদ।

শাকির ও কর্নেলের দৃষ্টি আটকে গেল পরস্পরের চোখে। বিসিআই এজেন্টের মনে হলো চিরকাল চেয়ে রয়েছে সে। প্রায় একই সঙ্গে নড়ে উঠল দু'জন। ঝটকা দিয়ে পিস্তল কক করল শাকির, কর্নেলের বুকে তাক করেই ট্রিগার টিপে দিল। জোরালো হৈ-চৈ শুনল। কর্নেলের পিছনে জড় হয়েছে উত্তেজিত জঙ্গিরা। অন্তত এক শ' লোক গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে।

পর পর চারবার ট্রিগার টিপল শাকির, তারপর টের পেল একটাও গুলি হয়নি। ওর মেরুদণ্ডে ঠেকল একটা মাযল। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল শাকির।

হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা কেড়ে নিল লিবিয়ান কর্নেল। 'এটার ফায়ারিং পিন নেই,' বলল আরবি ভাষায়।

জঙ্গিরা হাসছে। প্রশংসার ঝড় উঠল সবার কণ্ঠে।

মৃত্যু-মুখে শাকির হোসেন প্রতিজ্ঞা করল, লড়াই ছাড়া মরতে রাজি নয় সে। পিঠের উপর রাইফেলের মাযল, কিন্তু কপ্টার থেকে লাফিয়ে নামতে চাইল। হাত দুটো চলে গেল কর্নেলের গলা টিপে ধরতে। আর ঠিক তখনই পিছন থেকে একে-৪৭-এর এক পশলা গুলি এল। শাকিরের কিডনি থেকে শুরু করে কাঁধ পর্যন্ত

ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল। কাইনেটিক এনার্জি কর্নেলের পায়ের কাছে ফেলল বিসিআই এজেন্টকে।

মৃত শত্রুর দিকে চেয়ে রইল লিবিয়ান কর্নেল। যোগ্য প্রতিযোগীকে প্রায় অসম্ভব অ্যাম্বুশে হারিয়ে দিয়েছে, বিবেকবান কেউ স্যালিউট জানিয়ে সম্মান জানাত; তবে লাশের মুখে থুতু ফেলল আবু হোসেন, ঘুরে রওনা হয়ে গেল আরেক দিকে।

নির্দিষ্ট তাঁবুর ভিতর পেল সে ক্যাম্পের কমাণ্ডার রহমত শরীফুল্লাহ্‌কে। উষ্ণ আলিঙ্গন করল দুজন। দু' চার কথায় কুশল বিনিময় শেষ করে মূল কথায় চলে এল তারা।

'দোস্ত, খুলে বলো বন্দিরা পালাল কী করে।'

ইউনুস আল-কবিরের জঙ্গি সংগঠনে একই পদে রয়েছে দুই অফিসার। তবে ব্যক্তিত্বের দিক থেকে আবু হোসেন অনেক বেশি দৃঢ়।

'আমরা ওদেরকে শেষ করে দিয়েছি।'

'সব ক'জনকে? ও, হ্যাঁ, শুনেছি ব্রিজ উড়িয়ে দেবে তুমি। তাতে কাজ হয়েছিল?'

'না,' স্বীকার করল শরীফুল্লাহ্‌। 'ওরা ব্রিজ পেরিয়ে যায়। তবে এত দ্রুত ছুটছিল, ডকে পৌঁছে আর থামতে পারেনি। ছিটকে পড়েছে সাগরে।'

'কেউ পড়তে দেখেছে?'

'না। তবে তার পনেরো মিনিট পর আমাদের কপ্টার পৌঁছে। কাউকে পাওয়া যায়নি। চারপাশ খুঁজে দেখা হয়। কেউ নেই। বগি থেকে নামতেও পারেনি। তীর থেকে দুই শ' গজ দূরে ছিল বগি। শুধু ভেসে ছিল ছাতটা। তারপর সবার চোখের সামনে ডুবে গেছে।'

'খুবই ভাল,' বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে দিল আবু হোসেন। 'আল্লাহ্‌ আমাদের ইমামের মঙ্গল করুন। উনি সাবেক ফরেন মিনিস্টারকে

মরতে দেখলে খুব খুশি হতেন। তা যা-ই হোক, উনি খুশি হবেন, সলিল সমাধি হয়েছে ওদের।'

'তারপরও একটা কথা ভেবে মনের ভিতর খচ-খচ করছে,' বলল শরীফুল্লাহ্। 'আমার লোকের কাছ থেকে নিখুঁত বর্ণনা পাইনি। এমন হতে পারে বন্দিরা বাইরে থেকে সাহায্য পেয়েছে।'

'সাহায্য?'

'একটা সাধারণ ট্রাক ওটা। ক্যাবে কয়েকজন লোক ও এক মেয়ে ছিল। এরাই ক্যাম্পে হামলা করে। ওই একই সময়ে পালাতে শুরু করে বন্দিরা।'

'ওরা কারা, কী পরিচয় তাদের?'

'জানি না।'

'তাদের ট্রাক থেকে কিছু আন্দাজ করা যায়নি?'

'ধারণা করছি ওটাও বগির সঙ্গে ডুবে গেছে সাগরে। নিশ্চিত নই আমি। যারা শপথ করে বলছে নিজ চোখে দেখেছে, তাদের বেশির ভাগই নতুন রিক্রুট। হয়তো আমাদের নিজেদের কোনও ট্রাক দেখে ভুল ভাবছে।'

শুকনো হাসল কর্নেল হোসেন। 'হতে পারে। এসব ছোকরা প্রতিটা পাথর বা টিলার আড়ালে মোসাদ এজেন্ট দেখতে পায়।'

'আগামীকালের হামলার পর, গুটিয়ে নেব এই ক্যাম্প। আমাদের পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে সুদানে। যাদেরকে দিয়ে কিছু হবে, তাদেরকে নেয়া হবে। অন্যরা পড়ে থাকবে এখানে—একেকটা গাধা।'

'রিক্রুট নিয়ে আমাদের কখনও সমস্যা হয়নি। সমস্যা যোগ্য লোক পাওয়া।'

'ঠিক বলেছ।'

এক এইড একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে দু' চার কথায় কী যেন বলল শরীফুল্লাহ্। লোকটা চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে

এল অন্য আরেকজনকে নিয়ে। জঙ্গিদের সবার পরনে ছিল ধুলোমাখা ক্যামোফ্লেজড পোশাক ও ঘামে ভেজা কাফিয়ে; কিন্তু নতুন এ লোকের পরনে কালো ইউনিফর্ম। প্যান্টের পায়া গুঁজে নিয়েছে চকচকে বুটের ভিতর। মাথার চুলগুলো সুন্দর করে আঁচড়ানো। শেভ করা গাল। পরিষ্কার বেল্টে হোলস্টার। কাঁধের র‍্যাঙ্ক পিপগুলো সোনার মত জ্বলজ্বল করছে।

প্রায় নষ্ট পুরনো একে-৪৭ রাইফেল দিয়ে ট্রেইনিং দেয়া হয় রিক্রুটদের। সেসব রাইফেলের বয়সের অর্ধেক হয়নি রিক্রুটদের বয়স। তবে এর হাতে চকচকে রাইফেল। রিসিভারে কোনও দাগ নেই। কাঠের বাঁটে নখের আঁচড় পড়েনি।

'তোমার পরিচয়-পত্র?' কড়া গলায় জানতে চাইল আবু হোসেন।

নতুন লোকটা খটাস্ করে রাইফেল ঠুকল মাটিতে। পকেট থেকে বের করল চামড়ার বিলফোল্ড, খুলে দেখাল। সাবধানে পড়ল কর্নেল আবু হোসেন। যে সরকারী অফিস মিলিটারি আইডেন্টিফিকেশন তৈরি করে, সেখান থেকেই এসেছে এটা। ওখানে কাজ করে তাদের এক ধর্মের ভাই। তার রয়েছে এই সংগঠনের প্রতি প্রবল সহানুভূতি। ওরা এসব আইডেন্টিফিকেশন মিলিটারির প্রতিটি পদে ব্যবহার করছে। আর সে-কারণেই আজকের অপারেশনে পাওয়া গেছে মিলিটারি কপ্টার।

আইডির সঙ্গে রয়েছে আগামীকালের শান্তি মহাসম্মেলনের অথোরাইজেশন পাস। যে অফিস সত্যি সত্যি এসব ইশ্যু করে, সেখান থেকে এই জিনিস মিলত না। কাজেই এই ক্যাম্পেই তৈরি করা হয়েছে পাস। আর্মির ভিতর যারা আবু হোসেনের বন্ধু, তারা বিশাল ওই কনফারেন্সে সিকিউরিটি ফোর্স হিসাবে কাজ করছে। তাদের পাস মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করেছে সে, এখন চোখের সামনে দেখছে নিখুঁত একটা নকল।

কাগজ-পত্র ফিরিয়ে দিল সে, জানতে চাইল, 'আগামীকাল ওখানে কী দেখবে ভাবছ?'

'শহীদ হব আল্লাহ্‌র ইসলাম ও ইউনুস আল-কবিরের নামে।'

'তুমি কি নিজেকে অতটা সম্মান পাওয়ার যোগ্য মনে করো?'

ক' মুহূর্ত পর এল জবাব, 'এটা যথেষ্ট যে আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন ইমাম।'

'ভাল বলেছ,' বলল কর্নেল হোসেন। 'তুমি এবং তোমার লোক আঘাত হানতে চলেছ পশ্চিমা বিশ্বকে। এতে তাদের বন্ধুদের মন ভেঙে যাবে। কয়েক দশকের ভিতর কোমর সোজা করতে পারবে না। ইমাম ইউনুস আল-কবির ঘোষণা দিয়েছেন: ওরা এখন থেকে শাসন করবে না আমাদেরকে। নিজেদের মত করে জীবন গড়ব আমরা। যে ধরনের সিনেমা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে দুর্নীতি, গানবাজনা ও গণতন্ত্র; সবই শীঘ্রি নিষিদ্ধ হবে। এই দলের মানুষগুলো বুঝবে আমরা ওদের ওই পাপের জীবন চাই না। বেশি দিন দূরে নেই গোটা দুনিয়া শাসন করবে ইসলাম। আর সেই সঙ্গে সম্মানিত হবে তোমরা। এ সম্মান দিয়েছেন তোমাদেরকে ইমাম ইউনুস আল-কবির।'

'আমি তাঁর সম্মান রক্ষা করব,' বলল জঙ্গি। কণ্ঠ তার দৃঢ়, চোখের দৃষ্টি দীপ্ত।

'এবার তুমি যেতে পারো,' বলল আবু হোসেন। বন্ধুর দিকে চাইল। 'বন্ধু, এখানে ভাল কাজ দেখিয়েছ তুমি।'

'মিলিটারি ট্রেইনিং দেয়া সোজা ছিল,' বলল জঙ্গি কমাণ্ডার। 'কঠিন ছিল ওদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা। একেকটা ছিল উন্মত্ত চোখের বুনো বিড়াল।'

দু'জনই জানে, একের পর এক সুইসাইডাল অ্যাটাক ব্যর্থ হয়েছে শুধু কাঁচা ট্রেইনিঙের কারণে। অপ্রশিক্ষিত জঙ্গিরা কোনও কারণ ছাড়াই ভীত হয়ে উঠেছে। বহুবার এমনও হয়েছে, তাদের

আচরণে সাধারণ মানুষ বুঝে গেছে, যে-কোনও সময়ে বোমা ফাটবে। কিন্তু আজ যে পঞ্চাশজন জঙ্গিকে তারা ত্রিপোলি শহরে পাঠাবে, এরা কঠোর মনের মানুষ, সম্পূর্ণ সতর্ক; প্রশিক্ষিত সিকিউরিটি ফোর্সের ভিতর কাজ করবে। লিবিয়ান ফোর্স সব ধরনের আক্রমণের জন্য তৈরি থাকবে, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। মধ্যপ্রাচ্যের অন্তত বিশটা ট্রেইনিং ক্যাম্প থেকে বেছে নেয়া হয়েছে এ পঞ্চাশজনকে।

ঘড়ি দেখল আবু হোসেন। 'আগামী আঠারো ঘণ্টা পর, শত্রুদের শেষের শুরু। আবার বলতে পারি, নতুন দিনের ভোর আসছে আমাদের জন্য। মারা পড়বে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। রক্ত বইতে থাকবে প্যালেস হলে। নতুন করে আরেকবার থামিয়ে দেয়া হবে শান্তির নামে পশ্চিমাদের মিথ্যাচার ও আগ্রাসনকে। তাদের পা-চাটা সবাই মরবে। বলতে পারি, বরখেলাপ হবে না ইমামের কথার। আমরা আমাদের পছন্দের প্রিয় জীবনে ফিরব, দুনিয়াময় ছড়িয়ে দেব ইসলামের খুশ্‌বু।'

'প্রথম ইউনুস আল-কবির যে-কারণে লিখেছেন, "আমরা যখন নানা দুর্নীতির কারণে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হই; যখন বুঝি মনের শক্তি দুর্বল হয়েছে, ঠিক তখন সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চাই—তখন আমাদেরকে করতে হবে আত্মবিসর্জন; শত্রুদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে আমরা কখনও হারব না।"'

'অন্য একটা কথা আমার বেশি পছন্দের, "যারা ইসলাম ও আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করল না, তাদেরকে বিদ্ধ করতে হবে বুলেট দিয়ে।"'

'শীঘ্রি গুলিবিদ্ধ হবে ওরা।'

'একদম ঠিক কথা, দোস্ত। এবার, ওই ঘাড় ত্যাড়া বাংলাদেশি মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও আমাকে। তাকে ফ্রিগেটে তুলে দেয়ার আগে দু-চার কথা বলি।'

এগারো

মার্ভেলের হাসপাতালে লিবিয়ান বন্দিদেরকে পৌঁছে দিয়ে তাদের আরাম আয়েসের ব্যবস্থা করেছে রানা। বুঝতে পারছিল না ওদের বন্দি হবার কারণ কী। তারপর লিবিয়ান এক্স ফরেন মিনিস্টারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ফুয়াদ। জানাল, সে নিজে ছিল তাঁর ডেপুটি। তখন বাজে প্রায় দুপুর।

রানার ইচ্ছে ছিল কেবিনে ফিরে দীর্ঘ শাওয়ার নেবে। কিন্তু শাওয়ারে ঢুকতে না ঢুকতেই খটাখট আওয়াজ হলো কেবিনের দরজায়। বুঝতে দেরি হলো না রানার, ওটা বেয়াদ্দপ সোহেল না হয়েই যায় না। ব্যাটাকে দুটো গালি দেবে, সে উপায় নেই। কে জানে সঙ্গে করে কাকে নিয়ে এসেছে!

শাওয়ার থেকে বেরিয়ে রোব পরেই দরজা খুলে দিল রানা।

ঘরে ঢুকেই বিছানার উপর ধপ্ করে বসল সোহেল। ওর পর পরই ভিতরে ঢুকল রায়হান ও নবী।

'বক্সকার ডুবিয়ে দেয়ার চালাকি কাজে লেগেছে,' বলল সোহেল।

'বোসো তোমরা,' রায়হান ও নবীকে বলল রানা। নিজেও বসে পড়ল সোফায়। বন্ধুর দিকে চাইল। 'আর কী জানা গেল?'

'তোরা পৌঁছবার ঠিক পনেরো মিনিট পর তদন্ত করতে আসে একটা কপ্টার,' বলল সোহেল। 'রায়হান সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিল। ঠিক সময়েই ডুবে যায় বগিটা। বগির ছাত দেখে খুশি

হয়েছে কপ্টারের আরোহীরা।'

'এরপর ইউএভি নিয়ে নজর রাখি জঙ্গিদের ক্যাম্পে,' বলল রায়হান। 'অনেক উপরে থাকতে হয়েছিল। নইলে ইঞ্জিনের আওয়াজ পেত। ক্যামেরার রেযোলিউশন খারাপ, তবে মোটামুটি দেখেছি কী ঘটছে ওখানে।'

'কী বুঝলে?' জানতে চাইল রানা।

'আপনি ঠিকই বলেছেন, মাসুদ ভাই। লিবিয়ান কপ্টার নামল, কিন্তু বাধা দিতে এল না কেউ। আর কপ্টারের ভিতর সৈনিক ছিল না। মাত্র কয়েকজন নেমে এল।'

'কপ্টারগুলোকে ট্র্যান্সপোর্টের কাজে আনা হয়েছে,' বলল সোহেল।

'তাই করবে ওগুলো,' বলল রায়হান। 'এমআই-৮ কপ্টারে এত লোক আঁটত না।'

'কপ্টারগুলোর ক্যাপাসিটি কত?' জানতে চাইল রানা।

'কমপক্ষে পঞ্চাশজন নিতে পারবে।'

'অ্যাসল্ট ফোর্স হিসাবে যথেষ্ট লোক।'

'ওদের টার্গেট শান্তি মহাসম্মেলন,' মন্তব্য করল নবী।

'না-ও হতে পারে,' বলল রায়হান। 'ওখানকার সিকিউরিটি অভেদ্য। কোনও ডিগনিটারির এক মাইলের ভিতর পৌঁছুতে পারবে না কোনও জঙ্গি।'

'পারবে,' বলল সোহেল। 'যদি লিবিয়ান সরকার সুযোগ করে দেয়।'

'হাজার কোটি টাকার প্রশ্ন ওটা,' বলল রানা। 'প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি কি জানেন মোহাম্মদ ফতে আলী আসলে ইউনুস আল-কবির?'

'জানার তো কথা,' বলল নবী। 'উনিই তো তাকে মন্ত্রীত্ব দিয়েছেন।'

'ধরে নিলাম গাদ্দাফি জানেন,' বলল রানা। 'কিন্তু এটা কি জানেন আল-কবির কী করতে চলেছে?'

'কথা তো একই হলো, মাসুদ ভাই,' বলল নবী।

'একই কথা না-ও হতে পারে,' বলল রানা। 'আমাদের জানতে হবে গাদ্দাফি কতটা জানেন।'

'এসব আমরা জানব কীভাবে?' বলল নবী।

'উত্তরটা দু' মিনিট পর দিচ্ছি, নবী। ...রায়হান, কোনও উপায় আছে কপ্টারগুলোকে অনুসরণ করার?'

'আরেকটা ইউএভি লঞ্চ করতে পারি,' বলল রায়হান। 'আমাদের প্রথম ড্রোনের ফিউয়েল শেষ, আছড়ে পড়ে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেছে। তবে তার আগে পাওয়া গেছে এটা।'

রানার হাতে ঝাপসা একটা ফটো দিল সে। ওটা এসেছে ইউএভির ভিডিও ক্যামেরা থেকে। বড় অস্পষ্ট। তবে দেখা যায় দুই সশস্ত্র লোক একটা কপ্টারের দিকে এসকোর্ট করে নিয়ে চলেছে তৃতীয় কাউকে।

'উনিই কি প্রধানমন্ত্রী?' আনমনে বলল নবী।

'সম্ভাবনা খুবই বেশি। দু'পাশের দুই লোকের উচ্চতা এবং মাঝের মানুষটির উচ্চতা... তা ছাড়া, মাঝের জনের দৈহিক গড়ন মিলে যায়। পরনে বোরখা। চুল বা চুলের খোঁপা নেই। এসব থেকে মনে হয়...' থেমে গেল রায়হান।

'খুলে বলো তোমার কী ধারণা,' সোজা হয়ে বসেছে রানা।

'উনিই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু যতক্ষণে ইউএভি ওখানে পৌঁছবে, তার আগেই তাঁকে সরিয়ে নেয়া হতে পারে।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। ঠিক দিক ভেবেই লিবিয়ান বন্দিদেরকে সরিয়ে নিতে চেয়েছে। ওই ক্যাম্পে জঙ্গিদের সঙ্গে লড়তে গেলে বহু মানুষ মরত। একজনের জীবনের দাম যত বেশিই হোক, এক শ' মানুষের জীবনের দামের চেয়ে বেশি হতে

পারে না। সে যে-ই হোক। তবে খচ-খচ করছে এখন মনের ভিতর। মানুষটার এত কাছে পৌঁছেও কিছুই করতে পারল না। 'ঠিক আছে, আমরা যদি কপ্টারগুলোকে অনুসরণ করি?' ছবি থেকে চোখ তুলল না রানা।

'হয়তো দ্বিতীয় ইউএভি দিয়ে অনুসরণ করা যেতে পারে। মিসাইলও ছুঁড়তে পারব। কিন্তু বুঝব কী করে কোনটার ভিতর প্রধানমন্ত্রী আছেন? হয়তো ওটাই বিধ্বস্ত হলো।'

কেউ কিছু বলছে না।

সোহেলের দিকে চাইল রানা। 'অন্য কোনও অপশন?'

'নো অপশন।' গম্ভীর স্বরে বলল সোহেল। 'ওরা যদি সাগরের উপর দিয়েও আসে, মিসাইল ব্যবহারে প্রধানমন্ত্রী মরতে পারেন।'

'সোহেল ভাই ঠিকই বলেছেন,' বলল নবী।

'মরুভূমির উপর দিয়েও যেতে পারে,' বলল রায়হান।

খুকখুক করে কাশল সোহেল। 'সেক্ষেত্রে অপশন নেই বললেই চলে। তবে আমরা চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। তাঁকে বললে উনি হয়তো অন্যান্য ডেলিগেটদের সঙ্গে আলাপ করবেন। তাতে কপ্টারগুলোর উপর নজর রাখা যাবে।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'আমার বিশ্বাস, উনি কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না।'

'কেন নয়, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল রায়হান।

'দুটো কারণে। প্রথম কথা, ডেলিগেটরা যদি জানে হামলা হবে, পিস কনফারেন্স ছেড়ে প্রত্যেকে চলে যাবে নিজ দেশে। গুরুত্বপূর্ণ এতজন মানুষকে আর কখনও এভাবে জড় করা যাবে না। মহাসম্মেলন চলতেই হবে। আর এটাই চাইছেন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফিও। উনি পশ্চিমাদের অনুরোধ করতে চান, তারা যেন লিবিয়ার ভিতর বিরোধীদেরকে মদত না দেয়। একই কথা বলবে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য সরকার-প্রধানরা।

পশ্চিমাদের সাহায্য নিয়ে বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ আরম্ভ করতে পারে বিরোধী দলগুলো। তাতে গোটা এশিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হবে। ফলাফল হবে ভয়ঙ্কর।' টেবিল থেকে পানির গ্লাস নিয়ে চুমুক দিল রানা। গ্লাস রেখে বলল, 'এ প্রসঙ্গ বাদই দেয়া যাক। ...দ্বিতীয় আরেকটা কারণে কাউকে কিছু জানাবেন না বস্। কথা উঠবে: তোমাদের কাছে প্রমাণ নেই যে বলবে মোহাম্মদ ফতে আলীই জঙ্গি-নেতা ইউনুস আল-কবির, আর হামলা করতে চলেছে সে মহাসম্মেলনে। আর উনি এ-ও বলবেন, এটা তোমাদের একমাত্র সুযোগ ইউনুস আল-কবিরকে ধরার, তার সংগঠনকে ধ্বংস করে দেয়ার।'

'সেক্ষেত্রে নামকরা বহু মানুষের প্রাণের উপর ঝুঁকি নিচ্ছি আমরা,' বলল নবী।

'আসলে তা-ই,' বলল সোহেল। 'তবে এ ছাড়া বোধহয় কোনও উপায় নেই।'

'এ কথা ঠিক, আগে আমরা এত ঝুঁকি নিইনি,' বলল রানা। 'তবে এটাই চাইছেন বস। আমি কেবিনে পৌঁছেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। উনি বলেন, আমরা যদি কনফারেন্স শুরু হওয়ার আগেই ইউনুস আল-কবিরকে আটকাতে পারি, গোটা শান্তি মহাসম্মেলনের উপর জোরালো প্রভাব পড়বে। পৃথিবীর সেকেণ্ড মোস্ট ওয়ান্টেড ক্রিমিনালকে ধরতে পারলে মহাসম্মেলনের রাজনৈতিক চুক্তিগুলো হবে দীর্ঘ মেয়াদী।'

মাথা দোলাল সোহেল। 'বরাবরের মত ঠিক কথাই বলেছেন বস্।' প্রাণ-প্রিয় বন্ধুর দিকে চাইল। 'তোর কী মনে হয়, এখন কী করা উচিত?'

মৃদু হেসে ফেলল রায়হান ও নবী।

'বেশিরভাগ মানুষ কল্পনা-প্রবণ হয়,' বলল রানা, 'সুখ স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। আর সেটাকে কাজে লাগাব আমরা।'

'খুলে বল্।' নড়েচড়ে বসল সোহেল। একবার দেখে নিল রায়হান ও নবীকে, একটু রেগে আছে। ওই দুটো কী যেন গোপন করছে!

রানা বলল, 'স্মৃতি বলেছে, সত্যিকারের ইউনুস আল-কবিরের সমাধির ভিতর রয়েছে প্রাচীন জাহাজ ও আরও অনেক কিছু। আহমেদ শরীফও একই কথা বলেছে।' রায়হান ও নবীর দিকে চাইল। 'কী পেলে তোমরা?'

'আমরা হাতে সময় পাইনি,' প্রায় আপত্তি তুলল রায়হান। 'কাজেই আমাদের রিপোর্ট খুব ভাল কিছু হবে না।'

'আমরা শুনেছি,' কথা বলে উঠল নবী, 'ওই সমাধির ভিতর আছে ইউনুস আল-কবিরের শেষ দিনগুলোর বহু জিনিস-পত্র। সোনা-দানা ছাড়াও অতি মূলবান রত্নের কয়েকটা সিন্দুক। আর তার চেয়েও ঢের দামি একটা খাতা। ওটায় লিখিত ফতোয়ার কথা বলে গেছেন জেফ মার্টেল।' রানার দিকে চাইল নবী। 'তবে এসব ভুলও হতে পারে।'

'পারে, তবে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি,' বলল রানা। 'ইমাম ইউনুস আল-কবিরের শেষ ক'টা দিনের কথা ভাবো। খ্রিস্ট ধর্ম এবং ইসলামের ততটা বিরোধ নেই, যতটা আছে মিল। দুই ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান খুবই সম্ভব, এবং কাম্য। লিখে গেছেন কীভাবে এটা হতে পারে। ওসব ফতোয়া হাতে পেতে হবে আমাদেরকে। সেক্ষেত্রে কোটি কোটি মুসলিম মুখ ফিরিয়ে নেবে জঙ্গিবাদ ও ফ্যানাটিসিজমের দিক থেকে।'

'কিন্তু ওসব আছে কোথায়?' মাথা নাড়ল সোহেল, 'কেউ জানে না। এই মুহূর্তে আমাদের বোধহয় বাস্তব সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামানো উচিত। উদ্ধার করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে। ঠেকাতে হবে ইউনুস আল-কবিরের হামলা। এদিকে মনোযোগ দেয়া দরকার বলে মনে করছি।'

প্রসঙ্গ পাল্টে নিল রানা। 'একটা কথা মনে আছে তোর, সোহেল? লিবিয়ান সিক্রেট পুলিশ ধারণা করছে বন্দরের ওই পাইলট হারিস জামানই আসলে ইউনুস আল-কবির।'

'ওরা ভুল বোঝাতে চাইছে সবাইকে,' বলল সোহেল।

'গ্যাং ফেং তোকে বলেছে হারিস জামান ইউনুস আল-কবিরের সংগঠনের সঙ্গে জড়িত?'

'হ্যাঁ, বলেছে। ওরা দেখেছে দিনরাত ওই লোকের উপর চোখ রাখছে লিবিয়ান এজেন্টরা। যে-কোনও সময়ে গ্রেফতার করবে।'

'তা করতে পারে, কিন্তু পাবে শুধু একটা বুদ্ধু ছাগলকে,' বলে গম্ভীর হয়ে গেল রায়হান। মাথায়ই আসেনি সামনে মাসুদ ভাই।

'কোনও জরুরি কারণে তাকে টার্গেট করছে লিবিয়ানরা,' বলল রানা। 'সোহেল, তুই ফেং ও কাশেমের সঙ্গে যোগাযোগ কর। ওরা যেন তুলে নিয়ে আসে হারিসকে।'

'মিটিং শেষ হলেই জানিয়ে দেব,' বলল সোহেল।

নবীর দিকে চাইল রানা। ছেলেটা আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি হলো একটানা কাজ করে চলেছে। মুখে ক্লান্তি। তার বন্ধুর দিকে চাইল রানা। চকচক করছে রায়হানের চোখদুটো। 'একটা অপারেশনে যেতে পারবে, রায়হান?' জানতে চাইল রানা।

'আপনি বললে নিশ্চয়ই যাব!'

'তা হলে নিশাত আপার সঙ্গে তিউনিশিয়ায় যাচ্ছ তুমি। খুঁজে বের করবে ইউনুস আল-কবিরের সমাধি। তোমাদের সঙ্গে থাকবে স্বর্ণা, স্মৃতি এবং আরও দু'একজন।'

'আমিও ওদের সঙ্গে যাব,' জোর দিয়ে বলল সোহেল। রানা আপত্তি তুলবার আগেই চট্ করে যোগ করল, 'চেয়ারের সিটে বসে থাকতে থাকতে পিছনটা নীল হয়ে গেছে আমার!'

খুকখুক করে কাশল রানা। ছোটদের সামনে সোহেলের কথায় বিব্রত। তবে বুঝতে পারছে, জাহাজে আটকা পড়ে কী

রকম বিরক্ত হয়ে উঠেছে বেচারা। বাধা দিলেও মানবে না। কাজেই চুপ থাকল।

'আমাদেরকে সশস্ত্র থাকতে হবে,' বলল রায়হান, 'আর্কিওলজিস্টদের চতুর্থ লোকটাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'শুনেছি সুবিধার মানুষ ছিল না,' বলল সোহেল। 'এ-ও শুনেছি ওকে ধরে নিয়ে গেছে বারোজন টেরোরিস্ট। আমরা সতর্ক থাকব।'

'ওখানে একঘণ্টায় তোদেরকে পৌঁছে দেবেন আলম সিরাজ। দিয়েই আবার এখানে ফিরবেন। তা হলে এইটা ঠিক হলো: রায়হান আর সোহেল তো তৈরি; স্মৃতি, ক্যাপ্টেন নিশাত ও স্বর্ণা ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে নিলেই রওনা হবে দলটা। নেতৃত্বে থাকছে সোহেল। ওর পরামর্শ মত চলবে সবাই। সবুরের কাছে শুনেছি ওই সমাধিটা খুঁজছে জঙ্গি-নেতা ইউনুস আল-কবিরও। মরুভূমির ভিতর জঙ্গি ক্যাম্প করেছিল শুধু ওই সমাধি পাবার আশাতেই।' বন্ধুর দিকে চাইল রানা। 'যে-কোনও কিছুর জন্য তৈরি থাকবি।'

'তোর ভাবতে হবে না।'

ফোন বেজে উঠল। অপারেশন্স সেণ্টার থেকে যোগাযোগ করছে। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা। 'বলো।'

'মাসুদ ভাই, রেইডার নিচু দিয়ে যাওয়া এক এয়ারক্র্যাফট ধরেছে। ওটা জঙ্গি ক্যাম্প থেকে উঠে চলে গেছে সাগরে।'

'ট্র্যাক করা সম্ভব?'

'না। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দেখা দিয়েই আবারও হারিয়ে গেছে। আমার ধারণা ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে ছুটছে।'

'স্পিড আর বেয়ারিং?'

'কিছুই জানি না। মাত্র তিন সেকেণ্ডের ব্লিপ।'

'ঠিক আছে।' ক্রেডলে রিসিভার রাখল রানা। 'আল-কবিরের

লোক রওনা হয়েছে।'

'খুব জলদি!' ঘড়ি দেখল সোহেল।

'বোধহয় আমাদের কারণে ঝামেলা হয়েছে, তাতে ডেডলাইন বদলে গেছে,' চুপ হয়ে গেল রানা। খানিক বিরতি দিয়ে বলল, 'ওরা উপকূলের কাছে কেন?'

'প্রশ্ন তো সেটাই, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান। 'কেন এল সাগরের দিকে? ওদেরকে সহজে স্পট করা যাবে।'

'রওনা হওয়ার আগেই তুমি ইন্টারনেটে লিবিয়ান নেভাল ফোর্স সার্চ করবে,' বলল রানা। 'দেখবে কাছাকাছি কোথায় কী আছে। বিশেষ খেয়াল দেবে যেসব জাহাজে নামতে পারে হেলিকপ্টার।'

বারো

নিজের সিঙ্গেল খাটে বসে ছিল গ্যাং ফেং, তখনই এল ফোনটা। বড় জোর দশ সেকেণ্ড শুনল, তারপর কোনও আওয়াজ না করে সেল ফোনের ঢাকনি বন্ধ করল, নিঃশব্দে চাপল দীর্ঘশ্বাস।

তবে উত্তপ্ত ঘরের আরেক প্রান্ত থেকে কাশেম বক্স জানতে চাইল, 'কী হয়েছে, ফেং?'

এরই ভিতর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে দু'জনের।

সোহেল আহমেদ আগেই ওদেরকে ব্রিফ করেছে। কাজেই এই ফোনালাপ ছিল সংক্ষিপ্ত। তবে ফেঙের চেহারা নীরবে বলছে, ওদের জন্য রয়েছে খারাপ সংবাদ।

'মাসুদ ভাই চাইছেন আমরা হারিসকে মার্ভেলে ধরে নিয়ে যাই।'

'কখন? আজ রাতে?'

'এখনই।'

'কেন?'

'জানতে চাইনি।'

চায়নিজ টঙের কাছ থেকে এই নোংরা ঘুপচি ঘরটা ভাড়া নিয়েছে ওরা। কোনও এয়ারকুলার নেই। বাথরুমের ট্যাপে পানি নেই। ঘরে ছোটাছুটি করছে ধেড়ে ইঁদুর আর প্রমাণ সাইজের তেলাপোকা। মচমচে খাটের জাজিমের ভাঁজে অযুত-নিযুত ছারপোকা, একেকটা বিশাল আকারের।

গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পোশাক খুলে ফেলেছে ওরা। পরনে শুধু বক্সার শর্টস্। গা থেকে দরদর করে ঝরছে ঘাম।

আলনা থেকে পোশাক নিয়ে পরতে শুরু করল গ্যাং ফেং। প্যান্ট পরবার আগে ঝেড়ে ফেলতে চাইল তেলাপোকাগুলোকে। একই কাজ করছে কাশেম। কাঠের মেঝের ফাঁক দিয়ে উঠে আসছে নীচতলার রেস্টুরেন্টের সুস্বাদু খাবারের সুবাস।

'আমরা তৈরি, বলা যায় না,' কপাল-মুখ মুছে বলল কাশেম।

'মাসুদ ভাই জানিয়েছেন হারিস জামানের পেট থেকে তথ্য বেরুবে, কাজেই তাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।'

'দুর্নীতি পরায়ণ লোক, কিন্তু বিপজ্জনক মনে হয়নি আমার।'

'অথচ বাড়ি ও বন্দরে তার উপর নজর রাখছে লিবিয়ান সিক্রেট এজেন্ট।' কাঁধ ঝাঁকাল ফেং। 'কাজেই তাকে আরও বেশি সন্দেহ করা উচিত আমাদের। কালকে সোহেল ভাই বলেছেন লিবিয়ান অফিসাররা ধারণা করেছে, এ লোক ইউনুস আল-কবিরের ঘনিষ্ঠ কেউ। জঙ্গিদের সঙ্গে ভাল ভাবেই জড়িত। অথচ লোকটার লাইফস্টাইল টেরোরিস্টদের মত নয়। আধ ডজন

বিবাহিত বয়স্কা মেয়েলোকের সঙ্গে বিছানায় যাবে সত্যিকারের জঙ্গি? যে-কোনও সময়ে তো পুলিশের হাতে ধরা পড়বে এই লোক ঘুষ খেয়ে। ...আমি আসলে জানি না এ কে বা কী।'

'আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, ইউনুস আল-কবিরের সঙ্গে জড়িত নয় হারিস,' বলল কাশেম। 'কিন্তু তা হলে ওর উপর চোখ রাখছে কেন লিবিয়ান সিক্রেট পুলিশ? ধরতে দেরিই বা করছে কেন? কান ধরে নিয়ে গেলেই তো হয়!'

'নিশ্চয়ই গুটিয়ে আনছে জাল,' বলল ফেং। 'মাসুদ ভাইও চাইছেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। এই লোক সমস্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আরও কী করছে বা করেছে সেই বলতে পারবে।'

গোড়ালির কাছে বাঁধা হোলস্টারে কমপ্যাক্ট গ্লক ১৯ পিস্তল রাখল কাশেম, তারপর পরে নিল প্যান্ট। শার্ট পরতে শুরু করে বলল, 'লিবিয়ান সিক্রেট পুলিশের চোখের সামনে থেকে ব্যাটাকে নিয়ে যাওয়া কঠিনই হবে।'

'এতে দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়বে আমাদের,' বলল ফেং। হাসি-ঠাট্টার মানুষ নয় সে, সবসময় গম্ভীর থাকে মুখ। 'বয়স্ক চায়নিজরা বলেন, "নিজ খাবারের তালিকা বড় করো, খেতে শুরু করো ঘাস-ফড়িং; বিপদে পড়লে দেখবে দুনিয়া ভরা খাবার।"'

শুকনো হাসল কাশেম। 'শেষ খবর অনুযায়ী হারিস আছে তিন নম্বর প্রেমিকার বাসায়।'

'আশপাশে লিবিয়ান কর্তৃপক্ষ নেই। আমাদের খুশি হওয়া উচিত। এতক্ষণে হারিস টের পেয়েছে সিক্রেট পুলিশ তাকে খুঁজছে। হয়তো ভাববে মার্ভেলে ঠাঁই নেয়াই বুদ্ধির কাজ হবে। আমরা শুধু উৎসাহিত করব। বুঝিয়ে দেব সঙ্গে না গেলে কী ঘটতে পারে। আন্দাজ করছি, ব্যাটা সঙ্গে যাবে।'

হারিসের তৃতীয় উপ-পত্নী এক জাজের স্ত্রী। সে লোকের ফ্ল্যাট পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িতে। এসব পাথুরে দালান এক

শ' বছরের বেশি পুরনো। জানালা ও ব্যালকনিতে রট আয়ার্ন গ্রিল। সমতল ছাতে অজস্র বেকার স্যাটালাইট ডিশ। প্রায় প্রতিটি ফ্ল্যাট-বাড়ির নীচতলায় দোকান ও বুটিক। সেসব দোকান থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিস কেনে বিত্তবানরা।

পাশের ফুটপাথ চওড়া ও পরিচ্ছন্ন, তবে পেঁচানো এবং সরু পথ। তৈরি করা হয়েছিল বহু আগে ঘোড়াগাড়ি চলবার জন্য। এসব পথের কারণে এই মহল্লা নিঝুম নিরালা থাকে। নতুন কেউ হঠাৎ ঢুকে পড়লে ভাবতে পারে, বড় কোনও শহরে নয়, খুদে জনপদে হাজির হয়েছে।

চায়নিজ গ্যাঙের সদস্যরা হারিস জামানকে অনুসরণ করে এখানে অপেক্ষা করছে ভাঙাচোরা একটা ডেলিভারি ভ্যান নিয়ে। উপ-পত্নীর ফ্ল্যাটবাড়ির উল্টোদিকে থেমেছে তারা। বনেটের হুড খুলে ইঞ্জিন থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে কয়েকটা পার্টস্। সব রাখা হয়েছে ফুটপাথে তারপুলিনের উপর। আরবদের আলখেল্লা ও পশ্চিমা পোশাকের পুরুষ ও মহিলারা দ্বিতীয়বার না চেয়েই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

চায়নিজ ক্রিমিনালদের ভ্যান থেকে অনেক সামনে একটা গ্রোসারির দোকানের পাশে গাড়ি রেখেছে গ্যাং ফেং ও কাশেম। দোকানের দরজার পাশেই কমলার বিন, ওখান থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি-টক সুবাস।

গ্লাভ্‌স্ কমপার্টমেন্টের ভিতর ডানহাত ভরল ফেং, চোখ রেখেছে সরু পথের উপর। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা দেখলে সতর্ক হবে। চারদিকে চোখ রেখেছে কাশেমও। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তেমন কিছু চোখে পড়ল না ওদের। দুই বৃদ্ধ একটা ক্যাফের বাইরে পাতা টেবিলে ব্যাকগ্যামন খেলছেন। একটা ফার্নিচারের দোকানে ন্যাকড়া দিয়ে টেবিল-চেয়ার পরিষ্কার করছে এক ছেলে। রাস্তার উপর নজর নেই তার। কড়া রোদ

পড়েছে, তেমনি গনগনে গরম। চায়নিজ দলের ছোকরা দুটো ছাড়া এখানে কেউ গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে না।

এই ব্লকের শেষে আছে বিশাল একটা কনস্ট্রাকশন সাইট। ওখানে কাজ করছে একটা ক্রলার ক্রেন। মালামাল তুলছে দশ তলায়। স্টিল ও কংক্রিটের ওই ফ্রেমওঅর্ক কিছু দিনের ভিতর হয়ে উঠবে বিলাসবহুল কণ্ডোমিনিয়াম্। ওদিকে সন্দেহজনক কিছু দেখল না ফেং ও কাশেম। নিয়মিত গেট দিয়ে যাওয়া-আসা করছে সিমেণ্ট মিক্সারের ট্রাক।

'তৈরি, কাশেম?' কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল ফেং।

নিচু স্বরে বলল বাঙালি কমাণ্ডো, 'হ্যাঁ, চলো যাওয়া যাক।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরা। হ্যাট ও কালো সানগ্লাস পরে নিয়েছে ফেং। কেউ চট্ করে বুঝবে না ও চায়নিজ। ওদের পরনে ঢিলা প্যাণ্ট ও শার্ট। এ পোশাক পাওয়া যায় মিডল ইস্টের যে-কোনও এলাকায়। বিপদে পড়লে দ্রুত সবার ভিতর হারিয়ে যেতে পারবে ওরা।

ডেলিভারি ভ্যান পেরুনোর আগে চায়নিজ এক ছোকরার হাতে একটা ডিসপোযেবল সেল ফোন দিল ফেং, ফিসফিস করে বলল, 'এখান থেকে সরে চারপাশে নজর রাখো। খেয়াল রেখো আমাদের লাল ফিয়াটের উপর। স্পিড-ডায়ালে দুই নাম্বার টিপলে পাবে আমাকে।'

মনেই হলো না ছোকরা শুনতে পেয়েছে। তবে তার সঙ্গী ধুপ্ করে ইঞ্জিন বনেট নামিয়ে দিল। নাক বরাবর হেঁটে ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে রওনা হয়েছে ফেং ও কাশেম।

সদর দরজা তালাবদ্ধ নয়। তবে লবির সোফায় বসে আছে কালো ইউনিফর্ম পরা এক প্রহরী, মনোযোগ দিয়ে পড়ছে খবরের কাগজ। লবিতে পাশাপাশি হেঁটে ঢুকে পড়ল ফেং ও কাশেম, ভাব দেখে মনে হলো এই মাত্র কৌতুক বলেছে ফেং। হাসছে দু'জন।

খেয়ালই করল না প্রহরীকে। তবে পেপার রেখে আরবিতে কী যেন বলল লোকটা।

বুঝবার কথা নয় ফেং বা কাশেমের।

কাশেম বুঝলও না কী মুভ নিল ফেং। ওর ধারণা, যথেষ্ট কাছে পৌঁছনো হয়নি।

ফেন্সারদের মত তীরবেগে সামনে বাড়ল ফেং। ডানহাত নড়ে উঠতেই আড়ষ্ট তালুর বাইরের কিনারা ছোবল দিল গার্ডের গলায়, অ্যাডাম্‌স্‌ অ্যাপলের ঠিক নীচে। লোকটাকে খুন করতে পারত ফেং, তবে নিয়ন্ত্রিত আঘাত হেনেছে। মস্ত হাঁ করল গার্ড, আর ঠিক তখনই আরেকটা চপ পড়ল ঘাড়ের উপর। হঠাৎ উল্টে গেল লিবিয়ানের চোখ, বেরুল সাদা অংশ। জ্ঞান হারিয়ে ধুপ করে পড়ল সোফার উপর।

কাঁচের দরজার দিকে চট্‌ করে চাইল ফেং। বাইরে থেকে খেয়াল করেনি কেউ। তবে যে-কোনও সময়ে আসতে পারে যে-কেউ। কাশেমের সাহায্য নিল ফেং, লিবিয়ানের ধড়টা তুলল ওরা, নিয়ে এল পিছন-ঘরে, শুইয়ে দিল মেঝের উপর। পিছন-দেয়ালে এক সারিতে মেইলবক্স।

'কখন জ্ঞান ফিরবে?' জানতে চাইল কাশেম।

'আন্দাজ এক ঘণ্টা।' গার্ডের পকেট হাতড়াতে শুরু করেছে ফেং। আইডি পেয়ে পড়ল। গার্ডের নাম মনসুর মালিক। 'এসো, যাওয়া যাক হারিস জামানের কাছে। সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় উঠেই সামনের দরজা।'

পিস্তল হাতে লবিতে বেরুল ওরা। কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। উপর থেকে নামছে না কেউ। লোকজন বোধহয় লিফট ব্যবহার করে।

পাঁচতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা। সামনের হলওয়ে কার্পেট দিয়ে মোড়া। একটু পর পর বাতি জ্বলছে। এই তলায়

ছয়টি অ্যাপার্টমেণ্ট। ভারী মজবুত কাঠের কারুকার্য করা দরজা। কাঠের মিস্ত্রিরা আগে অনেক যত্নে, অনেক সময় ব্যয় করে তৈরি করত এসব। খুশি হয়ে উঠল ফেং ও কাশেম: দরজায় পিপহোল নেই।

উপ-পত্নীর অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় মৃদু নক করল ফেং। কয়েক মুহূর্ত পেরুল, তারপর শোনা গেল মহিলার অস্পষ্ট কণ্ঠ। বোধহয় নামধাম জানতে চাইছে। কাজেই ফেং বলল, 'আমি, মনজুর হোসেন।'

আবারও কী বলে উঠল মহিলা। বোধহয় জানতে চাইছে, কী চাই। কাজেই প্রথমে যে কথা মনে এল ফেঙের, তাই বলল। 'আল-জারিফের মেইল। ফেডারাল এক্সপ্রেস, ম্যাডাম।' এই শহরে ওই চকচকে ট্রাক দেখেছে।

হাতের ইশারা করল ফেং, সরে যেতে বলছে কাশেমকে। অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর থেকে শিকলের আওয়াজ এল। খোলা হলো দুটো লক। আর তখনই কাঁধ দিয়ে দরজার উপর প্রচণ্ড গুঁতো দিল ফেং। ভেবেছিল সহজে কবাট খুলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে মেঝের উপর। কিন্তু দরজা সরে যেতেই ধাক্কা খেল মহিলার মোটা দেহে, পিছলে গেল পা। মহিলাকে নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল ফেং। আর সে-কারণেই বেঁচে গেল। ওর কাঁধের উপর দিয়ে গেল সাইলেন্সড় পিস্তলের বুলেট।

মুখটা প্রকাণ্ড হাঁ করে বিকট চিৎকার ছাড়ল বিচারকের বিবি। ততক্ষণে শরীর গড়িয়ে দিয়ে সোফার আড়ালে সরে গেছে ফেং। 'হারিস, গুলি কোরো না,' শান্ত স্বরে বলতে চাইল, কিন্তু ধকধক করছে বুক। 'গুলি কোরো না, প্লিজ! আমরা তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

আক্রান্ত হয়নি বুঝতে পেরে থেমে গেল মহিলা। ব্রেসিয়ার ও প্যান্টির উপর হাত রেখে ফেঙের দিকে চেয়ে আছে। গ্র্যাণ্ডফাদার

ক্লক টিকটিক করছে, আর কোনও আওয়াজ নেই।

'কে তুমি?' আড়াল থেকে জানতে চাইল হারিস।

'কয়েক দিন আগে একটা ট্রাক নামিয়েছ জাহাজ থেকে,' বলল ফেং। 'আমি ওই জাহাজের লোক।'

'নেপলস্ থেকে এসেছে ওই জাহাজ?'

'হ্যাঁ।'

'কার মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয় আমার সঙ্গে?'

'বাংলাদেশি এক লোকের মাধ্যমে।'

'ঠিক আছে, উঠে দাঁড়াতে পারেন।'

সাবধানে উঠে দাঁড়াল ফেং, পিস্তলের ট্রিগারের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে তর্জনী। 'আমরা দুজন আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

এবার ঘরে ঢুকল কাশেম বক্স। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে রইল হারিস জামান, তারপর আবারও চোখ ফেরাল ফেঙের উপর। হ্যাট ও সানগ্লাস খুলে ফেলেছে চায়নিজ এজেন্ট, নিজেকে দেখতে দিচ্ছে। 'গত ক'দিন আগে আপনাকে দেখেছি, তখন হেলম্‌স্‌ম্যানের অভিনয় করছিলেন। তার পর থেকে মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে গেছি আপনাদের কারণে। সর্বক্ষণ আমাকে নজরবন্দি করে রেখেছে কেউ। যেখানে যাচ্ছি চায়নিজরা পিছু নিচ্ছে। এখন বুঝতে পারছি ওরা কেন পিছু নিয়েছে। আপনার কারণে।'

'স্থানীয় কয়েকটা ছেলেকে কাজে নিয়েছি।' পিস্তলটা প্যান্টের ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রাখল ফেং।

এগিয়ে এল হারিস, দু'হাতে মহিলাকে উঠতে সাহায্য করছে। ভারী ওজন তুলতে গিয়ে টলমল করে উঠল সে। চোখ-নাকের অশ্রু পড়েছে ঘন গোঁফে, ডানহাতে তা মুছল উপ-পত্নী। কমপক্ষে দু' শ' পাউণ্ড ওজনের মাল, আন্দাজ করল ফেং। উচ্চতা হবে

পাঁচ ফুটের কম, ফলে তাকে লাগছে মস্ত এক বাস্কেটবলের মত।

হারিস জামান দেখতে মোটেই ভাল নয়, পাক ধরেছে চুলে, খসে পড়েছে গোটা দুয়েক দাঁত, তবে যথেষ্ট বিনয়ী। এই মোটা মহিলার চেয়ে অনেক ভাল কোনও মেয়েকে পটাতে পারত। বোধহয় ভালবাসার জন্য নয়, এখানে আসে তথ্য পাওয়ার জন্য। আর যাই হোক, মহিলা একজন বিচারকের বউ।

মহিলার বাঁধাকপির মত কানের ভিতর গুনগুন করে আশ্বাস দিয়ে চলেছে হারিস। অ্যাপার্টমেন্ট ঘুরে এল ফেং। ফার্নিচারগুলো দামি, চামড়ার নতুন এক সেট সোফাও আছে, পাশেই মার্বেলের কফি টেবিল। ওটার উপর চকচকে ম্যাগাজিনের সব নতুন সংখ্যা। কাঠের মেঝের উপর পারস্যের কার্পেট। এক দেয়ালে কাঠের তাক, সেখানে সারিসারি চামড়া দিয়ে মোড়া আইনের বই। দেয়ালে কাঁচে ঢাকা জিয়োমেট্রিক ডিজাইন। বোধহয় ওই মহিলার তৈরি। ব্যালকনি থেকে আসা হাওয়া দুলিয়ে দিচ্ছে দামি পর্দা। নীচ থেকে জোরালো কোনও আওয়াজ আসছে না।

উপ-পত্নীর পশ্চাদ্দেশে চাপড় দিল হারিস, মহিলাকে পাঠিয়ে দিল বেডরুমে।

'খুবই ভাল মেয়ে,' মহিলা চলে যাওয়ার আগেই বলল। আর চলে যেতেই বলল, 'তবে মাথায় বুদ্ধি নেই মোটেও। দেখতে খারাপ, তবে বিছানায় একেবারে বাঘিনী।'

শিউরে উঠল কাশেম ও ফেং, চট্ করে পরস্পরের দিকে চাইল।

'কোনও ড্রিঙ্ক, জেন্টলমেন?' জানতে চাইল হারিস। 'জাজ পছন্দ করেন জিন। তবে এনে রেখেছি স্কচ হুইস্কি। আর, সত্যিই, আমি দুঃখিত আপনাদের দিকে গুলি করেছি। ওটা রিফ্লেক্স ছিল। ভেবেছি সে এসেছে।'

'অভিনয় বাদ দিলেই ভাল হয়, মিস্টার হারিস,' বলল ফেং।

ক' মুহূর্ত পেরুল, কেউ কোনও কথা বলল না। হারিসের চোখ খেয়াল করছে ফেং। সে-ও চেয়ে আছে। যেন বুঝতে চাইছে এরা ওকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছে, না ক্ষতি করতে।

একটু ঝুঁকে এল হারিসের দু' কাঁধ। 'ঠিক আছে, আর কোনও অভিনয় নয়।' এখনও ইংরেজি বলছে, তবে সুর অন্য রকম। 'আমার জীবন শেষ। কোনওভাবেই বাঁচতে পারব না। কাজেই অভিনয় করেই বা কী হবে? কারা আপনারা? ওই জাহাজে আমি ভেবেছিলাম আপনারা আইএসআই।'

'মস্ত ভুল ভেবেছেন,' বলল ফেং। 'ও কাশেম বক্স। আমার নাম গ্যাং ফেং।'

'আপনারা এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে খুঁজতে।'

'হ্যাঁ। মিশন তা-ই ছিল। পরে বদলে গেছে। এখন শুধু প্রধানমন্ত্রীকে খুঁজছি না, চাই ইউনুস আল-কবিরকেও।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে, আপনারা তাকে ধরতে চান। ওই লোকের সংগঠন অক্টোপাসের মত বাহু ছড়িয়ে রয়েছে লিবিয়ান সরকারের ভিতর। ছায়ার ভিতর কাজ করছে। উঁচু পর্যায়ের অফিসারদের ভিতরও ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেদের বিষ।'

'আপনি নিজে কে এবং কেন জড়িয়ে পড়েছেন?'

'আমার নাম লিও সিলভারম্যান।'

কথা শুনে চমকে গেল ফেং ও কাশেম। ওদের মনে হলো ঘুসি খেয়েছে পেটে।

'মোসাদ?' সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল কাশেম। 'আমরা জেনেছি আপনি এখানে আছেন পাঁচ বছর ধরে।'

'ভুল ভেবেছেন। সিআই-এর সঙ্গে আছি। আমার কাভার ফাইল গেছে ওই পাঁচ বছর পর্যন্ত। নিজে ত্রিপোলিতে এসেছি আঠারো মাস আগে। সিআইএ সন্দেহ করছে কিছুদিনের ভিতর নর্থ আফ্রিকা দখল করবে ইউনুস আল-কবির। আর এই কারণেই

ডিপ কাভার এজেন্টদেরকে পাঠিয়েছে মরোক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া আর লিবিয়ায়। তারপর যখন জানা গেল প্রথম হামলা আসছে লিবিয়া দখল করতে, অন্যান্য এজেন্ট ফিরে গেল, কিন্তু আমি রয়ে গেলাম এখানে।'

'এসব মহিলাদের সঙ্গে মাখামাখির ব্যাপারটা কী?' জানতে চাইল কাশেম।

গলা নিচু করল সিলভারম্যান, 'একাকী মহিলার সঙ্গে মিশতে হয়, কারণ এদের স্বামীরা ক্ষমতাধর। এসপিয়োনাজের প্রথম শর্ত তো ওটাই।'

'বন্দরে কী কাজ করতেন?' জানতে চাইল ফেং।

'কী আসছে আর কী যাচ্ছে, তা দেখতাম। আর্মস, সাপ্লাই, সবকিছুই আনিয়েছে ইউনুস আল-কবির। এসবের ভিতর একটা মডিফায়েড হিন্দ গানশিপও এসেছে পাকিস্তান থেকে। ওটা ব্যবহার করা হতো কাশ্মিরের উঁচু পাহাড়ে। অন্য কপ্টার অত উঁচুতে উঠতে পারে না। আমি বুঝতেই পারিনি হিন্দ দিয়ে কী করবে। তারপর বুঝতে পারলাম কেন ক্র্যাশ করেছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিমান।'

'আমাদের কয়েকজন ওই হিন্দ ধ্বংস করে দিয়েছে,' বলল ফেং। 'উদ্ধার করা হয়েছে লিবিয়ান ফরেন মিনিস্ট্রির শ'খানেক মানুষকে।'

'প্রথম যখন মিনিস্টার হিসাবে মোহাম্মদ ফাতে আলীর নাম এল, তখন গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। সাংবাদিকরা রিপোর্ট করে ওই মিনিস্ট্রির সবাই চলে গেছে, রিটায়ার করেছে, বা ট্র্যান্সফার হয়ে চলে গেছে সরকারের অন্য ডিপার্টমেন্টে। লিবিয়া এখনও পুলিশ স্টেট, কাজেই সবাই জানে অফিসারদের কাছে জবাব চাইলে বিপদে পড়তে হবে।'

'ঠিক আছে, পরে এ নিয়ে আলাপ করব আমরা,' বলল ফেং।

'এখন আপনাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আপনার অফিস আর বাড়িতে ফাঁদ পেতেছে সিক্রেট পুলিশ।'

'তাই তো এখানে লুকিয়ে আছি।'

'আপনার একযিট স্ট্র্যাটেজি কী?'

'দু' তিনটা পথ ভেবে রেখেছি। তবে ধারণা করছি, আমার কণ্ট্যাক্টরা আগেই জানিয়ে দেবে কোন্ পথে বেরুতে হবে। যে-কোনও সময়ে পালাতে হতে পারে, তাই তৈরি আছি। জজসাহেব বাড়ি ফিরলেই অ্যাম্বুশ করব, বেঁধে রেখে তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাব এখান থেকে। সঙ্গে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে, ওটা আমার লোকেশন জানিয়ে দেবে আমেরিকান স্যাটালাইটকে। আগেই জানিয়ে দিয়েছে, যেতে হবে দক্ষিণের মরুভূমিতে। যতটা পারা যায় সরে যেতে হবে। তারপর চাদের ডার্ফা-র রিফিউজিদের রিলিফ এজেন্সির ছদ্মবেশে আসবে সিআইয়ের কপ্টার।'

'ওদের চাইতে অনেক আগেই আপনাকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে পারব আমরা। তবে সেক্ষেত্রে এখনই রওনা হতে হবে।'

ফেঙের কথা শেষ হতে না হতেই বাজল সিলভারম্যানের ফোন। রিসিভ করল সে, তবে কথা না বলেই শুনতে লাগল। কানেকশন কেটে যাওয়ার পর বলল, 'বড় দেরি হয়ে গেল। আমার কণ্ট্যাক্ট জানাল এই এলাকায় চলে এসেছে পুলিশের দুটো ভ্যান। এদিকে আসছে হেলিকপ্টার। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলবে, তারপর জানাবে যদি বাঁচতে চাই, আত্ম-সমর্পণ করতে হবে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এই দালান থেকে একটা গোপন পথে বেরুনো যায়। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারব না। ঠিক করেছিলাম জাজ বাড়িতে ফিরলে ওই পথে পালাতে হবে।'

চট্ করে সিদ্ধান্ত নিল ফেং। 'আমরা দু' ভাগে ভাগ হয়ে যাব। কাশেম, তুমি সিলভারম্যানের সঙ্গে যাবে। কোনও এম্বাসিতে ঠাঁই নেয়ার চেষ্টা করবে। তবে বাংলাদেশ এম্বাসি বা আমার

দেশেরটায় না। সুইটজারল্যাণ্ড বা অন্য আনঅ্যালাইড দেশ হলে ভাল। ওখানে নিরাপদে থাকবে তোমরা।'

'তুমি কী করবে, ফেং?'

'তোমাদের দু'জনের উপর থেকে সরিয়ে নেব পুলিশদের মনোযোগ। সিলভারম্যান, মাস্টার বাথরুম কোনটা?'

'ওদিকে,' বন্ধ বেডরুম দেখিয়ে দিল সিলভারম্যান।

দ্রুত পায়ে গিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। সিলভারম্যান ও জাজের স্ত্রী নিচু স্বরে কয়েক মুহূর্ত আলাপ করল। মহিলাকে সান্ত্বনা দিল সিআইএ এজেন্ট। মোটা মহিলা এখনও পোশাক পরেনি। গজগজ করে অভিযোগ হানল। এদের পাত্তা দিল না ফেং, বাতি জ্বেলে দিল বাথরুমের। কাবার্ডের ডালা খুলে খুঁজতে লাগল। দশ সেকেণ্ডের আগেই পেয়ে গেল যা চাইছে।

প্রথমেই নিজের চুলগুলোকে ব্রাশ করে সিলভারম্যানের কোঁকড়া চুলের মত করে নিল। তার উপর ঢালল ট্যালকম পাউডার। দূর থেকে মনে হবে কাঁচা-পাকা চুল। ভুরু বদলে গেল কসমেটিক পেন্সিলের বদৌলতে। মুখের ভিতর চালান হলো টয়লেট পেপার, ফুলে উঠল গাল। মাসকারার বোতল পাল্টে দিল মুখ। দূর থেকে ঠিক লিও সিলভারম্যানের মতই লাগবে।

ফেং কী করছে দেখছে সে, খুলে ফেলল নিজে হার্বার পাইলটের শার্ট, ওটা দিয়ে দিল ফেংকে। বদলে পরে নিল ফেঙের খুলে দেয়া শার্ট।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল আমেরিকান এজেন্ট, পথ দেখিয়ে ঢুকে পড়ল উপ-পত্নীর ক্লজিটের ভিতর। ঝুলন্ত পোশাক সরাল সে, পিছন থেকে এল মহিলার তীক্ষ্ণ চিৎকার। তার ক্লজিটে কী করছে, জানতে চাইছে। পাত্তা দিল না সিলভারম্যান, সরিয়ে ফেলল জঘন্য দুর্গন্ধওয়ালা জুতোর র‍্যাক। দেখা গেল দেয়ালের সঙ্গে রাখা একটা তক্তা। ওটা সরাতেই দেখা গেল দুই ফুট চওড়া

ফাঁকা এক অংশ। এই ফাঁকা অংশ গেছে দালানের শেষ মাথা পর্যন্ত। উল্টোদিকে অন্য অ্যাপার্টমেন্টের পিছন-দেয়াল। মাথার উপর দুটো ধুলো ভরা স্কাইলাইট, ওখান থেকে আসছে আলো।

'বাড়িটা যখন অফিস থেকে পাল্টে ফ্ল্যাটবাড়ি করা হলো, তখন এই অংশ ব্যবহার করা যায়নি,' ব্যাখ্যা দিল লিও। 'পুরনো ব্লুপ্রিন্টে দেখতে পাই। এই ফাঁকা অংশ নেমে গেছে নীচে। ওখানে আরেকটা তক্তা রেখেছি। ওটা সরিয়ে বেরুতে পারব গ্যারাজে।'

'ঠিক আছে, তা হলে আপনারা দু'জন নামতে শুরু করুন। কাশেম, তুমি আমাদের গাড়ি নিয়ে গ্যারাজে ফিরবে, তুলে নেবে সিলভারম্যানকে। বাড়িটা এখনও ঘেরাও করেনি পুলিশ। করবেও না, আমার পিছনে তাড়া করবে ওরা।'

'অবশ্য ওরা যদি পুলিশ হয়ে থাকে,' বলল সিলভারম্যান। 'নিশ্চয়ই জানেন ইউনুস আল-কবির গাদ্দাফির সরকারের ভিতর নিজের ছায়া সরকার চালাচ্ছে।'

'এখন কে আসছে ভেবে কী হবে?' বলে ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল কাশেম। দুই পা দু'দিকের দেয়ালে রাখল, সাবধানে নামতে শুরু করল। ওর নড়াচড়ার কারণে উঠল মিহি সাদা ধুলো। হাত-পায়ের চাপে বাঁকা হয়ে গেল কাঠের দেয়াল। প্লাস্টারের টুকরো খসে পড়ছে অনেক নীচের অন্ধকারে।

জাজের বউয়ের মরণ-আলিঙ্গন থেকে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল সিলভারম্যান। মহিলার চোখে বৃষ্টির বান নেমেছে, ফোলা গালদুটো থেকে মেখে নামছে মেকআপ, প্রতি ফোঁপানির সঙ্গে দুলে উঠছে বিশাল দুই স্তন।

তারপর 'আহা, মেয়েমানুষ!' বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল সিলভারম্যান, রওনা হয়ে গেল কাশেমের পিছনে।

অনুসরণ করল ফেং। তবে সে নামছে না। কয়েক ফুট সরে গেল, এখন আর কাশেম বা সিলভারম্যানের মাথার উপর প্লাস্টার

পড়বে না। উপরে উঠতে লাগল সে। তাকে মাত্র বারো ফুট উঠতে হবে। তিন মিনিট পেরুল না স্কাইলাইটে পৌঁছে যেতে। শাফট থেকে এল গমগনে তাপ। ভেসে আসছে পুলিশ-কপ্টারের আওয়াজ। তিক্ত মনে ভাবল, হাতে সময় নেই। কাঁচের প্যানগুলো শক্ত করে ধরল ফেং, কিন্তু ধুলো জড় হয়ে পাথরের মত জমাট বেঁধে গেছে ধাতব ফ্রেম। কয়েকবার টানা-হ্যাঁচড়ার পর একটু ঢিলে হলো।

স্কাইলাইটের উপর দিয়ে ভেসে গেল একটা ছায়া।

কপ্টার!

ঢোক গিলল ফেং, জোর টান দিল বড় প্যানের উপর। ধুপ্ আওয়াজে খুলে গেল ওটা। দ্বিগুণ হলো কপ্টারের আওয়াজ। দুপুরের রোদ আরও কড়া হয়েছে। মনে হলো এয়ার-কণ্ডিশনারের মোটরের ভিতর ঢুকে পড়েছে ও।

স্কাইলাইট থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর শরীর গড়িয়ে দিল ফেং, তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েই চারপাশে চাইল। কয়েক ব্লক দূরে দালানগুলো থেকে এক শ' ফুট উঁচুতে ভাসছে পুলিশের কপ্টার। অপেক্ষা করল ফেং। দুই মিনিট পর ওকে খেয়াল করল স্পটার। ঘুরে গেল কপ্টার, তেড়ে এল বজ্র আওয়াজ তুলে। সাইড ডোর খুলে গেছে। ওখানে পুলিশের স্নাইপারকে দেখা গেল। কাঁধে তুলছে স্কোপওয়ালা রাইফেল।

দুই বাড়ির ছাতের মাঝখানে বুক সমান উঁচু প্যারাপেট। ওটার দিকে ছুটতে শুরু করল ফেং। দুই পা ডেবে যেতে চাইল গরম বিটুমেনে। দেয়ালের মাথার উপর কাঁচ। কপাল ভাল যে কাঁটাতারের মত ধারালো নয় ওগুলো, বছরের পর বছর বাতাসের অত্যাচারে মসৃণ। অনায়াসেই দেয়াল পেরুল ফেং, এসে নামল অন্য পাশে।

প্রথম বাড়ির মতই এই বাড়িটাও। বিস্তৃত ছাত, মাঝখানে শুধু

এলিভেটর হাউসিং, ডজনখানেক স্যাটালাইট ডিশ ও নষ্ট অ্যাণ্টেনা। ছাত ছুঁয়ে তেড়ে এল কপ্টার। কয়েক সেকেণ্ড ব্যয় করল ফেং। স্নাইপার নিশ্চিত হয়ে গেল ওই লোক হারিস জামান না হয়েই যায় না। দুই সেকেণ্ড পর এল তিন রাউণ্ডের গুলিবর্ষণ। ফেঙের পায়ের কাছে নরম বিটুমেন খুবলে নিল ওগুলো।

পুলিশ এখন জানে তাদের লোক ছাতে উঠেছে। সহজে সিলভারম্যানকে নিয়ে পালাতে পারবে কাশেম।

সাপের মত এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করল ফেং, শার্পশুটারকে এড়াতে চাইছে। আরেকটু হলে পড়ে যেত ছাত থেকে। শেষ মুহূর্তে টের পেল এই বাড়িতে ফায়ার এস্কেপ ঠিক জায়গায় নেই। দেয়ালে গেঁথে দেয়া হয়েছে ধাতব মই। চোখের সামনে মরণ-ফাঁদ দেখল ফেং। মই বেয়ে নামতে গেলে খুব কাছ থেকে গুলি করবে স্নাইপার।

চট্ করে পিছনে চাইল ফেং, মাথার উপর ঘুরছে কপ্টার। এইমাত্র স্থির হলো আকাশে। পাশের আরেক বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল ফেং। দৌড়ে গিয়ে দুহাতে ভর দিয়ে উঠে গেল দেয়ালের উপর। এর ফলে ঘ্যাচ করে কেটে গেল ডান তালুর মাংস। সব কাঁচ ভোঁতা হয়নি! লাফ দিয়ে পার হলো ফাঁকা জায়গাটা।

পাশের বাড়ির ছাতে লাগল কয়েকটা বুলেট, ছিটকে উঠল তপ্ত বিটুমেন। খানিক লাগল ফেঙের গালে। দৌড়ের ফাঁকে পিস্তল বের করেই পাল্টা গুলি করল। একটা গুলিও লাগল না কপ্টারে, তবে পাইলট বুঝে গেছে, বেশি বাহাদুরি ভাল না, বিপদ হতে পারে, সরে যেতে লাগল সে।

পরের বাড়ির দিকে বিদ্যুদ্বেগে দৌড়ে চলেছে ফেং, লাফিয়ে উঠল দেয়ালের উপর। নামতে গিয়ে থমকে গেল। পাশের বাড়ির ছাত একতলা নীচে। ওই ছাতের শেষে ফাঁকা জায়গা, শুরু হয়েছে

কনস্ট্রাকশন সাইট। দেয়াল থেকে ঝুলছে ফেং, কোনও ফায়ার এস্কেপ নেই। এমন কী এলিভেটরের কেব্‌ল্ হাউসও নেই।

আবার দেয়ালে উঠে অন্য পথ খুঁজতে হবে। কিন্তু ঠিক তখনই ওর দুই কবজির উপর নিশানা করল স্নাইপার। ইঁট ও সিমেন্টে এসে লাগল বুলেট। বাধ্য হয়ে দুই হাত ছেড়ে দিল ফেং। নীচের ছাতে পড়েই গড়িয়ে দিল দেহ। এতে পড়বার ঝাঁকি কিছুটা কমল, তবে বারো ফুটি পতন ওকে মুক্তি দিল না। ফাঁদ থেকে এখনও বেরুতে পারেনি। আবার তেড়ে আসছে পুলিশের কপ্টার!

তেরো

এয়ার শাফটের নীচে পৌঁছে কাশেম টের পেল, সাদা ধুলো মেখে ভূত হয়ে গেছে। কাঁধ ও হাঁটু টনটন করছে ব্যথায়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, মার্ভেলে ফিরবার পর আর ফাঁকি দেবে না, এখন থেকে নিয়মিত ব্যায়াম করবে ফিটনেস সেন্টারে। চোখের সামনে দেখেছে, কত সহজেই না দেয়াল বেয়ে উঠেছে ফেং। এখন রীতিমত লজ্জা লাগছে ওর। কমপক্ষে তিন মিনিট বাড়তি সময় নিয়েছে।

মেঝে ভরে আছে প্লাস্টারের টুকরো ও কবুতরের শুকনো পায়খানায়। লিও সিলভারম্যান শেষ দুই ফুট লাফিয়ে নেমে এল। মুখে ধুলোর কেক, মাঝ দিয়ে নেমেছে ঘামের স্রোত। চুলগুলো দেখে মনে হলো বয়স বেড়ে সত্তর হয়েছে।

'ঠিক আছেন তো?' হাঁপানোর ফাঁকে জানতে চাইল কাশেম।

গুঙিয়ে উঠল সিআইএ এজেন্ট, 'ভাল কোনও এস্কেপ রুট বেছে রাখা উচিত ছিল।' ধুলোর ভিতর শ্বাস নিতে চাইছে না। চাপা স্বরে বলল, 'আসুন। এই পথে।'

দালানের পিছন দিকে চলেছে ওরা। একটা জায়গায় থামল সিলভারম্যান, হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লাথি ছুঁড়ল ওরা কাঠের দেয়ালের দুই ফুট বর্গাকার এক অংশে। প্রথমে আঘাতগুলো দেয়ালে চিড় তৈরি করল। খসে পড়তে লাগল রং ও প্লাস্টার। এক ইঞ্চি পুরু সিমেন্ট চাপড়া দুই হাতে খুলতে লাগল সিলভারম্যান এক মিনিট পেরুনোর আগেই তৈরি হয়ে গেল একটা পথ। এখন হামাগুড়ি দিয়ে বেরুতে হবে।

এক এক করে এপাশে বেরুল ওরা। কাশেম দেখল এটা একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজ। বেশিরভাগ লট খালি। গাড়ি যে কটা আছে, সেগুলো বোধহয় চালায় গৃহিনীরা। প্রতিটি গাড়ি নতুন। একটা নিয়ে রওনা হবে, ভাবল কাশেম। কিন্তু চিন্তাটা দূর করে দিল। এসব গাড়িতে অ্যালার্ম থাকবে।

'বাঁকের ওপাশে আমাদের গাড়ি,' বলল কাশেম। 'লুকিয়ে থাকুন এক্সিটের সামনে, আমি যাব আর আসব।'

দু'হাতে পোশাক ঝেড়ে নিল কাশেম, তারপর দ্রুত পায়ে রওনা হয়ে গেল র‍্যাম্পের দিকে। গ্যারাজ থেকে বেরুতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল কড়া রোদে। রাস্তার উপর ছুটোছুটি করছে মানুষ। হেলিকপ্টার থেকে গুলি আসছে। সবাই পালাতে ব্যস্ত। ফলের দোকানের বিনের উপর কে যেন পিছলে পড়েছে। রাস্তায় গড়িয়ে চলেছে কমলালেবু। উল্টে গেছে দুই বুড়ো ভদ্রলোকের চেয়ার। ব্যাকগ্যামন খেলোয়াড়দের দেখা গেল না। আসতে শুরু করেছে পুলিশের ভ্যান।

ভীত লিবিয়ানদের মত ছুটতে শুরু করল কাশেম। ভাড়া নেয়া

গাড়ির পাশে পৌঁছল এক দৌড়ে, দরজা খুলেই উঠে পড়ল ড্রাইভিং সিটে। চারপাশ থেকে সাইরেন আসছে। বাতাস কাঁপছে সেই আওয়াজে। চাপা পড়ল কপ্টারের শব্দ।

প্রথমবারেই চালু হলো ফিয়াটের ইঞ্জিন। স্টিয়ারিঙে হাত রেখেই এগুতে চাইল কাশেম। স্টিয়ারিং হুইল ফস্কে গেল ঘর্মাক্ত হাতে, সামনের গাড়ির পিছনে গুঁতো দিয়ে বসল। তীক্ষ্ণ আওয়াজে বাজতে শুরু করল ওই গাড়ির অ্যালার্ম, পুলিশের সাইরেনের সঙ্গে হারমোনাইয করছে যেন।

একটা ভ্যান থেকে নামছে কালো ট্যাকটিকাল গিয়ার পরা অফিসার। কিছুক্ষণের ভিতর এই ব্লক ঘিরবে। তবে মনে হলো সবার চোখ আটকে গেছে বাড়ির দরজায়। গ্যাং ফেঙের কৌশল কাজে লাগছে। পুলিশরা ভাবছে লোকটাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে, কাজেই কোনও প্রসিডিউর মানছে না।

বাঁক ঘুরেই গতি কমাল কাশেম, চলে এল দালানের গ্যারাজের সামনে। তবে থামল না। লিও সিলভারম্যান বেরিয়ে এসেই লাফিয়ে উঠল প্যাসেঞ্জার সিটে। রওনা হয়ে গেল কাশেম, স্বাভাবিক গতি তুলে পেরুল ব্লক। আরও তিন ব্লক যেতে না যেতেই পিছনে কমে এল আওয়াজ।

আটবার স্টপলাইটে থামল কাশেম, আবার এগুলো। এরপর নিজেকে নিরাপদ মনে হলো সিলভারম্যানের, ড্যাশবোর্ডের নীচ থেকে উঁচু করল মাথা। 'ওই যে গ্যাস স্টেশন। ওখানে থামুন।'

'চেপে রাখতে পারবেন না?'

'ওই জন্য না। সিট বদলে নিতে হবে। আপনি তো ভাল করে রাস্তা চেনেন না। স্থানীয়দের মত গাড়ি চালাতে হবে। এখানে কেউ ট্রাফিক আইন মানে না।'

গ্যাস স্টেশনের লটে গিয়ে থামল কাশেম। কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল সিআইএ এজেন্ট, আশা করছে ড্রাইভিং সিট খালি করবে

লোকটা, তখন নিজে সে পিছলে সিটে বসবে। তবে নড়ছে না কাশেম বক্স। বাধ্য হয়ে গাড়ি থেকে বেরুল সিলভারম্যান, এতক্ষণে পাশে সরে প্যাসেঞ্জার সিটে বসল কমাণ্ডো।

ড্রাইভিং সিটে বসে রওনা হয়ে গেল সিলভারম্যান, শুকনো হাসল। 'এই ধরনের পরিস্থিতিতে সিআই-এর ইনস্ট্রাকটার কী বলেন জানেন? ড্রাইভারকে গাড়ি থেকে নামতে হবে।'

কৌতূহল নিয়ে চাইল কাশেম। 'তাই? তার মানে কয়েক সেকেণ্ড খালি থাকবে হুইল। আমার মনে হয় ইনস্ট্রাকটারের সঙ্গে আপনার আলাপ করা উচিত।'

'বাদ দিন,' হাসল সিলভারম্যান। 'আমরা বিপদ পিছনে ফেলে এসেছি।' একের পর এক বাঁক নিয়ে একটা সড়কে পড়ল গাড়ি। জাজের বউয়ের বাড়ি এখন বহু পিছনে। 'দুঃখিত, আপনার নামটা যেন কী?'

'কাশেম। কাশেম বক্স।'

'আরব নাম। কোথাকার মানুষ আপনি?'

'ঢাকার। বাংলাদেশের।'

'আপনার পরিবার কোথা থেকে এসেছে? সৌদি আরব?'

সরু এক গলির ভিতর দিয়ে চলেছে গাড়ি। দুই পাশে প্রকাণ্ড ওয়্যারহাউস। 'না। তবে কয়েক শ' বছর আগে আরব থেকেই গিয়েছিলেন আমার পূর্বপুরুষ।'

'মুসলিম, না খ্রিস্টান?'

'তাতে কী যায় আসে?'

'আপনি যদি খ্রিস্টান হতেন, আমার খারাপ লাগত না... বোধহয়!'

ফিয়াটের ভিতর বিকট আওয়াজ হলো, পিস্তলের বুলেট বিঁধল কাশেমের পাঁজরে। জানালার কাচে ছিটকে লাগল টকটকে লাল রক্ত। দ্বিতীয়বারের মত ট্রিগার টিপল সিলভারম্যান, তবে একটা

গর্তে পড়েছে চাকা। কাশেমের দেহে লাগল না গুলি, পাশের কাঁচ চুরচুর করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এত থমকে গেছে কাশেম, পাল্টা হামলা দূরের কথা, নড়তেই পারল না। ওর মনে হলো, বুকের ভিতর ঢুকেছে উত্তপ্ত খুন্তি। তীব্র ব্যথা বুক-পেটে। টের পেল গরম চটচটে কী যেন নামছে পেট বেয়ে।

হাত বাড়িয়ে খপ করে পিস্তলটা ধরতে চাইল। স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিল সিলভারম্যান, অস্ত্রটা পাঁজরে ঠেসে ধরে ট্রিগার টিপল। যেখান দিয়ে ঢুকেছে প্রথম বুলেট, ঠিক তার এক ইঞ্চি দূর দিয়ে ঢুকল তৃতীয় বুলেট। ভয়ানক ব্যথায় কাতরে উঠল কাশেম। তারই ফাঁকে বুঝল এ লড়াইয়ে মরতে হবে। কনুই দিয়ে চাপ দিল দরজার রিলিজে। দরজা খুলে যেতেই নিজেকে গড়িয়ে দিল বাইরে। ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল গতি তুলে চলেছে গাড়ি। নিতম্ব দিয়ে পড়ল কাশেম, ছিটকে পড়ল না, ছেঁচড়ে চলল পেভমেন্ট ধরে। চামড়া ছড়ে গেল শরীরের নানান জায়গায়।

ফিয়াটের ব্রেক লাইট জ্বলে উঠল। গাড়িটা থামবার আগেই গোড়ালির হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে নিল কাশেম, লোকটার মাথা বেরুতে দেখেই গুলি করল। মিস করল, সেজন্যই আবারও গুলি ছুঁড়ল। এবার ভেঙে পড়ল গাড়ির পিছনের কাঁচ। কাশেমের মনে হলো হাতের ভিতর লাথি দিচ্ছে পিস্তলটা, লক্ষ্য স্থির রাখতে পারছে না। আরও তিন রাউণ্ড গুলি বিঁধল গাড়িতে, অন্যগুলো লাগল রাস্তার ওপাশে দালানের গায়ে। কাশেম যাকে সিআইয়ের এজেন্ট ভেবেছে, সে বোধহয় ধারণা করেছে: ওই লোককে খতম করতে গিয়ে নিজেকে বিপদে ফেলবার কোনও মানেই হয় না।

'তুমি যদি গ্যাস স্টেশনে নামতে, স্রেফ গাড়িটা নিয়ে চলে যেতাম,' বলল সে। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, রাবার

ঘষবার তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে রওনা হয়ে গেল ফিয়াট।

চিত হয়ে পড়ে রইল কাশেম। হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে। দু'দিকের ক্ষত থেকে কুলকুল করে পড়ছে গরম রক্ত। শার্ট উঁচু করে ক্ষতস্থান দেখতে চাইল। ডানদিকের বুলেটের গর্তে জমছে বুদ্বুদের মত ফেনা। ডক্টর ফারার বক্তব্য না শুনেই বুঝে নিল, গুলি লেগেছে ফুসফুসে, দ্রুত হাসপাতালে না গেলে মরবে।

পথের দুই দিক দেখল কাশেম। দু'পাশে অনেক দূর পর্যন্ত শুধু এই গলি। এ পথে আসছে না কোনও গাড়ি। হিসাব কষে ফাঁদে ফেলেছে লোকটা। ওর মনে হচ্ছে অচেতন হয়ে পড়বে। বুকে তীব্র ব্যথা, দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়াল কাশেম, টলতে টলতে রওনা হলো। গলি থেকে বেরুতে চায়। লিও সিলভারম্যান যে-ই হোক, ওর নিশ্চিত মৃত্যুর ব্যবস্থা করেই বিদায় নিয়েছে।

কয়েক পা এগুতে পারল কাশেম, টলছে। তারপর রাস্তার ধারে ভাঙা বোতল ও আবর্জনার ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

চেতনা হারানোর আগে এক পলক ভাবল, বোধহয় ওই বিপদ থেকে বেরুতে পারবে গ্যাং ফেং। বিদ্যুতের তারের মত টানটান ওই চায়নিজ এজেন্ট, ওকে কাবু করা সহজ নয়।

মস্ত বিপদে পড়েছে গ্যাং ফেং। তারই ফাঁকে ভাবল, এতক্ষণে সিলভারম্যানকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে কাশেম। প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে মাথার উপর এসে থামল পুলিশের কপ্টার। ওটার নীচে দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল ফেং। দ্রুত কপ্টার নিয়ে সরে পড়ল পাইলট, চলে গেল পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে। তবে অনায়াসে ওখান থেকে লক্ষ্যভেদ করতে পারবে স্নাইপার। ফেঙের মাথার পিছনের দেয়ালে বিঁধল একটা গুলি বুলেট। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফেং, ঝেড়ে দৌড়াতে শুরু করল। ওকে তাক করছে মার্কস্‌ম্যান, গতিপথের একটু সামনে গুলি করতে চাইল। একটা

বুলেট ফেঙের ডান গোড়ালির পিছনে ছাতে বিঁধল।

নিজেকে ফাঁকা মঞ্চের একমাত্র অভিনেতা মনে হলো চায়নিজ এজেন্টের। এখনই কোনও কাভার না পেলে যে-কোনও সময়ে গুলিবিদ্ধ হবে। সামনে ছাত শেষ, আধ ফুট নীচে কারুকার্যময় এক কার্নিস। একটু দূরে কঙ্কালের মত কনস্ট্রাকশনের ফ্রেমওঅর্ক উঠে গেছে বহু উপরে। কোনও অলিম্পিক লং জাম্পার দৌড় শুরু করলেও ওই বাড়ি থেকে পনেরো ফুট আগেই পড়ে যাবে নীচে। কাশেম ও ফেং আগে যে ক্রেনের বুম দেখেছে, ওটা বেশ কাছে। তবে বুমের উপর লাফিয়ে পড়লে হাতে ধরবার মত কিছুই থাকবে না। ফলাফল: বুম থেকে ছিটকে গিয়ে পাথুরে জমিতে পড়বে।

নীলাকাশের বুকে পেন্সিল দিয়ে নিদাগ আঁকছে বুম, ড্রামের ভিতর পেঁচিয়ে চলেছে কেবলগুলো। উপরের কোনও ফ্লোরে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে মালামাল।

খিপ্র চিতার মত ছুটতে শুরু করল ফেং, যেন উড়াল দেবে আকাশে। অনেক উপর থেকে যিরোইন করল পুলিশ স্নাইপার, ফেঙের পায়ের পিছনের ছাতে বিঁধছে একের পর এক বুলেট। কার্নিসে পৌঁছুনোর আগেই ফেং দেখল, মালামাল তুলছে ক্রেন। গতি খানিক বদলে নিল ও, বাম পা পড়ল কার্নিসের উপর, একই সঙ্গে ডান পা বাড়িয়ে দিল সামনে—উড়ে চলেছে যেন। চারপাশ আঁধার হয়ে গেল ঘন ধূসর মেঘে, চারপাশে রইল শুধু ধুলো।

তারপর শুরু হলো ফেঙের পতন। চল্লিশ ফুট নীচে পাথুরে জমিন। পড়বার গতি বাড়ছে, আচমকা টান পড়ল পেটের পেশির উপর। ব্যথায় কুঁকড়ে যেতে চাইল দেহ। ঝাঁপ দেয়ার সময় বিশ ফুট নীচে মালামাল নিয়ে উঠছিল ক্রেন। ধুপ্ করে জিপসাম বোর্ডের উপর নেমে এল ফেং, পিছলে গেল ডান পা। আরেকটু হলেই পড়ে যেত।

কোনও কেবল ধরবার আগেই ওর পায়ের ধাক্কায় সরে গেল

জিপসাম বোর্ডগুলো। ব্যথায় টনটন করছে ডান গোড়ালি, মচকে গেছে। এদিকে বোর্ডগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে বাড়ি খেয়ে কাত হচ্ছে। পাল্টে গেল ওজনের অ্যাংগেল। কেবল ধরবার জন্য পাগল হয়ে উঠল ফেং, তবে বোর্ডগুলো একইসঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। নীচের দিকে রওনা হলো দুই টন মাল। পড়বার সময় আলাদা হয়ে গেল বোর্ডগুলো। যেন বিশাল কোনও দৈত্য দুই হাতে বাঁটছে তাস।

বোর্ড পতনের ফলে থরথর করে কাঁপছে শরীর। মালামাল পড়ছে, ক্রেনচালক ভারসাম্য অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছে। দু' হাতে একটা কেবল ধরে ফেলল ফেং, বাম পায়েও জড়িয়ে নিল।

ওর কপাল ভাল, ক্রেনের অপারেটর চালাক লোক, ক্যাব থেকে সবই দেখেছে। এইমাত্র লাফিয়ে পড়েছে এক লোক। আর তার কারণে পড়তে শুরু করেছে ভারী শিটগুলো। অপারেটর ধীরে ধীরে ক্রেন নামাল না, তার বদলে লক করে দিল কেবল স্পুল। অসম্পূর্ণ দালানের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে বুমটাকে।

কেবলের শেষে ঝুলছে ভারী হুক, ওটা ধরে পেণ্ডুলামের মত দুলছে ফেং। দালানের পাশে পৌঁছেই শরীর দুলিয়ে নামল মেঝেতে। অমসৃণ কংক্রিটে পিছলাল না পা, টলমল করে সামলে নিল। কয়েক তলা উপরে রয়েছে শ্রমিকরা, তারা ফেঙের ওই স্টান্ট দেখেছে। এই বাড়িতে এখনও সিঁড়ি তৈরি হয়নি। মই বেয়ে নেমে আসতে তাদের কয়েক মিনিট লাগবে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে আরেক দিকে রওনা হয়ে গেল ফেং। দালানের এক পাশে রয়েছে আবর্জনা ফেলবার শ্যুট। ওটার পাশে গিয়ে নীচে চাইল। ধাতব শ্যুট দেখতে টিউবের মত, ডায়ামিটার হবে চব্বিশ ইঞ্চির চেয়ে বেশি। জিনিসটা শেষ হয়েছে প্রকাণ্ড এক সবুজ ডাস্টবিনের উপর। ওটা আবার আছে একটা ফ্ল্যাটবেড ট্রাকের পিঠে। শ্যুটের ভিতর নেমে পড়ল ফেং, দেয়ালে ঠেসে

রাখল বাম পা, পিছনে দু'হাত রেখে সাবধানে নিয়ন্ত্রিত ভাবে নামতে লাগল। এখন একটাই ভয়, কেউ যদি উপর থেকে আবর্জনা ফেলে, সব এসে পড়বে ওর মাথার উপর। ফলে পাথরের মত নীচে গিয়ে পড়বে।

দুই মিনিট পর ডাস্টবিনের ধুলো-ময়লায় নেমে এল ফেং। দেরি না করে সরে গেল ডাস্টবিনের এক পাশে, মাটিতে নেমে এসে রওনা হয়ে গেল কনস্ট্রাকশন সাইটের গেটের দিকে। সবাই ভাবছে পলাতক এখনও চারতলায়, কারও চোখ ওর দিকে এল না। তার চেয়ে বড় কথা: ছয়তলা উচ্চতায় ভাসছে কপ্টার, স্নাইপারকে নিয়ে বাড়িগুলোর ছাত দেখছে পাইলট। নিঃসঙ্গ কোনও লোক কনস্ট্রাকশন সাইটের উঠান পেরুলে তাদের কী!

একটু দূরেই একটা পাম্প ট্রাক। ওটার উপর একটা সিমেন্ট মিক্সার, ডিজাইন করা হয়েছে আর্মার্ড হোস দিয়ে কংক্রিট উপরে পাঠানোর জন্য। এখন মিক্সারের পাম্প থেকে গলগল করে উপরে উঠছে কংক্রিট। ড্রাইভার কিছু বুঝবার আগেই ট্রাকের সামনের বাম্পারে লাফ দিয়ে উঠল ফেং, পা রাখল ড্রাইভারের ফেণ্ডারে, তারপর খপ্ করে ধরল বড়সড় উইং মিররের ডাণ্ডা। ড্রাইভার এখনও দেখেনি ওকে। খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল ফেং। চোয়ালের উপর প্রচণ্ড লাথি খেল ড্রাইভার, সিট থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল পাশের দরজার গায়ে।

ক্যাবের পিছনে গুড়গুড় আওয়াজ তুলছে মিক্সচার। সিমেন্টের ওই ড্রামের কারণে থরথর করে কাঁপছে গোটা ট্রাক। এক লাথিতে অচেতন ড্রাইভারকে প্যাসেঞ্জার ফুটওয়েলে পাঠিয়ে দিল ফেং। ফার্স্টগিয়ার দিয়ে রওনা হয়ে গেল। বিস্মিত শ্রমিকদের চিৎকার শুনতে পেল না, তবে আয়নার ভিতর দেখল সিমেন্ট মিক্সারের দিকে ছুটে আসছে তারা।

ট্রাক ঘুরিয়ে নিয়েই সুরকি ছাওয়া রাস্তায় উঠে এল ফেং,

পিছনের মিক্সচারের শ্যুট থেকে পড়ছে সিমেন্ট। এই ট্রাক যেন ডায়েরিয়া আক্রান্ত যান্ত্রিক কোনও দানব। বোধহয় কপ্টার থেকে গ্রাউণ্ড ফোর্সকে সতর্ক করা হয়েছে। পুলিশ ছুটে আসছে কনস্ট্রাকশন সাইটের দিকে। অন্তত ছয়জন তারা, প্রায় পৌঁছে গেছে চেইন-লিঙ্ক গেটের কাছে। আর ঠিক তখনই গেট উপড়ে সবাইকে চমকে দিয়ে বেরিয়ে এল ফেঙের ট্রাক। ছিটকে সরে গেল পুলিশ ক'জন।

বাঁক ঘুরেই এগুতে শুরু করেছে ট্রাক। স্টিলের শ্যুট এক দিকে ঘুরল, মনে হলো ফুল সুইঙে চালানো হয়েছে ক্রিকেট ব্যাট। ওটা সরবার সময় দুই লোককে ছিটকে ফেলেছে, ভেঙে দিয়েছে পার্ক করা এক সেডানের উইণ্ডশিল্ড। ফেঙের পিছু নিয়েছে পুলিশের একটা গাড়ি। সিমেন্ট মিক্সকার চেপে বসল ক্রুজারের হুডের উপর। মস্ত ট্রাক এবং কংক্রিটের ওজন পিষে দিল পুলিশের গাড়ির বনেট, চুরমার হয়ে গেল রেডিয়েটর। ট্রাকের পিছন চাকা পিছলে লাগল প্যাট্রল কারে, সরু রাস্তা জুড়ে থমকে গেল ওটা।

ট্রাক দ্রুত গতিতে রওনা হতেই ঘুরতে লাগল শ্যুট। সামনের একটা গাড়ির উইণ্ডশিল্ড চুরমার করে দিল। ধাতব লেজের মত এদিক ওদিক নড়ছে শ্যুট। চারপাশের গাড়িগুলো বিধ্বস্ত হচ্ছে। এসব গাড়ি না সরালে পিছু নিতে পারবে না পুলিশের ক্রুজার।

আয়নায় পিছনে চাইল ফেং, থেমে গেছে পুলিশের গাড়ি, লোকগুলো গুলি শুরু করেছে ট্রাকের দিকে। কিন্তু প্রকাণ্ড ঘুরন্ত ড্রামের কারণে একটা গুলিও লাগছে না ক্যাবে। ঝোড়ো গতি তুলছে ফেং, প্রতি সেকেণ্ডে বাড়িয়ে চলেছে দূরত্ব। গাড়িভরা পুলিশ নিয়ে কোনও চিন্তা নেই ওর, সমস্যা অন্যখানে। মাথার উপর ঘুরছে হেলিকপ্টার। এভাবে পালাতে দেবে না, ওর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে পাইলট, জানিয়ে দিচ্ছে ওর পজিশন।

সামনের পথ চওড়া হয়েছে, পিছনে পড়ল আবাসিক এলাকা।

তবে দূরে দেখা গেল প্রায় সত্তর মাইল গতি তুলে আসছে আরও তিনটে পুলিশের গাড়ি, ঝিকমিক করছে মাথার উপরের বাতি। এদের সঙ্গে রয়েছে চাকাওয়ালা আর্মার্ড ভেহিকেল। ফেং আন্দাজ করল, ওই গাড়িতে রয়েছে হেভি মেশিনগান।

অ্যাক্সেলারেটার মেঝের সঙ্গে টিপে ধরল ফেং। ট্র্যান্সমিশনে শর্ট শিফট করে দ্রুত গতি তুলতে চাইছে। ক্রুজারগুলো থেকে এক শ' ফুট দূরে থাকতেই কড়া ব্রেক কষল ফেং, বনবন করে ঘুরিয়ে দিল স্টিয়ারিং হুইল। সামনের ফেণ্ডার লাগল একটা বড় ডেলিভারি ট্রাকের পিছনে, সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারাল সিমেন্ট মিক্সার। বাইরের দিকের হুইলে ভর করে বিদ্যুদ্বেগে একপাশে সরতে লাগল ড্রাম, পরক্ষণে ট্রাক নিয়ে কাত হয়ে পড়ল।

প্যাসেঞ্জার সিটে ছিটকে পড়তে পারে, কাজেই দু' হাতে হুইল ধরেছে ফেং, দু'বাহু দিয়ে আড়াল করেছে মুখ। উইণ্ডশিল্ডের অজস্র কাঁচের টুকরো ছিটকে এল ভিতরে। ট্রাকের অজ্ঞান ড্রাইভার তার গর্তের ভিতর ভাল ভাবেই আটকা পড়েছে, তার উপর বর্ষণ হলো না কাঁচের।

সড়কের উপর ট্রাক আছড়ে পড়তেই প্রচণ্ড ঝাঁকিতে খুলে গেল সিমেন্ট ড্রামের পিন, ভেঙে গেল চেইন ড্রাইভের লিঙ্ক—বাকি কাজটুকু করল তীব্র গতি।

লেংচে লেংচে ছুটতে শুরু করল এগারো টনের স্টিল ও কংক্রিটের ড্রাম, ওটার প্রকাণ্ড মুখ থেকে ছলকে পড়ছে সিমেন্ট। পুলিশের দুই গাড়ির ড্রাইভার যথেষ্ট বুদ্ধিমান, ছিটকে সরে যেতে চাইল তারা, সামনের বাঁকে উঠে পড়ল ফুটপাথের উপর। একটা গাড়ি গুঁতো দিল বিদ্যুতের থামে, অন্যটার সামনের অংশ গেঁথে গেল এক দেয়ালে। অন্য ক্রুজার ও আর্মার্ড-কার আরও কাছে ছিল, ওগুলো কোনও সুযোগই পেল না। প্রকাণ্ড ড্রাম চড়ে বসল আর্মার্ড কারের ঢালু নাকে, চুরমার করে উড়িয়ে দিল খুদে টারেট।

গানার দু' টুকরো হতো, তবে শেষ মুহূর্তে ঢুকে পড়েছে গাড়ির ভিতর।

আর্মার্ড কার পেরিয়ে ধুপ করে পড়ল ড্রাম, অ্যাসফল্ট ফাটিয়ে দিয়ে লাগল গিয়ে পুলিশের ক্রুজারে। মুড়মুড় করে চেপ্টে দিল গাড়ির নাক থেকে পিছনের সিট পর্যন্ত। একটা দালানের গায়ে গিয়ে ঠেকল ব্যারেল, ওখানেই ধড়াম করে বাড়ি দিয়ে থেমে গেল। ওটার মুখ থেকে টুথ পেস্টের মত থকথকে সিমেন্ট পড়ছে।

ট্রাকের ক্যাবের পিছন-দেয়ালে পেগ থেকে ঝুলছে একটা স্পেয়ার ওঅর্ক শার্ট, ওটা খুলে নিল ফেং, ভেঙে পড়া উইণ্ডশিল্ডের ফাঁক দিয়ে বেরুল। আছে ট্রাকের আড়ালে, কপ্টারের আরোহীরা ওকে দেখতে পাবে না। দ্রুত হাতে মুখ থেকে কসমেটিক মুছে ফেলল ফেং, পরে নিল ডেনিম শার্ট। গোড়ালির ব্যথা তীব্র হয়ে উঠেছে, তবে ওটা পাত্তা না দিয়ে নেমে পড়ল ট্রাকের সামনে, সামান্যতম না খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। মাত্র কয়েক গজ গিয়ে উঠে পড়ল ফুটপাথে। দোকান ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে বহু লোক, চেয়ে রয়েছে দুর্ঘটনার জায়গার দিকে। ঠিক তাদেরই মত ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে গেল ফেং।

কিছুক্ষণ পর এল পুলিশের গাড়ি। যারা দুর্ঘটনা চাক্ষুষ করেছে, তাদের জেরা শুরু হলো। ফেংকে কোনও পাত্তাই দেয়া হলো না, পুলিশ খুঁজছে এক লিবিয়ান লোককে, আরবি জানে না এমন কোনও এশিয়ানকে দিয়ে তাদের চলবে না। খানিক অপেক্ষা করে হাঁটতে শুরু করল ফেং, হারিয়ে গেল ভিড়ে। অনেক দূরে সরে ফোন দিল। পাঁচ মিনিট পর এল ভাড়াটে চায়নিজ দলের সদস্যরা। তাদের ভ্যানে চড়ে রওনা হয়ে গেল ফেং।

ফেঙের ভাড়া নেয়া ফিয়াট পাঁচ মাইল সরে যাওয়ার পর বেজে

উঠল হারিস জামানের ফোন।

'হ্যাঁ, আমি,' ভুরু কুঁচকে বলল সে। 'আজ একটা রেইড হয়েছে। আরেকটু হলে ধরা পড়তাম পুলিশের হাতে। খবর নিয়ে জানাও কেন আমাকে সতর্ক করা হয়নি। এমন হওয়া উচিত ছিল না। সরে আসার সময় খানিক সাহায্য করেছে ওই অভিশপ্ত জাহাজের লোক। ওদের কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করছি, এমন সময় এল পুলিশ।'

চুপচাপ শুনতে লাগল হারিস, তারপর জবাব দিল, 'এখন কেউ এসব বললে ছিঁড়ে নেব জিভ! এই তুমিই তো ঠিক করেছ উপকূল সড়কে অ্যাম্বুশ হবে, নিজের পছন্দের লোকও রেখেছ। আমাদের যে লোক পুলিশের ভিতর থেকে রিপোর্ট দিয়েছে, ওই রিপোর্ট তুমি-আমি দু'জনই পড়েছি। সড়কে সাধারণ গাড়িকে থামাতে নিষেধ করা হয়েছিল। বদলে কী হলো? তোমার ওয়েল ট্রেইণ্ড পুলিশ পাগল হয়ে উঠল ঘুষের জন্য। জানি না ওই জাহাজের লোকগুলো কী করে ওদেরকে শেষ করল, কিন্তু তা-ই হয়েছে। তারপর আরও সামনে গিয়ে আমাদের হিন্দ উড়িয়ে দিয়েছে, মুক্ত করে দিয়েছে বেশিরভাগ বন্দিকে, প্রায় বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে আমাদের পরিকল্পনার... অ্যাঁ, কী? হ্যাঁ, তাই বলেছি, মুক্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয়ই ওদের কার্গো জাহাজ ভেড়ে কোলিং স্টেশনে। আমাদের লোক খালি একটা বক্সাকার দেখল, ডুবছে তখন... আমি কী করে বলব? ওই জাহাজ বোধহয় স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত চলতে পারে। নইলে বলতে হবে তুমি ট্রাক থামাতে যাদেরকে পাঠিয়েছ, তাদের চেয়েও বেশি গাধা ওই কপ্টারের লোকগুলো। ...আপাতত শহর থেকে হারিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে। সত্যি বলতে, চলে যাচ্ছি দেশ ছেড়ে। আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এক পাইলটকে চিনি। তাকে অনুরোধ করব আমাকে সরিয়ে নিতে। যারা ইউনুস আল-কবিরের সমাধি খুঁজছে,

তাদের ওখানে যাচ্ছি। পৌঁছেই নেতৃত্ব বুঝে নেব। এটা বলতে পারি, ক্ষতি যা-ই হয়ে থাক, তুমি ভাল ভাবেই এদিক সামলে নেবে। এতক্ষণে বাংলাদেশি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার কথা জল্লাদখানায়। কর্নেল হোসেন ফোন করেছিল, জানিয়েছে আমাদের আত্মত্যাগী দল রওনা হয়েছে।' চুপ হয়ে গেল হারিস, ওদিক থেকে কোনও কথা নেই। 'সব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর ফোন দেব না,' বলল হারিস। 'বিদায়ের সময় শুধু বলব, মহান আল্লাহ্ আমাদের উপর করুণা করুন।'

কানেকশন কেটে দিল হারিস জামান, পাশের সিটে রেখে দিল এনক্রিপ্টেড ফোন। নিজ আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে। নইলে এত দিন টিকত না। আজকের এই হামলা তাকে রাগিয়ে দিয়েছে। খানিক আগে মিথ্যা বলেনি, লিবিয়ান সরকারের ভিতর রয়েছে তাদের গুপ্তচর ও সহানুভূতিশীল বহু মানুষ। আগেই তাকে সতর্ক করা হয়েছে, বাড়ি ও অফিসে যে-কোনও সময়ে রেইড হবে। কিন্তু এই পুলিশি রেইডে আগেই সতর্কবাণী আসবার কথা ছিল, আসেনি।

তিক্ত হাসল হারিস জামান। ভাবল, সুপ্রিম লিডার মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে বুঝিয়ে দিতে হবে, তার ক্ষমতা আসলে বেশি নয়।

চোদ্দ

পাক্কা পনেরো মিনিট পাঁজরের নীচে খোঁচা দিয়ে চলেছে ছোরার মত পাথরটা, এবার সাবধানে ওটা সরিয়ে ফেলল সোহেল। ওর

পাশেই নিথর শুয়ে ক্যাপ্টেন নিশাত। আরেক পাশে রায়হান, স্বর্ণা ও স্মৃতি মাহমুদ।

এ দেশে এসে একের পর এক ঝুঁকি নিয়েছে স্মৃতি। এখনও যে-কোনও সময়ে বন্দি হতে পারে জঙ্গিদের হাতে। তারপরও নিজে থেকেই এই মিশনে আসতে চেয়েছে। ডক্টর ফারা ওর নানা ধরনের পরীক্ষা করার পর সনদ দিয়েছে, ও সম্পূর্ণ সুস্থ।

একটা টিলার উপর শুয়ে আছে ওরা। সামনেই শুকনো সেই নদী, এখান থেকে দেখে মনে হয় চওড়া একটা উপত্যকা। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এখানে নিজ দল নিয়ে ইউনুস আল-কবিরের হারিয়ে যাওয়া সমাধি খুঁজেছে স্মৃতি। তখন কোনও বিপদ ছিল না। কিন্তু এখন টিলার নীচে জড় হয়েছে ট্রেইনিং ক্যাম্প থেকে আসা এক ডজন জঙ্গি। লোকগুলো হয়তো দক্ষ খুনি ও মানুষের হাত-পা-রগ কাটতে অভ্যস্ত, তবে জানে না আর্কিওলজি কী জিনিস। এদের দলের নেতা বুঝতে পারছে না তারা এখানে কী করছে। পুরো নদী-খাতের এ অংশে পৌঁছেই সবাইকে ছড়িয়ে পড়তে বলে সে। এরপর খাড়া পাড়েও উঠেছে, যদি সমাধির কোনও চিহ্ন মেলে! তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। তারা একটা একটা করে পাথর সরিয়ে দেখতে শুরু করে। পরে বুঝেছে, এভাবে খুঁজে কোনও লাভ হবে না। যে গতিতে কাজ চলছে, চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর তারা পৌঁছুবে স্মৃতির সেই জলপ্রপাতে।

লোকগুলোর সঙ্গে রয়েছে আর্কিওলজিস্ট ব্রাম ট্যাগার্ট। বিনকিউলার ব্যবহার করতে পারছে না র‍্যাভেল টিম, তাই বোঝা যাচ্ছে না লোকটার অবস্থা কেমন। তবে মনে হলো সুস্থই আছে। আর সবার সঙ্গে খুঁজে চলেছে জলদস্যু নেতার ফেলে যাওয়া চিহ্ন। ধীরে ধীরে হাঁটছে, মনে হলো না মারধর পড়েছে, বা আহত হয়েছে। তিউনিশিয়ার অ্যান্টিকিউটি মিনিস্ট্রির রিপ্রেজেন্টেটিভ বা তার ছেলেকে দেখা গেল না। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য লোকটাকে

যথেষ্ট পয়সা দেয়া হয়েছে, এতক্ষণে ফিরে গেছে সে তিউনিসে।

কোথাও দেখা যায়নি পুরনো এমআই-৮ কপ্টার। সোহেলরা ধারণা করে নিয়েছে, নদীর আরও ভাটিতে নেমেছে ওটা। বোধহয় প্রয়োজনে জঙ্গিদের সামনে বা পিছনে নিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই এরা নির্দিষ্ট একটা অংশ পর্যন্ত যাবে, তারপর অন্য কোথাও খুঁজতে শুরু করবে।

রায়হানের কোমরে টোকা দিল সোহেল, সিগনাল দিয়ে জানিয়ে দিল, ওরা টিলার কিনারা থেকে পিছিয়ে যাবে। প্রায় নিঃশব্দে ক্রল করে রওনা হয়ে গেল সোহেল। ওর পর পরই স্বর্ণা, স্মৃতি ও রায়হান। নিজ জায়গা থেকে নড়ল না ক্যাপ্টেন নিশাত। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে বুঝে নিল নীচ থেকে কেউ খেয়াল করেনি। এবার নিজেও পিছিয়ে এল।

পরের বিশ মিনিট দক্ষিণে এগুলো ওরা, তারপর আবারও থামল।

ফিসফিস করে বলল রায়হান, 'আপনার কী মনে হয়, সোহেল ভাই?'

'কী বুঝতে বলো, হে?'

সোহেল আর কিছু বলছে না দেখে বলল স্বর্ণা, 'কাজ তো সহজ। পচে যাওয়া পিশাচগুলোকে খতম করে দিতে হবে; খুঁজে বের করতে হবে সমাধি—আবার কী? এটুকু না পারলে চলবে কেন? ...বাপরে, মেলা কাজ!'

মৃদু হেসে ফেলল স্মৃতি।

'আসল কথায় আসা যাক,' বলল গম্ভীর নিশাত। 'আমরা এখন জানি বদমায়েশগুলো কোথায়। হাতে সময় নেই। কয়েক ঘণ্টার ভিতর জলপ্রপাতে পৌঁছে যাবে তারা। এবার রায়হান আর সোহেল ভাই, আপনারা ঠিক করুন কীভাবে পাব সমাধি।'

'আগে জলপ্রপাতগুলো দেখতে হবে,' মতামত দিল রায়হান।

এই প্রথমবারের মত ওদের পরিকল্পনা শুনল স্মৃতি, কাজেই বলল, 'দাঁড়ান, একসেকেণ্ড। সব জলপ্রপাত আমি নিজ চোখে দেখেছি। কোনও পালতোলা জাহাজের সাধ্যি ছিল না ওগুলো পেরুবে। এসব প্রপাতের দেয়াল অনেক খাড়া।'

'হলোই বা,' উদাস হয়ে বলল সোহেল। 'আরেকবার ঝালিয়ে নেয়া যাক প্ল্যান।' এক পলক সবাইকে দেখে নিল। 'আমরা খুঁজে বের করতে চাইছি সমাধি। আপা, আপনি পিছনে রয়ে যাবেন। চোখ রাখবেন জঙ্গিদের উপর। ওরা আমাদের জলপ্রপাত থেকে একঘণ্টা দূরত্বে থাকতেই রেডিও করবেন। তখন সরে যাব আমরা। কারও কোনও প্রশ্ন?'

চুপ রইল সবাই। কোনও জিজ্ঞাসা নেই।

অনেক দূরে নদী-খাতে নেমেছে আলম সিরাজের কপ্টার, ওদের পৌঁছে দিয়েই চলে গেছেন ভদ্রলোক। তারপর থেকে হেঁটে চলেছে ওরা। মাঝে জঙ্গিদের দেখে সামান্য বিরতি পড়েছে। তারপর আবারও হাঁটতে শুরু করেছে। এখন দ্রুত চলছে পা, বেশি সময় লাগল না সোহেল, স্বর্ণা, স্মৃতি ও রায়হান পৌঁছে গেল জলপ্রপাতে। এখানে প্রথমবারের মত ভাঙা পড়েছে নদী-খাত। ব্লাফের উপর থেকে নীচের দিকে চাইল ওরা। সোহেল জানিয়ে দিল স্মৃতি যেন স্বর্ণা ও রায়হানের কাছ থেকে দূরে না সরে। নিজে সে যাবে এলাকা স্কাউটিং করতে। স্মৃতিকে নিয়ে একটা টিলার উপর উঠল স্বর্ণা ও রায়হান, বিনকিউলার দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল চারপাশ।

আগে নিজের দলকে নিয়ে এত উপরে ওঠেনি স্মৃতি, নীচের দৃশ্যটা দারুণ সুন্দর লাগল ওর কাছে। নদী-খাতে অদ্ভুত এক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল। উজানের দিকে প্রথম ক্যাটারাক্টের সামনে রয়েছে প্রাকৃতিক এক গামলা, নদীর পুরো প্রস্থ পর্যন্ত বিস্তৃত। লিভিং রকে ভরা বেসিন, কোটি বছর ধরে

একইরকম। জায়গাটা দৈর্ঘ্যে বড়জোর এক শ' ফুট, উজানের দিকে টিলার বুক দেয়ালের মত। এই খুদে প্রপাত মাত্র চার ফুট উঁচু। বেশিরভাগ ঝর্নার খাতে যে জোরালো স্রোত দুই পাড় থেকে সরিয়ে নেয় পাথর, এখানে তা হয়নি, বেসিনের মেঝে ভরে আছে পানির স্রোতে মসৃণ হওয়া পাথরে।

উপর থেকে স্মৃতি দেখল, ওখানে রয়েছে প্রাচীন এক প্রাচীর। কেন পানির ভিতর গড়ে তোলা হয়, কে জানে! এই প্রপাতের এক শ' ফুট সামনে ঘিরে দিয়েছে নদী-খাতকে।

মেঝের পাথরগুলো দেখেই বিনকিউলার চেয়ে নিয়েছে স্মৃতি। কয়েক মিনিট প্রাচীরের দিকে চেয়ে রইল। ওকে দেখে মনে হলো ভাবছে, ওই দেয়াল যে-কোনও সময়ে নড়ে উঠবে, আর বেরিয়ে আসবে ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ। আসলে কিছুই ঘটবে না, তবে দেয়ালটা যেন নীরবে বলছে, পাহাড়ের ভিতর রয়েছে কোনও পোতাশ্রয়।

'ওগুলো ব্যাসল্ট,' বিনকিউলার ফিরিয়ে দিল স্মৃতি। 'ওই দেয়ালের মতই।'

একটু আগে ফিরেছে সোহেল। জানতে চাইল, 'তো?'

'এই দেশে প্রথম স্যাণ্ডস্টোনের বদলে অন্য পাথর দেখলাম। এর মানে এখানে কোনও ভলক্যানিক অ্যাক্টিভিটি ছিল।'

'ফলে?' জানতে চাইল রায়হান।

'তার মানেই, এখানে যে-কোনও জায়গায় গুহা থাকতে পারে।'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' বলল স্বর্ণা।

হতাশা প্রকাশ পেল স্মৃতির কণ্ঠে, 'কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। ইউনুস আল-কবির এসব প্রপাত পেরিয়ে জাহাজ নিয়ে যেতে পারত না।'

'আপনি এ অঞ্চলকে জিওলজিস্টদের মত দেখছেন, কোনও

ইঞ্জিনিয়ারের মত নয়,' বলল সোহেল। রায়হানের দিকে চাইল। 'তোমার কী মনে হয়?'

'নদীর বুকেও দেয়াল আছে, ঠিক তীরের মত,' নদীর পাড়ে উঁচু কার্নিস দেখিয়ে দিল রায়হান।

'ঠিক,' বলল সোহেল। 'ওদিকটা অন্য দিকের চেয়ে কমপক্ষে বিশ ফুট উঁচু।'

মনে হলো ওরা কী যেন গোপন করছে।

'আপনারা কী নিয়ে আলাপ করছেন?' জানতে চাইল স্মৃতি। মার্ভেল জাহাজের সবাইকে ওর মার্সেনারি মনে হয়েছে। একবারও ভাবেনি এরা অন্য কিছুও জানতে পারে। এখন নিজেদের ভিতর আলাপ করছে, কিন্তু কিছুই বুঝছে না স্মৃতি। কাজেই বিরক্তি বোধ করছে।

'ডেরিক্‌স্‌,' সংক্ষেপে বলল সোহেল।

'আসুন, আপনাকে দেখিয়ে দিই,' যোগ করল রায়হান।

কার্নিসে নেমে এল ওরা। বর্ষার সময় নদী যখন ভরে উঠত, তখনও এই পাড় থাকত পানি-সমতল থেকে কয়েক ফুট উপরে। নদীর বুকেও দেয়াল দিয়ে ঘিরেছে। তবে তা কম উচ্চতার।

সোহেল ও রায়হান সেদিকে না চেয়ে কার্নিস থেকে নীচের জমিনের দিকে চেয়ে রয়েছে। তারপর কী যেন দেখতে পেল ওরা। নেমে গেল রায়হান, হাঁটু গেড়ে স্যাণ্ডস্টোনের উপর হাত রাখল, ধুলো-বালি সরাতে লাগল।

'তা হলে পাওয়া গেল,' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল। আঁজলা ভরে বালি তুলতে শুরু করেছে। বালির বুক থেকে বেরিয়ে এসেছে বিশ ইঞ্চি চওড়া একটা গর্ত। 'অনেক আগে এখানে ড্রিল করা হয়েছিল।' পুরো হাত ভরে দিল রায়হান।

'কী করছেন?' জানতে চাইল স্মৃতি। আর সবার সঙ্গে নেমে এসেছে নদী-খাতে।

'ডেরিকের জন্য এখানে বসানো হয়েছিল খুঁটি,' বলল সোহেল। 'আন্দাজ করছি ওগুলো ছিল শুকনো গাছের গুঁড়ি। এসবের সঙ্গে আড়ার মত থাকত বুম, দৈর্ঘ্যে ছিল নদীর অর্ধেক পর্যন্ত। খুঁটির গর্ত দেখে মনে হয়, বুমটা ছিল প্রকাণ্ড। ওটা বহু টন ওজন তুলতে পারত। অন্য তীরেও এই বুমের মত আরও ছিল।'

'বুঝলাম না, ওগুলো দিয়ে কী হতো?'

'এসব বুম দিয়ে নদীতে নামানো হতো পাথর,' বলল রায়হান।

'একটু ভুল হলো,' শুধরে দিল সোহেল। 'ওরা ব্যবহার করত বুনট করা বাস্কেট, বা পাল দিয়ে তৈরি ব্যাগ। এসবের ভিতর থাকত বালি। কাজ শেষে বালি পড়ে থাকলেই বা কী? স্রোত সরিয়ে নেবে সব। ক্ষতি নেই কোনও।'

'ঠিকই বলেছেন, সোহেল ভাই,' কথাটা মনে ধরেছে রায়হানের। 'মস্ত সব ব্যাগে বালি ভরে দেয়ালের আগে নামিয়ে দিত। প্রপাতের সামনে পানি জড় করত। একই কাজ করেছে পরেও। কখনোই পুরো নদী-খাত আটকে দিতে চাইত না। নইলে তাদের দেয়াল উপড়ে নিয়ে ছুটত প্রবল স্রোত।'

মাথা দোলাল সোহেল। 'ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ থাকত একটা শিপিং লকে। ওই চেম্বারে পরিমিত পানি জমত, এদিকে উঁচু করত বালির প্রাচীর। আরও পানি ভরে যেতেই জাহাজ নিয়ে যেত পরের লকে। নিশ্চয়ই ইউনুস আল-কবিরের ইঞ্জিনিয়াররা প্রাকৃতিক লক দেখেছিল, সেখান থেকেই পেয়েছে বুদ্ধিটা।'

'পরেও তাই করেছে,' বলল রায়হান। 'উজানের দিকে নিয়ে গেছে জাহাজটাকে।'

'আপনারা এই এলাকা না দেখেই আন্দাজ করেছেন?' শ্রদ্ধার সুরে বলল স্মৃতি। 'এ আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।'

'এই লক একমাত্র জিনিস যেটার সঙ্গে মিলবে জেফ মার্টেলের বলা "অদ্ভুত এক যন্ত্র,"' বলল সোহেল। 'তা ছাড়া...' একটু দ্বিধা করে ভাবল প্রশংসা না পেলেও চলে, 'রায়হান আর আমি আসার আগে স্যাটালাইট ইমেজারি দেখে নিশ্চিত হয়েছি, আমাদের হাইপথেসিস ভুল হবে না।'

'যাই হোক, কম ব্যাপার নয়,' বলল স্মৃতি। 'এত পড়াশোনা করেও এখন নিজেকে বুদ্ধু মনে হচ্ছে। এসব পাথুরে দেয়াল ও পাড়ের দিকে আমিও ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থেকেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিনি।'

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল রায়হান, 'একটা শুকনো মৌসুমে থেমে যায় নদী, আর সে সুযোগে ইউনুস আল-কবিরের লোক প্রপাতের আগে লক সিস্টেম তৈরি করে। এর ফলে এমন একটা জায়গায় যেতে পারল তাদের জাহাজ, যেখানে কেউ খুঁজবেই না।'

'তা হলে আরও উজানে রয়েছে ওই গুহা?'

'তাই।'

'চলো সবাই, রওনা হয়ে যাই,' বলল সোহেল।

এখন পর্যন্ত কী জানা গেছে, তা নিশাতকে রেডিও করে জানিয়ে দিল। বলে দিল, দূরত্ব ও টপোগ্রাফির কারণে রেডিও কণ্ট্যাক্ট হারিয়ে যেতে পারে। জবাবে কোনও কথা বলল না নিশাত। বোধহয় খুব কাছেই জঙ্গিরা। বদলে ইয়ারপিসে দ্রুত দুটো টোকার আওয়াজ এল।

তীরের দিকে চার ভাগের তিন ভাগ উঠে দক্ষিণে রওনা হয়ে গেল ওরা। দূরের দিগন্ত থেকে ওদেরকে দেখবে না কেউ। তা ছাড়া, বালি-ভরা দমকা হাওয়া আসছে মরুভূমি থেকে, সেটা থেকেও রক্ষা পাবে। এ এলাকা এমনই, নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হয়। ঝিকমিকে সোনার মত আকাশ যেন ওদের সঙ্গে চলেছে। প্রত্যেকে ক্যান্টিনে এক দিনের পানি নিয়েছে। এই চারজনের

ভিতর দু'জনই গত কয়েক দিনের ধকলে পরিশ্রান্ত।

কাজেই ওদেরকে তাড়া দিল না সোহেল। নিজের গরজে হেঁটে চলেছে স্মৃতি। যদি চুপচাপ থাকে বা কোথাও বসে, ওকে তাড়া করে আসাদ চৌধুরির প্রাণহীন চোখদুটো। পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট পড়ে আছে মরুভূমির উপর, কপালের ফুটো থেকে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। স্মৃতি একজন আর্কিওলজিস্ট, ওর স্থান হওয়ার কথা এসব থেকে বহু দূরে, কিন্তু এখানে যদি না আসত, নিজেকে ক্ষমা করতে পারত না। সারাজীবন আইন মেনে চলেছে, সেই ওর মন এখন বলছে, যারা আসাদকে মেরে ফেলেছে, কিডন্যাপ করেছে ওদেরকে, তাদেরকে শাস্তি পেতেই হবে। এই প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার আছে ওর।

জলপ্রপাত থেকে দুই মাইল উজানে এসে হঠাৎ বদলে গেছে নদী-খাত। স্যাণ্ডস্টোনের পাড় সরে গিয়ে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে হালকা রঙা পাথরকে। লক্ষ বছর আগে ওখানে ছিল লবণাক্ত রিফ, অনেক পরে ওগুলো হয়ে গেছে লাইমস্টোন।

'এখানেই থাকা সম্ভব,' চারপাশের জিওলজি দেখল স্মৃতি। 'লাইমস্টোনেই পাওয়া যায় গুহা, ফাটল ও খোঁড়ল। এখানেই।'

সোহেলের বাহুর উপর হাত রাখল রায়হান। একটা ড্রাইওয়াশের দিকে দেখিয়ে দিল। 'আপনার কী মনে হয়, সোহেল ভাই?'

ওখানে নদীর পাড়ে ভূমিধস্ হয়েছে, নদী-খাতের ভিতর পড়েছে কয়েক শ' টন পাথর ও বালি। ধসে পড়া অংশ দৈর্ঘ্যে দেড় শ' ফুট, এরপরে পাড় হয়ে গেছে অনেক উঁচু। আগে কখনও নদীর পাড় এত উপরে ওঠেনি।

মাথা দোলাল সোহেল। 'গুহার মুখ বুজিয়ে দিয়েছে বিস্ফোরক দিয়ে। পাথর-বালি সরালেই পাওয়া যাবে ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ, সমাধি ও সম্ভবত সোনাদানা-মনিমাণিক্যের সিন্দুক।'

সমাধিস্থল নির্ধারিত হতেই সবার উত্তেজনা কমে এসেছে।

চিন্তিত হয়ে বলল স্মৃতি, 'এখানে যে পরিমাণ জঞ্জাল জমেছে, হেভি কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট না পেলে কিছুই করা যাবে না। তাতেও সমাধি পর্যন্ত যেতে লাগবে কয়েক সপ্তাহ।'

'ভাববেন না,' বলল সোহেল। 'আমরা ঢুকে পড়ব পিছন-দরজা দিয়ে।'

দশ মিনিট লাগল নদী-খাতে নেমে উল্টো পাড়ে উঠতে, এসে থামল ওরা ভূমি-ধসের উপর। এ অংশ একটা টিলার পিছন দিক, ও-পাশে পশ্চিমে রয়েছে সাহারা। মরুভূমিতে রয়েছে একের পর এক গভীর খাদ ও ফাটল। বহুকাল আগে নদীর পাড়ে বিশাল এক সবুজ বনাঞ্চল ছিল। পরে সবই বিলুপ্ত হয়েছে সময়ের করাল গ্রাসে, খাঁ-খাঁ করছে বালি ও পাথরের প্রান্তর। ওরা চারজন দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। টিলার বুকে খুঁজতে শুরু করবার কিছুক্ষণের মধ্যেই পাওয়া গেল প্রথম গুহা-মুখ।

কোমর থেকে হ্যালোজেন ফ্ল্যাশলাইট খুলে নিল সোহেল, ঢুকে পড়ল বড়সড় গুহার ভিতর। কিন্তু দশ ফুট যেতে না যেতেই নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিল গুহা, তারপর দুই ফুট যেতেই সামনে পড়ল নিরেট পাথরের দেয়াল। আর যাওয়া গেল না।

স্বর্ণা ও স্মৃতি দ্বিতীয় আরেকটা গুহা পেল, কিন্তু খানিক যাওয়ার পর ওটাও বুজে গেল।

তৃতীয় গুহা অন্য দুটো থেকে অনেক সংকীর্ণ, বাধ্য হয়ে চার হাত-পায়ে ক্রল করে এগুতে লাগল সোহেল ও রায়হান। এই গুহা টিলার অনেক গভীরে গেছে। দেয়ালগুলো নানা ধরনের পাথরের তৈরি। আরও খানিক যাওয়ার পর মাথার উপর উঁচু হলো ছাত। হেঁটে এগুতে লাগল সোহেল ও রায়হান। কিন্তু তা কয়েক গজের জন্য, তারপর আবারও নেমে এল ছাত। বাধ্য হয়ে ক্রল করে এগুলো ওরা। পেটের নীচে কিরকির করছে বালি। রায়হান

আসবার সময় চকের টুকরো এনেছে, এবার ওটা কাজে লাগল। সামনে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। তিক্ত মনে ভাবল সোহেল, এই পথে বোধহয় চলত শেয়াল।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে ওরা সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকেছে।

'তোমার কী মনে হয়, রায়হান?' জানতে চাইল সোহেল। একদিকের দেয়াল দেখিয়ে দিল। পাথরে জ্যামিতিক নকশা। দক্ষ কেউ করেনি। ছুরি দিয়ে চেঁছে তৈরি।

এ ভাষা ওরা জানে না। তবে মনে হলো, ওটা কোনও আরবি স্ক্রিপ্ট হতে পারে।

'বোধহয় এই সুড়ঙ্গ ইউনুস আল-কবিরের গুহা পর্যন্ত গেছে,' মন্তব্য করল সোহেল।

'চারদিকে যেসব সুড়ঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলো খুঁজতে হলে আরও লোক লাগবে,' বলল রায়হান।

'লোক পাবে কোথায়?' বলল সোহেল। 'আছে তো স্বর্ণা আর স্মৃতি মাহমুদ। ওরা মহিলা।'

'তাই দিয়েই কাজ চালাতে দোষ কী?'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল সোহেল রেডিও করতে। কিন্তু পাহাড়ের এত গভীরে কোনও কাজ করছে না রেডিও। জবাব এল না কোনও। 'রওনা হয়ে যাও, বাছা,' বলল সোহেল। 'নিয়ে এসো ওদেরকে।'

'যদি এই বদ্ধ গুহার ভিতর ঢুকতে চায় আর কী।' ঘুরে রওনা হয়ে গেল রায়হান। ঢালু জমি বেয়ে উঠছে। কঠিন হয়ে উঠল ক্রল করা। বিড়বিড় করে নিজের কপালকে গালি দিয়ে চলেছে।

ব্যাটারির শক্তি সঞ্চয় করতে টর্চ নিভিয়ে দিল সোহেল। ঘুটঘুটে আঁধারে নানান চিন্তা আসছে। একবার মনে হলো শ্বাস আটকে আসছে। ফুরিয়ে এসেছে অক্সিজেন। এসব পাত্তাও দিল না সোহেল। কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের কথা মনে পড়ল, ওদেরকে এক ঘণ্টা থাকতে হতো সাগর-তলে, কোনও গুহার ভিতর। একবার

ওকে ধাওয়া করে মোটা এক মোরে ঈল। ছুরির পোচে ওটাকে শেষ করেছিল ও।

দীর্ঘ তিরিশ মিনিট পেরুল, তারপর শুনতে পেল কারা যেন ক্রল করে আসছে। টর্চ জ্বালল সোহেল। সবার আগে এল স্বর্ণা। ওর পর স্মৃতি ও রায়হান।

সবাইকে দুই মিনিট বিশ্রাম নিতে দিল সোহেল, তারপর নিজ পরিকল্পনা জানাল। ওরা ছড়িয়ে পড়বে পাতাল সুড়ঙ্গে। দেখতে শুরু করবে প্রতিটি সুড়ঙ্গ বা গুহা। কোনও দল সুড়ঙ্গের দুই মাথা পেলে একজন যাবে বামদিকের সুড়ঙ্গে, অন্যজন ডানদিকে। দশ মিনিটের ভিতর আবার ফিরবে আগের জায়গায়। দুই সুড়ঙ্গের ভিতর যেটা দেখে মনে হবে এই পথে গেলে ভাল, সে পথেই যাবে ওরা।

এরপর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল চারপাশ দেখতে। বাড়তি অ্যামিউনিশন ও অস্ত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠল ওদের জন্য। পাথরে ক্রল করতে গিয়ে ছিলে গেছে সবার হাঁটু ও কনুই। সঙ্গে যথেষ্ট ইকুইপমেন্ট নেই, কাজেই কম-বেশি সবাই গুঁতো খেল মাথায়। কপাল কেটে গেল সোহেলের, ওখানে আটকে নিল গজ টেপ।

দীর্ঘ করিডোরের মত সুড়ঙ্গ ধরে চলেছে ওরা চারজন। একটু পর পর সামনে পড়ছে পাথরের স্তূপ। তেমন একটার সামনে থামল সোহেল, আলো ফেলল উপরে। ছাত অন্তত দশ ফুট উঁচু। প্রথমে মনে হলো সিলিং থেকে ঝুলছে হাজারো স্ট্যালাকটাইট। খনির পানিতে ধীরে ধীরে তৈরি হয় এসব। জমতে থাকে সুড়ঙ্গের ছাতে, নেমে আসে মেঝে পর্যন্ত। কিন্তু একটু খেয়াল করতেই সোহেল বুঝল, একটার কোমরে প্যান্ট!

'হায় আল্লাহ্,' বিড়বিড় করে বলল স্বর্ণা।

উপরে চেয়ে চমকে গেছে স্মৃতিও। চিৎকার করবার আগেই

ডানহাতে চাপা দিল মুখ।

ছাত ভেদ করে নেমে এসেছে অনেকগুলো মামিফায়েড পা। কোনওটা হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত, কোনওটা উরু থেকে। একটা লাশের প্রায় পুরোটাই দেখা যাচ্ছে, কাত হয়ে আটকে আছে ছাতের সঙ্গে, ঘাড় মটকানো, অক্ষিকোটর কটমট করে চেয়ে আছে নীচের দিকে। লোকটার পোশাক আস্ত রয়েছে।

জীব-জন্তুও রয়েছে ওখানে আটকানো। ছাত থেকে ঝুলছে একটা উটের চার পা। ঘোড়ার ক্ষুরও চেনা গেল। শুষ্ক পরিবেশে সবই শুকিয়ে গেছে। হাড়ের সঙ্গে ঝুলছে চামড়া। যেন পার্চমেণ্ট কাগজ।

ঝুঁকে পড়ে মেঝে থেকে একটা স্যাণ্ডেল তুলে নিতে চাইল রায়হান। হাতের ভিতর গুঁড়ো হয়ে গেল সেটা।

'এদের কী হয়েছিল?' নিচু স্বরে বলল স্বর্ণা। 'পাথরে আটকা পড়ল কীভাবে?'

আরও মনোযোগ দিয়ে ছাত দেখল সোহেল। ছাত কুচকুচে কালো রঙের। কাঁচের মত লাগছে, তার ভিতর আটকা পড়েছে কোটি কোটি বালিকণা।

'সবাই কান ঢাকো,' বলল সোহেল। হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল। বদ্ধ পরিবেশে গুলি করতেই বিকট আওয়াজ হলো।

ছাতের ছোট এক অংশ উপড়ে ফেলল বুলেট, ঝরঝর করে নেমে এল টুকরোগুলো। ঝুঁকে পড়ে একটা টুকরো তুলল সোহেল। কয়েক সেকেণ্ড দেখে নিয়ে রায়হানের হাতে দিল।

'শক্ত,' বলল রায়হান। ব্যাখ্যা দিল, 'আমাদের ঠিক উপরেই বিশাল এক গর্ত ছিল। কালক্রমে এই গুহার ছাতটা ধসে পড়ায় নীচের এইসব পাথর দেখা যাচ্ছে, আর গর্তে জমে থাকা আলকাতরার কারণে ওখানে আটকে আছে মৃতদেহগুলো।'

রায়হানের কাছ থেকে জিনিসটা চেয়ে নিয়ে বলল স্মৃতি, 'ঠিক তা-ই।'

'এসব থেকে কী বুঝব?' বলল স্বর্ণা।

'বুঝবেন আমাদের মাথার উপর যখন তখন নেমে আসবে ছাতটা,' গম্ভীর হয়ে বলল রায়হান।

'আপনার ভবিষ্যদ্বাণী শুনে খুশি হতে পারলাম না।'

'আলকাতরার বিশাল গর্তের নীচটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। ওটাই আমাদের মাথার উপরের এই ছাত,' বলল সোহেল।

'আসলে এসব অ্যাসফল্টিক স্যাণ্ড,' বলল স্মৃতি। 'প্রতি গ্রীষ্মে আলকাতরা গরম হয়, আটকা পড়ে জন্তু ও মানুষ।'

'আমার ধারণা, শাস্তি হিসাবে এসব লোককে ছুঁড়ে ফেলা হয় ওখানে,' বলল সোহেল।

'মিটিং শেষে আহমেদ শরীফ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেন,' এই মাত্র মনে পড়তেই বলল স্মৃতি। 'আরও কিছু তথ্য জোগাড় করেন উনি। স্থানীয়রা বিশ্বাস করে ইউনুস আল-কবিরের কবর আছে কালো কিন্তু জ্বলে এমন কিছুর নীচে। আর এ কারণেই কয়লা খনি খুঁড়তে শুরু করে জঙ্গিরা।'

স্মৃতির হাত থেকে আলকাতরার টুকরো নিল সোহেল। ডিসপোজেবল লাইটার দিয়ে জ্বেলে দিল বৃদ্ধাঙ্গুল আকৃতির টুকরো। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ওটা। আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই মেঝের উপর ফেলল। ওটার দিকে চেয়ে রইল সবাই।

বুট দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিল স্বর্ণা। 'আমরা সমাধির অনেক কাছে চলে এসেছি।'

তবে পরবর্তী পুরো একটা ঘণ্টা পরিশ্রম করেও পাওয়া গেল না সমাধি।

এক জোড়া সুড়ঙ্গের কাছে এসে আবার আলাদা হয়ে গেল সোহেল-রায়হান ও স্বর্ণা-স্মৃতি। সোহেলরা ডানদিকের সুড়ঙ্গ ধরে

এগিয়ে গেল। খানিক পর টের পেল নদী-খাতের অনেক নীচে নেমে এসেছে। ফিরবার আগে ক্যান্টিন থেকে দুই ঢোক পানি গিলল রায়হান। সামনের মেঝে উপরে উঠে গেছে র‍্যাম্পের মত করে। সন্দেহ হলো সোহেলের, ঢালু পথ বেয়ে ছাতের কাছে পৌঁছে গেল।

ছাতের সঙ্গে যেখানে ঢালটা মিশেছে, সেখানে সরু একটা চিড় চোখে পড়ল। লাইটারের জন্য পকেট হাতড়াতে শুরু করল সোহেল। 'তোমার টর্চ নিভিয়ে দাও তো, রায়হান।'

'কী ব্যাপার? কেন, সোহেল ভাই?'

'আগে নেভাও তো।'

রায়হানের টর্চ নিভে যেতেই লাইটার জ্বালল সোহেল, শিখা নিয়ে গেল ফাটলের কাছে। তেমন একটা দুলছে না শিখা, তবে বোঝা যায় র‍্যাম্পের ওপাশে সামান্য হাওয়া চলছে। আবার টর্চ জ্বালল সোহেল, ছাত ও র‍্যাম্প যেখানে মিশেছে, ওই জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করল। খুব দক্ষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে এই র‍্যাম্প। চিড়টা চোখে পড়ে না বললেই চলে।

'মানুষ বানিয়েছে এটা,' বলল সোহেল। 'আমার মনে হয় এক ধরনের সি-স। পাশে এসে হাত লাগাও তো, রায়হান।'

র‍্যাম্পের ঢাল বেয়ে যতটা উপরে ওঠা গেল, উঠল ওরা, তারপর পিঠ ঠেকাল ছাতে।

'তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে পিঠ দিয়ে ঠেলা দেবে ওপরদিকে,' বলল সোহেল। 'এক... দুই... তিন!'

'হেঁইও!'

প্রাণপণে ঠেলা দিল দু'জন। প্রথমে মনে হলো কিছুই ঘটছে না। ওদের শ্বাস ফেলবার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ ছাড়া কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। তারপর হঠাৎ পায়ের নীচে নড়ে উঠল মেঝে, নেমে গেল একটু। ওরা ছাতে ও র‍্যাম্পে চাপ দেয়া

থামিয়ে দিতেই আবারও উপরের দিকে উঠল র‍্যাম্প।

'আবারও, রায়হান!'

দ্বিতীয় চেষ্টায় এক ইঞ্চি নীচে নামল প্রকাণ্ড লিভার। ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ওপাশে এক চেম্বার। চিড়ের ভিতর লাইটার গুঁজে দিল সোহেল, তবে র‍্যাম্পের উপর পায়ের চাপ কমে যেতেই প্লাস্টিকের লাইটার চুরমার হলো। পাথরের লিভারের ওজন অনেক বেশি।

'ভাল বুদ্ধি করেছেন, সোহেল ভাই,' বলল রায়হান। 'আমরা চারজন মিলে চেষ্টা করলে খুলে যাবে পথ। সবাই দাঁড়ানোর মত জায়গাও আছে।'

সাত মিনিট পর ওরা খুঁজে পেল স্বর্ণা ও স্মৃতিকে। তারা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে প্রোটিন বার খাচ্ছিল।

'আমরাও ব্যর্থ,' বলল স্বর্ণা। 'ওই মাথাও বন্ধ।'

'আমরা বোধহয় একটা পথ খুঁজে পেয়েছি,' বলল সোহেল।

রায়হান ব্যাখ্যা করে বলল কীভাবে পাওয়া গেছে র‍্যাম্প, আর ওটা কীভাবে খোলা যায়। লাফিয়ে উঠল স্বর্ণা ও স্মৃতি। আবারও র‍্যাম্পের কাছে ফিরল ওরা। ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় থামল সবাই, কাঁধ ঠেকাল সিলিঙে।

'এইবার এক সঙ্গে সবাই!' হাঁক ছাড়ল সোহেল।

চারজনের চাপের মুখে কর্কশ আওয়াজ তুলল পাথরের ঢাল, সমতল হতে শুরু করেছে র‍্যাম্প। সামান্য ওই চিড় হয়ে গেল চেম্বারের দরজা। ওপাশে কাদার ইঁট দিয়ে তৈরি এক দেয়াল। ওদের গায়ের জোরে র‍্যাম্প হয়ে উঠল সমান পথের মত।

'আমরা ওপাশে গেলে কিন্তু আর ফিরতে পারব না,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সোহেল। কপাল ভিজে গেছে ঘামে।

'তাই তো মনে হয়,' বলল স্বর্ণা।'

'আসুন, ঝুঁকিটা নিই, সবাই কাঁধ দিয়ে আরও চাপ তৈরি করুন

ছাতে,' বলল রায়হান।

পাথরের প্ল্যাটফর্ম নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। বিকট আওয়াজ তুলে প্ল্যাটফর্মের শেষমাথা নামল চেম্বারের মেঝের উপর। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে নেমে এল ওরা। সিঁড়ির নীচে যেমন কুঠি থাকে, মনে হলো তেমনই রয়েছে প্ল্যাটফর্মের শুরুর দিকে। ওখানে পুরু কাঠের গুঁড়ি দেখা গেল। ওগুলোই প্ল্যাটফর্ম উপরে তোলে ও নামায়। প্ল্যাটফর্ম যেখানে চেম্বারের মেঝের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে রয়েছে আরও কী যেন।

কর্কশ আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই নতুন আওয়াজ শুরু হলো উপর থেকে। যেন হিসহিস করছে মস্ত কোনও সাপ। বিশ ফুট উপরে ছাত, ওটার উপর আলো ফেলল সোহেল। আর ঠিক তখনই ছাতে ম্যানহোলের ঢাকনির মত বারোটা খাপ সরে গেল, ঝরঝর করে পড়তে লাগল বালি।

'সর্বনাশ,' বিড়বিড় করে বলল স্মৃতি।

পুরু কাঠের গুঁড়ি আসলে বুবি ট্র্যাপের ট্রিগার! ঝটকা দিয়ে উঠে গেল পাথরের প্ল্যাটফর্ম। মনে হলো ওখানে নিরেট পাথরের দেয়াল ছাড়া কিছুই নেই।

চারপাশে আলো ফেলল ওরা। দশ ফুট বর্গাকারের ঘর। তিন দিকের দেয়াল পাথরের। মনে হলো প্রাকৃতিক লাইমস্টোনের তৈরি অ্যালকোভ। চতুর্থ দেয়াল কাদা ও সুরকি দিয়ে তৈরি। পাথুরে দেয়ালের দিকে মনোযোগ না দিয়ে ইঁটের দেয়ালের দিকে চাইল ওরা। কোনও দরজা বা গর্ত নেই। মনে হলো না কখনও কোনও হ্যাণ্ডেল্ বা মেকানিজম ছিল। বেরুনোর কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

পাঁচ মিনিট দেয়াল খুঁজে দেখল ওরা। ততক্ষণে মেঝের উপর জমেছে দুই ফুট বালি। ছোট ঢিবি মনে হলো ওগুলোকে। মাথার উপর ছাত থেকে ঝরঝর করে পড়ছে বালি। খাপ থেকে ছোরা

বের করল সোহেল, একটা ইঁটের জোড়ার সুরকি সরাতে শুরু করল। ইস্পাতের ফলার সামনে গুঁড়ো হচ্ছে সুরকি। কিছুক্ষণ পর ঢিলা হয়ে গেল ইঁট। ওটা টান দিয়ে বের করে মেঝের উপর ফেলল সোহেল। ভিতরে আরও ইঁটের স্তর দেখা গেল। হয়তো আরও দশটা স্তর থাকতে পারে।

'ওই সি-স'র লিভারের কাছে পৌঁছতে হবে,' বলল স্বর্ণা। 'কিন্তু দেয়াল সরাব কী করে?' ভুলে বালির ধারার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিরক্ত হয়ে সরে গেল।

অ্যালকোভের ঠিক সামনে তিনটে গর্ত আছে, এরইমধ্যে অর্ধেক ভরে গেছে বালিতে।

'যেভাবে বালি পড়ছে, লিভার পেলেও আমাদের কবর হবে এখানে,' স্মৃতির কণ্ঠে আতঙ্ক প্রকাশ পেল, 'আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি। কী করব এখন?'

সোহেল-রায়হান পরস্পরের দিকে চাইল। কোনও কথা জোগাল না কারও মুখে।

পনেরো

পাইলট বন্ধুকে ধন্যবাদ দিল হারিস জামান, নেমে পড়ল কপ্টার থেকে, ধপ্ করে বন্ধ করে দিল পলকা দরজা। দু'বার চাপড় দিয়ে সরে গেল ঘুরন্ত রোটরের নীচ থেকে। খুদে সার্ভিস কপ্টার মরুভূমির মেঝে থেকে উঠতে লাগল আকাশে, চারপাশে ছড়িয়ে দিল বালি। ঝড়ের দিকে পিঠ রাখল হারিস, বুজে ফেলেছে

দু'চোখ।

কপ্টার সরে যেতেই টিম কমাণ্ডারের দিকে পা বাড়াল। ত্রিপোলির পুলিশ রেইডে বিরক্ত সে। কিন্তু সেই রাগ এখন হারিয়ে গেছে, সেখানে আছে শুধু আনন্দ। জঙ্গি নেতাকে জড়িয়ে ধরল সে, পচপচ করে দুটো চুমু দিল লোকটার দাড়িভরা দুই গালে।

'তারেক, ভাই আমার, আজ দারুণ এক দিন,' চওড়া হাসল হারিস।

আগেই রেডিও করেছে সে, জানিয়ে দিয়েছে এখানে আসছে। তার নির্দেশে সব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সঙ্গীরা অপেক্ষা করছে এমআই-৮ কপ্টারের রিয়ার কার্গো র‍্যাম্পের কাছে। হারিস ওদিকে হাত নাড়তেই হই-হই করে উঠল সবাই। একটা বেঞ্চ সিটে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে বন্দিকে।

হারিসের চেহারা লক্ষ করেছে তারেক। হাত নেড়ে বলল, 'মুখ না বাঁধলে মেয়েলোকের মত ফুঁপিয়ে কাঁদে। এ যদি ইউনুস আল-কবিরের বিষয়ে এক্সপার্ট না হতো, এক বুলেটে ওর মাথা ফুটো করে দিতাম।'

'একের পর এক কী আশ্চর্য ঘটনাপ্রবাহ,' বলল হারিস। ভুলেই গেছে ট্যাগার্টের কথা। 'মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করতে চাইল, আর এখন সামান্য পরেই মিলে গেল ইমামের সমাধি।'

'কীভাবে পেলেন?' জিজ্ঞেস করল তারেক। কপ্টারের দিকে হেঁটে চলেছে তারা। ঘুরতে শুরু করেছে রোটর।

'বন্ধুর কপ্টারে চড়ে সীমান্তের দিকে আসছি, পাইলটকে নিয়ে একটু ঘুরে দেখছিলাম। তিউনিশিয়ার উপর দিয়ে চলেছি, নীচে দেখলাম সেই পুরনো নদী। হঠাৎ চোখে পড়ল নদীর তীরে এক অংশ ধসে পড়েছে। মনে হলো বিস্ফোরক দিয়ে ধস নামানো হয়েছে। আমি যদি ভাটির জলপ্রপাতের কথা আগে জানতাম,

দ্বিতীয়বার দেখতে যেতাম না। কোনও জাহাজ ওদিক দিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু সন্দেহ হলো, কপ্টার নামাতে বললাম পাইলটকে।'

'তারপর? কখন এটা ঘটল?'

'তোমাকে রেডিও করার খানিক আগে—আন্দাজ আধ ঘণ্টা। নেমেই বুঝলাম, ওখানে আগেই এসেছে কয়েকজন লোক। চার জোড়া বুটের ছাপ দেখলাম। দুটো মেয়েদের, বা খুদে লোকের। তাদের একজন হতে পারে ওই আমেরিকান আর্কিওলজিস্টের দলের কেউ।' ট্যাগার্টের দিকে আঙুল তাক করল হারিস।

টারবাইন দ্রুত ঘুরতে শুরু করেছে। চিৎকার করে কথা না বললে কেউ শুনবে না। কপ্টারে উঠে পাশাপাশি দুটো সিটে বসল দুজন। 'সমস্ত ছাপ গেছে নদীর ওপাশে টিলার গুহায়। ওরা এখনও ভিতরেই আছে। ওদেরকে হাতে পেয়ে গেছি আমরা। এই শেষবারের মত বাধা দিয়েছে আমাদের পরিকল্পনায়, আর নয়। আমাদের মুঠোর ভিতর চলে এসেছে ইমাম ইউনুস আল-কবিরের সমাধি।

বাবুর্চি মোস্তফা আবুলের ট্রে থেকে কফির মগ নিল রানা।

'এখন কেমন বোধ করছেন, স্যর?'

'ভাল,' কড়া তরলে চুমুক দিল রানা। 'তুমি?'

'আপনার দোয়ায় ভাল।'

আর কোনও কথা বলছে না রানা। হতাশ হয়ে বিদায় নিল বাবুর্চি। অপারেশন্স সেন্টারে ব্যস্ত সবাই। দুই বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার একটা কন্সোলের কম্পিউটার সরিয়ে ফেলেছে। ওটার মনিটর কাজ করছে না। ওয়েপন্স অফিসার নবী আলাপ করছে নিজ গ্রুপের সঙ্গে। জাহাজের প্রতিটা অস্ত্র তৈরি রাখা হয়েছে। হেলম্সে গগল নির্ধারিত কোর্স ধরে লিবিয়ার বারো মাইল

জলসীমা পেরুতে শুরু করেছে।

জাহাজের সবই টিপটপ রাখা হয়েছে, ক্রুরা সবাই লড়বার জন্য প্রস্তুত। তবে আপাতত ওদেরকে কোনও কাজ দিতে পারবে না রানা।

এখনও নির্ভরযোগ্য তথ্য মেলেনি লিবিয়ান নৌবাহিনীর কোন্ কোন্ জাহাজে হেলিকপ্টার নামার ব্যবস্থা আছে। ওটা জানবার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রানা। আপাতত তীর থেকে দূরে সরছে মার্ভেল।

অপেক্ষা করতে গিয়ে অধৈর্য হয়ে উঠছে রানা। তীরে সোহেল এবং ওর দলকে রেখে সরে যেতে হচ্ছে। অস্থির লাগছে মনটা।

'রেডিও যোগাযোগ, মাসুদ ভাই,' কাঁধের উপর দিয়ে বলল রেডিও অপারেটার।

সিটের হাতলের সুইচ টিপল রানা, গোপন স্পিকারে ভেসে এল হাঁপিয়ে উঠবার আওয়াজ। একটা নারী কণ্ঠ বলল, 'স্যর, আমি নিশাত। আমরা বিপদে পড়েছি।'

'কী হয়েছে?'

'মোহাম্মদ ফতে আলী বোধহয় ইউনুস আল-কবির নয়,' মনে হলো কথার ফাঁকে দৌড়ে চলেছে নিশাত। 'এইমাত্র হারিস জামানকে দেখলাম, জঙ্গিদের নেতার গালে চুমু দিল। ওর এমআই-৮ কপ্টারে চেপে সমাধি খুঁজতে চলেছে। মনে হয় হারিস জামানই ইউনুস আল-কবির। সোহেল ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। ওঁরা আছেন বোধহয় মাটির নীচে। আমি পাহারায় ছিলাম। এখন চার-পাঁচ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে।'

'হারিস জামান?' সিট ছেড়ে নেমে পড়ল রানা, পায়চারি শুরু করেছে। 'আমরাও তাকে সন্দেহ করছি। ফোনে কাশেম বক্সকে পাওয়া যায়নি। ওর জিপিএস চিপ একদম নড়ছিল না দেখে আমি

খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলাম গ্যাং ফেংকে। পাওয়া গেছে ওকে, মারাত্মক আহত। খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। শেষ খবর অনুযায়ী কাশেমের সঙ্গে ছিল ওই হারিস জামান।'

'হায় আল্লাহ্! কাশেম এখন কেমন আছে?'

'এখনও জানি না। ফেং বলছে গুরুতর আহত। অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছে। আশপাশেই আছে। হাসপাতাল পর্যন্ত পিছু নেবে। আমরা এখন এর বেশি কিছুই করতে পারব না।'

কমিউনিকেশন সেন্টারে ফর্-ফর্ আওয়াজ করছে ফ্যাক্স।

'মহা বদলোক হারিস জামান,' বলল নিশাত। 'আকাশ থেকে নিশ্চয়ই কিছু দেখতে পেয়েছে বলেই সবাইকে নিয়ে জলপ্রপাতের দিকে চলেছে।'

'আমি ব্যাকআপ টিম পাঠাতে পারি, তবে তাতে লাগবে কয়েক ঘণ্টা,' হতাশা চেপে রাখল রানা। বুঝতে পারছে কোনও সাহায্যেই আসতে পারবে না ওরা। যা হওয়ার তা অনেক আগেই ঘটে যাবে।

ওর হাতে ফ্যাক্স ধরিয়ে দিল কমিউনিকেশন অফিসার। চট্ করে চোখ বোলাল রানা। দু'ঘণ্টা ধরে এই তথ্য চাইছিল। বিসিআই থেকে জানানো হয়েছে লিবিয়ান নেভি কী ধরনের জাহাজ ব্যবহার করে।

'কাউকে পাঠানোর দরকার নেই,' বলল নিশাত। 'আট মিনিটে এক মাইল করে পার হচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব। ওখানে বারোজন জঙ্গি আছে। আশা করি তাদেরকে চমকে দিতে পারব।'

মনোযোগ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে রানার। নিশাতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ন্যাভিগেশন কমপিউটারের সামনে চলে গেছে, 'এক মিনিট, আপা, ধরে রাখেন।' বলেই জিপিএস নম্বর ও জাহাজের কো-অর্ডিনেট্স পাঞ্চ করল কমপিউটারে, সেই সঙ্গে

জানিয়ে দিল গত কয়েক ঘণ্টা কোথায় ছিল লিবিয়ান জাহাজটা।

স্ক্রিনে ফুটল তথ্য। পড়তে শুরু করে আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। জঙ্গিদের ক্যাম্প থেকে ওই জাহাজে পৌঁছতে পারবে কপ্টার। ওর মন বলছে, ওই জাহাজেই রাখা হবে প্রধানমন্ত্রীকে। লিবিয়ানদের অন্য রণতরীগুলো এখন ত্রিপোলিতে, ওখানে শান্তি মহাসম্মেলনের আগেই মিলিটারি রিভিউ হবে। কিন্তু এই বিশেষ জাহাজটা রয়েছে তিউনিশিয়ার সীমান্তের কাছে। কেন?

'আপা, ওই গুহার কাছে পৌঁছে রেডিও করবেন,' বলল রানা।

'ঠিক আছে, স্যর।' কেটে গেল লাইন।

ওভারহেড ডিসপ্লেতে টিপটিপ করছে বাতি, ওটা দেখল রানা, 'গগল, তুমি কোর্স ঠিক করো, ওই জাহাজের কাছে পৌঁছতে চাই।' রানার কণ্ঠ এত গম্ভীর যে সবাই ঘুরে চাইল ওর দিকে। অপারেশন্স সেন্টারে সাগরের ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা।

'কোর্স লেইড, রানা।'

'পুরো গতি তুললে ইটিএ কখন?'

'তিন ঘণ্টার একটু বেশি।'

'রওনা হয়ে যাও।'

ক্রুরা শুনতে পেল অ্যালার্মের পরিচিত আওয়াজ। টপ স্পিডে মার্ভেল রওনা হলে সবার মনে হবে ঘোড়ার পিঠে চড়েছে। প্রতিটি খোলা জিনিস রেখে দিতে হবে ড্রয়ারের ভিতর। বাবুর্চির গ্যালির তৈজসপত্র ইত্যাদি ও মোফিজ বিল্লাহর মেকআপ পট সরিয়ে ফেলতে হবে নিরাপদ জায়গায়।

ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন মসৃণ ভাবে গতি তুলছে। তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়ছে ক্রাইয়োপাম্প। কপাল ভাল যে ওই ভয়ঙ্কর আওয়াজ মানুষের কানে পৌঁছে না। জাহাজে কোনও কুকুর থাকলে ভয়ে পাগল হয়ে যেত।

আবার সিটে বসল রানা, কমপিউটারের স্ক্রিনে বের করল লিবিয়ান ভেসেলের স্পেসিফিকেশন। ওই জাহাজ মডিফায়েড রাশান ফ্রিগেট। দুই হাজার পাঁচ সালে কেনা হয়। নাম দেয়া হয় বক্তিয়ার খিলজি। ওজন চোদ্দ শ' টন। দৈর্ঘ্যে মার্ভেলের তিন ভাগের দুই ভাগ—তিন শ' তেরো ফুট। লিবিয়ান ফ্রিগেটের চেয়ে অনেক আধুনিক মার্ভেলের অস্ত্রের ভাণ্ডার। কিন্তু ওটা সত্যিকারের শক্তিশালী একটা যুদ্ধজাহাজ। ডেকে রয়েছে চারটে তিন ইঞ্চি কামান, কয়েকটা এসএস-এন-২সি স্টিক্স শিপ-টু-শিপ মিসাইল ও গ্রেকো রকেট। বিপদে জাহাজকে আড়াল দেবে শেষেরগুলো। এ ছাড়া রয়েছে এয়ার অ্যাসল্টের জন্য ৩০এমএম কামান। ডেক লঞ্চার থেকে সাগরে নামাতে পারে টর্পেডো। স্টার্ন থেকে ছাড়তে পারে মাইন।

জেনস্ ডিফেন্স রিভিউয়ের ওয়েব সাইটে গিয়ে জাহাজটার ছবি দেখল রানা। ভয়ঙ্কর নীচ চেহারার একটা ভেসেল। লম্বাটে বো, রেডিও মাস্ট থেকে ঝুলছে অ্যান্টেনা। ওগুলোর আপগ্রেডেড সেন্সর সিস্টেম রয়েছে চিমনির পিছনে। জাহাজের সামনে-পিছনে আর্মার্ড টারেটে বসানো দুটো দুটো করে থ্রি ইঞ্চ গান। সামনেরটার একটু পিছনে অ্যান্টিশিপ মিসাইল লঞ্চারগুলো।

ওটার দিকে চেয়ে ভাবল রানা, এনগেইজমেন্ট হলে হারাতে পারবে মার্ভেল ওটাকে। ফ্রিগেট বক্তিয়ার খিলজির স্টিক্স সিস্টেমের দ্বিগুণ রেঞ্জ মার্ভেলের শিপ-টু-শিপ মিসাইলগুলোর। কিন্তু লিবিয়ান ফ্রিগেটে বহুদূর থেকে হামলা করার ইচ্ছা ওর নেই।

ওই ফ্রিগেটে নামতে হবে ওকে, প্রয়োজনে হাতাহাতি লড়াই করে উদ্ধার করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে।

'ওটাই না?' রানার পাশে এসে থেমেছে নবী। 'এ জিনিস আগেও দেখেছি পত্রিকায়।'

'তোমার কী মনে হয়, ডেকে নামতে পারব?'

'ওটার রেইডার স্পেক্স তো দেখেছেন, মাসুদ ভাই। পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে বুঝে ফেলবে কপ্টার আসছে। তা ছাড়া রয়েছে ট্রিপল এ এবং স্যাম মিসাইল।'

'কিন্তু মার্ভেলকে নিয়ে ওটার পাশে পৌঁছতেই হবে।'

'আমরা তো ওদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়ব, তাই না?'

'তার আগে তাদের মনোযোগ সরিয়ে দিতে হবে।'

চুপ হয়ে গেল নবী। মিসাইল আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে নেভাল যুদ্ধ নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। এখন আর ভারী আর্মার দিয়ে মোড়া ব্যাটলশিপ একটা আরেকটার উপর গোলা ফেলে না, বেশিরভাগ সময়ে দেখা যায় দুই পক্ষই কয়েক শ' মাইল দূর থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। হাই এক্সপ্লোসিভ টিপ্‌ড্ মিসাইলগুলো অনায়াসে ভেদ করছে জাহাজের কঠিন আবরণ।

মার্ভেল মজবুত জাহাজ, তবে ফ্রিগেট বক্তিয়ার খিলজির তিন ইঞ্চি কামান সবই ভেদ করতে পারবে। তার চেয়ে বড় কথা, কয়েকটা স্টিক্স মিসাইল পাশে এসে লাগলে...

রানা ভাবছে, লিবিয়ান ফ্রিগেটের পাশে পৌঁছবে। কমাণ্ডোদের নিয়ে নেমে পড়বে ডেকে। মার্ভেলের উপর গোলা ও মিসাইল বর্ষণ চলতে থাকা অবস্থাতেই।

'মাসুদ ভাই, দুই জাহাজ পরস্পরের সঙ্গে হাতাহাতি ডুয়েল লড়ছে, এমন ঘটনা শেষ কবে ঘটেছে?' জানতে চাইল নবী।

'আঠারো শ' বাষট্টি সালে। যুদ্ধটা হয় ভার্জিনিয়ার হ্যাম্পটন রোডে।'

'কে জেতে?'

'কেউ না। মনিটর ও মেরিম্যাক ড্র করে। তবে আমাদের সে সৌভাগ্য হবে না।'

'তার মানে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নেয়ার পর ফ্রিগেট

ডুবিয়ে না দিলে, আমাদেরকে ছাড়বে না ওরা,' বলল নবী। 'আমরা হয়তো চোরের মত ওদের জাহাজে উঠতে পারব, কিন্তু কাজ উদ্ধার করে কেটে পড়ব, সেটা হতে দেবে না লিবিয়ানরা।'

'আসলে তা-ই।'

'কী করবেন ভাবছেন, মাসুদ ভাই?'

'ভাবছি, এখনও জানি না।'

'ফ্রিগেটের মনোযোগ সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? কাছাকাছি যেতেই তো পারব না।'

'কী করা উচিত এখনও জানি না। তবে বুঝতে পারছি হামলা করতে হবে আঁধারে। তুমিও ভাবো কীভাবে ডিসট্র্যাকশনের ব্যবস্থা করা যায়। ...আরেকটা ব্যাপার...' থেমে গেল রানা।

'জী, মাসুদ ভাই?'

'ফ্রিগেট বক্তিয়ার খিলজির মত একটা জাহাজ ডুবতে কমপক্ষে বিশ মিনিট লাগে। ততক্ষণে অনায়াসে কয়েকটা মিসাইল ফেলতে পারবে মার্ভেলের ওপর।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল নবী। 'আপনার কথা শুনে গলা শুকিয়ে আসছে আমার। আল্লাহ্ জানেন আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছি।'

'আরও আছে। বক্তিয়ার খিলজির ডেকে নামার আগেই লিবিয়ান মানুষগুলোকে নামিয়ে দিতে হবে লাইফবোটে। চাই না যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তারা এই জাহাজে থাকুক। আমাদের যদি খারাপ কিছু হয়, তাদেরকে চট্ করে নামাতে পারব না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নবী। 'ঠিক আছে, আমরা ওদেরকে নামিয়ে দেব। তারপর লড়ব ওই ফ্রিগেটের সঙ্গে।'

কমিউনিকেশন অফিসার বলল, 'মাসুদ ভাই, আরেকটা কল এসেছে।'

'ক্যাপ্টেন নিশাত?'

'না। বিসিআই থেকে চিফ, রাহাত খান।'

'লাইন দাও,' হেডসেট পরে নিল রানা। কমপিউটারের কি বোর্ডে দুটো টোকা দিতেই সংযোগ হলো। 'জী, স্যর, বলুন।'

'কেমন আছ? বোধহয় সুস্থ, রানা?' ভারী কণ্ঠ ভেসে এল।

'জী, স্যর, পুরোপুরি ফিট।'

'গুড, তোমার গেস্টদের কী অবস্থা?' খুশি মনে হলো বৃদ্ধকে।

'ভাল, স্যর। একদিনেই জাহাজের বেশিরভাগ খাবার খেয়ে ফেলেছে।'

'আমি ফোন করলাম আপডেট নেয়ার জন্যে। আর দুয়েকটা খবরও আছে।'

অপেক্ষা করল রানা।

কথা বলছেন না চিফ। কী নিয়ে যেন চিন্তিত।

আরও কিছুক্ষণ পর তথ্য দিল রানা, 'হারিস জামান চলে গেছে তিউনিশিয়ায় ইউনুস আল-কবিরের সমাধির কাছে। সোহেল ওখানে আছে।'

'গুড। হারিস জামানই কি গাদ্দাফি সরকারে একমাত্র অফিশিয়াল, যাকে ইউনুস আল-কবির বলে ধারণা করা হচ্ছে?'

'এটা বোধহয় ঠিক নয়, স্যর। তবে আমরাই তাকে পালাতে সহায়তা দিই। বদলে গুলি করে ফেলে গেছে আমাদের একজনকে।'

'তাই? কে আহত?'

'কাশেম বক্স। বুকে গুলি খেয়েছে। চায়নিজ ইন্টেলিজেন্সের গ্যাং ফেং ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করছে। কণ্ডিশন এখনও জানি না।'

'অ্যাম্বাসেডার কামাল নাহিদকে জানিয়ে দেব, উনি ওদিকটা দেখবেন।' কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকলেন রাহাত খান, তারপর বললেন, 'তুমি কি নিশ্চিত লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ ফতে

আলী এসবের সঙ্গে জড়িত?'

'এখনও নিশ্চিত নই, স্যর। এমন হতে পারে জঙ্গিরা সরকারের সাহায্য ছাড়াই প্রধানমন্ত্রীর বিমান ফেলে দিয়েছে। পরে গোপনে সব প্রমাণ নষ্ট করতে চেয়েছে। লিবিয়ান সরকারের উপরমহল থেকেও এ-কাজ করা হয়ে থাকতে পারে। তাদের সরকারের উঁচু পর্যায়ে যদি ইউনুস আল-কবিরের লোক থাকে, সে বা তারা সব সরাতে বলে থাকতে পারে।'

'ঠিক। হয়তো ইউনুস আল-কবিরের সংগঠনে বড় নেতা মোহাম্মদ ফতে আলী। সে নির্দেশ দিলে বিমানের ধ্বংসাবশেষ নষ্ট করবার চেষ্টা করবে তার লোক। আবার সঠিক সময়ে জানিয়ে দিয়েছে কোথায় পাওয়া যাবে ভূ-পাতিত বিমান।'

'হতেই পারে, স্যর। আরেকটা ব্যাপার, মোহাম্মদ ফতে আলী পদ নিয়েছে সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছ থেকে। তখন সিনিয়র স্টাফ ও মন্ত্রীকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে বা গ্রেফতার করা হয়েছে। এটা ঘটাতে পারে মোহাম্মদ ফতে আলী বা স্বয়ং গাদ্দাফি।'

'সব মিলে বাজে পরিস্থিতি,' চুপ হয়ে গেলেন রাহাত খান। একটু বিরতি নিয়ে বললেন, 'মহাসম্মেলনের বেশির ভাগ অ্যাটেণ্ডেন্ট পৌঁছে গেছেন ত্রিপোলিতে। আজ রাতেই পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়িতে তাঁদের পার্টি। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেলিগেটদের নিয়ে ত্রিপোলি পৌঁছে গেছেন।'

'এই পার্টি বাতিল করলেই বোধহয় ভাল হতো,' বলল রানা।

'তা-ই। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই যে বাগড়া দেব। বিসিআইয়ের সলীল ওখানে থাকবে। লিবিয়ান সিক্রেট পুলিশ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে, ওখানে জঙ্গিদের হামলা হতে পারে। তবে কোনও সমস্যা হবে না, তাদের পাহারায় ঠিকভাবেই চলবে ডিনার।'

'কেন, স্যর? লিবিয়ানরা...'

রানাকে থামিয়ে দিলেন রাহাত খান, 'নিজ বাড়িতে হামলা হতে পারে, তা ক'জন ভাবতে চায়? প্রতিটি কুকুর তো নিজের বাড়িতে পৌঁছেই বাঘ। আজ রাতের পার্টিতে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের ছবি পরবর্তী খবরে দেখবে দুনিয়াবাসী। আমার ধারণা, যদি হামলা হয়, তা হবে আগামীকালের কনফারেন্সে।'

'লিবিয়ানরা মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছে,' বলল রানা। 'তবে নিজেদের জানের উপর দিয়ে নয়।'

'দুনিয়ার তাবৎ বড় রাজনৈতিক নেতা জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে। এখন থামবে না কনফারেন্স। হয় ত্রিপোলিতে মিটিং হবে, নইলে দেশে ফিরবেন তাঁরা। সেক্ষেত্রে শুরু হবে নানা ধরনের জঙ্গি হামলা।' থেমে গেলেন রাহাত খান। দীর্ঘ নীরবতার পর বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধার করবার কাজ কতদূর, রানা?'

'একটা সূত্র পেয়েছি,' বলল রানা। আগেই চিফকে জানিয়েছে রেইডারের ব্লিপের কথা, বলেছে ওর ধারণা প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে সাগরে। 'উনি বোধহয় বক্তিয়ার খিলজি নামের এক লিবিয়ান ফ্রিগেটে বন্দি। আমরা এখন ওদিকে চলেছি।'

'প্ল্যানটা কী?'

কল্পনায় রাহাত খানকে দেখতে পেল রানা, উনি এইমাত্র পাইপ ধরিয়েছেন, কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে খানিক ঝুঁকে এসেছেন সামনে। 'ওই জাহাজে নামব আমরা, উদ্ধার করব প্রধানমন্ত্রীকে, ডুবিয়ে দেব ফ্রিগেট।'

'ওটা মস্ত ভুল হবে!' কড়া স্বরে বললেন রাহাত খান। ধমক খেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানা। 'তুমি কোনও দেশের ন্যাভাল ভেসেল ডোবাতে পারো না। যদি ধরা পড়ো, দুনিয়ার কোথাও কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাবে না।'

'স্যার, আমরা যদি বিসিআই থেকে অনুমতি না নিই?'

খুকখুক করে কাশলেন বৃদ্ধ। 'তার মানে তোমাদেরকে চিনিই না আমরা?'

'জী, স্যর।'

'তা হলেও আমার আপত্তি আছে। তোমাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমতি আমি দিতে পারি না।'

'যদি অনুমতি না নিই?' রেগে যাচ্ছে রানা।

'আজ পর্যন্ত আমার মতের বিরুদ্ধে তুমি কিছু করোনি, আমি জানি, এখনও তা করবে না। প্রচ্ছন্ন হলেও আমার কিছুটা সায় তোমার দরকার, তা-ই না?' আবার একমিনিট চুপ। তারপর বললেন, 'কী উচিত আমি বুঝতে পারছি। জানি, এ ছাড়া এখন আর কোনও উপায় নেই। কিন্তু তোমাকে এই অনুমতি দিতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার, রানা।' করুণ মিনতির মত শোনাল বুড়োর কথাটা, তারপর ধমকের সুরে গর্জে উঠলেন, 'যথেষ্ট বয়স হয়েছে তোমাদের। যা ভাল বোঝো, করো।'

'থ্যাঙ্কিউ, স্যর। সবার সঙ্গে আলাপ করেই সিদ্ধান্ত নেব, স্যর।'

'ভাল হতো ওখানে প্রধানমন্ত্রী আছেন সেটা নিশ্চিত হতে পারলে। বাকি কাজ করত কূটনীতিকরা।' চুপ হয়ে গেলেন চিফ। অপেক্ষা করছে রানা। পাক্কা এক মিনিট পর আবার বললেন তিনি, 'ভাবতে ভাল লাগে, কূটনীতিকরা আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবেন; কিন্তু বাস্তবে কিছুই করতে পারবেন না। এসব জঙ্গিরা অর্ধ-উন্মাদ, নরপিশাচ, বেপরোয়া খুনি। এদের সঙ্গে কোনও ধরনের চুক্তি হতে পারে না কখনও।' আর কিছুই বলছেন না চিফ।

'স্যর, আমরা চেষ্টা করব, যদি পারা যায় লিবিয়ান ফ্রিগেট ডুবিয়ে না দিতে।'

'যা ভাল বোঝো,' চাপা শ্বাস ফেললেন রাহাত খান। 'নতুন

কোনও তথ্য পেলে জানাবে।' খুট করে কেটে গেল লাইন।

রানা টের পেল, প্রিয়পাত্রদের বিপদ দেখে অস্থির হয়ে পড়েছেন চিফ। ওরা আবারও যোগাযোগ না করা পর্যন্ত মহা দুশ্চিন্তায় থাকবেন বুড়ো। সামনে সোহেলটাও নেই যে মেজাজ করবেন ওর উপর।

ষোলো

ছাতের দিকে আরেকবার চাইল সোহেল। উপরের গর্তগুলো থেকে ঝরঝর করে পড়ছে বালি। আগেই নাকের উপর রুমাল বেঁধে নিয়েছে ওরা। তবে এত ধুলো-বালি, আটকে আসতে চাইছে দম। মিহি ধুলোর কারণে যথেষ্ট আলো দিতে পারছে না টর্চ। হ্যালোজেনের উজ্জ্বল প্রভা কমে এসেছে, মিটমিট করছে দুই ব্যাটারির টর্চের মত। ওদের মনে হচ্ছে, ঢুকে পড়েছে প্রাচীন কোনও কবরে, আর কখনও বেরুতে পারবে না এখান থেকে।

সোহেলের নির্দেশে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সবাই। নিজেদেরকে বালির নীচ থেকে খুঁড়ে তুলছে, থাকতে চাইছে ঢিবির উপর। এত দ্রুত বালি পড়ছে, কয়েক সেকেণ্ড খেয়াল না রাখলেই চাপা পড়ছে গোড়ালি। বাড়তি কয়েক মিনিট বেশি বাঁচতে কাজ করে চলেছে ওরা। যদিও অবশেষে মরতেই হবে বালির নীচে ডুবে। হিসহিস আওয়াজে নামছে নিশ্চিত মৃত্যু। অনেক উঁচু হয়ে উঠেছে ঢিবি। এখন ছাতের কারণে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না ওরা।

দুই শ' বছর আগে যে-লোক ফাঁদটা তৈরি করেছিল, সে

বোধহয় স্বর্গে বা নরকে শুয়ে শুয়ে ভাবছে, ভালই বুদ্ধি করেছিলাম তো! দিব্যি কাজ করছে এখনও!

পুরুষদের তুলনায় ভাল করছে স্মৃতি ও স্বর্ণা। ওরা হালকা শরীরে অনায়াসে গর্ত থেকে উঠে পড়ছে, সাহায্য করছে সোহেল ও রায়হানকে।

এইমাত্র সোহেলের পা টেনে তুলল স্বর্ণা। কিন্তু ওর দিকে খেয়ালই দিল না সোহেল, রায়হানের দিকে চেয়ে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, রায়হান, তুমি ঠিক জানো তো এ কুঠুরি শুকিয়ে যাওয়া নদীর নীচে?'

'জী, সোহেল ভাই। ...কিন্তু কেন?'

'তা হলে বোকার মত ভাবছি কেন? সূত্র তো বলছে ওয়ান-পয়েন্ট-সিক্স।'

'ওয়ান-পয়েন্ট-সিক্স? এ আবার কী?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'ওয়ান-পয়েন্ট-সিক্স হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ওভার-ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরের ফিগার।'

'তাই তো!' খুশি হয়ে উঠল রায়হান। 'ওটা আমার মনেই আসেনি।'

'একটু খুলে বলবেন?' বালির আওয়াজের উপর দিয়ে বলল স্বর্ণা। 'আমরা মরতে বসেছি, এখন অঙ্ক কষে কী হবে?'

'জীবনের সবই অঙ্ক, স্বর্ণা,' উদাস কণ্ঠে বলল রায়হান। 'তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর হাসি আর গানে ভরে তুলব...'

'অ্যাই, আপনি থামুন তো!' তেড়ে উঠল স্বর্ণা। 'শিল্পী শ্যামল মিত্রের গান আবৃত্তি করছেন, কণ্ঠে একফোঁটা সুরও নেই!'

'আমরা আছি নদীর নীচে এই কুঠুরির ভিতর, ঠিক?' বলল সোহেল। 'এই ফাঁদ তৈরি হয়েছে মানুষকে পানিতে ডুবিয়ে মারতে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেছে, শুকিয়ে গেছে নদীর পানি, সে জায়গা নিয়েছে শুকনো বালি।'

'তাতে কী, সোহেল ভাই?'

'পানির ভলিউমের চেয়ে বালির ওজন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বেশি,' তথ্য দিল রায়হান।

'তাতেই বা কী, হলো?' কড়া চোখে কমপিউটার বিশেষজ্ঞকে দেখল স্বর্ণা।

'বুঝলেন না? পানির ওজন নেয়ার জন্য তৈরি ইঁটের দেয়াল। কিন্তু এখন ঘর ভরে উঠছে বালি দিয়ে। ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বালির বাড়তি ওজন নেবে ওই দেয়াল?'

'যে-কোনও ভাল ইঞ্জিনিয়ার ফিফটি পার্সেন্ট সেফটি মার্জিন রাখে,' বলল সোহেল। 'কাজেই ঘরের দেয়াল তৈরি করার সময় যত মজবুতই করুক, তারপরও বালির বাড়তি দশ পার্সেন্ট ওজন ভেঙে দেবে দেয়াল। প্রশ্ন হচ্ছে: আমরা মরার একটু আগে, না একটু পরে।'

একবার সোহেল আরেকবার রায়হানের দিকে চাইল স্বর্ণা। এই দু'জন অনেকটা তলিয়ে গেছে। অথচ মুখে চিন্তার কোনও ছাপ নেই। বড় করে শ্বাস ফেলল স্বর্ণা। মনকে বোঝাল, এরা যখন ভয় পাচ্ছে না, আমিই বা ভয় পেতে যাই কেন!

ঝিরঝির করে বৃষ্টির মত ঝরছে বালি। বেশ কিছুক্ষণ পেরুল, কিন্তু মোটেও ধসে গেল না দেয়াল। ওরা হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে বসে পড়তে বাধ্য হয়েছে। ছাত চলে এসেছে মাথার কাছে। এখন চট্ করে সরতে পারবে না বালি প্রপাত থেকে। স্বর্ণা ও স্মৃতির বাড়তি সুবিধা হারিয়ে গেছে। সবার পিঠ ঠেকে গেল ছাতে। আর মাত্র আঠারো ইঞ্চি জায়গা বাকি। দেয়াল যদি এখন ভেঙে না পড়ে, ওরা দম আটকে মরবে। শেষ কয়েকটা মুহূর্ত হবে বড় কষ্টের।

আরও কিছুক্ষণ পর ওদের ধারণা হলো, এবার মরতেই হচ্ছে। বালি খুঁড়ে নিজেদেরকে তুলে রাখতে চাইছে। কয়েক

সেকেণ্ড চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল স্মৃতি। হিসহিস শব্দের ভিতর ওর ফোঁপানির আওয়াজ শুনতে পেল ওরা।

'ধুশ্-শালা, গেলামই তা হলে!' শোনা গেল হতাশ রায়হানের কণ্ঠ। সোহেল ভাইয়ের উপস্থিতি ভুলে গেছে। ছাতে গাল চেপে খুদে এয়ার পকেট তৈরি করতে চাইছে। তারপর ওর গোটা মুখ ঢেকে দিল বালি।

কিন্তু কয়েক শ' টন বালির প্রবল চাপ ইতিমধ্যেই ফাটল ধরাতে শুরু করেছে দেয়ালে। ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে সুরকি। পরক্ষণে ধসে পড়া বাঁধের মত চিত হয়ে গেল দেয়াল। তৈরি হলো চওড়া পথ, ওদিকে রয়েছে আরেকটা চেম্বার, সেদিকে ছুটল বালির স্রোত।

সোহেলরা আগেই জীবনকে বিদায় দিয়েছে। হঠাৎ বালির মেঝের নীচ থেকে এল প্রচণ্ড এক টান। যেন গভীর কোনও গর্তে পড়ছে ওরা। কিছুই করবার নেই, তবে পাঁচ সেকেণ্ড পর টের পেল, জাপটা-জাপটি হয়ে পড়ে আছে মেঝের উপর। একটু আগে যে বালি ওদেরকে শেষ করতে চেয়েছে, ওই একই জিনিস আদর করে নামিয়ে দিয়েছে মেঝেতে।

'ওরে হই, বেঁচেই গেলাম!' বিকট চিৎকার ছাড়ল রায়হান, সবার আগে উঠে পড়েছে। ওর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ফিরল বড় চেম্বার থেকে। উঠে দাঁড়িয়েছে সোহেল, খপ্ করে ওর বাহু ধরল রায়হান, 'দারুণ, সোহেল ভাই! আগে না বললে ভয়েই মারা পড়তাম!'

পোশাক ঝাড়তে শুরু করেছে সোহেল। 'আমি কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম না।'

'আমার কোনও সন্দেহই ছিল না।' স্মৃতি ও স্বর্ণাকে টেনে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রায়হান। 'তবে একেবারের শেষদিকে...'

উঠে দাঁড়িয়েই বলল স্মৃতি, 'মিস্টার আহমেদ, আপনাকে

সত্যিই ধন্যবাদ। আমিও রায়হান সাহেবের মত একই কথা বলব, আগে থেকে ভরসা না দিলে ভয়েই হার্টফেল করতাম।'

ওদের আধ মিনিট লাগল অস্ত্র খুঁজে নিতে। অ্যাসল্ট রাইফেল এ ধরনের বালি-হামলার কথা ভেবে তৈরি হয় না। ওগুলোর ব্যারেল ও রিসিভার ভালমত পরিষ্কার করতে হলো।

কাজ শেষে ঢুকে পড়ল ওরা পাশের গুহায়। গোলক-ধাঁধা এই ভূ-গর্ভস্থ কমপ্লেক্সের মত এই গুহাও লাইমস্টোনের তৈরি। ঢুকবার বা বেরুনোর পথ মাত্র একটি। সামনের দেয়াল থেকে দশ ফুট উপরে। পাথুরে দেয়াল খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে ধাপ।

'আমরা জানি এখানে বুবি-ট্র্যাপ থাকতে পারে,' প্রথম ধাপের সামনে গিয়ে থামল সোহেল। 'আমি সামনে সামনে চলব। আমার পিছনে আসবে স্বর্ণা। তারপর স্মৃতি ও রায়হান। এখন থেকে এদিক-ওদিক্ সরব না আমরা। কেউ বেশি কৌতূহলী হবে না। প্রত্যেকে সামনের জনের পিছু নেবে। কোনও কিছু অস্বাভাবিক মনে হলে সেটা পাথর খণ্ড হোক বা দেয়ালের লেখা, আমাকে জানাতে হবে।'

চাতালের মত পাথুরে ধাপ বেয়ে উঠে এল ওরা। সামনে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। কিন্তু এতই সরু, আঁচড়ে তুলে নেবে দুই কাঁধ ও কনুইয়ের চামড়া। উপরের দিকে গেছে পথ। রওনা হতেই ওদের মনে হলো, দু'পাশ থেকে চেপে আসছে দেয়াল। এখানে দ্রুত হাঁটা অসম্ভব। বেকায়দা পা ফেললে মচকে যাবে গোড়ালি। সাবধানে চলেছে সোহেল, খেয়াল রাখছে সামনে। যে-কোনও সময়ে বিপদ হতে পারে। খানিক যেতেই ট্রিপ ওয়ায়ার দেখল। পা ফেললেই ট্রিগার হবে।

সরু তামার তার, হাঁটু উচ্চতার একটু নীচে। এক অংশ দেয়ালের পেরেকে, অন্য প্রান্ত গেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ ধরে। আলো ফেলে তারটা দেখাল সোহেল, একে একে ওটা পেরুল

সবাই।

ট্রিপ ওয়ায়ার পেরিয়ে এক শ' ফুট যাওয়ার পর শেষ হলো সুড়ঙ্গ, সামনে পড়ল নিচু ছাতওয়ালা এক কুঠুরি। সুড়ঙ্গের শেষে কাঠের ট্রেস্‌ল, তার নীচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে হলো। তামার তার থেমেছে এক ডিভাইসের ধাতব লিভারে। ওখানে টান পড়লেই ট্রিপ হবে। নিচু এক মঞ্চ থেকে পাথরের বড়সড় একটা বল রওনা হবে। তিন ফুটি ফুটবল মনে হলো ওটাকে দেখে। ওজন হবে পাঁচ শ' কেজির বেশি। নীচের দিকে রওনা হলে লাফিয়ে গিয়ে পড়বে আগন্তুকের উপর। ফলাফল: সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

'ট্রিগার করলে, সোহেল ভাই?' জানতে চাইল রায়হান। ওর বাচ্চাদের মত মন চাইছে সুড়ঙ্গ ধরে ছুটে যাক বল, দেখবে।

'বাদ দিন তো,' বলল স্মৃতি। ওর আর্কিওলজিস্ট মন বলছে, কিছু বদল হওয়া উচিত নয়। আগে চারপাশ দেখে ঠিক করবে কী করা উচিত।

'ওটা এখানে রেখেই এগুব আমরা,' রায়হানকে হতাশ করল সোহেল। তবে মেঝে থেকে তুলে নিল দুটো পাথর, গুঁজে দিল পাথরের বলের নীচে। কেউ যদি ট্রিপ ওয়ায়ার ছিঁড়েও ফেলে, লিভার রিলিজ হবে, কিন্তু নড়বে না বল।

এই ঘরে মানুষের তৈরি কিছু জিনিস দেখা গেল। এক পাশে কাঠের সিন্দুক, তবে ছিটকিনি নেই। পড়ে আছে তলোয়ারের খাপ। আরেক পাশে বারবারি জলদস্যুদের ভয়ঙ্কর চেহারার সিমিটার। ওটা ব্রাসের তৈরি। কয়েকটা দড়ি ও বারোটা ধাতব শাফট। সোহেল চিনল, শেষেরগুলো র‍্যামরড, ওগুলো দিয়ে বারুদ ঢোকানো হতো আগ্নেয়াস্ত্রের ভিতর। দাঁড়িয়ে পড়ে ফ্ল্যাশলাইটের ব্যাটারি বদলে নিল ওরা, আবারও এগুতে লাগল।

ফুটবলের কুঠুরি থেকে বেরিয়ে সামনে পড়ল তিনটে সুড়ঙ্গ।

প্রথমে ডানদিকের সুড়ঙ্গে ঢুকল ওরা, চারপাশে কোনও বুবি-ট্র্যাপ দেখা গেল না। তবে শেষমাথা বন্ধ পাওয়া গেল। মাঝের সুড়ঙ্গের আধা পথ যেতেই সোহেলের পায়ে লাগল লুকানো ট্রিগার। একটু দেবে গেল মেঝে। সোহেল বুঝে গেল বিপদে পড়েছে ওরা।

সুড়ঙ্গের মেঝে বালিতে ভরা, নীচে লুকানো ছিল কাঠের তক্তা। ওটার উপর সোহেলের পা পড়তেই ফস্ করে উঠেছে তক্তার নীচের ইস্পাতের ফ্লিন্ট, ওটাই জ্বেলে দিয়েছে ফিউজ। গর্তের ভিতর রয়েছে বারুদের পিপে, ওটা বিস্ফোরিত হলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ওরা।

লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল সোহেল, ঘুরেই ধাক্কা দিল স্বর্ণার কাঁধে। সবাইকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। কয়েক পা পিছিয়ে গেল ওরা, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাদের উপর পড়ল সোহেল। তবে কোনও বিস্ফোরণ হলো না, তার বদলে অনিশ্চিত ভাবে পুড়তে লাগল বারুদ, ফস্-ফস্ আওয়াজ তুলছে। বিশ্রী গন্ধ ও ধোঁয়ায় ভরে গেল সুড়ঙ্গ। ফাঁদ পাতার পর দুই শ' বছর পেরিয়েছে, বারুদের অ্যাসিডিটি শুষে নিয়েছে পিপের কাঠ। নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে আগুন, বিস্ফোরিত হওয়ার ক্ষমতা নেই পুরিয়ে যাওয়া বারুদের।

'সবাই ঠিক আছ তো?' বারুদ পুড়ে শেষ হওয়ার পর উঠে দাঁড়াল সোহেল।

'আমি ঠিক... খক-খক!' জানাল স্মৃতি। বেদম কাশছে।

'আমার মনে হচ্ছে তিন রাউণ্ড ডোজো খেলেছি গ্যাং ফেণ্ডের সঙ্গে,' বলল স্বর্ণা। ডানহাতে বামকাঁধ ডলছে। 'জানতাম না এত ভাল হা-ডু-ডু খেলেন, সোহেল ভাই।'

মৃদু হাসল সোহেল। 'এই বুবি-ট্র্যাপ কিন্তু বলে দিচ্ছে আমরা ঠিক পথেই চলেছি।'

এগুতে শুরু করল ওরা, ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছে সুড়ঙ্গ। জানবার উপায় নেই টিলার কত গভীরে এসেছে, বা কত দূরে সরেছে নদী-তীর থেকে। তবে সবাই আন্দাজ করছে সমাধিটা কাছেই কোথাও আছে।

এই সুড়ঙ্গ বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। বালির উপর দেখা গেল মানুষের পায়ের ছাপ। আজ থেকে দুই শ' বছর আগে ফাঁদ পেতেছে এরা। আরও দু'বার সবাইকে দাঁড় করাল সোহেল, নিজে সামনের মেঝে পরীক্ষা করে দেখল, কোনও লুকানো বোমা পাওয়া গেল না। আবার এগুতে শুরু করল ওরা।

সামনে তীক্ষ্ণ মোড় নিয়েছে সুড়ঙ্গ। বাঁকের কাছে পৌঁছে থামল সোহেল, সাবধানে উঁকি দিল ওদিকে। দু' পা গেলেই পাথুরে দেয়ালের বুকে বসানো লোহার প্রকাণ্ড দরজা। জং ধরে লালচে হয়ে গেছে। ওটাই বলছে ওপাশে ছিল ভেজা বাতাস ও পাহাড়ি নদী। কোনও তালা বা চাবির ব্যবস্থা নেই দরজায়। কাঁচা লোহা পিটিয়ে তৈরি পাত। কবজা রয়েছে ওদিকে।

হাঁটু গেড়ে বসল সোহেল। ব্যাকপ্যাক নামিয়ে তার ভিতর হাত ভরে কী যেন খুঁজতে লাগল।

ওকে পাশ কাটাল রায়হান, থমকে দাঁড়াল দরজার সামনে। দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করল। নাটকীয় ভাবে বলে উঠল, 'ওপেন সিসেম!' মোটেই নড়ল না দরজা। ঘুরে স্মৃতির দিকে চাইল। 'আপনার কী মনে হয়, মন্ত্রে কাজ হওয়া উচিত না?'

'এ জাদুতে কাজ হবে,' উঠে দাঁড়াল সোহেল। হাতে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের খণ্ড।

স্বর্ণার ফার্স্ট-এইড কিট থেকে কার্ডবোর্ডের বাক্স নিল ও, ছিঁড়ে নিল এক অংশ। দরজার পাশে ওটা গুঁজে বুঝতে চাইল কোন দিকে রয়েছে কবজা। তাতে লাগল তিন মিনিট। তারপর দুই মিনিটের দুটো টাইমিং পেন্সিল বেছে নিয়ে বসিয়ে দিল

দরজার পাশে।

টাইমার কাজ শুরু করতেই মিষ্টি হাসল রায়হান। 'আপনারা আসছেন তো?' বলেই সোহেলকে পাশ কাটিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল। প্রশস্ত সুড়ঙ্গে ওকে দৌড়ে হারিয়ে দিল সোহেল ও স্বর্ণা। বেশি পিছনে রইল না স্মৃতিও।

পঞ্চাশ গজ গিয়ে থেমে গেল সোহেল। ওর নির্দেশে থামল সবাই। দূরত্বের কারণে আবছা শোনাল বিস্ফোরণের আওয়াজ। তবে প্রেসার ওয়েভ ঝাঁকি দিয়ে গেল ওদের পোশাকগুলোকে।

আগের জায়গায় আবারও ফিরল ওরা। ফ্রেম ও কবজা উড়ে গেছে। সামনের সুড়ঙ্গে ছিটকে গিয়ে পড়েছে দরজা।

পাঁচ ফুট যেতে না যেতেই ফুরিয়ে গেল সুড়ঙ্গ। সামনে প্রকাণ্ড এক গুহা। এতই বড়, হ্যালোজেন ফ্ল্যাশলাইট শেষমাথা স্পর্শ করছে না। ছাত কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট উঁচু, লাইমস্টোনের। ডানদিকে পাথরের বিশাল স্তূপ। ওটা তৈরি হয়েছে বিস্ফোরণের ফলে। জেফ মার্টেল যাওয়ার পর বুজিয়ে দেয়া হয়েছে গুহার মুখ।

বামদিকে উঁচু এক প্ল্যাটফর্ম, মনে হলো এককালে ওটা ইউনুস আল-কবিরের জেটি ছিল। পাশেই একটু কাত হয়ে পড়ে আছে কাঠের জাহাজ, জলদস্যু নেতার প্রিয় রক। এখন আর ভাসছে না ওটা, জমিতে ঠেকে আছে কিল। ভাল করে পিয়ারের সঙ্গে বাঁধা না থাকলে ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে পড়ে যেত।

মাস্তুল নামিয়ে সরিয়ে নেয়া হয়েছে রিগিং, নইলে গুহার ভিতর ঢুকতে পারত না। মনে হলো না জাহাজের কোনও ক্ষতি হয়েছে। এখনও সাগরে নামিয়ে দিলে ভাসবে। শুকনো বাতাসে ঠিক রয়ে গেছে খোল। জাহাজের মুখ নদীর দিকে, স্টার্নের বিকট-দর্শন কামানগুলো কালো গহ্বর নিয়ে তাক করে আছে সোহেলদের দিকে।

পিয়ারে উঠে কাছ থেকে জাহাজটা দেখল ওরা। আমেরিকান

জাহাজের সঙ্গে লড়তে গিয়ে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। গোলার আঘাতে উড়ে গেছে বুলওঅর্কের অংশ, ডেকে অন্তত দশটা জায়গায় আগুন ধরেছে। একটা কামান নেই। ওই এমপ্লেসমেণ্টের অনেক ক্ষতি হয়েছে। যুদ্ধের কোনও এক পর্যায়ে বিস্ফোরিত হয় কামান, হারিয়ে যায় সাগরে।

'চিন্তা করা যায় না,' শ্বাস আটকে বলল স্মৃতি। 'এ তো জীবন্ত ইতিহাস!'

'যেন শুনছি যুদ্ধের দামামা,' আবেগ দিয়ে বলল রায়হান।

'বাড়ি ফিরে কানের ডাক্তার দেখাবেন,' নীরস স্বরে বলল স্বর্ণা। 'সঙ্গে নিউরোলজিস্টও। ব্রেইনেও বড় ধরনের সমস্যা থাকতে পারে।'

প্রকাণ্ড গুহা ঘুরে দেখতে প্রচুর সময় লাগবে, তবে নড়ছে না কেউ জাহাজের কাছ থেকে। ভাবছে, কেমন ছিল সেসব দিন।

ডানদিকে সামান্য নড়াচড়া চোখে পড়ল রায়হানের, সচেতন হয়ে উঠল। ঘুরেই বিধ্বস্ত দরজার ফ্রেমের উপর আলো ফেলল। আর ঠিক তখনই দেখল চট্ করে সরে গেল এক লোক! চিৎকার করে সবাইকে সতর্ক করতে চাইল রায়হান, কিন্তু তার আগেই হুঙ্কার ছাড়ল অ্যাসল্ট রাইফেল। প্রথম যে লোককে দেখেছে, তার দশ ফুট দূরে আঁধারে ঝলসে উঠেছে কমলা আগুন!

পরক্ষণে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রায়হান, মাযল-ফ্ল্যাশে দেখেছে আরও কয়েকজনকে। ওদের চারপাশে এসে লাগছে বুলেট। তারপর গর্জন ছাড়ল আরও কয়েকটা রাইফেল।

সোহেল বসে পড়েই চট্ করে ওদিকে চাইল। তার আগেই কোমরের হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ভাবল, এরা এত তাড়াতাড়ি গুহা পেল কীভাবে! বুঝতে পারছে, মোটেই স্বপ্ন দেখছে না। ওদের তিনগুণ লোক হাজির হয়েছে, লড়বার জন্য এনেছে প্রচুর অ্যামিউনিশন। তার

চেয়েও খারাপ সংবাদ: বেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথই আটকে দিয়েছে তারা!

সতেরো

বিশাল সাগরের দিকে দ্বিতীয়বার চাইল রানা। এ এমন এক দৃশ্য, কখনও পুরনো হয় না। সাগর ওর কাছে রহস্যময় ও রাজকীয়; ওই দূরের দিগন্তের ওপাশে রয়েছে নতুন কিছু। সাগর যেন বড় শান্ত, মুহূর্তে আবার ভয়ঙ্কর খেপা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আবার বিপজ্জনক শত্রু। আর সে কারণেই সাগরকে অন্তর থেকে ভালবাসে রানা।

এখন কানে ফিসফিস করছে হাওয়া, জাহাজকে আলতো আদর জানিয়ে চলেছে মৃদু ঢেউ। মার্ভেল যেন তার প্রেয়সী, তাকে দোলনায় বসিয়ে দুলিয়ে দিচ্ছে সাগর। তীর থেকে অনেক দূরে ওরা, কাজেই বাতাস তাজা, তাতে লবণের মৃদু ঘ্রাণ।

'ক্যাপ্টেন রানা, ক্ষমা করবেন,' বলে উঠল কেউ। 'আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি, তবে চলে যাবার আগে আরেকবার ধন্যবাদ না দিলে ছোট হয়ে যাব নিজের কাছেই।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। মানুষটা সাবেক লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী। তাঁকে বেমানান লাগছে না মোফিজ বিল্লাহর দেয়া সুটে। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

উষ্ণ ভাবে করমর্দন করল রানা। 'নট নেসেসারি।'

ও চেয়েছে দিনের আলোয় জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবে পলাতক বন্দিদেরকে। ভাল করেই চেনে মার্ভেল ও ক্রুদেরকে,

তবে ভাল কোনও ক্যাপ্টেন চাইবে না রাতে লাইফবোটে মানুষ নামাতে। বাড়তি ঝুঁকি নিতে চায়নি। ব্রিজের উইং থেকে নীচে চাইল রানা। ডেকে শ' দুয়েক মানুষ, লাইফবোটের পাশে।

সবাইকে নতুন পোশাক দিতে পারেনি ওরা। অনেকের পরনে এখনও ছেঁড়া ন্যাকড়া। তবে পেয়েছে ভাল খাবার, সুযোগ হয়েছে গোসলের।

কেউ কেউ দেখতে পেয়েছে রানাকে, হাত নেড়ে বিদায় জানাল। কয়েক সেকেণ্ড পর সবার মনোযোগ চলে এল রানার উপর, অভিনন্দন জানাতে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই।

'আপনি এবং আপনার দল না থাকলে মারাই পড়তাম আমরা সবাই,' বললেন সাবেক মন্ত্রী।

পাশ ফিরে কূটনীতিকের দিকে চাইল রানা। 'আপনারা সুস্থ আছেন তা আমাদের জন্য যথেষ্ট প্রাপ্তি। আপনাদের সঙ্গে যাবে ক'জন ক্রু, তাদের মাধ্যমে জানবেন আমরা কী করছি। আশা করি, ভোরে আবার আপনাদেরকে তুলে নিতে পারব। কিন্তু খারাপ কিছু যদি ঘটে, মার্ভেলের ক্রুরা আপনাদেরকে পৌঁছে দেবে তিউনিশিয়ায়। ওখানে পৌঁছুনোর পর আপনারাই ঠিক করবেন কোথায় যাবেন।'

'আমি অবশ্যই দেশে ফিরব,' জোর দিয়ে বললেন সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী। 'ফিরে পেতে চাই আমার পদ।'

'আপনি কীভাবে গ্রেফতার হন? মোহাম্মদ ফতে আলীর নির্দেশে?'

'না। নির্দেশটা দেয় মিনিস্টার অভ জাস্টিস। আমার পুরনো রাজনৈতিক শত্রু সে। ব্যাপারটা ছিল এমন: গতকাল ছিলাম পররাষ্ট্র মন্ত্রী, আজ ভোরেই হয়ে গেলাম কয়েদি। একটা ভ্যানে তুলে সরিয়ে নিল আমাকে, আর আমার পদ পেল মোহাম্মদ ফতে আলী।'

'এটা কবের ঘটনা?'

'গত ফেব্রুয়ারির ছয় তারিখে।'

'তার আগে কী করত ফতে আলী? আপনার মিনিস্ট্রিতে ছিল?'

'না। সে চাইছে সবাই যেন তা-ই মনে করে। আগে কোথায় কাজ করত, জানি না। তবে এটা জানি, সে ফরেন মিনিস্ট্রিতে ছিল না। পরে লোকের মুখে শুনলাম, লোকটা সাক্ষাৎ করেছে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির সঙ্গে। অথচ কাজটা ছিল প্রায় অসম্ভব। যা-ই হোক, পরদিন ঘোষণা দেয়া হলো, আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এখন থেকে ফরেন মিনিস্টার মোহাম্মদ ফতে আলী।'

'এমন কি হতে পারে গাদ্দাফিকে ব্ল্যাকমেইল করছে সে?'

'মনে হয় না। ব্ল্যাকমেইল কীভাবে করবে? গাদ্দাফি চিরজীবনের প্রেসিডেন্ট। সুপ্রিম পাওয়ার তার হাতে।'

'এক মিনিট,' ব্রিজে এসে ঢুকল রানা, দেয়াল থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে যোগাযোগ করল অপারেশন্স সেণ্টারে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ডিউটি অফিসার। 'একটা জরুরি কাজে তোমাকে দরকার,' বলল রানা। 'ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস রিপোর্ট চেক করে বের করতে হবে, ফেব্রুয়ারির ছয় তারিখের আগে গত এক বছরে লিবিয়ান নাগরিকরা কী ধরনের পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে গেছে।'

ব্রিজ থেকে রানা বেরুতেই জানতে চাইলেন সাবেক মন্ত্রী, 'আপনি আসলে কী ভাবছেন?'

'আপনার যে পদ ছিল, সেই পদে অপরিচিত কাউকে কখনও নেয়া হয় না,' বলল রানা। ওর মন চাইছে মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, জানিয়ে দিতে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত হবে না ওই ডিনারে যাওয়া। তবে বলে কোনও লাভ হবে না। কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'মোহাম্মদ ফতে আলীকে এক পয়সা দিয়ে বিশ্বাস করি না আমি। কূটনৈতিক

মহলে দারুণ সাফল্য পেয়েছে, সাহায্য করেছে শীর্ষ সম্মেলন সংগঠিত করতে—তবে আমার ধারণা ইমাম ইউনুস আল কবিরের সঙ্গে সে ভাল ভাবেই যুক্ত। আর...' থেমে গেল রানা।

'বলুন?'

'এটা সন্দেহজনক যে আপনি বন্দি থাকবেন ইউনুস আল-কবিরের বন্দি-শিবিরে।' এক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'এ থেকে মনে হয় ইউনুস আল-কবিরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে মোহাম্মদ ফতে আলীর।'

'ক্যাপ্টেন, আপনার আগে বুঝতে হবে লিবিয়ান রাজনীতি, এই নোংরামি বহু বছর ধরে চলছে। আমরা জঙ্গি উৎপাদন করি, তাদের খেদমতের জন্য ব্যবহার করি রাজনৈতিক বন্দিদেরকে।'

'আমি শুনেছি লিবিয়ান সরকার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়ছে।'

'তাই করছে এখন। তবে বহু লোক গাদ্দাফির এই নতুন নীতি না-পছন্দ করছে। তাদের ভিতর একজন ওই জাস্টিস মিনিস্টার। আমি জানি, ইউনুস আল-কবিরকে আগেও সাহায্য করেছে সে।'

'তা হলে আপনি বলতে চাইছেন মোহাম্মদ ফতে আলী আইনগত ভাবেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছে?'

'আমার পদটা নিয়ে নিয়েছে সে, এখন বাস করছে আমার বাড়িতে; তাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না, কিন্তু বলতে কষ্ট লাগছে—ঘটনা বোধহয় তা-ই।'

ব্রিজের ইন্টারকম ব্লিপব্লিপ করে উঠল। আবার ফিরল রানা, বাটন টিপে জানতে চাইল, 'কী পেলে?'

'মাসুদ ভাই, আপনি যা আশা করছেন, তেমন সাড়া জাগানো কিছুই ঘটেনি। সার্চে বেরিয়ে এল, তিনজন লিবিয়ানকে গ্রেফতার করা হয় নীসে, এরা হেরোইন স্মাগলিং করছিল। সুইটযারল্যাণ্ডে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে এক লিবিয়ান, তার সঙ্গে মারা পড়ে আরও তিন সুইস আরোহী। ফ্রান্সে এক লিবিয়ান তার বউকে খুন

করে আত্মহত্যা করতে চায়। গ্রিসে এক লিবিয়ান ঝগড়া করে এক দোকানির সঙ্গে, ছুরি মারে লোকটাকে। কুইক সার্চে আর কিছুই নেই।'

'ঠিক আছে।' ফিরে এসে মন্ত্রীর দিকে চাইল রানা। 'উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না।'

'আপনি কী ভাবছিলেন?'

'সত্যি বলতে, জানি না কী খুঁজছি।'

নীচে দেখা গেল ডেভিট থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে চল্লিশ সিটের লাইফবোট। মার্ভেলের শিকল সরিয়ে নেয়ায় বোটে উঠছে রিফিউজিরা। প্রায় সবগুলো বোট নামাতে হবে সাগরে। চেপেচুপে বসতে হবে মানুষগুলোকে। তবে এসব বোটে ছাত ও দেয়াল আছে, কেউ পা ফস্কে পড়বে না সাগরে। খোলগুলো এমনভাবে তৈরি, হারিকেনের ভিতর পড়লেও ডুববে না।

দ্বিতীয়বারের মত কূটনীতিকের সঙ্গে করমর্দন করল রানা। 'ভাল থাকুন।'

'আপনিও ভাল থাকুন।' ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

রানা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দশ মিনিট পর শেষ লিবিয়ানও নেমে পড়ল চতুর্থ বোটে। মার্ভেলের চার নাবিক চালাবে বোটগুলো। চতুর্থ বোটের নাবিকের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল রানা। জবাবে মুখ কালো করে পাল্টা হাত নাড়ল নাবিক। ওর বোধহয় মনে হচ্ছে মার্ভেল থেকে ওকে চিরবিদায় করে দেয়া হচ্ছে। আর ওকে দেখেই রানার মনে হলো, বেশিরভাগ সময় আমরা যা চাই, তা পাই না। ওর মন কেমন যেন করে উঠল সোহেল-স্বর্ণা-রায়হান ও স্মৃতির কথা ভেবে। ওরা এখন কী করছে?

চেয়ে রইল রানা বোটের নাবিকের দিকে। জেনারেল অপারেশন্স টেকনিশিয়ান সে, বোটে উঠে প্লেক্সিগ্লাস হ্যাচ নামিয়ে

দিল। উইঞ্চগুলো কাজ শুরু করল। মার্ভেলের পাশ দিয়ে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে বোট। কয়েক মুহূর্ত পর লাইন সরিয়ে নেয়া হলো। পুটপুট আওয়াজ তুলে রওনা হয়েছে লাইফবোট, বিশাল জাহাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

দেখতে না দেখতে দূরের বোটগুলোর পাশে পৌঁছল। রাতে ওখানেই থাকবে ওগুলো। আশা করা যায়, ভোরে আবারও তুলে নেয়া যাবে মার্ভেলে।

পাইলট-হাউসের পিছনের গোপন এলিভেটরে উঠল রানা, নেমে এল অপারেশন্স সেন্টারে। নিজ সিটে বসে থাকল থম মেরে। এখনও কোনও পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেনি। ফ্রিগেট বক্তিয়ার খিলজির পাশে কীভাবে ভিড়বে? কীভাবে উদ্ধার করবে প্রধানমন্ত্রীকে? আর ফ্রিগেট না ডুবিয়েই বা কীভাবে সরে আসবে? মেইন ভিউ স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে রেইডার প্লট। ফ্রিগেট বক্তিয়ার খিলজি আছে তীর থেকে মাত্র এক মাইল দূরে, ওটার কেউ জানে না মার্ভেলের উচ্চক্ষমতাশালী সেন্সর সুইট সবই দেখছে। আট নট গতি তুলে অলসভাবে পুবে চলেছে জাহাজটা। প্লটে দেখা যাচ্ছে আরেকটি জাহাজ। ওটা বিশাল সুপারট্যাঙ্কার, প্যারালাল ট্র্যাকে চলছে। গন্তব্য বোধহয় আয-যাওয়াইয়া অয়েল টার্মিনাল।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। মাত্র সোয়া এক ঘণ্টা পর মোহাম্মদ ফতে আলীর বাড়িতে শুরু হবে কূটনীতিকদের রিসেপশন। তাঁরা বোধহয় এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছেন। আজ মাঝরাতের পর আকাশে ঝুলবে চার ভাগের এক ভাগ বাঁকা একটা চাঁদ। এসব ভাবতে গিয়ে দমে আসছে রানার মন। মগজে কোনও বুদ্ধি খেলছে না।

মন থেকে সব দুশ্চিন্তা সরিয়ে দিতে চাইল রানা। কখনও কখনও দেখা যায় ঠিক সিদ্ধান্ত মেলে একটু পরেই। কমপিউটারে ইন্টারনেট খুলল রানা, লিবিয়ানদের বিষয়ে লেখা পুলিশদের

রিপোর্ট পড়তে লাগল। ওই গাড়ি দুর্ঘটনা ছিল ভয়ঙ্কর। ড্রাইভার ও আরোহীরা আগুনে পুড়ে ঝলসে যাওয়া বেগুন হয়ে যায়। শেষে ডেন্টাল রেকর্ড দেখে সনাক্ত করতে হয়। এক লিবিয়ান ছাত্র রেন্টাল গাড়ি নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে, মারা যায় গাছে ধাক্কা দিয়ে।

আরও কয়েকটা রিপোর্ট বের করে পড়ল রানা, মনে পড়ল একটু আগে সাবেক মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করা কথাগুলো। স্ক্রিনে খুলে দেখল লিবিয়ান জাস্টিস মিনিস্টারকে। কুঁচকে গেল ওর ভুরু। অত্যন্ত কদাকার, মোটা লোক সে। নাক থেবড়ে গেছে। সরু দুই চোখ প্রায় দেখাই যায় না। কখনও আহত হয়েছিল। চোয়ালের নীচের অংশ নেই। গ্র্যাফ্‌ট্‌ করে বুজে দেয়া হয়েছে গর্তটা, এবড়োখেবড়ো, চকচকে। অফিশিয়াল বাইয়োগ্রাফি বলছে, উনিশ শ' ছিয়াশি সালে আমেরিকানরা ত্রিপোলিতে বোম্বিং করবার সময় তার ওই অবস্থা হয়। এবার রায়হানের কাছ থেকে শেখা বিদ্যা কাজে লাগাল রানা, বের করল সিআই-এর ডেটাবেস। জানা গেল: মন্ত্রী মরতে মরতে বেঁচে যায়। যে লোকের স্ত্রীর সঙ্গে বিছানায় ধরা পড়ে, সে লোকই আজরাইলের মত জান কবচ করতে চেয়েছে। বাকি সব বানোয়াট।

আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী কাছ থেকে পাওয়া কথাগুলো আবারও ভাবতে শুরু করেছে। লিবিয়ান আইনমন্ত্রী দক্ষ অভিনেতাদেরকে হাসতে হাসতে হারিয়ে দিয়েছে। আবার সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিজ পদ হারিয়েছে, বন্দি তো হয়েইছে, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়েছে; তারপরও মোহাম্মদ ফতে আলীকে দোষ দিচ্ছে না, বলছে না সে-ই তাকে গ্রেফতার করিয়েছে। কথা শুনে মনে হয়েছে ভদ্রলোক বেশি কষ্ট পেয়েছেন তাঁর বাড়িতে মোহাম্মদ ফতে আলী বাস করে বলে।

'স্বর্গের মত বাড়ি?' আনমনে বলল রানা।

ইন্টারনেটে কয়েক মিনিট খুঁজতে হলো ওকে, তারপর পেয়ে

গেল লিবিয়ান ফরেন মিনিস্টারের রেসিডেন্সের ঠিকানা। একটা ম্যাপিং সাইট থেকে পেয়ে গেল জিপিএস কোঅর্ডিনেট্স্, এবার ব্যবহার করল গুগল আর্থ। নির্দিষ্ট লোকেশনে পৌঁছে জুম করল কমপিউটার। কয়েক মুহূর্তের জন্য সব ঝাপসা হয়ে গেল, তারপর পিক্সেল ঠিক হলো। ভীষণ চমকে গেল রানা, প্রায় লাফ দিয়ে ছাড়ল সিট। চারপাশের সবাই অবাক হয়ে গেছে।

সিটের হাতলের ইন্টারকম চালু করল রানা, ভীষণ গম্ভীর স্বরে বলল, 'মার্ভেলের প্রত্যেক অফিসারকে হাজির হতে হবে। জলদি অপারেশন্স সেন্টারে চলে আসুন সবাই।'

স্যাটালাইট ইমেজের দিকে আবারও চাইল রানা। বাড়িটা বসে আছে মরুভূমির মাঝে। কয়েক মাইলের ভিতর কোনও বাড়ি নেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়িটাকে অনেক দূর থেকে ঘিরে রেখেছে উঁচু দেয়াল। মেইন গেট থেকে শুরু করে ড্রাইভওয়ে চলে গেছে বাড়ি পর্যন্ত। তার আগে গোল হয়ে উঠে গেছে ক্যান্টিলিভার করা পোর্ট-কশেয়ার। একপাশে যুক্ত হয়েছে কাঁচ দিয়ে ঢাকা সোলারিয়াম, পিছন উঠানে গোলক-ধাঁধার মত ঘন হেজ ঝোপ। বাড়ির ছাতে স্যাটালাইট আপলিঙ্ক অ্যান্টেনা।

ঠিক এই লেআউটের একটা নকল দেখেছে রানা, বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে, জঙ্গিদের ট্রেইনিং ক্যাম্পে!

বিদ্যুৎ-শিখার মত হঠাৎই সব বুঝে ফেলল রানা। ডিগনিটরিদের উপর হামলা হবে আজ রাতেই! মহাসম্মেলনে শান্তি নিয়ে আলাপ করবার সুযোগ রয়েছে, তা বুঝবার আগেই সব থামিয়ে দেবে নব্য ইউনুস আল-কবির। সে ভাল করেই জানে নাটকীয়তা জীবনের জন্য জরুরি। কাজেই হামলার আগেই গর্দান নেবে প্রধানমন্ত্রীর! ভদ্রমহিলার মুখটা চোখে ভাসল রানার, তিনি ধীর পায়ে গিয়ে চেয়ারে বসে ঘাড় নিচু করলেন, পিছনে এসে দাঁড়াল এক লোক, দু'হাতে তুলে ধরেছে তলোয়ার!

আস্তে করে চোখ মুদল রানা, দেখতে পেল ঝিলিক দিয়ে নেমে আসছে তলোয়ারটা!

আঠারো

ঘরে নজর বোলাল জল্লাদ। মন ভরছে না তার। থাকা উচিত বিশাল হলরুম, এমন মাঝারি ঘর নয়। শত শত মানুষ তার হাতের কাজ দেখবে। আপাতত ঘরে একা সে, সঠিক সময়ে হাজির হবে দর্শক। অবশ্য সংখ্যায় তারা হবে কম। এখানকার সবাই হাজির হতে চেয়েছে, কিন্তু শেষে লটারি করে ভাগ্যবান কয়েকজনকে সুযোগ দেয়া হয়েছে। ঘরের পিছনে ভারী কালো চাদর ঝুলছে। ট্রাইপডে ক্যামেরা, আগেই পরীক্ষা করা হয়েছে। ঠিক ভাবেই কাজ করছে আপলিঙ্ক। চেয়ারের সামনের মেঝেতে পেতে দেয়া হয়েছে পুরু প্লাস্টিকের শিট। কাজ শেষে রক্ত পরিষ্কার করতে সুবিধা হবে।

জল্লাদের মনে পড়ল, প্রথম যখন একজনকে কতল করতে চাইল, সে-লোকের হৃৎপিণ্ড খুব ধড়ফড় করছিল। প্রেসার উঠে গেল সাড়ে তিন শ'-এ। তারপর যখন কাটা পড়ল মাথা, ধড়টা থেকে ছিটকে বেরুল ফোয়ারার মত রক্ত। বাগদাদের সে সেফ হাউস আর ব্যবহারই করা গেল না। অত নোংরা সাফ করবে কে!

আজ এগারোবারের মত মাথা কাটতে চলেছে সে। আগে কখনও এতটা উত্তেজিত হয়নি। আজই প্রথম মেয়েমানুষ কতল করবে। ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে মরোক্কো পর্যন্ত প্রায়

সবখানে আগেও মেয়েদেরকে খুন করেছে, আশপাশের অনেক নির্দোষ মানুষও মারা পড়েছে তার ফলে; কিন্তু সেসব ছিল অন্য কিছু—বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিলে এই মজা কোথায়?

ওসব হত্যাকাণ্ডের কথা কখনও ভাবে না সে। ইউনুস আল-কবির নির্দেশ দিয়েছেন, কাজেই সেটা পালন করতেই হবে। বিবেকের কাছে সে পরিষ্কার, হাসতে হাসতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষের সঙ্গে হাত মেলাবে, তারপর উড়িয়ে দেবে বোমা ফাটিয়ে।

এ সংগঠনে খোলা কিন্তু গোপন তথ্য হচ্ছে, সে নিজে মুসলিমদের মত ধর্মের নিয়ম মানে না। তাদের পরিবারে গোঁড়ামি ছিল না, ঈদের দুই দিন সে নামাজ পড়ত মসজিদে। তাও বাদ দিয়েছে আজ বিশ বছরের বেশি। লিবিয়ান আর্মিতে ক্যাপ্টেন ছিল, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে শুনেই পদত্যাগ করে, যোগ দেয় ইমাম ইউনুস আল-কবিরের সংগঠনে। যুদ্ধে যেতে ভাল লাগে না তার। তবে ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিশর, সিরিয়া ও মরোক্কোয় ট্রেইনিং দিয়েছে নব্য জঙ্গিদেরকে। সে ভাল করেই জানে ধর্ম ও স্রষ্টার নামে ধার্মিক লোকও হয়ে ওঠে ভয়ানক রক্তলোলুপ। তবে এ নিয়ে ভাবে না সে, নিজ মনের খুশিতে খুন করে, কোনও ধর্মের জন্য নয়।

দরজায় মৃদু টোকার আওয়াজ এল। 'ঘর পছন্দ হয়েছে, ভাই মঞ্জুর?'

আনমনে বলল সে, 'হ্যাঁ, চলবে।'

'মেয়েলোকটাকে কখন আনবেন?' পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল লোকটা।

'গর্দান নেয়ার একটু আগে। এরা যখন বোঝে মরতেই হবে, তখন বেশি ভয় পায়। ওটাই সেরা মুহূর্ত।'

'আপনার যা মর্জি, ভাই। কিছু লাগলে আমাকে বলবেন। আমি বাইরেই আছি।'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না মঞ্জুর লোহানি। লোকটা নীরবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মঞ্জুরের মনে হয়নি মহিলা কাতর হয়ে প্রাণ-ভিক্ষা চাইবে। অল্প যেটুকু সময় দেখেছে, তাকে অত্যন্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নারী বলে মনে হয়েছে। সেটাই বোধহয় ভাল। কাউকে কাঁদতে দেখলে, কাকুতি-মিনতি করতে দেখলে মন খারাপ হয়; সেইসঙ্গে আসে বিরক্তি। হ্যাঁ, ওই বিরক্তিই তাকে খেপিয়ে তোলে। মহিলা সহজ ভাবে গ্রহণ করুক মৃত্যুকে, প্রাণভিক্ষা চাওয়ার দরকার নেই। তাতে মহিলার সম্মান অন্তত থাকে।

সবাই ভাবে, মাফ চাইলেই বুঝি বাঁচবে। বোঝে না, মঞ্জুরের দেখা পাওয়া মানেই আজরাইলের দেখা পাওয়া।

মৃদু হাসল মঞ্জুর লোহানি।

না, ওই মহিলা প্রাণভিক্ষা চাইবে না।

'ডানদিক কাভার করো!' চেঁচিয়ে উঠল সোহেল। রক জাহাজের রেলিঙের ওপাশ থেকে পাঠিয়ে দিল পিস্তলের এক পশলা বুলেট। 'পাথরের স্তূপ পেরিয়ে আমাদেরকে ঘিরতে চাইছে।'

ওর মাযল-ফ্ল্যাশ দেখেই চার জায়গা থেকে এল পাল্টা গুলি।

তৈরি ছিল স্বর্ণা, ডেকের বিশ ফুট দূরে ক্রল করে গেছে। উঠে দাঁড়িয়েই রাইফেল থেকে দুই সেকেণ্ড গুলিবর্ষণ করল। ওখানে ছিল এক জঙ্গি। তার কী হলো, বোঝা গেল না। গুহার ভিতর নেমে এসেছে নিকষ অন্ধকার।

আচমকা দু'দলের এভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় প্রথম কয়েক সেকেণ্ড সবাই সংগঠিত হতে চেয়েছে। সোহেলের নির্দেশে রক জাহাজের ডেকে উঠে পড়েছে ওর দল। স্বল্প সময়ে ওটাই ছিল সবচেয়ে কাছের ভাল কাভার। ওদিকে গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিয়েছে জঙ্গি-নেতা, জানিয়ে দিয়েছে অ্যামিউনিশন বাঁচিয়ে হামলা

করতে হবে।

একটু পর পর জোনাকির মত জ্বলছে তাদের ফ্ল্যাশলাইট। শত্রুদের গুলি এড়াতে, চট্ করে সামনের পথটা দেখে নিয়েই ছুটে আসতে চাইছে। শুরুতে টর্চওয়ালা লোকের দিকে মনোযোগ দিয়েছে সোহেলরা। কয়েক মুহূর্ত পর বুঝেছে, ওরা ভুল করছে। জঙ্গিরা কোনও কাভার না পাওয়া পর্যন্ত টর্চ জ্বালছে না। আর সে আলো শুধু পিছনে পড়া জঙ্গিদেরকে পথ দেখানোর জন্য।

'কই, কই!' নিচু স্বরে বলে চলেছে রায়হান। ব্যাকপ্যাক নামিয়ে সব ছিটিয়ে কী যেন খুঁজছে। 'আমি জানি তুই আছিস, কিন্তু কোথায়!'

জাহাজের গায়ে এসে লাগছে বুলেট। কয়েকটা ঢুকে পড়ল গানপোর্ট দিয়ে, রায়হানের মাথার পাশেই বিঁধল।

জোরে এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনল সোহেল, 'স্বর্ণা, তৈরি?'

ওরা রেলিঙের ওপাশ থেকে একইসঙ্গে উঠে দাঁড়াল, পরক্ষণে গুলি ছুঁড়তে লাগল। নতুন কাভার নেওয়ার জন্য ছুটতে শুরু করেছে এক জঙ্গি, কিন্তু দুর্ঘটনাবশত পড়ে গেল অন্য এক জঙ্গির টর্চের আলোর ভিতর। নদীর শুকনো তীর বেয়ে পিয়ারে উঠতে চাইছে সে। যদি সফল হয়, একাই শেষ করে দেবে শত্রুদেরকে।

সঙ্গীর টর্চের বিম পড়েছে তার পায়ের উপর। কিন্তু ওটুকুই যথেষ্ট, নিশানা ঠিক করল সোহেল, আন্দাজ করে নিল কোথায় থাকবে জঙ্গির বুক। পর পর দু'বার গুলি করল। তার পুরস্কারও পেল, ঠন-ঠনাৎ করে পড়ল রাইফেল, ভেসে এল আর্তচিৎকার।

আগেই চট্ করে ডেকে বসে পড়েছে সোহেল ও স্বর্ণা। মাথার উপর দিয়ে গেল একে-৪৭-এর বুলেট, রেলিঙে লাগল কয়েকটা ঠকাঠক।

'পাগলামি, স্রেফ পাগলামি,' সোহেলের পাশে বসে বিড়বিড় করছে স্মৃতি।

মৃদু হাসল সোহেল। 'মুখোমুখি গানফাইট এমনই হয়।'

রক জাহাজের স্টার্নে ঠনাৎ করে পড়ল কী যেন।

'শুয়ে পড়ো!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সোহেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। সবার দেহের উপর দিয়ে গেল শ্র্যাপনেল, খুবলে নিল শুকনো কাঠ।

ঝনঝন করছে সোহেলের দুই কান, তবে ওদিকে মনোযোগ দিল না। ওদেরকে শুইয়ে রাখতে গ্রেনেড ফেলেছে, সেই সুযোগে সামনে বাড়বে জঙ্গিরা। কিন্তু সময় দিতে চাইল না সোহেল, রেলিঙের ওপাশ থেকে উঁকি দিল। গুহার বিধ্বস্ত দরজা থেকে আরেক দিক পর্যন্ত টিপটিপ করে জ্বলছে টর্চ! হিমশীতল ভয় খামচে ধরল সোহেলের হৃৎপিণ্ডকে। স্মৃতির সঙ্গে অস্ত্র নেই, আর রায়হান গোলাগুলিতে একদম অদক্ষ। তার মানে লড়বে শুধু স্বর্ণা আর ও।

কিন্তু এতজনের বিরুদ্ধে কী করবে ওরা দু'জন?

কমব্যাট হার্নেসের অ্যামিউনিশন পাউচ হাতড়াতে শুরু করেছে সোহেল, খাবলে তুলে নিল এক টুকরো প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। গাঢ় আঁধারে আঙুলের স্পর্শে খুঁজে নিল ষাট সেকেণ্ডের টাইমিং পেন্সিল, গেঁথে দিল ঠিক জায়গায়, তারপর ডেক থেকে ছুঁড়ে ফেলল। আগেই বদলে নিয়েছে গ্লক ১৯-এর ম্যাগাজিন, তিন সেকেণ্ড গুলি করেই আবার বসে পড়ল।

'আমাদেরকে ঘিরে ফেলতে দেয়া চলবে না,' স্বর্ণার উদ্দেশে বলল। 'প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ফেলেছি। ওটা ফাটলে সেই সুযোগে টার্গেট খুঁজে নেবে।'

সোহেল ঠিক করে ফেলেছে, ওরা যদি সময় পায়, স্মৃতিকে কাজে লাগাবে, খালি ম্যাগাজিনে গুলি ভরবে সে।

পঁচিশ সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হলো প্লাস্টিক চার্জ। কংকাশন হলো বুকে লাথি খাওয়ার মত। তৈরি ছিল সোহেল, আগুনের মস্ত

ছাতি উঠে গেল ছাতের দিকে, অশুভ আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল গোটা গুহা।

একই সঙ্গে গুলি শুরু করল সোহেল ও স্বর্ণা। যেসব জঙ্গি কাভার নেওয়ার জন্য ছুটে আসছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে গেল প্রথম পশলা বুলেট, তারপরই যিরো-ইন করল সোহেলরা, বুকে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল তিন জঙ্গি।

আট জায়গা থেকে গুলি এল। রক্তে ভেসে গেল সোহেলের থুতনি। রেলিঙে লেগেছে বুলেট, ছিটকে উঠে এসেছে কাঠের চল্টা। ব্যথা পাত্তা দিতে চাইল না সোহেল, আলোর শিখা থাকতে থাকতেই টার্গেটে গুলি পাঠাতে হবে; কিন্তু তা সম্ভব হলো না, দূর থেকে এল অজস্র বুলেট।

গুলির বর্ষা কমে আসতেই আবারও উঠে দাঁড়াল সোহেল, নদী-খাত থেকে যে-কেউ উঠে আসতে পারে, কাজেই অন্ধের মত গুলি করল পিয়ারের পাশে। হঠাৎ করডাইটের কড়া গন্ধের পাশাপাশি ভেসে এল পরিচিত ঘ্রাণ—পুড়ছে কাঠ।

ঘুরে চাইল সোহেল। গ্রেনেড ফাটবার সময় আগুন ধরে গেছে ডেকে? শিখাগুলো এখনও নিচু, কাঠ চাটছে, প্রচুর ধোঁয়া তৈরি করছে। তবে বাড়তে শুরু করেছে শিখা। একবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে পুড়ে মরতে হবে ওদেরকে। জ্বলন্ত চিতা হয়ে উঠতে পারে ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ।

'রায়হান, আগুন নেভাও, আমরা কাভার দেব,' নির্দেশ দিল সোহেল।

রায়হানের পাশ থেকে ক্রল করে সোহেলের দিকে এগুল স্মৃতি। 'ও অন্য কাজে ব্যস্ত। আমি নেভাই।'

'মাথা উঁচু করবেন না,' সাবধান করল সোহেল। মেয়েটির সাহস দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না।

দাউ-দাউ করে বেড়ে চলেছে শিখা। লাল আভায় দেখা গেল

গোটা স্টার্ন। ওখানে যেন উঠছে নতুন সূর্য। আলোর বলয় বাড়ছে দ্রুত, সুযোগ পেয়ে গেল জঙ্গিরা। আগের চেয়ে ভাল ভাবে দেখতে পাচ্ছে জাহাজটা। নিশানা করছে অনায়াসে।

সোহেল থেকে ত্রিশ ফুট দূরে জ্বলন্ত কাঠের কিনারায় পৌঁছে গেল স্মৃতি। ডেক জ্বলছে না। হেলমসম্যানের বেঞ্চ পুড়ছে। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল স্মৃতি, বেঞ্চের নীচে দুই পা রেখে জাহাজ থেকে ফেলে দিতে চাইল বেঞ্চ। কিন্তু সম্ভব হলো না, দু'টুকরো হয়ে গেল বেঞ্চ, ঝরঝর করে স্মৃতির উপর পড়ল কয়লার আগুন।

পুড়ছে ত্বক, চাপড় দিয়ে আগুন নেভাতে চাইল স্মৃতি। ধড়মড় করে উঠে বসল, মাথা গলিয়ে বের করে নিল শার্ট। পরনে ব্রেসিয়ার, ছিঁড়ে ফেলল শার্ট, ওটা দিয়েই দুই হাতে নেভাতে চাইল আগুন। ওর মাথার উপর দিয়ে রাগী মৌমাছির মত ছুটছে দু'পক্ষের গুলি।

জেদি শিখা নেভাতে অন্তত তিন মিনিট লাগল। ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেল স্মৃতির শার্ট। দুই তালু থেকে উঠে গেল চামড়া, সেখানে রইল শুধু লালচে মাংস। ব্যথায় পাগল হয়ে যাওয়ার দশা হলো ওর, কখনও ভাবতে পারেনি জীবনে এত কষ্ট থাকতে পারে।

যন্ত্রণা এতই তীব্র, ক্রল করে এগুতে পারল না, সাপের মত করে পিছলে ফিরে এল অন্যদের কাছে।

স্মৃতির হাতের উপর আলো ফেলেই চমকে গেল সোহেল।

'ঠিক হয়ে যাবে,' কাঁপা স্বরে বলল স্মৃতি।

'সবাই কান চাপা দিন,' উত্তেজিত কিন্তু নিচু স্বরে বলল রায়হান।

কিছুক্ষণ ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে দেখল জাহাজের বিশাল কামানের টাচহোল। কয়েক সেকেণ্ড পর মনে হলো ঠিক সময় হয়েছে, টাচহোলের ভিতর ফেলে দিল টাইমার পেন্সিল। আগেই কামানের

ব্যারেলের ভিতর ঠেসে দিয়েছে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। ওটার সামনেই রয়েছে গোলা—অন্তত বারোটা ধাতব বল দিয়ে তৈরি, ফিউজ দিয়ে পেঁচানো।

ফাটল টাইমার, ডেটোনেট করল প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভকে, অমনি কামানের মুখ থেকে ছিটকে বেরুল দশ ফুটি আগুনের হলকা। তার আগেই বেরিয়ে গেছে বারোটা গোলা। কামানের পিছিয়ে যাওয়া ঠেকাতে যে দড়িগুলো, সেগুলো কোনও কাজেই এল না; দুই টনি ব্রোঞ্জের কামান রকেটের মত বিপরীত দিকে ছুটল, রেলিং ভেঙে গিয়ে পড়ল পিয়ারের নীচে, নদীর পাড়ে।

বারোটা গোলার আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে প্রকাণ্ড কামানের গর্জনে। রায়হান দেখল যেখানে তাক করেছে, সেখানে তিনটি টর্চের দুটো নিভে গেছে।

কামানের গর্জন যেন কোনও সিগনাল, জানিয়ে দেয়া হয়েছে প্রথম রাউণ্ড যুদ্ধ শেষ, এবার দ্বিতীয় রাউণ্ড। জঙ্গিরা নতুন উদ্যমে গুলিবর্ষণ শুরু করল। জাহাজের শুকনো কাঠ চিবিয়ে চলেছে বুলেটগুলো। যেন জাহাজ টুকরো টুকরো করতে চাইছে জঙ্গিরা। জবাবে তাদের দিকে গুলি শুরু করল মার্ভেলের তিনজন। তবে শত্রুপক্ষে লোক বেশি, তারাই আটকে রাখল সোহেলদেরকে।

গলা ফাটানো চিৎকার শোনা গেল, সবাই মিলে তেড়ে আসছে জঙ্গিরা।

পাল্টা গুলি করতে গিয়ে আহত হলো স্বর্ণা। কাঁধের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে বুলেট। আহত কাঁধে রাইফেলের বাঁট ঠেকাতে পারবে না, কাজেই অস্ত্র ফুল অটোতে নিয়ে গেল, তারপর জাহাজ থেকে তিরিশ ফুট দূরে নিশানা করে গুলিবর্ষণ করল। বুলেটের একটা পর্দা তৈরি করতে চাইছে, যাতে জঙ্গিরা এগুতে না পারে।

রাইফেলের বোল্ট খট্ করে আটকে যেতেই স্বর্ণা বুঝল ম্যাগাজিন শেষ। ওর কাছ থেকে যেন দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে

রায়হান, গুলিবর্ষণ শুরু করল। যেভাবে হোক থামাতে হবে জঙ্গিদের ছুটে আসা। দেখতে না দেখতে রায়হানের অস্ত্রের গুলিও ফুরিয়ে গেল। একা সোহেল গুলি করে চলেছে পিস্তল দিয়ে, চেম্বার খালি হলেই পিস্তল ডেকে রেখে বদলে নিচ্ছে ম্যাগাজিন। ও যেন কোনও রোবট, ওর একমাত্র কাজ জঙ্গিদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা। সোহেলের অভিজ্ঞতা বলছে, লোকগুলো একবার সাহস হারালে পিছিয়ে যাবে কাভার নেয়ার জন্য।

চারপাশে এসে লাগছে বুলেট, পরোয়া করছে না সোহেল। কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, ওরাই জিতছে। মাযল-ফ্ল্যাশ পিছাতে শুরু করেছে। আপাতত পিছিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিরা।

বুলওঅর্কের পিছনে বসে পড়ল সোহেল, একের পর এক গুলি করে ব্যথা করছে কাঁধ-বাহু-কবজি। ঘেমে নেয়ে গেছে ও। জঙ্গিদের গুলি কমতেই জানতে চাইল, 'তোমাদের কার কী অবস্থা?'

'কাঁধে গুলি খেয়েছি,' অন্ধকারে জানাল স্বর্ণা।

'কপালের দোষ দিচ্ছি এখনও,' তিক্ত স্বরে বলল রায়হান। 'নিশাত আপার কাছ থেকে নাইট ভিশন নেয়া উচিত ছিল। যা-তা কারবার করলাম, সবচেয়ে জরুরি গিয়ারই ভুলে গেলাম!'

'স্মৃতি?'

'আমি ঠিক আছি,' নিচু স্বরে বলল স্মৃতি। ব্যথায় কাঁপছে কণ্ঠ।

'রায়হান, স্বর্ণার মেডিকেল কিট থেকে ব্যথার ওষুধ নিয়ে স্মৃতিকে ইঞ্জেকশন দাও।'

গত দশ মিনিট গুলির আওয়াজ অনেক বেড়ে ছিল, তবে এখন কেউ গুলি করছে না। থমথম করছে চারপাশ।

সবার কানে ধাঁধা লেগে গেছে, তবে শুনতে পেল এক লোকের কণ্ঠ, আসছে গুহার দরজার কাছ থেকে। 'তোমাদেরকে

একটা সুযোগ দেব। বাঁচতে চাইলে আত্মসমর্পণ করতে পারো।'

'হারামজাদা,' বলে উঠল স্বর্ণা। 'আমি তোর ওই গলা চিনি!'

'কী বললে?' বলল সোহেল। 'লোকটা কে?'

'মার্ভেলের ডেকে মাসুদ ভাই কথা বলেন ওই লোকের সঙ্গে। হার্বার পাইলট। নাম হারিস জামান।'

'এখন বুঝলাম কেন উপকূল সড়কে হামলা হয়েছিল,' বলল রায়হান।

'এ থেকে কোনও সুবিধা পাব না আমরা,' বলল সোহেল। কয়েক মুহূর্ত ভেবে গলা চড়িয়ে বলল, 'আত্মসমর্পণ, হারিস? তোমরাই বরং তাই করো! মাফ পেতেও পারো!'

'ব্যাটাকে আরও চেতিয়ে দিলেন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রায়হান।

এবার শুরু হলো তৃতীয় রাউণ্ড হামলা।

উনিশ

একটু আগে ভাল সংবাদ পেয়েছে রানা। লিবিয়ান ফ্রিগেট বক্তিয়ার খিলজিকে যে সুপারট্যাঙ্কার পাশ কাটাবে, ওটাকে ভাল করেই চেনে রানা। ইজরায়েলের অ্যাশকেলন নৌ-ঘাঁটিতে পারমাণবিক মিসাইল ধ্বংস করে ফিরবার সময় সুপারট্যাঙ্কার এইযির সঙ্গে দেখা হয় ওদের। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ হয় আতাসির। পেট্রোলিয়াম ইউএসএ-বেস কোম্পানির জাহাজটি ডুবত ইজরায়েলি সাবমেরিনের টর্পেডোর আঘাতে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে রক্ষা পায় দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস জাহাজটি সাবমেরিনকে থামিয়ে

দেয়ায়। বুদ্ধিমান লোক ক্যাপ্টেন জর্জ অ্যাডাম্‌স্‌, তাঁকে বেশি কিছু বলা হয়নি, তবে অনেক কিছুই বুঝে নিয়েছেন। একবারও জানতে চাননি মার্ভেল জাহাজটি কোন্‌ দেশের নেভির। ক্যাপ্টেন মাসুদ রানাকে ধন্যবাদ দেন তিনি।

মার্ভেল ও এইযি এখন খব কাছে চলে এসেছে, কাজেই ধরে নেয়া যায় বক্তিয়ার খিলজি থেকে ওদের কমিউনিকেশন মনিটর করা হচ্ছে। এই সমস্যা দূর করতে ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়েছে রানা। পেট্রোলিয়াম ইউএলসিসি কোম্পানির ওয়েব সাইট থেকে পেয়েছে এইযির ই-মেইল অ্যাড্রেস, ওই ঠিকানা অনুযায়ী নোট পাঠিয়েছে ক্যাপ্টেন বরাবর। ওই চিঠি সত্যি মার্ভেল থেকে পাঠানো হচ্ছে তা বুঝবার উপায় নেই কারও। হতে পারে আমেরিকার যে-কোনও শহর থেকে ফালতু কোনও ছোকরা ই-মেইল করছে। আর এ কারণেই প্রায় বিশ মিনিট কথা চালাচালির পর ক্যাপ্টেন অ্যাডাম্‌স্‌ মাত্র বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, এ লোকই দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা। এবং তাঁর জাহাজটি নিয়ে এইযির মাত্র এক হাজার ফুট দূরে চলে এসেছেন তিনি।

প্রতিটি জবাব পাওয়ার ফাঁকে আফসোস করছে রানা, এখন রায়হান থাকলে খুব ভাল হতো। ছোকরা পেরেন্ট কোম্পানির মেইনফ্রেম হ্যাক করে সরাসরি অর্ডার ঝাড়ত। সেক্ষেত্রে এত কথা লিখে এইযির ক্যাপ্টেনকে পটানোর চেষ্টা করতে হতো না। বারবার তাঁকে লিখতে হচ্ছে ওদের কী ধরনের সাহায্য দরকার।

নতুন একটা ই-মেইল দেখা দিল ইনবক্সে।

ক্যাপ্টেন রানা, বিষয়টা আমার ভাল লাগছে না। বহু বছর হলো আমি এই জাহাজের ক্যাপ্টেন। আমার প্রশিক্ষণও এ কাজ করতে বাধা দিচ্ছে। তবে আপনার অনুরোধ রাখব বলে ঠিক করেছি। জানিয়ে রাখি, আমরা ওই ফ্রিগেটের আধ মাইল দূর

দিয়ে যাব, তার চেয়ে কাছে যাব না। এবং, অ্যাশকেলন উপসাগরে আপনি যে ধরনের নিরাপত্তা দিয়েছেন, আশা করি লিবিয়ান ফ্রিগেট গোলা ফেলতে শুরু করলে ঠিক তেমনভাবেই রক্ষা করবেন আমাদেরকে।

আপনাকে সাহায্য করতে যতই চাই না কেন, এই জাহাজ এবং এর ক্রুদের নিরাপত্তা সবসময়েই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে। আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় পার করেছি মিডল ইস্টের বন্দরে, দেখেছি সন্ত্রাসীরা কীভাবে বদলে দিয়েছে ওই এলাকা; তবে আমার জাহাজের কিছু হোক তা আমি হতে দেব না। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমার জাহাজ যদি খালি না থাকত, তেল দিয়ে ভরা থাকত ট্যাঙ্ক; এক কথায় আপনার অনুরোধ ফিরিয়ে দিতাম।

ভাল থাকুন। ক্যাপ্টেন জর্জ অ্যাডাম্‌স্‌।

ধন্যবাদ আপনাকে, মনে মনে বলল রানা।

পাশে এসে থেমেছে খোরশেদ নবী, নিচু স্বরে বলল, 'তা হলে খেলতে শুরু করেছি আমরা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ওরা বুঝবার আগেই ঢুকে পড়ব ফ্রিগেটের ডিফেন্সের ভিতর। মাঝখানে থাকবে এইযি। ফ্রিগেটের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে নেব। ওরা ভাববে ওখানে রয়েছে একটা জাহাজ। পাশ কাটিয়ে যেতে দেবে। এইযি পেরিয়ে যাওয়ার আগে বুঝবেই না মার্ভেল ওদের অতটা কাছে চলে গেছে।'

কথা বলবার ফাঁকে টাইপ করছে রানা, এবার ই-মেইল করে দিল।

ক্যাপ্টেন জর্জ অ্যাডাম্‌স্‌, আপনি এবং আপনার ক্রুরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছেন। সেজন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধারণা করি, এ সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য পরবর্তীতে আপনাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মাননা দেয়া হবে।

তবে, আজ যা ঘটবে তা গোপন রাখতে হবে।

আমরা আপনাদের ব্রিজে অ্যালডিস লাম্পের আলো ফেললে বুঝবেন শুরু হচ্ছে কাজ। ধরে নিতে পারেন, আমরা তৈরি হব দশ মিনিট পর।

আবারও বলছি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা।

টেবিলের উপর রাশার তৈরি কোনি-ক্লাস ফ্রিগেটের স্কিম্যাটিক বিছিয়ে দিয়েছে রানা। সবাই চোখের সামনে দেখছে ইণ্টেরিয়র প্যাসেজগুলো। জলিল খান ও দশজন কমাণ্ডো মনোযোগ দিয়ে দেখছে সব। এরা প্রত্যেকে দক্ষ যোদ্ধা, নেমে পড়বে লিবিয়ান ফ্রিগেটে, হাসতে হাসতে প্রাণের ঝুঁকি নেবে। তবে রানার মনে হলো, সবচেয়ে ভাল হতো সোহেল, নিশাত ও স্বর্ণা এ কাজে সাথে থাকলে।

স্টারবোর্ডের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক হাজার ফুটি বিশাল জাহাজ এইযিকে। পানিতে পেট ভরে নিচু হয়ে গেছে মার্ভেল। সুপারট্যাঙ্কারের পেট একদম খালি, এত দূর থেকেও মনে হচ্ছে ওই জাহাজ আকাশ-সমান উঁচু। স্টার্নে অ্যাকোমডেশন ব্লক, আস্ত অফিস বিল্ডিঙের সমান। ভোঁতা চিমনি যেন দাঁড়িয়ে পড়া কোনও রেলরোড ট্যাঙ্ক কার।

'ঠিক আছে, সবাই ভাল মত দেখে নাও,' বলল রানা। 'ধারণা করছি ওরা প্রধানমন্ত্রীকে শেষ করতে চাইবে ক্রুদের মেসে। ...কারও কোনও নতুন আইডিয়া?'

'ক্রুদের মেস একমাত্র খোলামেলা জায়গা,' বলল জলিল খান। বাংলাদেশ আর্মি থেকে ওকে নিয়ে নেয়া হয়নি। গত বছর রানা এজেন্সিতে যোগ দিয়েছে। 'মাসুদ ভাই, যা কিছু ঘটবার, ওখানেই ঘটবে।'

আপত্তি তুলল না কেউ।

সবার পরনে লিবিয়ান নেভির ইউনিফর্ম। আরেকবার জাদু দেখিয়েছে মেকআপ আর্টিস্ট মোফিজ বিল্লাহ্, মাত্র এক ঘণ্টায় সরবরাহ করেছে প্রয়োজনীয় পোশাক। বক্তিয়ার খিলজির ক্রুরা চট্ করে বুঝবে না দলে ঢুকে পড়েছে নতুন কেউ।

'কিন্তু জাহাজে কেন, মাসুদ ভাই,' হঠাৎ বঁলে উঠল কমাণ্ডো রিপন খন্দকার। 'মানে বলতে চাইছি, প্রধানমন্ত্রীকে শেষ করতে জাহাজে তুলতে হবে কেন?'

'কারণ জাহাজের ভিতর অংশ হয় প্রায় ত্রিকোণ, কোথা থেকে সিগন্যাল ব্রডকাস্ট করা হলো, বোঝা খুব কঠিন,' বলল রানা। 'তারপরও যদি বোঝা যায়, জাহাজ চলে যাবে বহু দূরে। কেউ সঠিক জায়গায় পৌঁছলে দেখবে ফাঁকা সাগর।' মেইন ডেকের অ্যামিডশিপ হ্যাচের উপর আঙুল তাক করল রানা। 'আমরা এখান দিয়ে ফ্রিগেটে ঢুকব। দুটো দরজা পেরুব, ডানদিকের সিঁড়ি বেয়ে নামব একতলা। তারপর বামে, ডানে, তারপর আবারও বামে যেতে হবে। সামনে পড়বে ক্রুদের মেস। ...কারও কোনও প্রশ্ন?'

'ওখানে নাবিকদের অনেকে থাকবে,' আন্দাজ করল রিপন।

'হতে পারে,' বলল রানা। 'তবে যে মুহূর্তে আমরা কাজ শুরু করব, তারা চলে যাবে চারদিকে। ফাঁকা হয়ে যাবে হলওয়ে। তারপরও যারা মেস হলে থাকবে, ধরে নিতে পারো তারা জঙ্গি। সত্যিকারের ক্রুরা থাকবে ব্যাটল্ স্টেশনে। আমরা জঙ্গিদেরকে শেষ করব, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে আসব উপরের ডেকে। আমরা ওখানে আছি তা কেউ বুঝবার আগেই ফিরব মার্ভেলে।'

কেউ কিছু বলছে না। প্রত্যেকে গম্ভীর। ওরা জানে কিছুক্ষণের মধ্যে মরতে হতে পারে।

'আমাদের এই পরিকল্পনায় একটা খুঁত আছে,' একটু দ্বিধা নিয়ে বলল নবী। 'আমাদের কোনও একযিট স্ট্র্যাটেজি নেই।

আমরা সরে এলেই হামলা করবে ফ্রিগেট। কাজেই আমাদের দলকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। স্যাচেল চার্জ নিয়ে ফ্রিগেটে নামবে একটা টিম। বোমা ফাটিয়ে দুর্বল করে দিতে হবে জাহাজটাকে।'

সবার উপর চোখ বোলাল রানা। 'কারও কোনও প্রশ্ন?'

আবারও চুপ থাকল সবাই।

'তোমরা আরও মনোযোগ দাও,' বলল রানা, 'নবীর ওই প্ল্যানে স্যাচেল চার্জ নিয়ে যারা নামবে, তাদেরকে শুরুতেই শেষ করে দেবে ফ্রিগেটের প্রাইমারি ওয়েপন্স সিস্টেম।' স্কিম্যাটিক আবারও দেখাল রানা। 'সুপারস্ট্রাকচারের চার কোনা থেকে আসবে .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগানের গুলি। আমরা সামনের মেশিনগান দুটো দেখব। ধরলাম উড়িয়ে দেয়া গেল, কিন্তু দূরের দুটো রয়েই গেল; জাহাজই রক্ষা করবে ও-দুটোকে। তার মানে, আমাদেরকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলবে।'

'ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ কপ্টার নিয়ে উঠলে?' বলল জলিল। 'উনি ওই দুই মেশিনগানের উপর মিসাইল ফেলতে পারেন।'

'স্যাম মিসাইল পুরো কাভার দেবে ফ্রিগেটকে,' আপত্তির সুরে বলল নবী। 'ক্যাপ্টেন সিরাজ ভিড়তেই পারবেন না কাছে।'

'তা হলে আমরা কী করব?' বলল রিপন।

পরস্পরের দিকে চাইছে কমাণ্ডোরা।

ন্যাভাল ড্রয়িং গুটিয়ে ফেলল রানা। ওটার নীচ থেকে বেরুল লিবিয়ান উপকূলের মানচিত্র। মার্ভেল থেকে দক্ষিণের সাগর দেখানো হয়েছে। দশ মাইল পশ্চিমের এক জায়গায় টোকা দিল রানা। 'এটাই সব।'

জুলজুল করে চেয়ে রইল নবী, জলিল ও তার দলের সবাই মানচিত্র দেখছে। আধ মিনিট পর পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল জলিলের মুখে। 'ঠিক, মাসুদ ভাই!'

'দারুণ ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া!' বলল নবী।

সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। 'তোমাদের পছন্দ হয়েছে?'

ঘনঘন মাথা দোলাল ওরা।

মৃদু হাসছে ক্যাপ্টেন নবী। 'আমরা এজন্যই হামলা পিছিয়ে দিয়েছি দশ মিনিট?'

'ওরা আরও কাছে যাক, নইলে আমাদের প্ল্যান কাজ করবে না,' বলল রানা।

হাসতে শুরু করেছে সবাই।

'আর কোনও কথা নেই তো?' বলল রানা।

মাথা নাড়ল সবাই।

'তা হলে চলো, সবাই পজিশনে চলে যাই।'

'আমরা ওদেরকে ন্যাংটো করে ছেড়ে দেব,' বলল জলিল খান। পরক্ষণে জিভ কাটল, পচা কথা বলে ফেলেছে মাসুদ ভাইয়ের সামনে। লজ্জায় লাল হয়ে গেল তার গাল।

নবী ফিরে চলল অপারেশন্স সেন্টারে। তার কাজ জাহাজ থেকে হামলা করা।

অন্যরা নকল ব্রিজ থেকে বেরুল, সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল মেইন ডেকে। সবার পিছনে নামছে রানা। ভাবছে, আমরা বাঘের গুহার ভিতর ঢুকছি, আর বাঘও বসে আছে ভিতরে। জঙ্গিরা যদি বোঝে কী করতে চাই, দেরি না করে খুন করে ফেলবে প্রধানমন্ত্রীকে। সেক্ষেত্রে এত ঝুঁকি নিয়েও কিছুই করতে পারব না, বাঁচানো যাবে না তাঁকে।

ক্যাপ্টেন জর্জ অ্যাডাম্‌স্‌কে সিগন্যাল দিতেই বিশাল জাহাজের কোর্স বদলে নিলেন তিনি, এখন চলেছেন দক্ষিণে, লিবিয়ান ফ্রিগেটের দিকে। খুব সাবধানে সরে গেছেন আগের কোর্স থেকে, কোনও সতর্কবাণীও দেয়া হয়নি ফ্রিগেটকে।

দেখতে না দেখতে দুই জাহাজের মাঝের দূরত্ব কমল। আগের হিসাব অনুযায়ী ফ্রিগেট থেকে পাঁচ মাইল দূরত্ব রেখে চলবার কথা, কিন্তু সুপারট্যাঙ্কারের গতি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, চেপে এল ওটা ফ্রিগেটের দিকে।

লিবিয়ান রণতরী থেকে দুই মাইল উত্তরে, এক মাইল পিছনে চলে এসেছে সুপারট্যাঙ্কার। তখনও চুপ রইল দুই জাহাজের রেডিও। পোর্টেবল হ্যাণ্ডসেট নিয়ে গানওয়েলের ছায়ায় অপেক্ষা করছে রানা, পাশেই দলের সবাই। দিগন্তে ডুবতে শুরু করেছে সূর্য। সারাদিনের চাঁদি ফাটানো গরম কমে আসছে। তবে ডেক এখনও তপ্ত, স্পর্শ করলে চমকে যেতে হয়।

'লিবিয়ান নেভির বক্তিয়ার খিলজি থেকে ট্যাঙ্কার, আপনারা আমার স্টার্নের খুব কাছে চলে এসেছেন। নিরাপদে যেতে হলে সরে যেতে হবে আপনাদেরকে। বদলে নিন কোর্স, পিছন থেকে সরে যান, নইলে সংঘর্ষ হতে পারে।'

'বক্তিয়ার খিলজি, আমি জর্জ অ্যাডাম্স্, ইউএলসিসি এইযির ক্যাপ্টেন,' নরম স্বরে বললেন এইযির ক্যাপ্টেন। কেন যেন কল্পনায় রানা দেখল, ভদ্রলোক ছয় ফুট দুই ইঞ্চি, মাথাটা ডিমের মত, পুরোপুরি ছেলা। 'আমরা জোরালো ভাটার ভিতর পড়েছি। এইমাত্র আমাদের রাডার কাজ শুরু করেছে। আশা করি ঠিক সময়ে সরতে পারব।'

'ভাল,' কড়া স্বরে বক্তিয়ার খিলজি থেকে জানানো হলো। 'আপনাদের সমস্যা বাড়লে আমাদেরকে জানাবেন।'

রানার শিখিয়ে দেয়া সংলাপ বলেছেন এইযির ক্যাপ্টেন, এবং এখন পর্যন্ত সব ঠিক চলছে। ফ্রিগেটের দিকে যেতে থাকবেন অ্যাডাম্স্, আরও সময় পাইয়ে দেবেন রানাকে।

দশ মিনিট পেরুল, আগের গতি বজায় রেখে চলেছে বক্তিয়ার খিলজি, সুপারট্যাঙ্কারও গতি কমায়নি। ফ্রিগেটের আধ মাইল পাশ

দিয়ে চলেছে এইযি। রানা ভাবল, অনেক আগেই যোগাযোগ করবার কথা ফ্রিগেটের, কিন্তু তা করেনি। এটা ওদের জন্য সুবিধা এনে দিতে পারে।

'এইযি, এইযি, বক্তিয়ার খিলজি থেকে বলছি,' পেশাদার, শীতল স্বরে বলা হলো। 'এখনও সমস্যা চলছে?'

'এক মিনিট,' রেডিও করলেন ক্যাপ্টেন, আরও সময় নিতে চাইছেন।

তারপর পাঁচ মিনিট পেরুল, তারপর আবারও যোগাযোগ করা হলো ফ্রিগেট থেকে। এবার কণ্ঠে তাগাদা।

'দুঃখিত, আগেই যোগাযোগ করা উচিত ছিল। ভাটা আরও বেড়েছে। তবে আমরা টান থেকে বেরিয়ে আসছি।'

'আপনার বলা ওই ভাটার টানের কিছুই টের পাইনি আমরা।'

'তার কারণ আমার জাহাজের কিল চল্লিশ ফুট নীচে। তা ছাড়া, এই জাহাজ চওড়ায় তিনটে ফুটবল মাঠের সমান।'

এইযি, বাপ্, এইতো, চমৎকার হচ্ছে; মনে মনে বলল রানা।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে ওর। অ্যাডাম্স্ নিজেই একটু পর যোগাযোগ করবেন। দু'মিনিট পেরুল, তারপর বললেন তিনি, 'বক্তিয়ার খিলজি, এইযি থেকে বলছি। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি: আমাদের স্টিয়ারিং গিয়ার নষ্ট হয়েছে। আমি ইঞ্জিনিয়ারদের এখনই থামতে বলছি। তবে যে গতি তুলে চলেছি, তাতে কয়েক মাইল লাগবে থামতে। ক্যালকুলেট করেছি, আপনাদের পোর্ট বিম থেকে আধ মাইল দূর দিয়ে যাব। কাজেই অনুরোধ করছি, আপনারা কোর্স ও গতি পাল্টে নিয়ে এগুতে থাকুন।'

থামছে না সুপারট্যাঙ্কার, একই গতি তুলে ছুটছে। ফ্যানটেইলে পানি ছিটকে তুলছে একমাত্র প্রপেলার, ওখানে যেন ঝড় চলছে। মৃদু হেসে ফেলল রানা। ওর সংলাপে এটা ছিল না।

নিজ থেকেই ঝুঁকি নিয়েছেন ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন। চাইছেন মার্ভেল আরও কাছে পৌঁছে যাক। মনে মনে শপথ করল রানা, এই কাজ শেষ হলে ওই লোককে খুঁজে বের করবে, দুনিয়ার সেরা ড্রিঙ্ক কিনবে তার জন্য।

বাঁক নিতে শুরু করেছে বক্তিয়ার খিলজি, জলদি গতি তুলতে চাইছে। তবে এখন যথেষ্ট গতি নেই, কাজেই দ্রুত সরতে পারবে না। সুপারট্যাঙ্কার খাটো করে দিয়েছে লিবিয়ান রণতরীকে, পাশ কাটিয়ে চলেছে আঠারো নট গতি তুলে। দুই জাহাজের ভিতর মাত্র পাঁচ শ' গজ দূরত্ব।

রানা টের পেল মার্ভেলের ডেক মৃদু কাঁপতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী পাম্পগুলো স্যাডল ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক থেকে বের করে দিচ্ছে সাগরের পানি। বাড়তে শুরু করেছে গতি।

হেলম-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিনসেণ্ট গগল, রানার মতই সে-ও শুনেছে এইযির ক্যাপ্টেনের বক্তব্য। একবার কাত হয়ে ওয়েপন্স কন্সোলের দিকে চাইল। ওখানে জ্বলজ্বল করছে বেশ কিছু বাতি। জাহাজের বাইরের বেশ কিছু দরজা গুটিয়ে নেয়া হয়েছে, বেরিয়ে এসেছে সব ধরনের অস্ত্র।

পাম্প জেট থামিয়ে দিল গগল, পরক্ষণে রিভার্স করল প্রচণ্ড স্রোত। বো-র দুই টিউবের ভিতর বিস্ফোরিত হলো পানি। এত দ্রুত গতি কমল মার্ভেলের, খানিকটা উপরে উঠে গেল স্টার্ন। এইযির আড়াল থেকে ছিটকে বেরুল ফ্রেইটার। রিভার্স থামিয়ে দিল গগল, পূর্ণ গতিতে সামনে বাড়ছে। ক্রাইয়োপাম্পগুলো এক শ' ডিগ্রির বেশি নীচে রাখল ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিনকে, ফলে জেটগুলো পাগল হয়ে উঠল শক্তি পাওয়ার জন্য।

রেসের ঘোড়ার মত ছুটল মার্ভেল, বাঁক নিয়ে বেরুল সুপারট্যাঙ্কারের আড়াল থেকে। সামনে দেখা গেল ধূসর রঙের লিবিয়ান ফ্রিগেট।

মার্ভেলের সবাই চেয়ে রইল রণতরীর দিকে। নিশ্চয়ই ওই জাহাজের ব্রিজে চমকে গেছে সবাই। কোনও সতর্কবাণী ছাড়াই কোথেকে এল এ-জাহাজ? আর ছিলই বা কোথায়? সুপারট্যাঙ্কার একবারও বলেনি এত কাছে অন্য কোনও জাহাজ ছিল!

হ্যাঁ, থমকে গেছে ফ্রিগেটের সবাই। তিরিশ সেকেণ্ড লাগল তাদের সামলে নিতে। তারপর রেডিও চালু হলো, জবাবদিহি চাইছে, সেইসঙ্গে চলল হুমকি।

'এখুনি জানাও জাহাজের নাম কী, নইলে ফায়ার ওপেন করব!'

দ্বিতীয়বারের মত একই কথা বলা হলো। গগল ধারণা করল, তৃতীয়বার কথা বলতে গিয়ে সময় নষ্ট করবে না ফ্রিগেটের ক্যাপ্টেন। এখনও অনেকখানি দূরে বক্তিয়ার খিলজি, কাজেই মার্ভেলের উপর ফেলতে পারবে তিন ইঞ্চি কামানের গোলা। একবার গগলের মনে হলো তুলে নেবে হ্যাণ্ডসেট, বলবে আমরা দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। কিন্তু এখন কিছু বলে লাভ হবে না।

মনিটরে গগল দেখল তুলার একটা বল ছিটকে উঠেছে। ওটা যেন মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ছে। বক্তিয়ার খিলজির সামনের কামান গোলা ছুঁড়েছে। মার্ভেলের বো-র উপর দিয়ে গেল গোলা, পঞ্চাশ ফুট গিয়ে সাগরে পড়েই বিস্ফোরিত হলো। জাহাজের উপর দিয়ে বয়ে গেল কংকাশন।

'প্রথমটা সতর্ক করার জন্য, রানা,' জানাল গগল। 'দ্বিতীয়টা পড়বে মার্ভেলের উপর।'

বক্তিয়ার খিলজির পিছনের কামান গর্জে উঠল। গোলা এসে পড়ল উইং ব্রিজে, পুরো জায়গাটা উড়িয়ে নিয়ে গেল।

সিট থেকে লাফ দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো গগলের। 'ব্যস্, যথেষ্ট! নবী, ফায়ার অ্যাট উইল!'

দুই জাহাজের মাঝের আকাশ ভরে গেল গুলি ও গোলা

দিয়ে। চালু হয়ে গেছে মার্ভেলের ৩০এমএম গ্যাটলিং গান। গর্জে উঠল বোফোর্স অটোক্যাননা। ব্যারালের মুখ থেকে ছিটকে বেরুতে লাগল কমলা আগুনের জিভ। লিবিয়ান ফ্রিগেটের মেইন ব্যাটারির সঙ্গে সঙ্গত শুরু করেছে অ্যান্টিক্রাফট গানগুলো। প্রতি মিনিটে চারটে করে ক্লিপ খালি করছে।

প্রতি আঘাতে ঘণ্টির মত বাজতে লাগল মার্ভেল। এএএ রাউণ্ড ফুটো করছে খোল, থামছে গিয়ে পরের বাল্‌ক্‌হেডে লেগে। ডেকের কামানগুলোর রাউণ্ড ছিন্নভিন্ন করছে সব।

এরইমধ্যে তিনটে কেবিন বিধ্বস্ত হয়েছে। ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কের দেয়াল থেকে মার্বেলের স্ল্যাব পড়ছে গিয়ে সুইমিং পুলে। প্রতিটি গোলা সামনে যা পাচ্ছে, ধ্বংস করছে। সিনিয়র স্টাফ বোর্ডরুমে সরাসরি গোলা লাগল। উল্টে পড়ল আড়াই শ' কেজি ওজনের টেবিল। ছিটকে পড়ল চামড়া মোড়া চেয়ারগুলো, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল আগুন।

একইসঙ্গে আধ ডজন জায়গায় কাজ শুরু করল অটোমেটেড ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেম, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আগুন নেভাতে। ফায়ার টিমগুলোকে আগেই বলে দেয়া হয়েছে, অন্য ক্রুদের সঙ্গে তারাও জাহাজের আরেক পাশে থাকবে, ডুয়েল শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেরুবে না।

লিবিয়ান ফ্রিগেটের গোলাবর্ষণের জবাবে পাল্টা জবাব দিচ্ছে মার্ভেল। বক্তিয়ার খিলজির ব্রিজের সমস্ত জানালা উড়ে গেছে, টাংস্টেনের রাউণ্ড যেখানেই ঢুকছে, বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে ন্যাভিগেশন ও স্টিয়ারিং ইকুইপমেন্টের। আর্মার্ড দেহের এখানে ওখানে লেগে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে বুলেটগুলো। গ্যাটলিং গানের বুলেটের তোড়ে থরথর করে কাঁপছে লাইফবোট, দূর থেকে মনে হলো ওটা আহত ইঁদুর, ওটাকে চোয়ালের ভিতর ভরে ঝাঁকিয়ে চলেছে টেরিয়ার কুকুর। গ্যাটলিং গান ওখান থেকে সরে গেল,

অজস্র ফুটো নিয়ে একজোড়া পুলি থেকে দুলতে লাগল লাইফবোট।

টারেটগুলোকে ভেদ করতে পারবে না ছোট ক্যালিবারের বুলেট, কাজেই খোরশেদ নবী চালু করল বো-র সামনের ১২০এমএম কামান। ওটার স্টেবিলিটি কন্ট্রোল সিস্টেম এম১এ২ ব্যাটল ট্যাঙ্কের সমকক্ষ, নিখুঁত ভাবে লক্ষ্যভেদ করে। খিলজির ডেকের সঙ্গে যেখানে মিশেছে টারেট, সেখানে লাগল কামানের প্রথম রাউণ্ড। গোটা জিনিসটা লাফ দিয়ে পাঁচ ফুট উপরে উঠেই আবার ধপ্ করে পড়ল। কামানের ব্যারেল থেকে তখনও তেলতেলে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

পরস্পরের উপর হামলা করছে দুই জাহাজ। প্রচণ্ড আঘাত সইতে তৈরি করা হয়েছে ওগুলোকে। মার্ভেল ও বক্তিয়ারের মাঝখানের সাগর সরু হয়ে গেছে। আরও কাছে চলে এল দুই জাহাজ। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে আর নিশানা করতে হচ্ছে না তাদের, কামানের ব্যারেল থেকে বেরুতে না বেরুতে আঘাত হানছে গোলা।

গত এক শতকে কেউ এ ধরনের ন্যাভাল ওয়ারফেয়ার দেখেনি। আর দেখবেও না।

রানা ও তার দল দাঁড়িয়েছে নির্দিষ্ট একটা রেলিঙের অংশে। ওই জায়গা তিনগুণ রিইনফোর্সড, তবে ৩০এমএম অটোক্যাননের মুখে ওদের মনে হলো, ওরা সবাই দিগম্বর শিশু। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজে থরথর করে কাঁপছে সবাই।

এ ধরনের যুদ্ধে জড়াতে হবে, কেউ ধারণা করেনি। তবে রানা জানে, এ ছাড়া উপায় নেই ওদের। টেকনোলজি ওয়ারফেয়ারকে ভদ্রোচিত করেছে, দূর থেকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা ও ধ্বংস ডেকে আনা যায়। একটা বাটন টিপে শেষ করে দাও তোমার শত্রুকে। কিন্তু ওরা এখন লড়ছে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের

যুদ্ধ। শত্রুদের বুক থেকে উথলে ওঠা প্রবল ঘৃণা টের পাচ্ছে রানা। প্রতিটা গোলা যেন একেকটা ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল।

বুকের মাঝে রানা টের পেল, লিবিয়ান জঙ্গিরা ওদেরকে মৃত দেখতে চাইছে। শুধু তা-ই নয়, উড়িয়ে দিতে চাইছে ওদের লাশটাও। যেন কখনও পৃথিবীতেই ছিল না ওরা।

আর্মার্ড প্লেটে এসে লাগল আরেকটা গোলা। রানার মনে হলো, ওর দেহের ভিতর সব তরল হয়ে গেছে। কান নেই, হাত নেই, পা নেই, ও যেন একটা জেলিফিশ। এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে হলো, মস্ত ভুল করে ফেলেছি!

পরক্ষণে ভাবল, না, ভুল করিনি। কেউ না থামালে, কখনও থামবে না এই জঙ্গিরা, বহু মানুষের প্রাণ নেবে। যুক্তি বলতে এদের কিছু নেই। এরা মানুষ নয়, মানুষের মত দেখতে সাক্ষাৎ একেকটা পিশাচ!

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল ওরা। থরথর করে কাঁপতে লাগল মার্ভেল। বক্তিয়ার খিলজির পাশে ধাক্কা দিয়েছে ওদের জাহাজ। গগল ব্যালাস্ট ঠিক করেছে, দুই জাহাজের রেলিং এখন সমান উচ্চতায়। কম্প্যাক্ট মেশিন পিস্তল বের করল রানা, পরক্ষণে রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়ল বক্তিয়ার খিলজির ডেকে।

ওর মাথার আধ ফুট উপর দিয়ে গেল আরপিজি। নিজের পোড়া চুলের গন্ধ পেল রানা। বক্তিয়ার খিলজির স্টার্নে রিয়ার টারেটের পিছন থেকে রওনা হয়েছে রকেট, সোজা গিয়ে লাগল রিইনফোর্সড রেলিঙের উপর। ওর সঙ্গের এগারোজন এইমাত্র রেলিং টপকাতে শুরু করেছে। ব্রিগেডিয়ারের ইচ্ছা পূরণ হলো, ছিটকে পিছিয়ে গেল পাঁচ কমান্ডো। রক্তাক্ত, আহত এবং অচেতন। রেলিং পেরিয়ে ফ্রিগেটে পৌঁছুল মাত্র চারজন, তাদেরও লড়বার সাধ্য নেই। ঘোরের ভিতর চলে গেছে, জানেই না কোথায় আছে। দু'জন ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে জাহাজ থেকে।

দুই জাহাজের মাঝে সামান্য সরু সাগর তৈরি হয়েছে, ওখানে পড়ল কি না, বোঝা গেল না।

ক্লোজড্ সার্কিট টেলিভিশনে সবই দেখেছে গগল, দেরি না করে মার্ভেলকে সরিয়ে নিতে লাগল। মনে মনে আশা করছে, ওই দুই কমাণ্ডো টুথ পেস্টের মত চেপ্টে যায়নি। দ্রুত নির্দেশ দিল গগল। বোট গ্যারাজে অপেক্ষা করছে রেসকিউ টিম, তারা সঙ্গে সঙ্গে যোডিয়াক নামাল সাগরে।

এক টেকনিশিয়ান জয়স্টিক নেড়ে সরিয়ে নিল ক্যামেরা, স্ক্যান করতে লাগল বক্তিয়ার খিলজির ডেক।

'ওই যে ও!' বলে উঠল গগল।

রেলিঙের পাশে বসে পড়েছে আহত কমাণ্ডোরা। আরেকটু সামনে মাসুদ রানা, হাতে হেকলার অ্যাণ্ড কচ মেশিন পিস্তল। ব্যারেলের মুখ থেকে ধোঁয়া উঠছে। যে লোক রকেট লঞ্চার রিলোড করছে, বুকে বুলেট খেয়ে ছিটকে পড়ল সে। গগলের মনে হলো, রানা যেন জানে ওর উপর স্থির হয়েছে ক্যামেরা। একবার এদিকে চাইল, তারপর ছুটতে শুরু করল। ওর লক্ষ্য ফ্রিগেটের হ্যাচওয়ে।

বিশ

চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাম্বাসেডার নাহিদ কামাল, দেখছেন দূরে সোফায় বসে আছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। বেয়ারা গিয়ে শ্যাম্পেইন দিতে চাইল তাঁকে, তবে মাথা নেড়ে বারণ

করলেন তিনি। অ্যাম্বাসেডার নিজেও ড্রিঙ্ক নেননি। একটু দূরে মেয়ে বিষয়ে নোংরা কৌতুক শুনিয়ে চলেছেন আমেরিকান ভাইস-প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট অসুস্থ থাকায় তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে এসেছেন ইনি। কাছের ডিগনিটরিরা ভদ্রতার খাতিরে হাসির ভঙ্গি করছেন।

চমৎকার রিসেপশন হল ঘুরে দেখতে রওনা হয়ে গেলেন অ্যাম্বাসেডার। পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ ফতে আলীর বাড়িটা প্রকাণ্ড, মরুভূমির ভিতর মরূদ্যানের মত। মুরিশ ঢঙে তৈরি পাথরের এই বাড়ি যেন নিচু দুর্গ একটা। পোর্ট-কোশেয়ার থেকে নানাদিকে যাওয়া যায়, ওঠা যায় তিনতলা ছাতের উপর। দোতলা ও তৃতীয় তলায় রট-আয়ার্নের বুল্যাস্টার রাজকীয়। বিশ ফুট চওড়া সিঁড়ি নেমে এসেছে একতলায়। মাঝ ল্যাণ্ডিঙে বসানো হয়েছে অর্কেস্ট্রা, ওখান থেকে দু'দিকে গেছে সিঁড়ি। মিউজিশিয়ানরা ক্লাসিকাল অ্যারাবিক মিউজিক বাজিয়ে চলেছে।

বাড়িটা প্রকাণ্ড ও রাজকীয়, কিন্তু আজ যাঁরা এখানে এসেছেন; তাঁদের মহা গুরুত্বের কারণে গুরুত্ব চাপা পড়ে গেছে ওটার। যেদিকে চোখ পড়ছে কামালের, দেখছেন কমপক্ষে আট-দশজন প্রেসিডেন্ট। তাঁদের পরনে অভিজাত পোশাক। এক কোণে অদ্ভুত সুন্দর আলোয় বউ সেজেছে পটে রাখা এক পাম গাছ। ওখানে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত আলাপ সারছেন লেবাননের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। প্রকাণ্ড ঘরের আরেকদিকে গল্প করছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ও ইরানের ফরেন মিনিস্টার।

লিবিয়ান এ রিসেপশনে এঁরা ভদ্রতা বজায় রেখে আলাপ করবেন, তা জানেন কামাল, এঁরা রাজনীতিক ও কূটনীতিক। তবে কামালের মনে হলো, আজ এই অনুষ্ঠানে সবাই যেন একটু বেশি আন্তরিক। এ ঘরে যেন মেঘের মত ভাসছে পুঞ্জ পুঞ্জ আশা, সফল হবে ত্রিপোলির এই শান্তি মহাসম্মেলন।

দূর থেকে সবার কণ্ঠ গুঞ্জনের মত আসছে। এক পলকের জন্য আত্মবিশ্বাস হারালেন কামাল। প্রথম কথা, আগে আজ রাতে বেঁচে থাকতে হবে এই মানুষগুলোকে! তারপর না শান্তি।

সবচেয়ে বেশি ডিগনিটারি জড় হয়েছেন লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ ফতে আলীকে ঘিরে। বলকে ওঠা এক মোজাইক টাইল্ড্ ফোয়ারার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। হাতের গ্লাস একটু নাড়লেন, অ্যাম্বাসেডার কামালকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি দেখেছেন। আস্তে করে মাথা নাড়লেন, যেন নীরবে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি দুঃখিত যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁদের মাঝে নেই।

আজকের সবচেয়ে আলোচিত প্রসঙ্গ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া। কামালকে জানানো হয়েছে, আজ ইউনিফর্মের বদলে সিভিলিয়ান পোশাক পরবেন প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি, এবং বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে। জানানো হবে, তাঁরা সবাই দুঃখিত যে উনি আজ তাঁদের ভিতর নেই।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও অ্যাম্বাসেডার নাহিদ কামালের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বিসিআই-এর দুর্ধর্ষ এজেন্ট সলীল সেন। চমৎকার টুক্সেডো পরেছে। এখানে ঢুকবার সময়ে ইশারায় সলীল দেখিয়েছে সংযুক্ত লিভিংরুমের সিলিঙে রয়েছে ভিডিও ক্যামেরা।

ঘুরে ফিরে এইমাত্র অ্যাম্বাসেডারের পাশে এসে দাঁড়াল সলীল। বাংলায় বলল, 'এ পর্যন্ত পাঁচটা দেখলাম।'

'সিকিউরিটির জন্য?' জানতে চাইলেন কামাল।

'এখনও জানি না। তবে কাজ করছে ওগুলো। হামলা হলে সব রেকর্ড হবে। আরও দেখলাম লিভিংরুমে টেম্পরারি ভাবে প্লাজমা টেলিভিশন বসানো। কার্পেটের নীচ দিয়ে যায়নি ওয়ায়ার, টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে মেঝের সঙ্গে। প্রত্যেকে দেখতে

পাবে প্রধানমন্ত্রীর গর্দান নেয়ার দৃশ্য। সবাই যখন জড় হবে টিভির সামনে, আমার ধারণা, ঠিক তখনই হামলা হবে। দু'ধরনের পারফর্মেন্সের আয়োজন হয়েছে। দেখলাম, টিভির পাশেই রাখা টু-ওয়ে ওয়েবক্যাম।'

'সত্যিই এসব ঘটবে, মিস্টার সেন? বিশ্বাস হতে চায় না।'

'ওরা পরিকল্পনা সফল করতে চাইবে। আপনাকে আগেই জানিয়েছি, আমরা কী করতে চলেছি।'

'আপনারা জানবেন কী করে কারা সত্যিকারের সিকিউরিটি গার্ড, আর কারা জঙ্গি?' বললেন কামাল।

'জঙ্গিরা এখনও বাইরে। যারা এ পরিকল্পনা করেছে, তারা ভাল করেই জানে, জঙ্গিরা ভিতরে ঢুকলে বেশিক্ষণ কাভার নিয়ে থাকতে পারবে না।' কাঁধ ঝাঁকাল সলীল। ওর চোখ চলে গেছে আরেক দিকে। গেস্টদের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন লিবিয়ান এজেন্ট।

সবার উপর মাথা তুলতে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠলেন প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি, হাতে দেখা গেল ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। অর্কেস্ট্রা থেমে গেল, ঘুরে চাইলেন ডিগনিটরিরা। এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু বিষয়ে কিছু কথা বলবেন লিবিয়ান প্রেসিডেন্ট।

এঁরা সবাই জানেন, লম্বা বক্তৃতা দেন লিবিয়ান নেতা। দশ মিনিট মনোযোগ দিয়ে শুনলেন কামাল, তারপর বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে চাইলেন। এয়ারকণ্ডিশড্ কামরাতেও স্যুটের ভিতর দরদর করে ঘামছেন তিনি। দু'বার রুমাল বের করে হাত পরিষ্কার করলেন। এখন যদি স্যুট খুলে ফেলেন, দেখা যাবে ঘামে ভিজে গেছে গোটা শার্ট।

চট্ করে সলীল সেনের দিকে চাইলেন তিনি। লোকটা কি পাথর দিয়ে তৈরি? একদম নিশ্চিন্ত কেন চেহারা!

বদ্ধ গুহার নিকষ আঁধারে অস্ত্রের ম্যাগাজিন বদলে নিল সোহেল, স্বর্ণা ও রায়হান। স্বর্ণা জানাল, ওর হার্নেসে রইল মাত্র দুটো ম্যাগাজিন। ব্যথায় দপ-দপ করছে ওর আহত কাঁধ। শুশ্রূষা করবার সময় মেলেনি। ডান হাতের আঙুলগুলো চটচট করছে রক্তে।

অনেকটা দূর থেকে ছুঁড়ে দেয়া হলো গ্রেনেড। গানওয়েলের একটু নীচে লেগে বালির উপর পড়ল ওটা। জাহাজের খোলের কারণে বিস্ফোরণের আওয়াজ চাপা শোনাল, তবে জাহাজ দশ ডিগ্রি কাত হয়ে গেল পিয়ারের দিকে। শুকনো কাঠে সহজেই ধরে গেল আগুন, লাল জিভ দিয়ে চাটছে খোল। ওদিকে গিয়ে নেভাতে পারবে না ওরা, পরস্পরের দিকে চাইল।

'আগুন আরও বাড়লে টোস্টবিস্কুট হয়ে যাব আমরা,' মন্তব্য করল রায়হান।

মৃদু আলোয় এখনই দেখা যাচ্ছে কমপিউটার বিশেষজ্ঞকে। তিক্ত হয়ে গেল সোহেলের মন। ঠিকই বলেছে রায়হান। ওরা এতক্ষণ টিকেছে শুধু আঁধারের সুবিধা পেয়ে। এখন আরও বাড়ছে আগুন, সে আলো ছড়িয়ে পড়বে গুহার ভিতর। বাড়তি সুবিধা পাবে জঙ্গিরা। জরুরি প্রশ্ন হয়ে উঠেছে: ওরা কি এখানে অপেক্ষা করবে, আশা করবে ভাল কিছু হবে? এমন কিছু যে-কারণে পালাতে বাধ্য হবে জঙ্গিরা? কিন্তু তেমন কিছু ঘটবার কোনও কারণ নেই। ওদের বোধহয় এখনই পিছিয়ে যাওয়া উচিত। খুঁজে বের করা উচিত এই ফাঁদ থেকে বেরুবার কোনও পথ।

আর কোনও উপায় নেই, দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল সোহেল। 'ঠিক আছে, স্বর্ণা, রায়হান, আমি কিছুক্ষণের জন্য কাভার ফায়ার দেব। তোমরা স্মৃতিকে নিয়ে নেমে পড়বে পিয়ার থেকে। কোনও ডিফেন্সিভ পজিশন খুঁজে নেবে। আশা করি, তিরিশ সেকেণ্ড

কাভার দিতে পারব। ওদেরকে আটকে রাখব, তারপর ঝেড়ে দৌড় লাগাব তোমাদের পিছু পিছু।'

ভাল লাগছে না সোহেল ভাইয়ের কথা, নিজের জীবন নিয়ে খেলবেন উনি, চাপা শ্বাস ফেলল স্বর্ণা। একবার আপত্তি তুলতে গিয়েও থেমে গেল। সব বুঝেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উনি।

জলদস্যু তরীর রেলিঙের পাশে তৈরি হয়ে নিল ওরা। এখনও খুব ভাল করে আগুন ধরেনি কাঠে, আবছা আলোয় বিধ্বস্ত দরজা চোখে পড়ল না। তবে দশ-পনেরো ফুট পরিষ্কার দেখা গেল। দৃষ্টির শেষ সীমায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে এক জঙ্গি। বুকের নীচে জমেছে কালো রক্ত।

'ফায়ার!' নির্দেশ দিল সোহেল। পাথরের স্তূপ লক্ষ্য করে এক নাগাড়ে গুলিবর্ষণ শুরু করল ওরা। যে পথে এদিকে এসেছে, সেদিক থেকে কাউকে আসতে দেবে না।

অস্ত্রের ম্যাগাজিন খালি হতেই লাফ দিয়ে উঠল স্বর্ণা ও রায়হান, খপ করে স্মৃতির দুই বাহু ধরে পেরিয়ে গেল রেলিং, নেমে পড়ল পিয়ারে। ওখান থেকে পড়তে পড়তে সামলে নিল স্মৃতি। শক্ত করে ওর হাত ধরেছে রায়হান, নইলে আহত হাত নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত মেয়েটা। রেলিঙের পিছনে দাঁড়িয়ে আঁধারে গুলি করছে সোহেল, আটকে রাখতে চাইছে জঙ্গিদেরকে।

রায়হান ও স্মৃতিকে নিয়ে এগুতে শুরু করেছে স্বর্ণা। প্রত্যেকে কুঁজো হয়ে হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড পর গুহার দেয়াল পেয়ে গেল স্বর্ণা। দশ ফুট যেতেই ডানদিকে বাঁক নিল দেয়াল। পায়ের নীচে অমসৃণ হয়ে উঠল মেঝে। পাথরে হাত রেখে এগুতে পারছে না স্মৃতি। তবে পিছন থেকে ওর কাঁধ ধরে পরিচালনা করল রায়হান।

অন্ধ ফকিরের মত দেয়াল ধরে পঁচাত্তর ফুট এগুলো ওরা, তারপর পিছনে শুনতে পেল আবারও নতুন উদ্যমে গুলি শুরু

হয়েছে। ওদের মনেই হলো না সরতে পেরেছে। বদ্ধ পরিবেশে বিকট আওয়াজ তুলছে গুলি।

ঝুঁকি নিয়ে টর্চ জ্বালল রায়হান। ওরা চলে এসেছে পিয়ারের শেষে। সামনে স্তূপ হয়ে আছে নটিকাল গিয়ার, কুণ্ডুলি পাকানো দড়ি ও চেইন। পাশেই নলখাগড়া দিয়ে তৈরি বাস্কেট ও কাঠের খুঁটি। এক পলক সব দেখল রায়হান, তবে ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে অন্য কিছু। এই বড় গুহার পাশে রয়েছে ছোট আরেক গুহা। প্রবেশদ্বারের উপর রয়েছে লোহার ডাণ্ডা, সেখান থেকে ঝুলছে ছেঁড়া পর্দার মত কিছু। কোনও এক সময়ে ওখানে ছিল দুটো ট্যাপেস্ট্রি, আড়াল দিত গুহার ভিতর অংশ।

'চলুন, ভিতরে ঢুকে পড়ি,' তাগাদা দিল রায়হান।

নতুন এই গুহার ভিতর ঢুকল ওরা।

শেড দুটো টেনে দিল স্বর্ণা, গ্লক ১৯ পিস্তল হাতে ওখানেই থামল। রায়হান ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে চারপাশে আলো ফেলল। আঙুল দিয়ে ঢেকে কমিয়ে রেখেছে হ্যালোজেন বাতির আলো।

'এ কী সত্যি?' ফিসফিস করে বলল স্মৃতি। মুহূর্তের জন্য ভুলেই গেছে দুই হাতে ভীষণ ব্যথা, বাইরে চলছে গোলাগুলি, জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা। ভুলে গেছে সব।

পাথরের মেঝে থেকে যেন ঠাণ্ডা উঠতে না পারে, তাই কয়েক পরত পারশিয়ান কার্পেট মেঝের উপর পাতা। দেয়ালগুলো ঢাকা পড়েছে নানা ধরনের ট্যাপেস্ট্রি দিয়ে। দেখলে মনে হয় এটা কোনও তাঁবু। ঘরের দু'পাশে দুটো দড়ির বিছানা। ওগুলোর একটা অগোছালো, অন্যটা সুন্দর পরিপাটি। অন্যান্য আসবাব-পত্রের সঙ্গে রয়েছে কয়েকটা সিন্দুক ও প্রকাণ্ড একটা কাঠের টেবিল। তার উপর কালির দোয়াত ও পালকের কলম। কলমগুলোর উপর অংশ খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়া। টেবিলের উপর অংশে মাদার অভ পার্ল দিয়ে তৈরি জ্যামিতিক নকশা। রাজকীয়

চেয়ারের পাশে মেঝের উপর স্তূপ করা অসংখ্য বই। একটু দূরেই বুক শেলফ। প্রায় ছেঁড়া এক বাইবেলের পাশে সম্মান দিয়ে রাখা হয়েছে নকশাদার কোরআন।

বুক শেলফের পাশেই একটা অ্যালকোভ, ওখানে মেঝে থেকে শুরু করে ছাত পর্যন্ত একের পর এক সিন্দুক। একটার ডালা একটু খোলা। ওখানে আলো ফেলল রায়হান। আস্তে করে শ্বাস ফেলল। ভিতর অংশ থেকে জ্বলজ্বল করে উঠল সোনার মোহর।

এসব সিন্দুকের ওপাশে দরজা থাকতে পারে। আলো ফেলল রায়হান। না, কিছুই বোঝা গেল না। শুধু তাকে তাকে সাজানো সিন্দুক। সবচেয়ে উঁচুটা সরাতে চাইল, কিন্তু নড়ল না ওটা। নীচের সিন্দুকের মত সোনার মোহরে ভরা থাকলে, ওটার ওজন হবে কমপক্ষে পাঁচ শ' কেজি।

স্মৃতির দিকে টর্চ এগিয়ে দিল রায়হান। ওটা বগলের ভিতর গুঁজে নিল মেয়েটি, হাত দিয়ে ধরতে পারবে না।

'বেরুনোর কোনও পথ নেই,' স্বর্ণার পাশে এসে থামল রায়হান। স্বর্ণা দ্রুত হাতে রিলোড করেছে রাইফেল। ওটা বাড়িয়ে দিল রায়হানের দিকে। রাইফেল নিল রায়হান, নিচু স্বরে বলল, 'একটাই ভাল দিক, আমরা বড়লোক হয়ে মরছি। অন্তত কয়েক হাজার কোটি টাকা ওই সোনার দাম।'

'আহ্, জ্বালাতন করে না,' মুখ বাঁকাল স্বর্ণা। পিস্তল নিয়ে চলে গেল গুহার মুখে।

বাইরে এক নাগাড়ে গুলি চলছে। কান পাতল স্বর্ণা। সোহেল ভাই বোধহয় আগের জায়গা থেকে সরে গেছেন। জঙ্গিদের একে-৪৭-এর হুঙ্কারের ফাঁকে গ্লক পিস্তলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। দস্যু-তরীর স্টার্ন জ্বলন্ত চিতা হয়ে গেছে। শিখাগুলো স্পর্শ করছে গুহার ছাত। চারপাশ ভরে উঠছে ধোঁয়ায়।

নিচু স্বরে বলে চলেছে স্বর্ণা, 'সোহেল ভাই, আমরা এখানে।'

কিছুক্ষণ পেরুল, তারপর আবছা আলোর ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আমি আসছি!'

ট্যাপেস্ট্রি সরিয়ে দিল স্বর্ণা, এক পাশে সরে গেল। ছুটে এসে ভিতরে ঢুকল সোহেল। জানতে চাইল, 'বেরোবার কোনও রাস্তা পেলে?'

'না, সোহেল ভাই। একটাই ভাল খবর, আমরা বড়লোক হয়ে গেছি,' জানাল রায়হান। 'মারা গেলে হয়ে যাব বড়লোক ভূত!'

দুই জাহাজ এতই ঘেঁষে চলেছে, একটা অন্যটার উপর আর গোলা ফেলতে পারছে না। আপাতত স্টেলমেট চলছে। তবে বাড়তি ওজন ও শক্তি কাজে লাগাচ্ছে এবার মার্ভেল, তীরের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে লিবিয়ান ফ্রিগেটকে। বারবার ওটার উপর চেপে বসতে চাইছে মার্ভেল। প্রতিবার স্টারবোর্ডে সরে যেতে হচ্ছে বক্তিয়ার খিলজিকে। একটু পর পর দুঃসাহসী বা আত্মহত্যাকারী জঙ্গিরা উঠে আসছে ডেকের উপর, আরপিজি ফেলতে চাইছে ফ্রেইটারের উপর। তবে একনাগাড়ে গুলিবর্ষণ করছে মার্ভেলের .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগানগুলো, ডেকে বেরুতে দিচ্ছে না জঙ্গিদেরকে। দু'বার আরপিজি ছুঁড়েছে জঙ্গিরা, কিন্তু দু'বারই মার্ভেলের উপর দিয়ে গিয়ে সাগরে পড়েছে রকেট। ওই দুই হামলাকারী মারা পড়েছে গুলিতে।

ফ্রিগেটের করিডোরগুলোর ভিতর হুলস্থুল চলছে। ড্যামেজ-কন্ট্রোল টিমগুলো নানান দিকে ছুটছে। জাহাজের সামনের দিকে আগুন জ্বলছে, বাতাসে ভাসছে তৈলাক্ত ধোঁয়া। কাজ করছে পুরনো স্ক্রাবারগুলো, তবে পরিষ্কার হচ্ছে না বাতাস। চারপাশ থেকে আসছে অ্যালার্মের আওয়াজ। চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে অফিসাররা।

এসব আওয়াজ মধুর মত লাগছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কানে। এক অফিসারের কেবিনে খাটিয়ার সঙ্গে তাঁকে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। জানেন না চারপাশে কী ঘটছে। তবে এটা বুঝতে পারছেন, যারা তাঁকে কিডন্যাপ করেছে, তারা বিপদে পড়েছে।

এটা জানেন জঙ্গিদের ক্যাম্প থেকে তাঁকে তুলে দেয়া হয়েছে কপ্টারে। ওটা তাঁকে নামিয়ে দিয়েছে একটা জাহাজে। তখন একটা ব্যাগের ভিতর মাথা ছিল তাঁর, দেখতে পাননি কিছুই। তবে লবণাক্ত বাতাস টের পেয়েছেন।

এখন দ্রুত চলছে জাহাজের ইঞ্জিন। একটু একটু কাঁপছে খাটিয়া। ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে দুলছে জাহাজ। একটু আগেও জানতেন না, তবে এখন বুঝতে পারছেন, এরা কামান ব্যবহার করছে। এটা কোনও রণতরী। কাছেই আরেকটা রণতরী থেকে গোলা এসে লাগছে এটার গায়ে। ভাবছেন: কারা আক্রমণ করল! বাংলাদেশ নেভি নয়, এটুকু নিশ্চিত; তা হলে কারা এরা?

খুবই অবাক হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ইউনুস আল-কবিরের এতই ক্ষমতা যে লিবিয়ান রণতরী ব্যবহার করছে? স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ধারণা করেছেন, এ জাহাজের ক্রুরা ওই জঙ্গি-নেতার সংগঠনের সদস্য।

একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজ আসছে, একটু একটু করে ভাল লাগছে তাঁর। যে ধরনের যুদ্ধই চলুক, সব থামবার আগেই হয়তো তাঁকে মেরে ফেলবে এরা। তারপরও তিনি খুশি, এই ভেবে যে, এই খুনিগুলোরও অনেকেই বাঁচবে না।

প্রচণ্ড এক আওয়াজ এল, থরথর করে কাঁপতে লাগল জাহাজ। তারপর সামনের কামানের আওয়াজ থেমে গেল। প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারছেন যে-কারণেই হোক, লিবিয়ান রণতরীর সামনের কামানের টারেট বিধ্বস্ত হয়েছে।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল কেবিনের দরজা, তাঁর জেলারদের মুখ কাফিয়ে দিয়ে ঢাকা, পিঠে ঝুলছে একে-৪৭। একটু আগের ভাল অনুভূতি বিদায় নিল তাঁর মন থেকে। এখন হাতে হ্যাণ্ডকাফ নেই, দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাঁকে বিছানা থেকে তোলা হলো, টেনে বের করা হলো কেবিন থেকে।

ইউনিফর্ম পরা নাবিকরা তাঁর দিকে দ্বিতীয়বার চাইল না। জাহাজ রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে আছে। খেয়ালই নেই নতুন পাওয়া পুরস্কারের দিকে। পরপর কয়েকটা গোলা পাশে এসে লাগতেই কাত হয়ে গেল জাহাজ, ভারসাম্য হারিয়ে বালক্‌হেডের উপর পড়লেন প্রধানমন্ত্রী। বাইরে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। ওদিকে মন চলে গেল তাঁর, ঠিকভাবে খেয়ালই করলেন না তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হয়েছে একটা মাঝারি ঘরে।

ঘরের পিছনে ঝুলছে কালো চাদর। এক পাশে ভিডিও ক্যামেরা। এক লোক মস্ত তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবার তিনি সবই বুঝলেন। ঘরে আরও কয়েকজন রয়েছে। এরাও জঙ্গি, লিবিয়ান নাবিক নয়। কাফিয়ে দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ। একজন দাঁড়িয়েছে ভিডিও ক্যামেরার পিছনে। আরেকজন ঠিক করছে স্যাটালাইট-আপলিঙ্ক কন্ট্রোল। অন্য লোকগুলো এসেছে সাক্ষী হিসাবে। এদের গায়ে খাকি পোশাক। যেমন ছিল মরুভূমির বেসের জঙ্গিদের পরনে। তলোয়ার হাতে লোকটার পরনে কালো পোশাক। বোঝা গেল, এ-ই জল্লাদ।

মেস হলের অ্যালার্মের লাউডস্পিকার ডিসেবল করা হয়েছে। তবে জাহাজের অন্যান্য অংশ থেকে আসছে সতর্কধ্বনি।

'তোমাকে আর বাঁচাবে কী, ওই জাহাজ এসে তোমার মরণ আরও ঘনিয়ে দিল,' আরবিতে বলল জল্লাদ মঞ্জুর। কড়া চোখে চেয়ে রয়েছে সে প্রধানমন্ত্রীর দিকে। বিরক্ত হলো, বেয়াদব মহিলা

পাল্টা চেয়ে রয়েছে দেখে। 'মৃত্যুর জন্য তুমি তৈরি?'

'আমি সবসময়েই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।' শান্ত স্বরে বললেন প্রধানমন্ত্রী, 'শুধু দুঃখ, তোমাদের মত নীচ জানোয়ারের হাতে মরতে হচ্ছে।'

তাঁকে বসিয়ে দেয়া হলো চেয়ারে। মেঝের উপর চোখ পড়ল তাঁর। দেখতে পেলেন প্লাস্টিকের শিট পেতে রাখা হয়েছে। এক ফালি কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়া হলো মুখ। শেষ সময়ে কোনও কথা বলতে দেয়া হবে না।

ক্যামেরাম্যানের দিকে মাথা দোলাল জল্লাদ মঞ্জুর। কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখের উপর স্থির হলো লেন্স, দর্শকরা ভাল করেই দেখবে কাকে খুন করা হচ্ছে। এবার প্রধানমন্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়াল জল্লাদ, কারুকার্যময় তলোয়ার তুলে দেখাল।

'আমরা, ইমাম ইউনুস আল-কবিরের অনুসারীরা আজ পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেব ইসলাম-বিদ্বেষী এক মেয়েলোককে, যে বেপর্দা জেনানা নিজ দেশে জঙ্গি দমনের নাম করে ধার্মিক মুসলিমদের দমন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এমনকী কয়েকজন বুজুর্গ, সাচ্চা মুসলমানকে মিথ্যা দোষারোপ করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিয়েছে।' এক হাতে ধরা স্ক্রিপ্ট পড়ছে সে। 'এটা আল্লাহ্ ও ইমামের প্রতি আমাদের কর্তব্য। আমরা এই গুরু-দায়িত্ব পালন করবই। ইসলামের শত্রু এই মহিলাকে এখনই দোজখের পথে রওনা করিয়ে দেয়া হবে।'

প্রধানমন্ত্রী চাইলেন না লোকটার দিকে মনোযোগ দিতে, মাথা উঁচু করে বসে রইলেন। মনে মনে বললেন, 'হে মাবুদ, আমার কোনও ভুল হয়ে থাকলে আপনিই ক্ষমা করতে পারেন; নিশ্চয়ই একদল নর-পিশাচ কাউকে সাজা দিতে পারে না।'

মার্ভেলের ডেকে পড়ে গেছে কয়েক কমাণ্ডো, ওদিকে চাইল রানা।

বুঝতে পারছে, এখন ওদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। নিজেও ফিরতে পারবে না মার্ভেলের ডেকে। দুই জাহাজের মাঝে তৈরি হয়েছে দশ ফুট দূরত্ব। তা ছাড়া, ফিরে যেতে আসেনি ও।

ফ্রিগেটে পাঁচ কমাণ্ডো নেমেছিল, তাদের চারজন ফিরতে পেরেছে মার্ভেলে, এতে রানা খুশি। ওরা আহত ছিল। অবশ্য অন্য কমাণ্ডোকে দেখতে পেল না। কোথায় যেন সরে গেছে। ফ্রিগেটের নাবিকরা ওর দিকে ঘুরেও চাইছে না। ইউনুস আল-কবিরের সংগঠনের শীর্ষ এবং নেভির উচ্চপদস্থ দু'চারজন এই জাহাজ ব্যবহার করছে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার কাজে।

অনায়াসেই করিডোরে ঢুকে পড়ল রানা, আগে থেকে স্থির করা পথে এগুতে শুরু করল। জাহাজের ভিতর ছুটোছুটি করছে নাবিকরা, অন্য কোনও দিকে চাইবার উপায় নেই তাদের। দ্রুত পায়ে বাঁক পেরুল রানা, তারপর থামতে হলো। সামনে থেকে ছুটে এল ফায়ার-কন্ট্রোল টিম। দেয়ালে সেঁটে গিয়ে তাদেরকে যেতে দিল রানা। যে-কোনও ট্রেইণ্ড নাবিক তা-ই করবে।

'আমাদের সঙ্গে এসো,' না থেমেই ছুটছে ফায়ার টিমের লিডার।

'ক্যাপ্টেনের আদেশ,' কাঁধের উপর দিয়ে বলেই দৌড়াতে শুরু করল রানা। সামনেই পড়ল সিঁড়ি, একেক বারে তিন ধাপ করে নামতে লাগল। উপরে উঠছে এক নাবিক, তার দিকে চেয়েও দেখল না রানা, নেমে এল পরের ডেকে। মাঝারি দৌড়ে এগিয়ে চলেছে ক্রুদের মেস লক্ষ্য করে। কিন্তু মেস হলের দরজার সামনে দু'পাশে দাঁড়িয়েছে দুই প্রহরী। প্রথমজন উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে কামরার ভিতর। অন্যজন রানার দিকে চাইল, তবে ওর ইউনিফর্ম দেখে ধরে নিল, এ লোক জাহাজের নাবিক।

সামনের লোকগুলো জঙ্গি, বুঝতে দেরি হলো না রানার। এদের মুখে কাফিয়ে, কাঁধে ঝুলছে একে-৪৭ রাইফেল।

দশ কদম দূর থেকেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। মেস হলের ভিতর বলে চলেছে এক লোক: '...যারা বাড়ির ভিতর হামলা করে মেয়েমানুষ ও শিশুদের হত্যা করে, বোমা ফেলে তাদের গ্রাম-কে-গ্রাম ধ্বংস করে দেয়, ব্রাশফায়ার করে খুন করে নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে, সেই আমেরিকানদের দোসর এই মহিলা। তাকে মরতেই হবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়।'

যথেষ্ট শুনেছে রানা, আরও দুই কদম এগুলো, তার আগেই হাতে উঠে এসেছে কম্প্যাক্ট মেশিন পিস্তল। এক জঙ্গির চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো, পরক্ষণে গুলি বিঁধল কপালে। খুলি ভেদ করে বেরিয়ে গেল বুলেট, পিছনের দেয়ালে ছিটকে লাগল রক্ত ও মগজ। তার হাত থেকে খটাস্ করে পড়ল রাইফেল। তারপরই পড়ল লাশ।

তার আগেই ছুটতে শুরু করেছে রানা। এইমাত্র ঘুরে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয় জঙ্গি। তার বুকে লাগল গুলি, পিছিয়ে মেস হলের ভিতর গিয়ে পড়ল লোকটা। প্রায় একই সঙ্গে ঘরে ঢুকল রানা, দেখল ডানদিকে ছয়জন সশস্ত্র লোককে দেখিয়ে চলেছে ট্রাইপডের উপর রাখা ক্যামেরা। ভিডিও ইকুইপমেন্টের পাশে আরও দুইজন। ক্যামেরার সামনে একজন, এক হাতে কাগজ, অন্য হাতে কারুকার্যময় তলোয়ার।

তার পিছনে চেয়ারে বসে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মুখ বেঁধে রাখা হয়েছে, তবে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো।

আধ সেকেণ্ডে চারপাশ দেখে নিল রানা, ওর জানা হয়ে গেল কে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। প্রধানমন্ত্রীকে কতল করতে হলে জল্লাদকে জায়গা থেকে সরতে হবে, এবং যে দু'জন ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত, তারা ডেস্কের উপর নামিয়ে রেখেছে অস্ত্র।

পিছলে থেমে গেল রানা, পা ভাঁজ করে শুটিং পজিশনে পৌঁছে গেল। গুলি করবার সময় দ্রুত ট্রিগার টিপল। ওর প্রথম লক্ষ্য ছয়

জঙ্গি। রানা ঘরে ঢুকেছে তা সবাই বুঝবার আগেই মারা গেল দুইজন। তৃতীয়জন কাঁধ থেকে রাইফেল নামাতে গিয়ে মরল। হেকলার অ্যাণ্ড কচ্-এর ব্যারেল ছিটকে উপরে ওঠে, আর ওটা আছে ফুল অটোম্যাটিকে, পঞ্চম লোকটার কপালে ঢুকল দুটো বুলেট, মাথার পিছন থেকে ছিটকে উঠল মগজ।

এক সেকেণ্ড ট্রিগার থেকে আঙুল সরাল রানা, পরক্ষণে নিশানা ঠিক করে নিতে চাইল। তবে গুলি করেছে ষষ্ঠ লোকটা। রানার মাথা থেকে আধ ফুট দূর দিয়ে গেল বুলেট, ধাতব দেয়ালে লেগে সাদা রং তুলে চারদিকে ছুটতে লাগল।

সাইট ঠিক করেছে রানা, ট্রিগার টিপল—দুটো বুলেট লোকটাকে তুলে দিল বালক্‌হেডের কাছে। লাশ পড়বার আগেই কালো পোশাক পরা লোকটার দিকে ঘুরে গেছে রানা। আগে কখনও কাউকে এত দ্রুত নড়তে দেখেনি। ও ঘরে ঢুকে গুলি শুরু করেছে সাত সেকেণ্ডও হয়নি, অন্য কেউ হলে মাত্র বুঝতে শুরু করত কী ঘটছে।

কিন্তু তলোয়ারধারী জল্লাদ অন্য জিনিস।

রানা নড়তেই সরে গেছে সে, ঝটকা দিয়ে তুলে ফেলেছে তলোয়ার, নেমে আসছে ওটা প্রধানমন্ত্রীর গর্দান লক্ষ্য করে।

মাত্র ষষ্ঠ জঙ্গিকে গুলি করেছে রানা। অ্যাড্রেনালিন চালিত করছে ওকে, আধ সেকেণ্ড অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল—বড় দেরি করে ফেলেছে! তা-ও গুলি করল। আগে খেয়াল করেনি কখন পিস্তল বের করেছে ভিডিওগ্রাফার।

প্রচণ্ড আঘাত লাগল রানার মাথার পাশে, দুই চোখে নামছে নিকষ আঁধার!

একুশ

আধঘণ্টা হলো বক্তৃতা শুরু করেছেন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি। বারোবারের মত ঘড়ি দেখলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ ফতে আলী, আবারও চাইলেন অ্যাসিস্ট্যান্টের দিকে। সে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে, কানে গুঁজে নিয়েছে রেডিওর বাড। যতবার ওদিকে চাইছেন ফতে আলী, আস্তে করে মাথা নাড়ছে সে।

বিষয়টি লক্ষ্য করেছে সলীল সেন। খেয়াল করছে লিবিয়ান মন্ত্রীকে। আরও কিছু অভ্যেস চোখে পড়ল ওর। একটু পর পর পা বদল করে দাঁড়াচ্ছেন ফতে আলী, বারবার জ্যাকেটের পকেটে রাখছেন হাত, ঘড়ি দেখছেন। গাদ্দাফির উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছেন ডিগনিটরিরা। লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে ক্লান্ত এবং হতাশ মনে হলো।

আবারও এইডের দিকে চাইলেন। সামান্য কাত হয়ে দাঁড়াল লোকটা। বোধহয় মনোযোগ দিয়ে গাদ্দাফির বক্তব্য শুনতে হাত রাখল কানের উপর। দুই সেকেণ্ড পর সোজা হয়ে দাঁড়াল, মাথা দোলাল ফতে আলীর দিকে। ঠোঁটে ফুটে উঠেছে প্রসারিত হাসি।

'খেলা শুরু,' অ্যাম্বাসেডারের পাশ থেকে বলল সলীল সেন।

সিঁড়ির এক ধাপ উঠলেন ফতে আলী, মনোযোগ আকর্ষণ করবেন গাদ্দাফির। ঠিক তখনই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা শেষ করলেন প্রেসিডেন্ট। আরও দুই ধাপ উঠলেন ফতে আলী,

ফিসফিস করে কী যেন বললেন গাদ্দাফির কানে।

ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন গাদ্দাফি। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন,' বললেন। একটু আগে আবেগ ছিল কণ্ঠে, কিন্তু এখন অন্য কারণে কাঁপছে গলা, 'এইমাত্র আমাকে ভয়ঙ্কর এক দুঃসংবাদ দেয়া হলো...'

সঙ্গীর জন্য অনুবাদ করলেন অ্যাম্বাসেডার কামাল।

'এইমাত্র জানা গেল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আসলে ওই ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।' কথাটা সবাই শুনেছেন, এবার ঘরে গুঞ্জন উঠল। হাসিমুখে পরস্পরের ভিতর আলাপ শুরু হলো। 'প্লিয, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। প্লিয! আপনারা যা ভাবছেন, তা ঘটেনি। ওই দুর্ঘটনার পর জোর করে তাঁকে কিডন্যাপ করে সন্ত্রাসী ইউনুস আল-কবিরের অনুসারীরা। এইমাত্র শুনতে পেলাম, তারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কতল করতে চলেছে। মিনিস্টার আলী আমাকে আরও বলেছেন, এই বাড়িতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে জঙ্গিরা।'

ফরেন মিনিস্টারের পিছু নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন গাদ্দাফি। তাঁর পিছু নিলেন সবাই, স্তম্ভিত। অ্যাম্বাসেডার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে তাঁদের পিছু নিতে দিল না সলীল সেন, হাতের ইশারায় মানা করল। তিনজন রয়ে গেল এণ্ট্রি হলে, সবার কাঁধের উপর দিয়ে টেলিভিশনের দিকে চাইল। চালু করা হয়েছে প্লাজমা টেলিভিশন, চারপাশে ফেলছে ওটা ম্লান আলো। ডিগনিটরিদের মুখ থেকে সরে গেছে রক্ত। ফুঁপিয়ে উঠলেন উপস্থিত কয়েকজন আমন্ত্রিত মহিলা।

হঠাৎ মনিটরে লাফ দিয়ে উঠল একটা দৃশ্য। কালো চাদরের সামনে চেয়ারে বসে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, লালচে হয়ে গেছে চোখ দুটো। রুমাল দিয়ে শক্ত

ভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে তাঁর মুখ।

ঘরের ভিতর কাঁদতে শুরু করেছেন ভদ্রমহিলারা।

এবার দেখা গেল চেক দেয়া কাফিয়ে পরা এক লোককে। হাতে মস্ত এক তলোয়ার, আরেক হাতে পরখ করছে ওটার ধার।

'আমরা, ইমাম ইউনুস আল-কবিরের অনুসারীরা আজ পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেব ইসলাম-বিদ্বেষী এক মেয়েলোককে, যে বেপর্দা জেনানা নিজ দেশে জঙ্গি দমনের নাম করে ধার্মিক মুসলিমদের দমন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এমনকী কয়েকজন বুজুর্গ, সাচ্চা মুসলমানকে মিথ্যা দোষারোপ করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিয়েছে।' এক হাতে ধরা স্ক্রিপ্ট পড়ছে সে। 'এটা আল্লাহ্ ও ইমামের প্রতি আমাদের কর্তব্য। আমরা এই গুরু-দায়িত্ব পালন করবই। ইসলামের শত্রু এই মহিলাকে এখনই দোজখের পথে রওনা করিয়ে দেয়া হবে।'

মনোযোগ দিয়ে মোহাম্মদ ফতে আলীর মুখ দেখছে সলীল সেন। দীপ্ত মনে হলো লোকটার চোখ, চকচক করছে চেহারা। যেন অলৌকিক কিছু আশা করছে।

টেলিভিশনের উপর থেকে ছোট ক্যামেরাটা তুলে নিলেন গাদ্দাফি, মুখের সামনে ধরলেন। 'ভাই,' ভারী স্বরে বললেন, 'আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা, আপনারা আল্লাহ্‌র পথে চলুন, মানুষ হত্যা করে নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেবেন না। আসুন, আমরা চেষ্টা করি যেন দুনিয়ায় নেমে আসে শান্তি। একজনের রক্তপাত করলে বদলে আমাদেরকেও রক্ত হারাতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ওঁকে হত্যা করলে কিছুই পাবেন না। এতে কষ্ট কমবে না মুসলিম বিশ্বের আমজনতার। বরং সঠিক পথ থেকে সরে যাব আমরা। আমরা জানি শত্রুদের সাথে বসে আলোচনা করলে বেরুতে পারে শান্তির পথ। আমরা সবাই একইসঙ্গে প্রশান্তিময় জীবন পেতে পারি।'

'আল-কোরআন আমাদেরকে জানিয়েছে, অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বাস করে শান্তি মিলবে না।'

'আল-কোরআন এ-ও বলেছে, প্রতিটি প্রাণীকে ভালবাসো। আল্লাহ্ই তো মানুষকে নিজের পথ বেছে নেয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমরা কী ঘৃণার পথ বেছে নেব, না ভালবাসার? নিশ্চয়ই বুক ভরা ভালবাসা? আজ ত্রিপোলিতে দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশের শীর্ষ নেতা এসেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, হাত থেকে নামিয়ে রাখুন তলোয়ার, বাঁচতে দিন ওঁকে।'

কাফিয়ের কারণে ঢাকা পড়েছে তলোয়ারধারীর মুখ, তবে নড়বার ভঙ্গি বহু কিছুই বুঝিয়ে দিল। হঠাৎ ঝুঁকে এল জল্লাদের দুই কাঁধ, দৃশ্যপট থেকে সরে গেল তলোয়ার।

রিসেপশন হলে বারোজন লোকের পায়ের আওয়াজ ছুটে আসছে। ধুপধাপ আওয়াজ উঠছে মার্বেলের মেঝেতে।

সাধের পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে চলেছে, গাদ্দাফির হাত থেকে খপ্ করে ক্যামেরা কেড়ে নিল ফতে আলী, চিৎকার করে বলে উঠল, 'মঞ্জুর! কী করছ! আমাদের লোক পৌঁছে গেছে! খুন করো ওকে! খুন করো!'

কিন্তু তলোয়ার তুলল না জল্লাদ, বদলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে খুলছে রুমাল।

'মঞ্জুর!' গলা ফাটিয়ে বলল ফতে। 'না!'

কে যেন তার হাত থেকে কেড়ে নিল ক্যামেরা। একই সঙ্গে তার মেরুদণ্ডের উপর ঠেসে ধরল পিস্তলের মাযল। ঘুরে চাইল ফতে আলী, লোকটা বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে এসেছে।

'আপনার খেলা শেষ!' বলল সলীল, 'টিভিতে দেখুন।'

চট্ করে চাইল ফতে আলী। মনিটরে যে লোককে মঞ্জুর মনে করেছে, যাকে ভেবেছে সবচেয়ে বিশ্বাসী, সে লোক কাফিয়ে

খুলছে মুখ থেকে। কাপড় সরে যেতেই দেখা গেল লোকটার মাথায় পুরু ব্যাণ্ডেজ। এবং সে মঞ্জুর নয়!

'এ অনুষ্ঠান আপনাদের কেমন লাগল?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'হাতে-নাতে ধরা পড়েছে লিবিয়ান শয়তান,' মন্তব্য করলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির ব্যক্তিগত বডিগার্ডরা ঢুকেছে হলঘরে। তাদের নেতা রিপোর্ট দিল, একটা গুলি ছুঁড়বার আগেই বাইরের সিকিউরিটি পারসোনেলদের হাতে ধরা পড়েছে জঙ্গিরা।

আজ বিকেলে এ অপারেশন শুরু হওয়ার অনেক আগেই গাদ্দাফির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বাংলাদেশি পররাষ্ট্র মন্ত্রী, সবই খুলে বলেছেন।

সবার চোখের সামনে গ্রেফতার করা হচ্ছে মোহাম্মদ ফতে আলীকে। লোকটার দিকে চাইলেন গাদ্দাফি, নিচু স্বরে বললেন, 'তোমার শয়তানির দিন শেষ। বিকেলে অচেনা এক লোক ফোন করেছে সুইস মিলিটারি চিফকে। একটা বাড়িতে রেইড করেন তাঁরা। আগে বলতে পারিনি, গাড়ি দুর্ঘটনায় মরেনি আমার নাতি। যে বাড়িতে আটকে রেখেছিলে, সেখান থেকে ওকে উদ্ধার করা হয়েছে। ও এখন নিরাপদ। আর কখনও আমার বুকের উপর বসে তুমি যা খুশি করতে পারবে না। তোমার দিন শেষ।'

'আমি জানতাম না তুমিই ইউনুস আল-কবির। ভেবেছি ব্ল্যাকমেইল করছ নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। কিন্তু এখন দুনিয়ার সামনে বেরিয়ে এসেছে তুমি কে। তোমার অপরাধের শেষ নেই, বিচারও হবে কঠোর ভাবেই। খুব দ্রুত মরবে তুমি। আমি খুঁজে বের করব আমার সরকারে কারা তোমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাদেরকেও ছাড়া হবে না।'

দু'হাত প্রসারিত করলেন গাদ্দাফি, ঘরের সবার উদ্দেশে

বললেন, 'আমরা সবাই জঙ্গিবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। বিশ্ব-নেতাদের খুন করতে পারবে না এরা। আমি আশা করি, শান্তি মহাসম্মেলন সত্যিকারের অর্থবহ সম্মেলন হবে এবং প্রতিটি দেশ শান্তির জন্য একসঙ্গে কাজ করবে।' সিকিউরিটি পারসোনেলদের উদ্দেশে হাত নাড়লেন তিনি। 'আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নাও এই বজ্জাতকে।'

শক্তিশালী এক লিবিয়ান সৈনিক ঘাড় ধরল ফতে আলীর, আরেক হাতে ধরেছে টাই, সবার সামনে থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো লোকটাকে।

টেলিভিশনে ভেসে এল নারী কণ্ঠ, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, চমৎকার বলেছেন আপনি।' রানার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। 'সঠিক পথে চলুক শান্তি মহাসম্মেলন। আমি আগামীকাল সকালে ঠিক নয়টায় পৌঁছে যাব মিটিঙে।'

মেস হলে মাথার পাশে বুলেটের আঘাত লাগতেই ধড়াস্ করে মেঝের উপর পড়ল রানা। তার আগে যে গুলিটা করেছে সেটা একই সঙ্গে দুটো কাজ করেছে। নেমে এসেছে জল্লাদের তলোয়ার, কিন্তু ওটার পাতের উপর লেগেছে বুলেট, সরিয়ে দিয়েছে অস্ত্রটা। এবং বুলেট বিঁধেছে চেয়ারে, প্রধানমন্ত্রী সহ ছিটকে পড়েছে চেয়ার।

পাশ থেকে পিস্তল তুলে নিল রানা, গুলি করল তিনবার। বুকে গুলি খেয়ে মরল ক্যামেরাম্যান ও তার সহকারী। হাত থেকে তলোয়ার ছিটকে বেরিয়ে যেতে কয়েক পা পিছিয়ে গেছে জল্লাদ, মাথার উপর তুলল দুই হাত।

ঠিক তখনই মেস হলে ঢুকল সশস্ত্র জলিল খান।

'প্লিয!' বলে উঠল জল্লাদ, 'আমি নিরস্ত্র।'

'প্রধানমন্ত্রীর হাত খুলে দাও,' তাকে নির্দেশ দিল রানা। 'মুখ

থেকেও রুমাল খুলবে।'

লোকটা নড়বার আগেই ছরছর আওয়াজ শুনতে পেল রানা। একটু আগের বীরপুরুষ, যে-লোক নিরস্ত্র মহিলাকে খুন করতে প্রস্তুত ছিল, সে ভয়ে কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছে!

'সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে লড়ার চেয়ে নীরিহ মহিলাকে হাত-পা বেঁধে খুন করা সোজা, তাই না?' বলল রানা।

চুপচাপ দেখছে জলিল খান, ঠোঁটে টিটকারির হাসি।

জল্লাদ মঞ্জুর প্রধানমন্ত্রীর দড়ি ও মুখের রুমাল খুলে দিল।

'আপনি ঠিক আছেন, ম্যাডাম?' পরিষ্কার বাংলায় জানতে চাইল রানা।

'ম্যাডাম নয়, আপা বলো। হ্যাঁ। ঠিক আছি।' চেয়ে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর বললেন, 'আরে, তোমাকে চিনি আমি। তুমিই না নিউ ইয়র্কে নেভির পিয়ারে... কনফারেন্স হলে... হ্যাঁ, তুমিই তো সেই মাসুদ রানা!'

'আমারও মনে পড়ছে,' মৃদু হাসল রানা। প্যান্টের পকেট থেকে রেডিও বের করল। 'গগল, নবী, শুনছ তোমরা?'

'ঠিক সময়ে যোগাযোগ করেছ,' নীরস স্বরে বলল গগল।

'আমরা ওঁকে পেয়েছি। উঠে আসছি ডেকে।'

'জলদি করো। বক্তিয়ার গতি বাড়িয়েছে। তোমাদেরকে তুলে নেয়ার জন্য দু'মিনিট সময় পাব। তারপর...'

উঠে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী, ডান হাতে বাম কবজি ডলছেন। সরে গেলেন জল্লাদের কাছ থেকে। তারপর যা করলেন তার জন্য রানা তৈরি ছিল না। মঞ্জুরের দিকে চেয়ে নরম স্বরে বললেন, 'আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। হয়তো আবারও কখনও দেখা হবে আমাদের। তখন তুমি শত্রু থাকবে না, হবে বন্ধু।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'এ লোককে মেরে ফেলো না। প্লিয!'

'কিন্তু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী...' আপত্তি তুলতে গিয়েও থেমে গেল রানা।

'চলো, যাওয়া যাক,' বললেন প্রধানমন্ত্রী।

উনি দরজার দিকে পা বাড়াতেই পিছু নিয়েছে জলিল।

হাঁটতে শুরু করবার আগে একবার চাইল রানা, ডেক থেকে পিস্তল তুলছে জল্লাদ!

কমপ্যাক্ট মেশিন পিস্তল তুলল রানা, মাত্র একবার স্পর্শ করল ট্রিগার। কণ্ঠে গুলি খেয়ে ছিটকে গিয়ে ডেকে পড়ল লোকটা। ছেঁড়া গলা থেকে বেরুল ঘড়ঘড় আওয়াজ। তার ফেলে দেয়া স্ক্রিপ্ট পড়েছে টেলিভিশন ক্যামেরার পাশে, ওটা তুলে নিল রানা, একবার দেখল ক্যামেরার ব্রডকাস্টিং ফ্রিকোয়েন্সি, তারপর হাঁটতে শুরু করে চলে এল প্রধানমন্ত্রীর পাশে।

'ওকে না মারলে চলত না?' নিচু স্বরে বললেন প্রধানমন্ত্রী।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'না, আপা।' অন্য বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছে। বলল, 'এবার আমাদেরকে ছুটতে হবে, হাতে সময় নেই।' খপ্ করে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরল, হালকা চালে ছুটতে শুরু করল। কাভার দিতে পিছনে রইল জলিল খান।

সিঁড়ির দিকে ছুটছে ওরা। রানা দেখল হালকা হয়ে এসেছে চারপাশের ধোঁয়া। সিঁড়ির উপর ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়েছে দুই নাবিক। কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না তারা। তবে কাছাকাছি উঠে যাওয়ার পর তারা বুঝতে পারল মহিলা লিবিয়ান নয়। দুইজন তারা প্রধানমন্ত্রীকে ধরতে লাফিয়ে নামতে শুরু করল। ডানদিকের লোকটা রানার গুলি খেয়ে সিঁড়ির পাশ থেকে নীচে গিয়ে পড়ল। দ্বিতীয়জন কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল রানার বুকে। ভুশ্ করে শ্বাস বেরিয়ে গেল ওর। কয়েক সেকেণ্ড লাগল সামলে নিতে। তার আগেই পেটে ধপাধপ্ গোটা পাঁচেক ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটা।

রানার পিছনে রয়েছে জলিল খান, গুলি করতে পারছে না।

উদ্ধারকারীর বিপদে সাহায্য করতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী। দুই হাতে ধরলেন নাবিকের বাম হাত, প্রায় ঝুলে পড়লেন। ধাক্কা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিতে চাইল লোকটা। গত কয়েক দিনের অত্যাচারে দুর্বল হয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী, সিঁড়ির এক পাশে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। রানার চোয়ালে নেমে এল নাবিকের লাথি।

বাইরে থেকে হৈ-চৈ শোনা গেল। যেন থরথর করে কাঁপছে গোটা সিঁড়ি।

মার্ভেলের ডেকের গোপন লঞ্চ টিউব থেকে বেরিয়ে ফ্রিগেটের দিকে আসছে মিসাইল। আঁধার আকাশকে চিরে দিল আগুনের শিখা। এক্সপ্লোসিভ টিপড রকেট সংক্ষিপ্ত পথ পেরুতে শুরু করেছে।

বিকট বিস্ফোরণের সঙ্গে হিসহিস আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। আগুনে পুড়ছে ইস্পাত। একই মুহূর্তে দম নিতে পারল রানা, কুঁজো হয়ে পরের ঘুসিটা বাহুর উপর নিল, পরক্ষণে ওর ডান পায়ের লাথি পড়ল নাবিকের শিন বোনের উপর। মড়াৎ করে ভেঙে গেল হাড়।

দুই পায়ে দাঁড়াতে যেতেই ঘষা লাগল হাড়ের ভাঙা দুই অংশ, গলা ফাটানো চিৎকার ছাড়ল লোকটা। সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, পরক্ষণে হাঁটু তুলে গুঁতো দিল নাবিকের পেটে। দুই হাতে টান দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে, জলিলের ধাক্কা খেয়ে নীচে গিয়ে পড়ল লোকটা। প্রধানমন্ত্রীকে উঠতে সাহায্য করল রানা, তারপর তাঁকে নিয়ে দ্রুত পায়ে ল্যাণ্ডিঙে উঠে এল, পিছনে জলিল।

যে হ্যাচ দিয়ে ফ্রিগেটে ঢুকেছে, তা বন্ধ। হুইল ঘুরিয়ে দরজা খুলল রানা, ছিটকে বেরুল ডেকে। ভেবেছে ফ্রিগেটের পাশে থাকবে মার্ভেল, কিন্তু ওটা আছে কমপক্ষে তিরিশ ফুট দূরে। পিছনে আগুনের লেজ নিয়ে আঁধার চিরে কিলবিলে সাপের মত এল আরেকটা রকেট।

ফ্রিগেটের স্টারবোর্ডের দিক থেকে ভেসে এল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ। আগে রকেট আঘাত হানলেও এত শব্দ হয়নি। মার্ভেলের দুটো শিপ-টু-শোর রকেট আঘাত হেনেছে উপসাগরীয় টাইডাল পাওয়ার স্টেশনের প্রধান স্লুইস গেটে!

শাখা-গুহার ভিতর এসে লাগছে আটটি রাইফেলের অজস্র বুলেট। চারপাশে ছিটকে পড়ছে পাথরের কুচি, যেন খেপা ভিমরুল। তিন মিনিট পেরুনোর আগেই সোহেল, স্বর্ণা, রায়হান ও স্মৃতি সবার শরীর থেকে বেরুল রক্ত। তবে স্বর্ণা ছাড়া অন্য কেউ গুরুতর ভাবে আহত নয়।

প্রধান গুহা থেকে একনাগাড়ে গুলি আসছে। ওরা পাল্টা গুলি করবে, তা সম্ভব নয়। পাথরকুচি থেকে নিজেদেরকে আড়াল করতেই উবু হয়ে গেছে মেঝের উপর। শত শত গুলি ছুঁড়ছে জঙ্গিরা, বোধহয় নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ ছিটকে ভিতরে ঢুকল এক জঙ্গি, উন্মাদের মত চিৎকার করছে। কোমরের পাশে রাইফেল রেখে গুলি শুরু করল। দেয়ালে লাগছে বুলেট, ছিন্নভিন্ন হলো বিছানা ও শেলফের বই। আঁধারে শত্রু খুঁজতে চাইছে লোকটা। তবে সোহেলের তিন রাউণ্ড গুলি বিঁধল তার বুকে। ছিটকে পিছিয়ে গেল লাশ, আবার গিয়ে পড়ল প্রধান গুহার ভিতর।

স্রেফ কপাল, লোকটা ওদেরকে শেষ করতে পারেনি। তবে ওরা সবাই বুঝল, পরেরবার মরতে হবে। ছুটে আসবে জঙ্গিরা, মৌচাকের মত অসংখ্য ফুটো নিয়ে এখানেই পড়ে থাকবে ওদের লাশ।

নিজ অ্যামিউনিশন দেখে নিল সোহেল। ওর হার্নেসে স্পেয়ার ম্যাগাজিন নেই। পিস্তলের ভিতর মাত্র সাতটা গুলি। রায়হানের রাইফেল ও পিস্তলে গুলি নেই। রাইফেলটা ধরেছে গদার মত

করে। প্রয়োজনে ওটা নিয়ে হ্যাণ্ড-টু-হ্যাণ্ড কমব্যাট করবে। বোধহয় স্বর্ণার পিস্তলেও বেশি গুলি নেই।

তরুণ বয়স থেকে দেশের জন্য লড়ছে সোহেল। ভাবতে গিয়ে তিক্ত হাসল—ও মরবে না দেশের শ্যামল মাটিতে, বাংলার মাটিতে কবর হবে না ওর। এই পাথরের গুহার ভিতর পড়ে থাকবে লাশ। ওর দেহের উপর থুতু ফেলবে জঙ্গি ফ্যানাটিকরা। এবং পরে আরও বহু মানুষকে শেষ করবে তারা।

বড় গুহার ভিতর যেন কমে এসেছে গুলিবর্ষণ। লোকগুলো বোধহয় শেষবারের মত হামলা করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ধোঁয়া ভরা প্যাসেজ পেরুল গ্রেনেড, ঠং করে লাগল অ্যালকোভ ভরা সিন্দুকের নীচেরটায়। বিস্ফোরণের অর্ধেক চাপ সইল কাঠ, চার দিকে ছিটকে পড়ল চল্টা। চারপাশের দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ল সোনার মুদ্রা ও শ্র্যাপনেল। আবারও বেঁচে গেল ওরা, কেউ নতুন করে আহত হয়নি। তবে প্রচণ্ড কংকাশনে কাঁপতে লাগল থরথর করে। জ্বলন্ত কাঠের টুকরো পড়েছে দুই বিছানার উপর, জ্বলে উঠল লিনেনের কাপড়। ধোঁয়ায় ভরে উঠল গুহা।

স্বর্ণা কী যেন চিৎকার করে বলতে চাইল সোহেলের কানে। কিন্তু আপাতত বধির বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। এটা বুঝল, এবার আসবে জঙ্গিরা। গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ায় ওদেরকে বাগে পেয়ে গেছে, এবার শেষ করবে খেলা। নোংরার ভিতর বসে আছে সোহেল, থরথর করে কাঁপছে দেহ, আঙুল চলে গেল পিস্তলের ট্রিগারে। আয় শালারা, আমরা তো মরেইছি, তোদেরও ক'জনকে নিয়ে যাই!

কিন্তু এক এক করে কয়েক মিনিট পেরুল। সাত জঙ্গির মাত্র দুই একজন এখনও গুলি করছে গুহার ভিতর। ওরা অপেক্ষা করছে, ভাবল সোহেল। এই ধোঁয়াই ওদেরকে বেরুতে বাধ্য

করবে। অথবা জঙ্গিরা ভাবছে, আগুনই শেষ করবে ওদেরকে।

চিত হয়ে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল সোহেল, ধোঁয়ার ভিতর শ্বাস নিতে চাইছে। প্রতিবার দম নিতে গেলে জ্বলে উঠছে ফুসফুস। তিক্ত মনে ভাবল সোহেল, হারিস জামানের লোকদের ইচ্ছাপূরণ হবে। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না ওরা। আবছা আলোয় স্বর্ণা ও রায়হানকে দেখল। ঠিক যেন ওর মত করেই ভাবছে ওরা। যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল সোহেল। মরলে তো একবারই মরব! ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল, পাশে উঠে দাঁড়িয়েছে স্বর্ণা ও রায়হানও।

'আজ আমাদের জীবনের শেষ দিন, হয়তো কখনও আর দেখা হবে না,' বলল সোহেল।

'তা-ই, সোহেল ভাই,' তিক্ত হাসল স্বর্ণা।

'বিদায় আপনাদেরকে,' বলল রায়হান। 'কোনও দোষ করে থাকলে মাফ করে দেবেন, সোহেল ভাই, স্বর্ণা।'

'একসঙ্গে বেরুব আমরা,' বলল সোহেল। পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল, তারপর পিস্তল বাগিয়ে ধরে ছুটতে শুরু করল। পাশে চলেছে স্বর্ণা ও রায়হান।

গুহা-মুখের পাঁচ ফুট দূরে চলে এল ওরা, তাও গুলি আসছে না। ছিটকে বেরুল তিনজন, কাঁপা আলোয় টার্গেট খুঁজল সোহেল ও স্বর্ণা। রায়হান দুই হাতে গদার মত ধরে আছে রাইফেল। দূরে জ্বলছে জলদস্যু-জাহাজ। ওদের দিকে ছুটে আসছে না কেউ। কয়েক ফুট দূরে পড়ে আছে এক জঙ্গি। দুই শোল্ডার ব্লেড গ্রিল করে দিয়েছে বুলেট। একটু দূরে অন্য জঙ্গিদেরকে দেখতে পেল ওরা। বুঝল না কীভাবে শেষ হলো এরা। গুহার মেঝের উপর পড়ে আছে জঙ্গিদের লাশ। দৌড় থামাল সোহেল-স্বর্ণা-রায়হান। চমকে গেছে। গুণে দেখল পড়ে আছে আট জঙ্গি।

কখনও কুসংস্কার বিশ্বাস করেনি, কিন্তু এখন শিরশির করে উঠল সোহেলের মেরুদণ্ড।

এক জঙ্গি এখনও মারা যায়নি, বালি খামচে ধরে শ্বাস নিতে চাইছে। প্রথমজনের মতই, ওর পিঠেও গুলি লেগেছে। লাথি দিয়ে লোকটার হাতের কাছ থেকে রাইফেল সরিয়ে দিল রায়হান, দুই হাতে চিত করল তাকে। জঙ্গির ঠোঁটে জমছে রক্তাক্ত ফেনা। ফুসফুসে লেগেছে বুলেট। শ্বাস নিতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে।

জোড়া ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল হারিস জামান, 'কী করে?'

'আমরাও জানি না,' ঢোক গিলে বলল রায়হান।

'আমি বলতে পারি,' ক্যাপ্টেন নিশাতের একটু পুরুষালি কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা, 'এই চলে এলাম আর কী!'

'নিশাত আপা?' হেসে ফেলল সোহেল।

'আপনারা কেমন আছেন, স্যর?' কাভার পজিশন থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন নিশাত। দুই হাতে ধরেছে কক করা রাইফেল। মুখের বেশির ভাগই ঢেকে রেখেছে নাইট ভিশন গগলস। ওটা খুলে ফেলল। 'যতটা সম্ভব দ্রুত এসেছি, তবে তাতে একটু সময় লেগেছে।'

বিশালদেহিনী নিশাতের কাঁধে হাত রাখল সোহেল। 'দারুণ দেখালেন, আপা।'

নিশাতের পিঠ ফাটিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে যেন রায়হান, চাপড়ের পর চাপড় পড়ছে বেচারির পিঠে।

'অ্যাই ছোকরা!' খেপে গিয়ে ধমক দিল নিশাত। 'আর একটা চাপড় মারলে এক চড়ে তোর বত্রিশ দাঁত ফেলে দেব!'

থতমত খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল রায়হান। হাসতে শুরু করেছে সোহেল, স্বর্ণা ও নিশাত। কয়েক সেকেণ্ড পর হেসে ফেলল রায়হানও।

'আপনারা নিজেরা তো খেলা দেখিয়ে দিয়েছেন,' বলল নিশাত।

পাশের গুহা থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছে স্মৃতি। শার্ট আগেই হারিয়েছে, ধুলো ও ময়লায় কালো হয়ে আছে ব্রেসিয়ার। আহত হাতে ধরে রেখেছে কয়েকটা বই। আগুন ধরে গেছে পাতাগুলোয়। চট্ করে বইগুলো নিল রায়হান, বালির উপর ফেলে দিল। দুই হাতে ওগুলোর উপর ফেলছে বালি। কয়েক মুহূর্ত পর নিভে গেল আগুন।

'আমি যদি আরও সরাতে পারতাম,' কাশির ফাঁকে আফসোস করল স্মৃতি। 'কিন্তু ওই ধোঁয়া... আর পারলাম না। অবশ্য, এটা পেয়েছি।'

'ওটা কী?' জানতে চাইল নিশাত।

সামনে হাত বাড়িয়ে দিল স্মৃতি, তালুর উপর একটা রূপার চেইন। ওটার সঙ্গে ঝুলছে খুদে এক বই। 'সত্যিকারের ইউনুস আল-কবিরের ফতোয়া। কাভার পুড়ে গেছে। আগুনের শিখার কারণেই দেখতে পেলাম বিছানার উপর একটা মামি। ওটার মাথা মক্কার দিকে। তখনই বুঝলাম উনিই সেই ইমাম। উনি মারা গেলে ওখানেই শুইয়ে দেন জেফ মার্টেল, এবং সব ধনরত্ন ফেলে চলে যান। বোধহয় প্রায় দুই শ' বছর হলো, এরপর আমরা এলাম এই গুহায়।'

টাইডাল স্টেশনের ওপাশে মরুভূমির খুব নিচু জমি। ওখান থেকে দূরে এক শ' ফুট চওড়া জেনারেটিং প্ল্যান্টের বিশাল ইস্পাতের গেট। ফ্যাসিলিটি যখন ফুল ক্যাপাসিটি নিয়ে কাজ করে, ওই গেট নামিয়ে দেয়া হয় পানির তিরিশ ফুট নীচে। বিপুল পরিমাণ পানি গলগল করে ঢোকে বিশাল মোটা পাইপগুলোর ভিতর, ওগুলোর মাধ্যমে এক শ' ফুট নীচে পৌঁছে

যায় পানি টারবাইন রুমে। এখন পশ্চিমে প্রা[illegible] আপাতত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ইস্পাতের গেট। [illegible] এখন স্তব্ধ, সূর্য উঠবার পর মরুভূমি থেকে বাড়তি [illegible] নেবে ক্রুরা। এটাই এই ফ্যাসিলিটির বৈশিষ্ট্য, [illegible] জেনারেটিং প্লান্ট একেই বলে।

মার্ভেল থেকে আসা দুই মিসাইল ফ্রিগেটকে ডিঙিয়ে [illegible] হেনেছে গেট কন্ট্রোলের মেশিনারির উপর। ছিটকে পড়েছে হাইড্রলিক সিস্টেম, যে গিয়ার মেকানিকাল ব্রেকের কাজ করে, ওটা বিকল হয়েছে। এগুলোকে ডিজাইন করা হয়েছে যেন সাগরের বিপুল চাপ সইতে পারে, কিন্তু এখন কোনও সিস্টেম বা গিয়ার কাজ করছে না। বাইরের প্রচণ্ড চাপ খেয়ে নামতে লাগল ভারী গেট। ওপাশেই মানব-সৃষ্ট গভীর গহ্বর।

প্রথমে গেটের উপর দিয়ে সরু রেখায় ঢুকল সাগরের ঢেউ, তারপরই ভারী বৃষ্টির পর্দার মত ছিটকে ঢুকতে লাগল পানি। অনেক নীচের দিকে ছুটছে পানি। ভূমধ্য সাগর বাইরে থেকে চাপ তৈরি করছে গেটের উপর। দ্রুত নামতে লাগল ইস্পাতের দরজা, প্রচণ্ড চাপ পড়ছে ওটার উপর। আরও তাড়াতাড়ি নামছে এখন। ফাঁকা পথ পেয়ে ঢুকতে লাগল মিলিয়ন মিলিয়ন টন পানি। যে পাইপগুলো পাওয়ার হাউসকে পানি সরবরাহ করে, সেগুলো এখন বন্ধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে না টারবাইন। কাজেই অনেক নীচে মরুভূমির বিশাল গহ্বরে গিয়ে পড়ছে সমস্ত পানি।

এই প্লান্ট যখন কাজ করে, তখনও জানিয়ে দেয়া হয়, যেন দুই মাইলের ভিতর কোনও জাহাজ না আসে। কিন্তু এখন ওই নিয়ম খুশি মনে অমান্য করেছে গগল। প্রায় ধাক্কিয়ে বক্তিয়ার খিলজিকে সঠিক পজিশনে নিয়ে এসেছে ও। ঠিক সময়ে মিসাইল ছুঁড়েছে নবী।

ওরা এখন অপারেশন্স সেন্টারে, মেইন স্ক্রিনে দেখছে ফ্রিগেটের ওপাশে সাগরের বুকে তৈরি হয়েছে বিশাল এক গর্ত। মার্ভেলের কন্ট্রোল নিয়ে কাজ শুরু করেছে গগল। ওর প্রিয় জাহাজ টান খেয়ে চলে যেতে চাইছে আরেক দিকে।

প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাকের ভিতর পড়ে মার্ভেলের কাছ থেকে দ্রুত সরছে ফ্রিগেট, ওটাকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে খেপা সাগর। মনে হলো ফ্রিগেট যেন বিশাল গর্তের দিকে ছুটছে। ডিরেকশনাল থ্রাস্টার কাজে লাগাল গগল, কমিয়ে আনল দুই জাহাজের দূরত্ব। বারবার দেখছে মেইন ভিউ স্ক্রিন। এখনও দেখা নেই রানার!

'রানা!' বিড়বিড় করে বলল গগল, 'জলদি, ভাই!'

এর এক সেকেণ্ড পর ফ্রিগেটের হ্যাচওয়ে খুলে গেল, ছিটকে বেরুল রানা, টেনে নিয়ে আসছে একজনকে। পিছনে ছুটছে জলিল খান। মার্ভেলের সরবার অ্যাংগেল বাড়াল গগল, দ্রুত চেপে এল ফ্রিগেটের দিকে। পাশাপাশি হয়ে গেল দুই জাহাজ। ঘষা খেয়ে উঠছে রং। বক্তিয়ারের রেলিঙে উঠে পড়ল রানা, প্রধানমন্ত্রীকে পিছন থেকে তুলে নিল জলিল। তারপর নিজে টপকে চলে এল মার্ভেলে, নামিয়ে নিল প্রধানমন্ত্রীকে। প্রায় একই সঙ্গে এ জাহাজে নামল রানা। অপেক্ষা করছে পাঁচ কমাণ্ডো, তারা সরিয়ে নিল ভদ্রমহিলাকে।

রানারা ডেকে নামতেই মার্ভেল সরিয়ে নিয়েছে গগল, টান খেয়ে গহ্বরের দিকে ধেয়ে চলেছে লিবিয়ান ফ্রিগেট। থ্রটল পুরো খুলে দিয়েছে গগল। বক্তিয়ার খিলজিও প্রাণপণ চেষ্টা করছে ঘূর্ণিপাক থেকে সরে যেতে। চিমনি থেকে বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া, দ্রুত পানি কাটছে প্রপেলার, তবে প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে টান, ওটাকে নিয়ে চলেছে খোলা গেটের দিকে।

মার্ভেলের ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিনের বিপুল

শক্তি ফ্রিগেটের ইঞ্জিনের দশ গুণ, ওটার টিউবগুলোর ভিতর পানি ঢুকতেই সাগরের টান থমকে গেল, সরে যেতে লাগল মার্ভেল। গগল প্রয়োজনের বেশি খাটাতে চাইল না ইঞ্জিনকে, একটু কমাল গতি। প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে ও এই জাহাজটিকে।

বক্তিয়ার খিলজির খোল আড়াআড়ি ভাবে আছড়ে পড়ল খোলা স্লুইস গেটের ইনটেকে। ওটার কিলের নীচ দিয়ে হু-হু করে ঢুকছে পানি। কিন্তু পানির স্রোত বাধা পাচ্ছে খোলে। বিতিকিচ্ছিরি ভাবে আটকা পড়ল ফ্রিগেট, প্রবল চাপে মড়মড় আওয়াজ তুলল স্টিলের খোল। ভেস্তে গেছে লিবিয়ান জঙ্গিদের সব পরিকল্পনা। কিছুই করতে পারছে না নাবিকরা, তাদের ফ্রিগেটের ইঞ্জিন এখন আর এগুতে পারছে না।

একটু আগে আরপিজি হামলার সময় সুপারস্ট্রাকচারের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে মার্ভেলের অপারেটিভরা, কিন্তু এখন রানা ও ওর অতিথিকে ঘিরে ফেলল ওরা। সঠিক সময়ে মেডিক্যাল স্টাফদের নিয়ে হাজির হতে পারেনি ডক্টর ফারা, পৌঁছে দেখল রানা ছাড়া আর কেউ আহত হয়নি।

হাসছে জলিল খান, বলল, 'স্বাগতম আমাদের জাহাজে, প্রধানমন্ত্রী।'

ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলেন প্রধানমন্ত্রী, তবে হাতটা শক্ত করে ধরলেন রানার। 'সত্যি ধন্যবাদ তোমাকে।'

'আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা,' বলল রানা। 'অভিনয় করেছেন কখনও?'

ভুরু কুঁচকালেন ভদ্রমহিলা। 'অভিনয়?'

'জী। ওটা শিখতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে।' হাতের ইশারায় পথ দেখাল রানা। 'চিন্তা করবেন না, আপনার নিজের চরিত্রেই অভিনয় করবেন। আমরা শুধু একটা দৃশ্য তৈরি করব

মোহাম্মদ ফতে আলীর জন্যে।'

'আপনি জানেন সে কে?'

'হ্যাঁ। এ-ও জানি, কী করে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির উপর চাপ তৈরি করেছে। তাঁর নাতি সুইটযারল্যাণ্ডে ছুটিতে ছিল। গাড়ি থেকে কিডন্যাপ করা হয় তাকে। দুর্ঘটনা ঘটানো হয় ওই গাড়ি দিয়ে। জানিয়ে দেয়া হয় গাদ্দাফি যদি নাতিকে বাঁচাতে চান, মোহাম্মদ ফতে আলীকে ফরেন মিনিস্টার করতে হবে। ভদ্রলোক বুঝতে পারেননি দুনিয়ার অন্যতম টেরোরিস্টকে নিজ সরকারের এত গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিয়েছেন। তখন থেকে যা খুশি করছে লোকটা।'

'তুমি এসবের সঙ্গে জড়িত হলে কীভাবে?' জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।

মৃদু হাসল রানা। 'বোধহয় কপালের ফেরে।'

পেরিয়ে গেল সাতটা দিন।

মার্ভেলের সিনিয়র স্টাফরা এসে সমবেত হয়েছে হেলিপ্যাডের পাশে। এইমাত্র ফিরছেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ। ত্রিপোলির হাসপাতাল থেকে কাশেম বক্সকে নিয়ে আসছেন তিনি। ফারার সামনে হুইল চেয়ার, মুখ ফিরিয়ে চাইল। মার্ভেলের ফ্যানটেইল নীচে রেখে হাজির হলো এমডি-৫২০এন কপ্টার।

প্যাডের ঠিক মাঝে নামল স্কিডগুলো। টারবাইন বন্ধ করে দিলেন আলম সিরাজ। সবাই ছুটে গিয়ে ঘুরন্ত রোটরের নীচে চলে গেল। রানা টোকা দিল রিয়ার ডোর গ্লাসে। সিটে বসে আছে কাশেম বক্স, সবাইকে দেখে চওড়া হাসি ফুটে উঠল মুখে। ওর বুকে ভারী ব্যাণ্ডেজ। পাঁচ ঘণ্টা অপারেশন করা হয়েছে কাশেমের বুকে। হারিস জামানের গুলি ওর ভিতরের অর্গ্যান

ক্ষতিগ্রস্ত করে। পুরো এক সপ্তাহ পড়ে থেকেছে হাসপাতালে আর লিবিয়ানদের খাবার খেয়ে ওর মনে হয়েছে, [illegible] আর বাঁচবে না। ডাক্তার ছেড়ে দেয়ার পরই আবার বলেছে মার্ভেলে ফিরে বাবুর্চি মোস্তফা আবুলের কাবাব না খেলে মারাই যাবে।

এখন মার্ভেলে পৌঁছে হাসি থামছে না ওর।

সবাই ওরা জানে, আজ পর্যন্ত যত মিশনে গেছে, সেগুলোর ভিতর এবারেরটাই সবচেয়ে কঠিন ছিল। সেদিন ভোরে চার লাইফবোটের সঙ্গে রন্দেভু করেছে মার্ভেল, তুলে নিয়েছে সবাইকে। এরই মধ্যে নিজ পদ ফিরে পেয়েছেন ফরেন মিনিস্টার। যোগ দিয়েছেন শান্তি মহাসম্মেলনে।

কদিন আগেই সোহেল ও অন্যদেরকে পাহাড়ি গুহার পাশ থেকে তুলে এনেছেন আলম সিরাজ। সোহেলরা গুহা থেকে বেরুতে গিয়ে দেখে ব্রাম ট্যাগার্টকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। মুখ বাঁধা ছিল কাপড় দিয়ে, ওটা খুলতেই ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে থাকে। নিশাতের ভয়ঙ্কর ধমক খেয়ে শেষে ফিঁউ-ফিঁউ আওয়াজ তুলে থেমে যায়।

যে কমাণ্ডোরা মার্ভেল থেকে বক্তিয়ার খিলজিতে উঠতে গিয়ে আহত হয়, তারা এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠছে। যে দু'জন সাগরে পড়ে যায়, তাদেরকে উদ্ধার করে যোডিয়াক। মুক্তির দুই হাত ও স্বর্ণার কাঁধের ক্ষত সেরে উঠছে। সোহেলের দলের সবার শরীর থেকে এক ছটাক পাথরের কুচি বের করেছে ফারা।

মার্ভেলে মাত্র এক রাত ছিল মুক্তি, তারপর ফিরে গেছে আমেরিকায়। বাংলাদেশি, লিবিয়ান ও তিউনিশিয়ান ত্রিদেশি একটি আর্কিওলজিকাল টিম গেছে ইউনুস আল-কবিরের সেই গুহায়। মহান জলদস্যুর জাহাজটা একেবারেই পুড়ে ছাই হয়ে

গেছে। আগুন থেকে রক্ষা পায়নি মানুষটার দেহ, সিন্দুক, বই ও আসবাবপত্র। ওই গুহার মেঝেতে পড়ে ছিল হাজার হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা ও হীরা-মণিমুক্তা। বারবারির জলদস্যুদের কাছে এসব এসেছে ইউরোপের দেশগুলো থেকে। পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকেও বহু আগের স্বর্ণ-মুদ্রা পেয়েছেন ইউনুস আল-কবির। ওগুলোর মূল্য সাধারণ সোনার কমপক্ষে ত্রিশ গুণ।

ত্রিপোলি শান্তি মহাসম্মেলনে নেতারা ঘোষণা দিয়েছেন, এসব সম্পদ বিক্রি করে তৈরি করা হবে দরিদ্রদের জন্য ফাণ্ড। শুধু তা-ই নয়, বৈঠকে বসে একের পর এক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছেন তাঁরা।

অন্তত দশটা হাত এগিয়ে গেল কাশেম বক্সকে নামাতে। কপ্টারের দরজা খুলে যেতেই তাকে আস্তে করে নামিয়ে দেয়া হলো হুইলচেয়ারে।

'তোমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে না,' বলল রানা।

'আমারও মনে হচ্ছে না, মাসুদ ভাই,' হাসল কাশেম। 'তবে জানি না কোনটা বেশি খারাপ, গাধা হয়ে যাওয়া, নাকি গুলি খাওয়া। লোকটা বলেছিল ও সিআইএ এজেন্ট!'

'যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে,' বলল সোহেল। 'ওই ফুসফুসে আঘাত খেয়েই মরেছে।'

আর্কিওলজিকাল ফাইণ্ড হিসাবে পাওয়া গেছে কয়েকটা বই এবং ইমাম ইউনুস আল-কবিরের নিজ হাতে লেখা ফতোয়া। ওখানে বিস্তারিত ভাবে লেখা হয়েছে খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের মানুষ কীভাবে পাশাপাশি বাস করতে পারে। এরই মধ্যে পরীক্ষা করা হয়েছে লেখাগুলোকে। সেসব ইমামের নিজ হাতেরই লেখা, পশ্চিমারা নকল কিছু লিখে মানুষকে ধাপ্পা দেয়নি। মহাসম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ফতোয়াগুলো

পড়ে শুনিয়েছেন।

বিশ্ব-নেতারা আশা করছেন, এর ফলে বিলুপ্ত হবে ধর্মের নামে টেরোরিজম। তবে রানা তা মনে করে না। ওর সঙ্গে একমত সোহেলও। মানুষ যতদিন অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে না, ততদিন নানান বিবাদ তৈরি হতেই থাকবে।

কাশেম বক্সের হুইল চেয়ারের পিছু নিল সবাই। ওরা জানে, যতদিন অত্যাচারীরা সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন করবে, ততদিন ওদের মত যোদ্ধা মানুষের প্রয়োজন পড়বে।

(সমাপ্ত)